বিক্রমপুর

পঞ্চম বর্ষ } বৈশাখ, ১৩২৪ { ১ম সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণ।

যে শিব মঙ্গলময় নিত্যশান্তি নিকেতন,
স্মরিলে যাহায় হয় অশিব অবিদ্যা দূর।
স্বাত্মরূপে যেই শিবে করে যোগী দরশন,
নববর্ষে তাঁর বর বরিছে "বিক্রমপুর।"

পুষ্পিত ফলিত তরু রম্য হর্ম্ম্য সুশোভিত
তট যার, ভাঙ্গিলেও তটিনী-প্রবাহ ক্রুর।
শস্যদ শ্যামল শত দ্বীপ হয় অভ্যুদিত,
সে পুরের যশোগাথা গাহিছে "বিক্রমপুর।"

যথায় জ্যোতিষ ন্যায় অশেষ শাস্ত্র আকর,
জাত যথা "মণিরত্ন" যেন দীপ্ত কোহিনুর।
জন্মিয়াছে ব্রহ্মানন্দ আর কত যোগিবর,
সে পুরের যশোগানে যশস্বি "বিক্রমপুর।"

যথায় কেদার, চাঁদ বীরেন্দ্র রাজন্যগণ,
করিয়াছে বাহুবলে বিপক্ষের দর্পচূর।
ভয়ে মগ, পর্ত্তুগীজ করিয়াছে পলায়ন,
সে পুরের গর্ব্বে সদা গর্ব্বিত "বিক্রমপুর।"

পাদপে যে দেয় ভাষা পাষাণে প্রদানে প্রাণ,
গাহিছে জগৎ যার যশোগীতি সুমধুর।
বিজ্ঞান-বীরেশ সেই 'জগদীশ' জন্মস্থান
যেই পুর, তার হর্ষে হর্ষিত "বিক্রমপুর।"

ছিন্ন করি স্মৃতিপাশ ধায় দিগ্ দিগন্তরে
অসংখ্য সন্তান যার উচ্চশিক্ষাকাঙ্ক্ষিশূর,
বিচিত্র বিজ্ঞান বিদ্যা যশোধন লাভ করে,
সে পুরের সুখে সুখী সতত "বিক্রমপুর।"

কিন্তু এ বিশ্বসংসারে সর্ব্ববস্তু দোষান্বিত,
অঙ্কিত শশাঙ্ক অঙ্কে কলঙ্ক অঙ্কপ্রচুর।
এপুরও নহে পূর্ণ, নহে দোষ বিরহিত,
সেই দোষ দরশনে বিষণ্ণ "বিক্রমপুর।"

যাতে পল্লিবাসিগণ ক্রমশঃ প্রবুদ্ধ হয়,
কুরীতি কুপ্রথাসহ অসত্য প্রত্যয় দূর,
শিল্পের উন্নতি হয় শিক্ষালাভ সর্ব্বময়,
তাহাতে জীবনার্পণ করিল "বিক্রমপুর।"

সোঽহং স্বামী।

নববর্ষের অভিভাষণ।

কবি গাহিয়াছেন, "আপনার বেগে, আপনার মনে,
কোথায় বরষ চলিয়া যায়
অপূর্ণ বাসনা রহিল কাহার
দেখিতে বারেক ফিরি' না চায়।"

কবির এই ধ্রুব সত্যবাণী মানবমাত্রেরই জীবনে পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সময় চলিয়া যায়, বর্ষ চলিয়া যায়, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার গতি-চক্রে নিয়ত ঘূর্ণামান, কেহ কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, সকলেই আপনা আপনি চলিয়া যাইতেছে। যে গিরিনির্ঝরিণীকে দেখিয়াছিলাম—তুষার কিরিট-মণ্ডিত, অভ্রভেদি গিরিশৃঙ্গ হইতে অতিভয়ে, অতি সন্তর্পণে চঞ্চলা-বালিকার মত লুটিয়া ছুটিয়া পড়িয়া, নাচিতে নাচিতে বহিয়া আসিতেছে, কাল তাহাকে দেখিলাম বিরাটকায়া তরঙ্গমালিনী ভীমা ভয়ঙ্করারূপে অনন্ত বিস্তৃত নীলাম্বুরাশির বুকে সে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। এই খানেই নদীর পরিণতি। কাল যে ক্ষুদ্র বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি দেখিয়াছিলাম, সেদিন, কয়েক বৎসর পরে, দেখিলাম সে আর ক্ষুদ্র বৃক্ষ-শিশুটী নাই,—বিস্তৃত সবুজ-সুন্দর প্রান্তর মধ্যে সে আপনার মহিমায় সমুন্নত দেহে বিদ্যমান। পত্র-পল্লবে তাহার অপূর্ব্ব শোভা, সুপক্ক ফলে তাহার অপূর্ব্ব মাধুরী, শত শত বিহঙ্গকুল তাহার শাখায় নীড় বাঁধিয়াছে, শত শত শ্রান্তক্লান্ত পান্থ তাহার সুশীতল ছায়ায় বিশ্রামলাভ করিতেছে, শত শত ক্ষুধার্ত্ত মানব তাহার সুস্বাদু সুপক্ক ফল গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে। এইখানেই তরুজীবনের সার্থকতা। আর আমরা মানব, বিশ্বজগতের সারসৃষ্টি, অসীম কর্ত্তব্য, জগতের সারসত্য—জ্ঞানের অপূর্ব্ব মহিমা, প্রীতি, প্রেম, ভক্তি ও সৌন্দর্য্য—ইহা লইয়াই আমাদের জীবন। জীবনের সার্থকতা কোথায়? সাফল্য কোথায়? তাহা নির্ণয় করিয়া লইয়া বিশ্বজগতের কর্মক্ষেত্রে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়াই মানব-জীবনের সারসত্য। আপনার চিন্তায়, আপনার ভাবে, বিভোর হইয়া গিরিশৃঙ্গের মত অচল অটলভাবে ধ্যানীমৌন রহিয়া কাজ করাই সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ সাধনা। যেখানে সাধনা নাই, সেখানে সিদ্ধি আসিতে পারে না।

এই সাধনার জন্যই আমাদের আকাঙ্ক্ষা, এই সাধনাকে আয়ত্ত করিবার জন্যই আমাদের বাসনা,' এই সাধনার পুণ্য-তন্ত্রী হৃদয় বীণার তারে তারে ঝঙ্কৃত করিয়া সেই বিনোদবীণার মধুর তান-লহরী দিকে দিকে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে, প্রাণে প্রাণে, অনুভূতির মোহন মন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়া দিয়া প্রকৃত কর্ম্মকেন্দ্রে মনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই আমাদের এই চারিবছরের প্রাণের সাধনা। জানিনা এই সাধনা-পথে আমরা কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি।

* * *

অতীত চলিয়া গিয়াছে, আজ তাহাকে চোখের জলে বিদায় দিতেছি। আর কি করিব ? যে ভুল, যে ত্রুটী করিয়াছি, যে পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, তাহার সাথে সাথে গ্রহণ করিয়াছি, তাহাত আর দূর করিতে পারিব না। সে যে বেদনা দিয়াছিল, তাহা নীরবে বহন করিয়াছি, সে যে হর্ষ দিয়াছিল তাহা হাসিমুখে ভোগ করিয়াছি। আজ তাই তাহাকে বিদায় দিতে,—

"প্রেম-জলে ডুবু ডুবু লোচন-তারা
প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা।"

এখন হে নবীন বর্ষ, হে নূতন সখা! এস! আজ তোমাকে আশার স্বপ্ন বুকে লইয়া দেখিতেছি। আজ যে তুমি বড় সুন্দর, আজ নয়ন-নিগম-নিগূঢ় প্রেম-ভক্তি পুলকচিত্তে আমার নয়ন তোমাকে দেখিতেছে, আজ তুমি অপূর্ব্ব সুন্দর, আজ তোমার

"কমল জিনিয়া আঁখি শোভাকরে মুখ-শশি,
করুণায় সবাপানে চায়,
বাহু পশারিয়া বলে, আইস আইস করি কোলে,
প্রেম ধন সবারে বিলায়।"

* * *

আজ 'বিক্রমপুর' পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। ইহাতে বিক্রমপুর-বাসী মাত্রেরই গৌরব করিবার হেতু আছে। আমরা নানারূপ বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া যে আজ চারিবৎসর কাল কাগজ খানাকে পরিচালিত করিতে পারিয়াছি, সে জন্য সর্ব্বাগ্রে জগদীশ্বরের চরণে আমাদের আন্তরিক ভক্তি জ্ঞাপন করিতেছি। তারপর যে সকল মহাত্মা নানাভাবে আমাদিগকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন

তাঁহাদিগকে আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। বিক্রমপুরবাসী ও বঙ্গদেশের যে সকল খ্যাতনামা প্রবীণ ও নবীন লেখক আমাদের পত্রিকা পরিচালনায় বিবিধ রচনাদ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি, আশা করি এ বৎসরও তাহাদের সেই স্নেহ অটুট থাকিবে। বিক্রমপুরের সর্ব্ববিধ উন্নতি মূলক প্রচেষ্টার যথাসাধ্য সহায়তার নিমিত্ত এবং যাহাতে বিক্রমপুরবাসী লোকমাত্রেই দেশের উন্নতি কল্পে তাহাদের স্বাধীন চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করিতে পারেন সে জন্যই "বিক্রমপুরে"র প্রচার। একাজ আমাদের একার নহে,—দেশের সকলের। কাজেই যিনি যে ভাবে পারেন আমাদিগকে সাহায্য করুন। সকলের সমবেত চেষ্টা ও যত্ন ব্যতীত আমরা কখনও এই বহু আয়াসসাধ্য ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে পারিবনা। আমরা শুধু বিদুরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ কণাদ্বারা বিশ্বপতি শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুধা দুর করিবার মত আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি, সামর্থ্য ও অতি সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া দেশ-জননীর সেবায় ব্রতী হইয়াছি। আমাদের এই সেবা সামান্যতঃ সার্থক হইলেই আমরা ধন্য হইব। আমরা প্রতি নিয়ত এই মূলমন্ত্রটুকু বুকে লইয়া কাজ করিতেছি যে,—

"ছাড়িসনে, ধরে থাক্ এঁটে,
ওরে হবে তোর জয়!
অন্ধকার যায় বুঝি কেটে
ওরে আর নেই ভয়।"

জাপানের কথা।

ইয়াকোহামা। ১৯।৬।১৬।

(১)

টোকিও থেকে টাট্‌কা এখানে এসেছি। আর্টের ঝুনো জহুরি—পাকা সমজ্‌দার—অযুতের অধিপতি মিঃ হারার প্রকাণ্ড হাবেলীর ভেতর আমরা ডেরা-ডাণ্ডা ফেলে গট্ হয়ে বসে গেছি। এ একটা কাঠের "প্রবালসৌধছবি" অথচ রঙীন রঙমহল।

জাপানে এসে অবধি হারার নামটাই প্রাণের পর্দ্দায় পর্দ্দায় বাজছিল। আজ "হারা"নিধি পেয়ে সমস্ত ফাঁক্‌গুলি সুরে ভরে উঠ্‌ল। পিপাসা দূর হলো। হারা একটা বড় রকমের কুবের বটেন। তা'বলে লক্ষ্মীছাড়া গোছের লক্ষ্মীন্দর নন। সেখানে পেঁচার চেঁচামিচি কিংবা খিটিমিটি আদৌ নেই—কেবলি "কোয়েলা কুহু বোলে", লক্ষ্মীঠাকুরুণ লোহার সিন্দুক ছেড়ে কমলবনেই বেশীর ভাগ কেলী করে বেড়ান। হারা সাহেব মোটেই বখিল নহেন; রসিকের জন্য হামেসা খিল খুলে রেখেচেন।

এই অপূর্ব্ব এমারত্‌টা গোটা আমাদের আরামের জন্য তিনি খোসমেজাজে-বাহাল তবিয়তে ছেড়ে দিয়েছেন। আর নিজে ছেলেপুলে নিয়ে পাহাড়ের নীচে একটা ক্ষুদ্র খড়ের ঘরে—পদ্ম পুকুরের পারে—বসবাস কচ্ছেন। ছবি আঁকবার সমস্ত সাজসরঞ্জাম আনিয়ে দিয়েছেন। ছবির নেশা এর বেজায়। জলের মত অকাতরে টাকা কড়ি ঢেলে দিচ্ছেন—কলাদেবীর জন্য। শিল্পী-শেখর টাইকণ-শিখামুড়া-কান্‌জান সবাই ইহার দ্বারস্থ। ইহাদের ছবির কাগজের সঙ্গে প্রায়ই Currency কাগজ অদল বদল করে আনেন।

আমাদের এ বাড়ীটা আগাগোড়া কাঠের। তা'বলে কাঠখোট্টাটার মতো নয়—একেবারে শান্তিকুটীর—ঠিক্ "সিন্ধুকূলে রই" ধরণের। এ বাড়ীতে বাসা নিয়ে অবধি বেসাক্ মনে হচ্ছে—"আমি বাদ্‌সা বনেছি।" প্রাচীরের গায়ে প্রচুর চিত্র শিল্প, দালানের ভেতর দামী দামী ফুলদানী-চা-পেয়ালা, বাগানে ফুলের মেলা। বিস্তর দাসদাসী—সবাই তটস্থ, এক পায়ে আট পহর খাঁড়া। কিচ্ছু চাইতে হয় না, আবশ্যকীয় আসবাব পত্র আপনি এসে হাজির। কি সুন্দর বন্দোবস্ত! কি চমৎকার সাজান গোছান!

আমাদের বাড়ীর সামনেই প্রশান্ত মহাসাগর। এই কি সেই ভূগোলের Pacific-Ocean!—মেপের মহাসাগর আজ চোখের সামনে—আজ কেবলি ঐ গানটা রয়ে রয়ে মনে পড়ছে—

"যমুনে! এই কি তুমি সেই যমুনে
প্রবাহিনী!"

এই মহাসমুদ্রের পাড় থেকে ঠিক খাড়া মস্ত মস্ত পাহাড় মাথা তুলে উঠেছে। পাহাড়টা বেশ ছায়াশীতল—মনোহর। এই পাহাড়ের উপরে পাইনপুঞ্জের ভেতরে

আমাদের এই কুঞ্জকুটীর। চীন ও জাপানী ধরণে রকম সকম করে তৈরী। বাড়ীর সামনের দিকে Project করা খানিকটা খোলা ছাদ আছে। সকাল ও সন্ধ্যে উহাতে টহল ফিরি। ছাদ থেকে "ফুজি" পাহাড় ধূ ধূ দেখা যায়। ফুজি পাহাড় একটা উপভোগ করবার সামগ্রী।

আজকালের সূর্য্যাস্ত খুব সুন্দর। সোনার মস্ত একটা অভিযান করে রোজ রোজ সূর্য্য অস্ত যান। সন্ধ্যেরাণী পূব দিক থেকে তার ঝিল্‌মিলে নীল ঘোমটাখানি টেনে দিয়ে যখন সাগর জলে গা-ধুয়ে উঠেন—ইচ্ছে হয় তখন ঝাঁপিয়ে পড়ি, অতলতলে ডুবে মরি। এ ত মরণ নয়—বরণ—স্বরণে সিনান—অনন্তে অবগাহন!

বাড়ীর কাছেই একটা দেলখোস বাগ। এই বাগানে জন-সাধারণ যখন তখন এসে থাকে—বেড়াতে আর—চড়ুই ভাতি কত্তে। তাদের জন্য জালাভরা জল, আঁটি আঁটি জ্বালানীকাঠ—উনকোটি উনুন-বসবার ছোট ছোট আসন সব সময়ই প্রস্তুত থাকে।

পৃথিবীর মধ্যে জাপানই আজকাল আর্টের তীর্থক্ষেত্র। আর কোনো জাতি এদের উপর টেক্কা দিতে পারে নাই। অপরে আঁকে—খাওয়া পড়ার জন্য—খ্যাতির খাতিরে, কোনো রকম করে হুকুড়ি সাত রেখে যায়। এরা কিন্তু ইস্তক বিস্তি কাবার না করে উঠ্‌বার পাত্র নয়। পয়সাও রোজগার করে বটে, প্রাণটা কিন্তু আগেই বিকিয়ে বসে। নিরবচ্ছিন্ন আঁকবার—আনন্দেই এরা এঁকে থাকেন!

গুরুদেব খুব লিখ্‌চেন— আমেরিকার জন্য তৈরী হচ্ছেন। আর পিয়ার্সন সাহেব তাঁর লেখাগুলি বসে বসে type কচ্ছেন। এনড্রুজ সাহেবও মাঝে মাঝে লিখ্‌ছেন—কখনো আমাকে পড়াচ্ছেন—আর তামাম সহর দেখে শুনে বেড়াচ্ছেন। এখানে গুরুদেব ইংরেজীতে দুটো অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন—"Spirit of Japan" আর "Message of India to Japan." Interpreter তর্জ্জমা করে, সবাইকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। অমৃত জিনিসটা যে কি, জাপানীরা এতদিনে বোধহয়, তার খানিকটা স্বাদ পেল।

পাজীর পটের মত লম্বা কাগজে, তুলি দিয়ে জাপানীরা চিঠী লিখে। আমাদের মত বাঁ দিক থেকে কি মুসলমানদের মত ডান দিক থেকে লিখ্‌তে সুরু

করে না একেবারে উল্টো। নীচ থেকে আরম্ভ করে, সোজাসুজি উপর দিকে সটান লিখে যায়। আমার এই চিঠী খানিও জাপানী তুলি দিয়ে লিখা হয়েছে। তাই মোটা মোটা হরফ। তারিফ করবার কিছু নেই বটে নতুন বলে একটা নমুনা দেওয়া গেল।

আমাদের খাবার টেবিলে গুরুদেব রোজ রোজ কত কি নতুন কথা বলেন। খাওয়ার সাথে গল্পগুলিও বেশ খাপ খাচ্ছে। হাল্‌কা ও রুচিকর বলে সঙ্গে সঙ্গেই হজম হচ্ছে। ওঁর কাছে যদি আরো কিছু দিন থাকতে পারি, সত্যিকার মানুষ হয়ে যাব। ওঁকেত আমি এতদিন জানতুম না। আর জানবার বয়সও তখন হয়নি। "শান্তি-নিকেতনে"ও গুরুদেবের কাছে ছিলুম বটে, তখন তাঁর কাছে ঘেঁস্‌তে মোটেই সাহসে কুলাত না। এম্‌নি দয়া করে কাছে টেনে নিয়েছেন, তাই গুরুদেবকে পাওয়ার মত পেয়েছি। আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে।

এদের ছবি আঁকবার পদ্ধতি বড়ই সুন্দর। ছবিটাকে দুচারি আঁচর কেটে দিব্যি ফুটিয়ে তোলে। আর আমাদের কলিকাতার ছবি—জাপানের তুলনায় নেহাৎ ছেলেখেলা জড়ভরত গোছের। এদের চিত্রগুলি প্রাণে পূর্ণ-রসে ভরপুর। এটা শুধু ছবির দেশ নয়—কবিরও দেশও বটে। রঙ-সঙ, আলো বাতাস-হাসি তামাসা-গাছপালা-খেলাধুলা নিয়েই এদের কারবার কারখানা। অবনী বাবু, গগন বাবু, নন্দ দা' কেন যে এখানে আসেন না তাই ভাব্‌ছি। এখানে আসলে তাঁরা একেবারে মেতে উঠতেন। নবজীবন পেতেন।

আমি ও পিয়ার্সন সাহেব গুরুদেবের সঙ্গে সেপ্টেম্বরের সুরুতেই আমেরিকায় যাব। বার্থ রিজার্ভকরা হয়ে গেচে। এন্‌ড্রুজ্ সাহেব দেশে ফিরে যাবেন। আমেরিকায় গিয়ে Etching শিখ্‌ব। লড়াইএর গোলমাল কেটে গেলে বিলেতও যেতে পারি। এখান থেকেই Etching এ মক্‌স করা অভ্যাস কচ্ছি। আমার একটা Etching-plate সেদিন পিয়ার্সন সাহেব Mr. Muirhead Bone নামক একজনা উঁচু দরের Etcher এর কাছে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমায় খুব আশাভরসা দিয়ে চিঠি লিখেছেন—আর Promising বলে পিঠ চাপ্‌ড়িয়েছেন। জাপানের মধ্যে শিমামুড়াই হচ্ছেন সব চেয়ে বড় Artist; ইহারি কাছে এখন তুলি-তল্পি নিয়ে আসা যাওয়া কচ্ছি। ইনি আমাকে খুবই

স্নেহ করেন। এবং দস্তুর মত interest নিয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। বোলপুরের ৭ই পৌষের মেলায় আমার আঁকা একটা ছবি ছিল। ছবিটা তাঁর পছন্দ হওয়াতে, কৃপা করে উহা নিয়ে নিয়েছেন। আর অজস্র আশীষ আমার মাথায় ঢেলে দিয়েছেন। কি উদার হৃদয়—কি মুক্ত প্রশংসা! ছবিখানিতে কত কি খুঁৎ ছিল—সেগুলি যেন তাঁর চোখেই পড়েনি—এমনি ভাব। সুখ্যাতির ভারে আমি কিন্তু একেবারে নুয়ে পড়লুম। "বিক্রমপুরের" প্রচ্ছদ পটের জন্য সাদাসিধে ধরণের একটা ছোট ছবি এঁকে পাঠালুম। যোগেন্ বাবুর মনে ধরবে কিনা জানিনে। কিছু দিন বাদে দেখে শুনে একটা বড় রকমের তৈরী করে পাঠিয়ে দিব। এখন বড়ই কাজের ভিড়। তাই তাড়াতাড়ি সারতে হলো। "বিক্রমপুরের" জন্য আমায় কিছু বলতে হবেনা। বিক্রমপুরের মাটি যে আমার রক্ত মাংস। কত দিনে "শ্যামা মার" কোলে ফিরে যাব, বল্‌তে পারিনে। তবে এখন থেকেই দিন গুণচি।

এখানে এসে মনটা বিলক্ষণ তরতাজা হয়ে উঠেছে। গুরুদেবের কাছে নিত্য নতুন Idea পাচ্ছি—তাঁরি দেওয়া ভাবরস চিত্রে ফলিয়ে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা কচ্ছি। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর কবিতা পড়ে আমাকে শুনান, গিট্‌কিরীগুলি মোলায়েম করে বুঝিয়ে দেন। সাদা কথার ভেতরে কত মিহি কারিগরি। এতদিন ভাসা ভাসা পড়ে গেছি। ভাল করে বুঝতে পারিনেই। এখন যেন একটু একটু করে কোয়াসা কেটে যাচ্ছে।

আজ বিকেলে আমি ও আমার একজন জাপানী বন্ধু সমুদ্রে নেমে খুব সাঁতার কেটে চান করলুম। গুরুদেবরা পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। ছেলেবেলা সাঁতারে, আমার হাতটা খুব পেকেছিল—পদ্মার পাড়ে বাড়ী কিনা! রোজ বিকেলে স্কুলের ছেলেরা এখানে সমুদ্রে নাইতে আসে। আর drill করে। কেউবা খোলা গায়ে যুযুৎসু লড়ে। কেউ ডুবদিয়ে খেলে। হল্লা লুকোচুরি হৈ-চৈ করে শান্ত সাগরটাকে একেবারে ক্ষেপিয়ে তোলে। ওদের হাত পাগুলি দিব্যি গোলগাল—সুন্দর সুস্থ সুঠাম। জলে কি গোলাপী আভা। দুচোখ খুলে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। আর সোণার বাংলার সোণার চাঁদদের শ্রীঅঙ্গের ছাঁদ! হাত পা কাঠি—পেট ভরা পিলে—আর আঁখিকোণে কালী। তার

উপর "Teen" পার হতে না হতেই "অমিয় সাগরে সিনান!" দুদিন বাদেই নয়ন জল, হা হুতাশ, আর দীঘল শ্বাস—

"অমিয় সায়রে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।"

শ্রীমুকুলচন্দ্র দে।

স্মার্ত্তের বৈধব্যবিধান।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন "ঋগ্বেদবাদাৎ ইমানারীরবিধবা ইত্যাদি মন্ত্রাৎ" বলিয়া সহমরণের বৈদিকত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেম। "ইমানারীরবিধবাঃ সুপত্নী-রাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্ত। অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে॥ এই মন্ত্রের 'অগ্রে'স্থলে' "অগ্নে" পাঠই সহমরণ বিধির জ্ঞপ্তি। সায়নাচার্য্য যখন ঋগ্বেদের ভাষ্য করেন, এই "অগ্রে" শব্দই তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এবং "তা অগ্রে সর্ব্বেষাং প্রথমত এব যোনিং গৃহং আরোহন্ত" এই ভাষ্যই করিয়াছেন; "অবিধবা" শব্দের অর্থ তিনি সধবা করিয়াছেন, সুতরাং তাহার মতে এই মন্ত্র বিধবা বিষয়কই নহে। মোক্ষমূলর "অবিধবা" শব্দে অবিধবাঃ সত্যঃ অর্থাৎ বৈধব্য দুঃখ ভোগ না করিয়া এবং "সুপত্নীঃ-শোভনপতিকাঃসত্যঃ অর্থাৎ মনোমত পতি লাভ করিয়া" এই ভাষ্য করিয়াছেন, সুতরাং প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য কোন মতেই এই মন্ত্র সহমরণ সূচক নহে। ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্র বিধবা বিবাহ বিষয়ক "উদীর্ষ নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্ত-গ্রাভস্য দিধিষোস্ত বেদং পত্যুর্জনিত্ব মভিসংবভূথ॥ এই মন্ত্রের সায়নভাষ্যের তাৎপর্য্য—"হে নারি, মৃতস্যপতির্ উত্তিষ্ঠ" জীবিত মনুষ্যের নিকট আগমন কর, দ্বিতীয় চরণের তাৎপর্য্য—এই যে, "হস্তগ্রাভস্য" পাণিগ্রহণকারীর, "দিধিষোঃ-বিবাহেচ্ছুর, পত্যুঃ পতির, 'ইদম্' এই, "জনিত্বম্" পত্নীত্ব "তব" তোমার "অভিসংবভূথ" সম্যক প্রকারে যোগ্য হইয়াছে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদান্তর্গত তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ৬।১।৩ মন্ত্রে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর আছে কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য ইত্যাকার

বিধবা বিবাহ। আপস্তম্বগৃহ্যসূত্রের ৪।২।১৮ সূত্র "তামুত্থাপয়েদ্দেবর পতিস্থানীয়োহন্তেবাসী জরদ্দাসোবোদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোকমিতি" বাক্য উক্ত ঋক্ অনুসারে অনুজ্ঞা করিতেছে, এবং গার্গ্যনারায়ণ তাহার ভাষ্য করিয়াছেন—"অথ পত্নীমুত্থাপয়েৎকঃ ? দেবরঃ পতিস্থানীয়ঃ। অনেন জ্ঞায়তে পতি কর্ত্তৃকংকর্ম্ম পুংসবনাদি পত্যসম্ভবে দেবরঃ কুর্য্যাদিতি। "যো বহুকালং দাস্যংকৃত্বা বৃদ্ধোহভূৎ" সে, অথবা অন্তেবাসী, শিষ্যও এই সকল বাক্য সহ বিধবাকে মৃত পতির নিকট হইতে উত্তোলন করিতে পারে। ইত্যাকার ঋক্ দৃষ্টে যাস্কাচার্য্য দেবর শব্দের "দেবরঃ দ্বিতীয়োবরঃ" এই নিরুক্ত করিয়াছেন, সুতরাং আমি "ইমানারী" বা "ইত্যাদির" কুত্রাপিও সহমরণ প্রসঙ্গ দেখিতেছি না। এই মন্ত্রদ্বয় ঋগ্বেদের ৭অঃ ৬অঃ ১০ম ১৮ সূক্তের ৭ম এবং ৮ম সংখ্যক। এই সূক্তে সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্দ্দশটী মন্ত্র আছে, মন্ত্রদ্বয়ের পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী মন্ত্রে বিধবা বিষয়ে অপর কোন প্রসঙ্গ নাই, পূর্ব্ববর্ত্তী ৬টী মন্ত্র মৃত্যু এবং দীর্ঘজীবন লাভ বিষয়ক, এবং পরবর্ত্তী ৬টী মন্ত্র পাঠে বোধ হয় যেন শব মৃত্তিকায় প্রোথিত করার প্রথাও প্রচলিত ছিল। পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী মন্ত্রেও অগ্নিসংস্কারের কোন উল্লেখ নাই, তথাপি সপ্তম মন্ত্র কিরূপে সহমরণ বিধায়ক বলিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দন সহমরণের বৈদিকত্ব প্রতিপাদন করিলেন তাহা সহজ বুদ্ধির অগম্য। ঋক্ কিম্বা অপর বেদত্রয়ে বিধবার সহমরণ সম্বন্ধীয় কোন মন্ত্র আমার নয়ন পথের পথিক হয় নাই, যদ্যপি বৈদিক সময়ে সহমরণ প্রচলিত ছিল তবে কোন বেদে তাহার উল্লেখ নাই কেন ? বর্ত্তমান সময়ে বেদের যে সকল সংস্করণ ভারতে দৃষ্ট হয়, এবং পাশ্চাত্যদেশে যে সকল সংস্করণ হইয়াছে তাহাতে "অগ্র" শব্দই দৃষ্ট হয়; "কোন হস্তলিপিতে "অগ্নে" শব্দ ছিল," প্রতিবাদীর ইত্যাকার বাক্য সমর্থন এবং খণ্ডন উভয়ই দুরূহ।

এই একটী শব্দের সন্দেহজনক পাঠ এবং একটী বেদমন্ত্রের প্রমাণহীন ভিন্নার্থের উপর নির্ভর করিয়াই কি স্মৃতিকারগণ কোটী কোটী নিরপরাধিনী রমণীর হত্যা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ? এই সন্দিগ্ধ শব্দের সম্মানার্থেই কি কোটী কোটী বিধবা শ্মশানানলে আত্মঘাতিনী হইয়াছে ? দেবরপতি, ক্ষেত্রজপুত্র, এবং সহমরণ এই ত্রিবিধ বিধিই বৈদিক এবং আবহমান কাল প্রচলিত, ইহাই যদ্যপি সিদ্ধান্ত হয়, তবে কি যুক্তি বা শ্রুতি প্রমাণানুসারে কলিযুগের জন্য

প্রথমোক্ত প্রথাদ্বয় প্রতিসিদ্ধা এবং শেষোক্ত প্রথা প্রচলিতা হইয়াছিল? উক্ত অগ্নি বা অগ্রান্তক বেদমন্ত্র সহমরণ-বোধক স্বীকৃত হইলেও তাহাতে কোন ফলশ্রুতি পরিলক্ষিত হয় না কিন্তু স্মৃতি ও পুরাণকার সহমরণের অমোঘ ফল কল্পনা করিয়াছেন, যথা—"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনং। সারুন্ধতীসমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে" অর্থাৎ ভর্ত্তা মৃত হইলে যে নারী চিতারোহণ করে, সে অরুন্ধতীর ন্যায় হইয়া স্বর্গলোকে বাস করে। "তিস্রঃ-কোট্যোর্দ্ধ কোটীচ যানি লোমানি মানবে। তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গে ভর্ত্তারং যাঽনুগচ্ছতি"। যে নারী ভর্ত্তার অনুগামিনী হয় সে সার্দ্ধত্রিকোটী বৎসর (মানব শরীরের লোম সংখ্যক) স্বর্গবাস করে। "ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতেবিলাৎ। তদ্বদ্ভর্ত্তার মাদায় তেনৈব সহমোদতে"। অর্থাৎ যেরূপ "সাপুড়িয়া" গর্ত্ত হইতে সবলে সর্প উত্তোলন করে সে তদ্রূপ ভর্ত্তাকে উদ্ধার পূর্ব্বক তাহার সহিত সুখে বাস করে। "পুনাতি ত্রিকুলং নারী ভর্ত্তারং যাঽনুগচ্ছতি" পতির সহগামিনী নারী ত্রিকুল পবিত্র করে। কোন্ শ্রুতি বা যুক্তি বলে স্মৃতি ও পুরাণকার ইত্যাকার প্রলোভন এবং উৎসাহ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন? স্বর্গ নামক স্থান সম্বন্ধে তাহাদের কি অভিজ্ঞতা ছিল? স্বর্গবাসের বৎসরের সংখ্যা কিরূপে নির্ণীত হইয়াছিল? পতিত পতির উদ্ধারেরই বা যুক্তি প্রমাণ কি আছে? স্মৃতিকার কেবল প্রলোভন প্রদান করিয়াই কি নিরস্ত হইয়াছিলেন? "নান্যোধর্ম্মোহি বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ" এই উক্তি দ্বারা বিধবার অন্যবিধ ধর্ম্মপথও অবরোধ করিয়াছিলেন, সুতরাং অবিবেকিনী, সংস্কারান্ধা, শোকমোহবিহ্বলা হতভাগিনীর আত্মহত্যার বাসনা হওয়া অসম্ভব নহে।

যখন মৃতসহ জীবিতার দেহ প্রজ্জ্বলিত অনলে দগ্ধ হইত, তৎকালিক স্বাভাবিক পলায়ন চেষ্টা নিবারণার্থে শব সহ পত্নীর দেহ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইত, এবং কাসর-ঘণ্টা ঢাক ঢোলের ভীষণ শব্দে হতভাগিনীর দাহক্লেশজনিত আর্ত্তনাদ অভিভূত হইত, এই প্রবাদ নিতান্ত অলীক বা অস্বাভাবিক বোধ হয় না। এই বীভৎস আচারই হিন্দু বিধবার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা, হিন্দুর বিচারে ইহার প্রবর্ত্তকগণ ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মা, সাহায্যকারিগণ পুণ্য লাভ করিতেন, এবং সহমৃতার আত্মীয় স্বজন কৃতকৃতার্থ হইতেন, কিন্তু অপর জাতি

এই পৈশাচিক কাণ্ড কি চক্ষে দেখিত? আমি এ বিষয়ে মোক্ষমূলরের মত উদ্ধৃত করিতেছি।

"This is perhaps the most fragrant instance of what can be done by an unscrupulous priesthood. Here have thousands and thousands of lives been sacrificed...........on the authority of a passage which was mangled, mistranslated and misapplied."

যে শাস্ত্রকারগণ "দ্বিজানাংপাদ শুশ্রূষা শূদ্রৈঃকার্য্যা সদাত্বিহ। পদ প্রক্ষালনং গন্ধৈ র্ভোজ্য মুচ্ছিষ্টমাত্রকম্।"—বাক্যে শৌদ্র ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহারাই "আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়েত বা পত্যৌ সাধ্বীজ্ঞেয়া পতিব্রতা॥" এই বাক্যে নারীধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে এই উভয় ধর্ম্মবিধানেরই বিচার করিব।

মানব মাত্রেই আত্মসুখ কামনা বলবতী, এবং আত্মসুখপরায়ণ জেতা বা বলবানের বিজিত বা দুর্ব্বলের প্রতি বৈধ কিংবা অবৈধ উৎপীড়ন পৃথিবীতে বিরল নহে, কিন্তু এই কার্য্য কুত্রাপি প্রশংসার্হ হয় না, বরং ঈদৃশ অত্যাচারী সভ্য সমাজে নিন্দিত এবং লাঞ্ছিতই হইয়া থাকে; কিন্তু শাস্ত্রপ্রণয়ন পূর্ব্বক এক মানবকে অপর মানবের পদসেবী এবং উচ্ছিষ্ট ভোজী দাসে পরিণত করার বিধি এবং ঐ হীন কর্ম্মই তাহার একমাত্র ইহ ও পারলৌকিক ধর্ম্ম, এরূপ বিধান এবং স্বর্গ মোক্ষাভিলাষি শূদ্রের অপর ধর্ম্ম সাধনাপরাধে প্রাণান্তদণ্ড প্রদানের দৃষ্টান্ত একমাত্র উদার হিন্দু সমাজের মুখই উজ্জ্বল করিতেছে। ঈদৃশ ধর্ম্মবিধি অন্য কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না, হইবেইবা কিরূপে? ত্রিকালদর্শী মহাত্মা আর কোথায় ছিল যে এতাদৃশ নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিবে?

পত্নী পতির হর্ষে হর্ষিতা, দুঃখে দুঃখিতা, বিরহে মলিনা এবং কৃশা হইবে, পুরুষ মাত্রেই আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে, ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু এই মনোবৃত্তি উন্নতঃ হইলেও অস্বাভাবিক বাচ্য হয় না, বহুস্থলে ইহা পরিলক্ষিত হইয়াও থাকে, রমণী স্মৃতিকর্ত্রীরূপে লেখনী ধারণ করিলে এই সকল বিধি বিপরীত ভাবাপন্ন হইবারই সম্ভাবনা ছিল। কোন জ্ঞানবান ব্যক্তিই সংসারীর এই নৈসর্গিক বৃত্তির নিন্দা করে না, কিন্তু পতির মৃত্যুতে পত্নী সহমৃতা হইলে পতির

কি সুখ? সুখ ছিল, শাস্ত্রানুরূপ পত্নীসহ দীর্ঘকাল স্বর্গবাসের আশা, এবং পত্নীর পুণ্যজনিত উদ্ধারের আশা, কোন সভ্য সমাজে ঈদৃশ শাস্ত্রবিধি নাই, আশাও নাই, তাহারা আমাদের করুণারপাত্র। স্মৃতিকারগণ যদ্যপি লৌহ-সিন্দুক, ভূসম্পত্তি এবং বাহনাদিরও সহমরণ ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে পরলোকে কোন অভাবেরই সম্ভাবনা ছিল না। এতদ্বিষয়ে আমেরিকার আদিমবাসীর বিধি ব্যবহার অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহারা পতির শবসহ পত্নী, অশ্ব 'টোমেহক' নামক অস্ত্র, ধনুর্ব্বাণাদি ভূমিতে প্রোথিত করিত, সুতরাং পরলোকবাসী পুরুষের আকাশস্থ মৃগয়াভূমিতে কোন প্রকার অভাবেরই সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু পতির পূর্ব্বে পত্নীর মৃত্যু হইলে পরলোকে সম্মিলন সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যে জনকের শুক্রকীট এই দেহে পরিণত হইয়াছে, যে জননীর শোণিতে এই দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, যে সহোদরা সহোদরগণ এক রক্তমাংসে গঠিত, তাহাদের সহিত পারলৌকিক সম্মিলনের জন্য কেহ লালায়িত নহে, এবং তজ্জন্য স্মৃতিকারগণও কোন বিধি ব্যবস্থা করেন নাই; অথচ পত্নী, যাহার সহিত রক্ত মাংসের কোন সম্বন্ধ নাই, একমাত্র বিবাহ জনিত সামাজিক সম্বন্ধ, ভাব বৈলক্ষণ্যে যে সম্বন্ধ মুহূর্ত্ত মধ্যে ছিন্ন হয়, তাহার সহিত পারলৌকিক সংমিলন কামনার এবং ঈদৃশ বিধি-ব্যবস্থার কারণ কি? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মানবমাত্রেরই আত্মসুখ কামনা বলবতী, আত্মসুখই জাগতিক সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে; যতদিন পর্য্যন্ত পিতা মাতার স্নেহ যত্নের প্রয়োজন থাকে, তাঁহাদের অভাবে জগৎশূন্য বোধ হয়, যতদিন স্বার্থপরায়ণতা হৃদয়ে উন্মেষিত না হয় ততদিন সহোদর সহোদরা প্রাণোপম সঙ্গী এবং সঙ্গিনী থাকে। যৌবনে এবং প্রৌঢ়াবস্থায় স্ত্রী পুত্রাদিসহ নব সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়, নব সুখ এবং নব সুখোপাদানে মন আকৃষ্ট হয়, সুতরাং বহুস্থলেই পিতা মাতা ভ্রাতাদির সহ সম্বন্ধ শিথিল হইয়া যায়, ইত্যাকার মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানবের পরলোকে পিতা মাতা ভ্রাতাদির প্রয়োজন কি? সুখদায়িনী পত্নীর প্রয়োজন, এবং তদনুরূপ বৃত্তি বিশিষ্ট স্মৃতিকারই সেই প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

স্বীয় কাম্যানারীতে পুরুষান্তরের আসক্তি কিংবা ঈদৃশা রমণীর পুরুষান্তরে লোলুপতা দর্শনে যে বৃত্তি উত্তেজিতা হয় তাহা ইংরেজিতে "জেলাসি" বাচ্য,

আমাদের ভাষায় উহাকে ঈর্ষা বলা যাইতে পারে। অধিকাংশ মানবই এই বৃত্তিবিশিষ্ট, পশ্বাদিতেও এই বৃত্তি বিরল নহে, স্বীয় দেহান্তে স্ত্রীর পরপুরুষ সংসর্গ হিন্দু প্রশান্তচিত্তে কল্পনা করিতে অক্ষম, স্মৃতিকার এই বৃত্তির বশীভূত হইয়াই স্বীয় দেহান্তে পত্নীসহ অপর পুরুষের সংসর্গ সম্ভাবনা নিবারণার্থে বিধবার সহমরণ বা আমরণ ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং এই নৈসর্গিক বৃত্তির বশীভূত সমাজ উহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, এই অনুমান নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ নহে।

কোন কোন পুরাণ ও স্মৃতিকার, "মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা" অর্থাৎ বিধবার ব্রহ্মচর্য্য বা সহমরণ ইহার একতম ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং "নান্যোধর্ম্ম ইতি তু সহমরণস্তুত্যর্থং" বলিয়া পরবর্ত্তী স্মৃতিকারও উভয় কুল রক্ষা করিয়াছেন। আমি অতঃপর বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের বিচার করিব। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের বিধান কোন আর্ষশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না, সুতরাং মৃতদার বা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অবৈদিক। পুরুষের বেদবিহিত দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষেধ করিয়া কিহেতু স্মৃতিকার বিধবার জন্য আমরণ ব্রহ্মচর্য্য বিধান করিয়াছিলেন? করুণা পরবশ হইয়া বিধবার মঙ্গলার্থে-ই কি এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন? কিংবা স্বীয় এবং অপর পুরুষের মৃত্যুকালিন প্রজ্বলিত ঈর্ষানল দগ্ধ হৃদয়ের শান্তির জন্যই এই বিধান? "ব্রহ্মণি বেদেচরতীতি"—ইহাই ব্রহ্মচারী শব্দের অর্থ, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রকৃত কৃত্য বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নজনিত বিদ্যা বা জ্ঞান লাভ, মধু মাংসাদি বর্জ্জন এবং অষ্টাঙ্গ মৈথুন নিরোধ আনুসঙ্গিক অবান্তর কর্ম্ম, উহার সহায়করূপে কল্পিত হইয়াছে, সুতরাং মৈথুন নিরোধ এবং মধুমাংসাদি বর্জ্জনকারী বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নবিনা ব্রহ্মচারী বাচ্য হইতে পারে না, পক্ষান্তরে মধুমাংসাদি বর্জ্জন না করিয়াও যদ্যপি কেহ বেদাধ্যয়ন ও তজ্জনিত বিদ্যালাভ করেন তিনি ব্রহ্মচর্য্যের অভীষ্ট ফললাভহেতু ব্রহ্মচারী বাচ্য। স্মৃতিকার, স্মার্ত্ত এবং সমাজ বিধবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া ব্রহ্মচারিণীর জন্য বেদাধ্যয়নের কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং করিতেছেন? পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে তাহারা শত শত উপবাস এবং সংযম করিলেও বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ব্যতীত ব্রহ্মচারিণী হইতে পারে না। প্রতিবাদী বলিবেন, রমণীর বেদে অধিকার নাই; বর্ত্তমান ব্রাহ্মণেরই কি আছে? কিন্তু ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের ঋষী

অগ্নিগোত্রজা বিশ্ববারা নাম্নী রমণী, বিশ্ববারা যজ্ঞের ঋত্বিজা এবং মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার বাক্যই ঋগ্বেদের একতম সূক্ত। গার্গী, মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী প্রভৃতি বিদুষী বিদ্বজ্জনের সুপরিচিতা। "বেদেষু চরতে যস্মাত্তেন সা ব্রহ্মচারিণী" বাক্যে দেবীপুরাণ ও ব্রহ্মচারিণী শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছে। সুতরাং এই উক্তি অর্বাচীনতার পরিচায়িকা। বাস্তব ব্রহ্মচর্য্য এবং বেদাদি আর্ষ শাস্ত্রাধ্যয়ন হিন্দু সমাজ হইতে বহু পূর্ব্বেই নিরাকৃত হইয়াছিল।

এইক্ষণ অভাগিনী বিধবার জন্য এই যুগপৎ হাস্য ও করুণ রসাত্মক ব্রহ্মচর্য্যের ভাণ কেন? ইহার ফল কি? বিধবার শাস্ত্রাধ্যয়নজনিত বিদ্যা লাভ হয় না, নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক দ্বারা ইহা মাত্র ফলভোগ বিরাগ অর্থাৎ বৈরাগ্য জন্মে না, সুতরাং সংসার সুখাসক্ত আত্মীয় স্বজনের সহবাস, ও অহোরাত্র সাংসারিক সুখ ভোগের দৃষ্টান্ত তাহার বাসনানলে ইন্ধন প্রদান করে, এবং অতৃপ্ত বাসনানল তাহার হৃদয়ে রাবণশ্মশানবৎ সতত প্রজ্জলিত থাকে। "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য" ইত্যাদি গীতাবাক্যানুসারে বিধবা কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম এবং বিষয় স্মরণপূর্ব্বক সতত মিথ্যাচারজনিত পাপগ্রস্তা হইতেছে, ইহাই তাহার ব্রহ্মচর্য্যের পরিণাম।

পূর্ব্বকালে হতভাগিনী বিধবার প্রদীপ্ত শ্মশানানলে দণ্ডেক মধ্যে শোক দুঃখের অবসান হইত, এইক্ষণ প্রজ্জলিত বাসনানলে তাহার নিরাশ হৃদয় আমরণ দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু হায়! ভস্ম হইতেছে না। তাহার হৃদয়ের করুণ আর্ত্তনাদ তাহার মর্ম্মভেদি দীর্ঘ নিশ্বাস, বধির হিন্দুসমাজ শ্রবণ করেনা। তাহার বিষাদ কালিমাময় দীনানন, বাণাহতা হরিণীর ন্যায় হতাশ দৃষ্টি, অন্ধ হিন্দুসমাজ দর্শন করেনা। চিরদুঃখিনী বিধবার দুঃখ-সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গাঘাতে মুমূর্ষু হিন্দু সমাজের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয় না। অহো! শাস্ত্র বিশ্বাসে অন্ধ, কুসংস্কারে বধির, এবং কল্পিত পাপভয়ে মৃতকল্প হিন্দুসমাজের কি শোচনীয় অবস্থা।

স্মৃতিকার, স্মার্ত্ত এবং সমাজ বিধবার জন্য হবিঃ শূন্য হবিষ্য এবং একাহার সহ একাদশী ব্রতের ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত, কিন্তু তাহার ফল কি? আহার কৃচ্ছে, শরীর ক্লিষ্ট এবং কৃশ হয় সত্য, তাহাতে কি মনোবৃত্তি সংযত হয়? শরীর এবং ইন্দ্রিয় শিথিল হইলেই কি বৃত্তি রুদ্ধ হয়? না, তাহা হয় না, পুরাণোক্ত বায়ুপর্ণভোজি বৃদ্ধ তাপসগণের পতন, ছিন্ন মুষ্ক ছাগ এবং পুরুষত্ব-হীন মানবের তীব্র বাসনাই তাহার দীপ্যমান প্রমাণ। অবিবেকী স্মৃতিকারের

বিধান অনভিজ্ঞ হিন্দুসমাজ শত শত বৎসর নতশিরে প্রতিপালন করিতেছে, তাহার পরিণাম প্রত্যক্ষ করিতেছে, কিন্তু চৈতন্যোদয় হইতেছেনা। যোগ-সূত্র "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম্ তন্নিরোধঃ" সূত্র দ্বারা অভ্যাস এবং বৈরাগ্যই বৃত্তি-নিরোধের উপায় ইহা নিরূপণ করিয়াছে। গীতা "অভ্যাসেনতু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেনচ গৃহ্যতে" বলিয়া ঐ বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতেছে। বিধবার বিবেকজ বৈরাগ্য এবং আত্মতত্ত্বে স্থিতির প্রযত্ন বা অভ্যাসের উপায় নাই, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহার বৃত্তি সংযত হয় না, বাসনাও পরিতৃপ্ত হয় না, ভোগও হয় না, যোগও হয় না, হতভাগিনীর ইহকাল এবং পরকাল উভয় পণ্ড হইতেছে। তাহার বাসনা ভোগ, কামনা ভোগ, কল্পনা ভোগ, তাহার ধর্ম্মাখ্য কর্ম্মের ফল ও পারলৌকিক ভোগ, ভোগপিপাসাকাতরা হতভাগিনী অপার ভোগসাগরে ভাসিতেছে, কিন্তু তাহার জন্য পার্থিব ভোগবারি সমুদ্রসলিলবৎ লবণাক্ত, অপেয়, সুতরাং পিপাসা বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইতেছে না।

লোক ভয়ে এবং পাপ ভয়ে অনেক বিধবার বহিরিন্দ্রিয় বহু আয়াসে সংযত থাকে, স্থূলদর্শী সমাজ তাহাতেই সন্তুষ্ট, তাহাতেই গর্ব্বিত; কিন্তু নৈসর্গিক বৃত্তির দুর্দ্দম্য আবেগে বিহ্বলা শত শত অভাগিনী আত্মহত্যা ও ভ্রূণহত্যা পাপে নিমজ্জিতা হইতেছে, এবং বিমূঢ় সমাজ নিমীলিত নেত্রে সস্মিত বদনে সেই পাপরাশি গলাধঃকরণ পূর্ব্বক স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষা করিতেছে। অহো! ইহাই অপরিণামদর্শি স্মৃতিকারের ব্যবস্থা এবং নৃশংস হিন্দু সমাজের শাস্ত্রান্ধতার পরিণাম।

গলিত অঙ্গ, স্খলিত দন্ত, পলিত মুণ্ড পিতামহের চতুর্থ পক্ষে বালিকার পাণি-গ্রহণ স্মৃতিমতে দোষাবহ নহে, হইবেইবা কেন? তিনি যে স্মৃতিকারের স্বজাতীয়! বৃদ্ধকালে সেবা করে কে? মরণান্তে ব্রহ্মচর্য্য এবং একাদশী ব্রত ধারণ পূর্ব্বক তর্পণাদির দ্বারা পারলৌকিক মঙ্গল সাধনইবা করিবে কে? তজ্জন্যই বিবাহের বিশেষ প্রয়োজন। মানব মাত্রেরই অদৃষ্ট অনিশ্চিত, স্মৃতিকারের অদৃষ্টও নৈসর্গিক নিয়মের অধীন, ইহা মনন করিয়াই মনীষী স্মৃতিকার স্বার্থে এবং পরার্থে মৃতদার প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধের বিবাহ প্রতিষেধ করেন নাই, তজ্জন্য তাহারা হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইত্যাকার স্থবির পিতামহ যৎকালে ষোড়শী বিধবা পৌত্রী, দৌহিত্রী বা পুত্রপৌত্র বধূর চরিত্র রক্ষার্থে ইন্দ্রিয় সংযমের জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক উপদেশ ও শাসন বাক্য প্রয়োগ করেন, তৎকালে স্মৃতিকার, স্মার্ত্ত এবং হিন্দু সমাজে, বিধাতার এই ত্রিবিধ অপূর্ব্ব সৃষ্টির সম্মুখে আমাদের লজ্জিতানন স্বতঃই অবনত হয়।

একাদশী ব্রত অবৈদিক, বেদাদি আর্ষ শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ নাই। পুরাণ বা পুরাণে প্রক্ষিপ্ত নবীন শ্লোকই অপরাপর ব্রতের ন্যায় ইহারও ভিত্তি। আমরা এই বিধবা ব্যামোহক ব্রতের সংক্ষেপে বিচার করিব। কাত্যায়ন স্মৃতিমতে "অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যোহপূর্ণাশীতি বৎসরঃ" অর্থাৎ অষ্টম বর্ষ হইতে অশীতিবর্ষ বয়স্ক সকল জীবেরই একাদশী কর্ত্তব্য। পদ্মপুরাণ, "বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চাপি" বাক্যে মনুষ্য নির্ব্বিশেষেই ব্রতের ব্যবস্থা করিয়াছে। তত্ত্বসাগর, "স্বর্গমোক্ষপ্রদাহ্যেষা রাজ্যপুত্র প্রদায়িনী" বাক্যে একাদশী ব্রতফল মোক্ষ পর্য্যন্ত নিরূপণ করিয়াছে। যে কর্ম্মের ফল রাজ্য পুত্র তাহারই ফল মোক্ষ? হইবে না কেন? ইহা যে তত্ত্বের সাগর! মোক্ষশাস্ত্রানভিজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানহীন স্মৃতিকারগণ এই সাগর মন্থন করিয়া কি অপূর্ব্ব তত্ত্বরত্নই উদ্ধার করিয়াছিলেন! বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছে "প্রতিগ্রাসং স ভুঙ্‌তে তু কিল্বিষংশ্বানবিষ্টসমং" অর্থাৎ একাদশীতে প্রতিগ্রাসে কুক্কুর মল ভোজন তুল্য পাপ ভোজন হয়। ভবিষ্যপুরাণ বলিতেছে, "যানিকানিচ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানিচ। অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥" অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাদি সর্ব্ব প্রকার পাপ ঐ তিথিতে অন্ন আশ্রয় করিয়া থাকে। সনৎকুমার বলিতেছেন, "একাদশ্যন্নকামস্তু পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি" অর্থাৎ একাদশীতে অন্নকামনা করিলে পিতৃলোক সহ নরকে মজ্জিত হয়। "ব্রাহ্মণস্য বিশেষতো নিত্যঃ" এবং "বিধবানান্তু সর্ব্বাস্বেব নিত্যাধিকারঃ" বাক্যে স্মৃতি, ব্রাহ্মণ এবং বিধবার জন্য ইহা "নিত্য কর্ম্ম" এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে। যাহা অকরণে প্রত্যবায় হয় তাহাই নিত্যকর্ম্ম বাচ্য।

একাদশী ব্রত সাম্প্রদায়িক, সার্ব্বজনীন নহে, ইহার সংশ্লিষ্ট পাপ-পুণ্য সংস্কার জনিত, কর্ম্মজনিত নহে, কারণ হিন্দু ভিন্ন অপর কেহ এই ব্রতে কর্ত্তব্য বোধজনিত পাপ-পুণ্যের ভাগী হয় না। তথাপি বিচার্য্য এই যে ব্রহ্মহত্যা পাপ ব্রহ্মহত্যা ব্যতীত কিরূপে উৎপন্ন হয়? উক্ত তিথিতে ইত্যাকার পাপের অন্ন মধ্যে প্রবেশ এবং স্থিতিইবা কিরূপে সম্ভবে? হিন্দুর

পাপাখ্য পদার্থটা চিন্ময়, মনোময় কিংবা জড় এবং কোন্ সময়, কি ভাবে, কি কারণে, কোথায় স্থিত থাকে ও গমনাগমন করে তাহা সহজ বোধ্য নহে। একাদশী তিথিতে ব্রহ্মহত্যাদি পাপের অন্নমধ্যে স্থিতি যদ্যপি নৈসর্গিক বিধানে সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণেতর সকল বর্ণের এবং সধবারও উক্ত তিথিতে অন্নাহার হেতু ঐ পাপ অবশ্যম্ভাবী। যদ্যপি প্রতিবাদী বলেন যে অবরবর্ণজ এবং সধবা মৎস্যকণ্টকবৎ পাপবিবিক্ত করিয়া অন্নাহার করে, কিন্তু বিধবা এবং ব্রাহ্মণ তাহাতে অক্ষম, তাহা হইলে আমরা পরাজয় স্বীকার করিতেছি। এই ব্রতের প্রবর্ত্তনাবধি কোনও সময়ে যে অষ্টম বর্ষ হইতে অশীতিবর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণগণ ইহা প্রতিপালন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ নাই। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই বিধবার উপর একাদশীর ভার অর্পণ পূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে অন্নাহার করিতেছেন, তাহারা ভোজ্যান্নে "শ্বানবিটের" স্বাদ, গন্ধ, কিঞ্চিন্মাত্রও অনুভব করেন না, এবং ভোজনজনিত পাপে পিতৃলোক সহ নরক গমনের ভীতিও তাহাদের বাক্যে বা ব্যবহারে পরিলক্ষিত হয় না, অধিকন্তু স্মৃতিবিধি উল্লঙ্ঘন হেতু সমাজ তাহাদিগকে পাপী বা পতিত গণ্য করে না। প্রতিবাদী বলিতে পারেন, ঐ সকল শাস্ত্র বাক্যের একাংশ রোচক স্তুতিবাক্য এবং অপরাংশ ভীতিপ্রদর্শনার্থে নিন্দামাত্র, বাস্তব ঐ সকল স্তুতিনিন্দার কোন সারবত্তা নাই। যদ্যপি এই ব্রতের পুরাণোক্ত পাপপুণ্যাত্মিকা ফলশ্রুতি কেবল রোচনার্থে এবং ভীতি প্রদর্শনার্থে কল্পিতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বিধি প্রতিষেধের তাৎপর্য্য কি? এবং একাদশী ব্রতের বাস্তবিক ফল কি? ইহা করণজনিত স্বর্গাদিফলে এবং অকরণজনিত প্রত্যবায়ে আন্তরিক বিশ্বাস থাকিলে কি যুক্তিতে ব্রাহ্মণগণ ইহা উপেক্ষা করেন? আর বিধবা—নিন্দাভয়ে সশঙ্কিতা, পাপ ত্রাসে সন্ত্রাসিতা, নিদাঘতাপে সন্তাপিতা হতভাগিনী শুষ্ককণ্ঠে শুষ্কবক্ষে জঠরানলে দগ্ধা হইয়া স্মৃতির সম্মান রক্ষা করিতেছে! এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে স্থানাভাব হেতু মাত্র দৃষ্টান্ত দ্বয় প্রদর্শন করিয়া "একাদশীতত্ত্বের', উপসংহার করিব।

কাশীবাসিনী বৃদ্ধা বিধবা তাহার জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করিতেছিলেন অষ্টমবর্ষে গৌরীদান করিয়া তাহার পিতা অক্ষয় পুণ্যলাভ করেন, অব্যবহিত পরেই তাহার বৈধব্য দশা ঘটিয়াছিল, তখন সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল না, সুতরাং তাহার অদৃষ্টে ব্রহ্মচর্য্যাই ব্যবস্থিত হইয়াছিল।

তাহার স্মার্ত্ত শ্বশুর একাদশীব্রত পালনে স্বয়ং অক্ষম ছিলেন, কিন্তু বিধবা বধূর ব্রতভঙ্গ ভয়ে একাদশী দিনে তাহাকে একটী নিভৃতকক্ষে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতেন, ক্ষুৎপিপাসা কাতর হতভাগিনী বালিকা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া অবশেষে অচৈতন্যা হইত, বালবধূর মর্ম্মভেদী বিলাপ শাস্ত্রজ্ঞ শ্বশুরকে ধর্ম্ম-পথ ভ্রষ্ট করিতে সক্ষম হইত না, এবং তাহার শাসনভয়ে পরিবারস্থ কেহ এক বিন্দু জল প্রদানেও সাহসী হইত না।

গর্ভবতী বিধবা একাদশী দিনে প্রসবকালে "জল জল" বলিয়া পিপাসায় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল, তথাপি পাপ ভয়ে একবিন্দু জল দ্বারা কেহ তাহার প্রাণ রক্ষা করে নাই, ইহা সংবাদপত্র পাঠকগণ বিস্মৃত হইয়াছেন কি? ইহাই স্মৃতিবিধির পরিণাম, ইহাই হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্ম।

প্রবন্ধের পরিশেষে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে—ঐ একাহারিণী, একাদশী-ব্রতানলদগ্ধা, বিষণ্ণবদনা রমণীই কি ব্রহ্মচারিণী? ঐ শাস্ত্র জ্ঞানহীনা, নিরক্ষরা, কুসংস্কারাপন্না রমণীই কি ব্রহ্মচারিণী? ঐ সংসার সুখবিহীনা, সাংসারিক সর্ব্বদুঃখ ভোগিনী হতভাগিনীই কি ব্রহ্মচারিণী?

ঐ সন্তানহীনা, ভ্রাতা এবং দেবরাদির সন্তান পরিচর্য্যাকারিণী, স্নেহমুগ্ধা-রমণীই কি ব্রহ্মচারিণী?

ঐ শ্বশ্রূ, মাতা, ননন্দা বা ভ্রাতৃ বধূর বাক্যবাণবিদ্ধা, শোকসন্তপ্তা সজল নয়না পরিচারিণীই কি ব্রহ্মচারিণী?

ঐ উদ্বাহাদি শুভকর্ম্মে অমঙ্গলস্বরূপিণী, স্বজন-হৃদয়ে সদা শোক স্মৃতি উদ্দীপন কারিণী, সার্ব্বজনীন কৃপাপাত্রী, বিধুরা বালাই কি ব্রহ্মচারিণী?

কিম্বা ঐ বিষাদ প্রতিমা, স্মৃতিকারের অবিমৃষ্যকারিতা এবং অধঃপতিত কলিগ্রস্ত হিন্দু সমাজের বিমূঢ়তার এবং নৃশংসতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি?

সোহংস্বামী।

স্বাগত।

ধন্য হইল "বাংলার মাটি" ধন্য "পুণ্য-পীযুষ"-জল
ধন্য "শীতল-অতল-দীঘী, নির্ম্মল-নীল" গগনতল
"পল্লব ঘন কানন" ধন্য, ধন্য পেলব "পল্লীবাট"
ধন্য "হরিত ধান্য ক্ষেত্র" মুক্তা খচিত "মুক্তমাঠ।"
মুঞ্জি উঠিল বাণীর কুঞ্জ, শুনিয়া মঞ্জু বীণার তান
গুঞ্জি গাহিলা বাঙ্গালাভাষা পঞ্জরে আজি পাইয়া প্রাণ।
বন্দে তোমারে প্রতীচী পূর্ব্ব গরবে গৌড় দৃপ্তশির
ভারত কৈলা গীতির তীর্থ; স্বাগত! গীরথ! বিজয়ী বীর!
আজি, ভাস্বর অঙ্গি ভারতী, তব কাব্য কিরণে করিয়া স্নান
সমগ্র বঙ্গ মনীষীসংঘ তোমারে অর্ঘ্য করিছে দান।
এসহে রবি! "এসিয়া-কবি"! আনন্দ্ রহো" নক্ত দিন
সিক্ত করহ ঊষর চিত্ত বাজায়ে নিত্য অমিয় বীণ্!
দিয়ে "অবদান" জাগালে জাপান—শুদ্ধ করিলে বৌদ্ধমঠ
ঋত্বিক্ বেশে মার্কিণে এসে স্থাপিলে নূতন পূজার ঘট
"কানাডা"র ডাকে নাহি দিলে কাণ, দ্রবিল পরাণ দেশের তরে,
নিজ "নিকেতনে" এস দ্বিজোত্তম! শান্তিকেতন লইয়া করে।

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

——:০:——

সাময়িক সারসংগ্রহ।

ভারতে কৃষি-বিজ্ঞান।

কৃষি-বিজ্ঞান ভারতবর্ষে কোন্ উপায়ে প্রচলিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম মতামত প্রকাশ করিয়াছেন এবং বহুবিধ উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ ফলোদয় হইয়াছে একথা বোধ হয় কেহ

স্বীকার করিবেন না। কৃষি জীবিরা একটা আদর্শ লইয়া কাজ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু সেই আদর্শটিকেই তাহারা খুঁজিয়া পাইতেছে না। অনেক সভা সমিতিতে এবিষয় লইয়া অনেক রকম আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং বহুবিধ বাদানুবাদও হইয়াছে কিন্তু তাহার ফল কিছুই হয় নাই বলিলেই চলে।

গোড়াতেই এই প্রসঙ্গটি নিম্ন লিখিত দুইটি সমস্যার গণ্ডগোলে পড়িয়া নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে :—

১। যে সমস্ত লোক কৃষি-বিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়া কৃষি-বিভাগের উচ্চপদের উপযোগী হইবার চেষ্টা করিতেছে অথবা যাহারা শুধু এই বিভাগের অধ্যাপনা কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিতে সমুৎসুক তাহাদিগকে কলেজ স্থাপন করিয়া শিক্ষা প্রদানের প্রকৃষ্ট উপায় নিরূপণ করা।

২। কৃষক সন্তানদিগকে শিক্ষাদান করিবার অভিপ্রায়ে প্রাথমিক বা অপেক্ষাকৃত উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কৃষি-বিজ্ঞান প্রচারের সহজ পন্থা আবিষ্কার করা।

শুধু ইহাই নয়—উপরোক্ত ভূম্যাধিকারিদিগের সন্তানদিগকে কিন্তু বিদ্যালয়ের উপাধির দিকে আকৃষ্ট হইতে না দিয়া তাহাদিগকে কৃষি বিভাগে সুদক্ষ করিবার ইচ্ছাটাকেও এই প্রসঙ্গের সহিত জড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাতে মূল বিষয়টি আরম্ভেই জটিল আকার ধারণ করিয়াছে।

প্রাথমিক এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষা প্রচারের আলোচনাই আমরা প্রথমে করিব। ১৮৮০ খৃঃ দুর্ভিক্ষ সমিতির সদস্যগণ বলিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত পল্লীবাসিগণ উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং সংস্কার-কল্পে যত্নবান না হইবে ততদিন উক্তবিদ্যার উন্নতি অসম্ভব। ১৮৮৮ খৃঃ কৃষি বিভাগের সমিতি উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন এবং নির্ব্বন্ধতার সহিত বলিয়াছেন যে "আবশ্যকীয় বিষয়গুলি" শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য প্রথমেই উপযুক্ত এবং কর্ম্মদক্ষ শিক্ষক গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। যদি ঐ আবশ্যকীয় বিষয়গুলি সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইত তবে ভবিষ্যতে আর কোন গোলমালেরই সৃষ্টি হইত না। আর উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ার করিতে হইলে একটি বিশেষ ভাবের কলেজ স্থাপন করা বিশেষ আবশ্যকীয়।

কৃষিজীবিদের ভিতরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার যে একটি আবশ্যকীয় এবং সঙ্গত প্রস্তাব তাহা ডাক্তার ভল্‌কার তাহার, বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং সমিতিও উহার সমর্থন করিয়াছেন। এই মূল প্রণালীটির সঙ্গে অন্যান্য উদ্দেশ্য মিশিয়া পরবর্ত্তী সময়ে গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। তৎসময়ে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা প্রণালীর সহিত কৃষি বিষয়ক শিক্ষার সংযোগ রাখিতে হইবে এবং উক্ত বিষয়ক দুইএকখানি পুস্তকও গ্রাম্য বিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত পাঠ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের এই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। যাহাতে সর্ব্ববিধ শিল্প কার্য্যাদির দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয় তৎবিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। পাঠ্য পুস্তকে পরিচিত বস্তুগুলির সহজ ভাষায় আলোচনা হওয়া আবশ্যকীয়। শিক্ষনীয় বস্তুগুলি যথেচ্ছভাবে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে সুদক্ষ শিক্ষকেরা অভিপ্রেত বিষয়গুলি উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করিতে পারে তজ্জন্য নর্ম্মাল স্কুল সমূহের শিক্ষার নিয়মাদি কতক অংশে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

পরবর্ত্তী আলোচনাতেও উপরুক্ত নিয়মাবলীর সমর্থন করা হইয়াছে। কৃষি স্বম্বন্ধীয় সহজ এবং সুলভ বিষয়গুলি প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। পল্লী বিদ্যালয় সমূহে যে রকমেরই কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদান করা হউক না কেন, তাহাতে কৃষি স্বম্বন্ধীয় কথা যেন সর্ব্বদাই সংযুক্ত থাকে কারণ পল্লীবাসীদের আশেপাশের প্রায় সমস্ত জিনিষই উক্ত ব্যাপারে জড়িত।

এখন আমরা দেখিতেছি যে পূর্ব্বে মূল উদ্দেশ্যই ছিল পল্লীগ্রামের বিদ্যালয় ইত্যাদিতে কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করা। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে সে উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। কৃষি বিদ্যা যদিও প্রকৃত বিজ্ঞান নয় কিন্তু অনেক রকম বৈজ্ঞানিক বিষয় ইহাতে জড়িত আছে, সেই জন্য উক্ত বিদ্যা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে বিজ্ঞান শাস্ত্রে উপযুক্ত পরিমাণে পারদর্শিতা লাভ চাই। এখন সকলেরই ধারণা হইয়াছে যে কৃষি বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় না। পল্লী বিদ্যালয় সমুহে সাধারণ বিষয়াদিতে শিক্ষা প্রদান করা উচিত। এবং কৃষি বিষয়ক শিক্ষা পারিভাষিক হওয়া উচিত। যদি সাধারণ শিক্ষার প্রকৃত অবস্থার দিকে সবিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হইত তবে কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের জন্য উদ্যম যে

আরও বাড়িয়া যাইত তাহার কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে যাহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইতেই স্কুল ছাড়িয়া দেয়। সুতরাং ক্রমশঃই উপরের দিকের সংখ্যা কমিয়া যায়। ইহার মধ্যে কৃষিজীবি কতজন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কিন্তু সংখ্যা যে অত্যন্ত কম তাহার সন্দেহ নাই।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে বালকদের পক্ষে এই বিষয়টা নিতান্তই কঠিন হইয়া পড়ে এবং এই বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা তাহাদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভবপর নয়। কিন্তু আবার অন্যপক্ষে ইহাও বলা যাইতে পারে যে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে বালকেরা যে শিক্ষা লাভকরে তাহা তাহাদের জ্ঞাত বিষয়ের কোন কার্য্যে আসিবেনা কেন? যদি একজন বালক তাহার দৈনন্দিন পাঠের মধ্যে চাউলের বৃত্তান্ত পাঠ করে তবে নিশ্চয়ই সে চাউলের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবে, কেননা সেত উহা প্রত্যহই দেখিতেছে। যে সমস্ত প্রাণীদের বিষয় বালকেরা অবগত থাকে সেই সব প্রাণীদের বিষয়ই তাহাদিগকে পাঠ করিতে দেওয়া উচিত। আলিপুরের চিড়িয়াখানা তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া কিছুই লাভ হইবে না। উচ্চ শ্রেণীতে তাহাকে শুধু সুধের হিসাব এবং ফসলের মূল্যাদি নিরূপণের পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করা উচিত। কারণ ভবিষ্যতে ইহাই তাহার উপজীবিকা হইবে। ঋতু এবং উদ্যান ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা থাকিলে তাহার পক্ষে অপরাপর বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা সহজ সাধ্য হয় সন্দেহ নাই। মোটের উপর যাহাতে ভিত্তিদৃঢ়রূপে গঠিত হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। ভিত্তি দৃঢ় হইলে জ্ঞানের বিকাশ আপনা হইতেই হয়। ভাষা আয়ত্ব করিবার প্রণালী উত্তমরূপে শিক্ষা হইলে কার্য্যতঃ তাহার ব্যবহার আপনা হইতেই আসে।

সম্প্রতি পল্লী বিদ্যালয় সমূহে কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদানের অভিমতটা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এবং পাঠ্য পুস্তকের তালিকা হইতে উহাকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে এখন মত হইয়াছে যে, যাহাতে সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতিতে কৃষি সম্বন্ধীয় বিষয়ও কিছু থাকে তাহার চেষ্টাকরা হইবে। এবং অনুধ্যান শক্তি ও স্কুল সমূহের চতুর্দ্দিকে দ্রষ্টব্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান যাহাতে সহজ লভ্য হয় সেই জন্য প্রকৃতি বিষয়ক শিক্ষা প্রদানও করিতে

হইবে। এখন স্কুলপাঠ্য গুলিও সেই উদ্দেশ্যানুসারে লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতি বিষয়ক শিক্ষাপ্রদান করা হইয়া থাকে এবং স্কুলের চারিদিকে উদ্যানাদি রচনা করা হইতেছে। কিন্তু ইহাতে একটি অসুবিধাও আবার আছে। উপযুক্ত শিক্ষক অনেক সময় পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক ছাত্রদের স্বভাব জ্ঞানের বিকাশ হইতে উত্তমরূপে হয় তৎবিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সাধারণভাবে শিক্ষা প্রদান করিলেই চলিবে। কোন বিশেষ এবং নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করার কোন আবশ্যক নাই। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে যাহাতে চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা শক্তি বৃদ্ধিপায় সেইজন্য সাধারণ শিক্ষা উত্তমরূপে হওয়া উচিত। তাহা হইলে বালকদিগের মন আপনা হইতেই তাহাদের চারিদিকের বিষয়াদির দিকে আকৃষ্ট হইবে।

অপেক্ষাকৃত উচ্চবিদ্যালয় সমূহে কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করা ঐ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মোটেই পছন্দ করেন না। বস্তুতঃ যে সকল যুবক কৃষিকলেজে ভর্ত্তি হইতে চায় তাহাদের পক্ষে ইহা একটা অসুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহা দেখা গিয়াছে যে, যে সমস্ত যুবক কৃষিকলেজে প্রবিষ্ট হইবার জন্য আবেদন করে তাহাদের অনুধ্যান শক্তি বড়ই দুর্ব্বল। ইংরাজী ভাষায় তাহাদের অভিজ্ঞতা কম এবং হস্ত সম্বন্ধীয় কার্য্য কৌশল মোটেই জানে না। কৃষিকলেজে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইলে সাধারণ শিক্ষা যথেষ্ট থাকা উচিত; অনুধ্যান শক্তি প্রখর হওয়া উচিত এবং উদ্ভিদ কিংবা রাসায়নিক বিজ্ঞানে কিছু কার্য্যকরী জ্ঞান থাকা উচিত। কারণ তাহাতে শুধু মস্তিষ্ক পরিচালনা নয় হস্তের ব্যবহারও করিতে হয়। পল্লী-বিদ্যালয় সমূহে যেমন ছাত্রদিগের স্বভাব বিকাশের জন্য উত্তমরূপে কোন শিক্ষা প্রদান করা উচিত, কৃষি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাও ঠিক সেই অনুপাতে হওয়া উচিত। কারণ তাহাদের শিক্ষা পল্লীছাত্র সমূহ হইতে কোন অংশে ন্যূন হওয়া উচিত নহে।

পুসার কলেজ এবং কৃষিবিভাগের বর্ত্তমান উন্নতি হইবার পূর্ব্বে মান্দ্রাজ, বম্বে, বঙ্গ, যুক্ত এবং মধ্য প্রদেশে উচ্চকৃষি বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করা হইত কিন্তু তাহাতে যে পরিমাণে টাকা ব্যয় ও আয়াস স্বীকার করা হইয়াছে সেই অনুপাতে বিশেষ কোন ফল লাভ হয় নাই। তাহার কারণ সেই সময়ে কৃষিকলেজ এবং স্কুল গুলিকে লোকে গভর্মেণ্টের চাকুরী পাইবার একটি প্রধান

উপায় বলিয়া গণ্য করিত। এমন কি যাহারা নিজের জমীর উন্নতি কামনায় শিক্ষা করিতে যাইত তাহারাও বিশেষ লাভবান হয় নাই। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ আশা করিয়াছিলেন যে উপরোক্ত শ্রেণীর লোকেরাই কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিবে কিন্তু তাহাদের সে আশা সফল হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে একটা কথা উঠিয়াছে যে ভারতবর্ষে বোধ হয় উন্নতভাবের কৃষিশিক্ষা প্রচারের আবশ্যক ততটা নাই। কার্য্যের সঙ্গে যে অভিজ্ঞতা জন্মে তাহার সহিত রসায়ন কিংবা উদ্ভিদ সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান থাকিলেই কৃষিজীবিদের পক্ষে শিক্ষা যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়।

১৯০৪ খৃঃ গভর্মেণ্ট স্বকীয় মন্তব্য প্রকাশকালে পুসাকেই কৃষিশিক্ষার প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৃষি প্রচারের উদ্দেশ্যটাকে একটু বড় করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে একটা সুব্যবস্থা স্থাপন অগ্রে করিতে হইবে। কারণ এই রকম শিক্ষার গুরুত্ব ক্রমেই লোকে উপলব্ধি করিতেছে। কিন্তু উন্নতি প্রথম উপরের দিক হইতেই আরম্ভ হওয়া উচিত। দেশীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান সম্ভব হইবার পূর্ব্বে যাহাতে পাঠ্য পুস্তক সহজেই সরবরাহ করা যাইতে পারে এজন্য দেশস্থ লোকদিগকে ইংরাজী ভাষায়ই শিক্ষা প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ উত্তমরূপে একখানা প্রাথমিক পুস্তক প্রকাশিত করিতে হইলে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন হয়। এই সময়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিশিক্ষা ইংরাজিতেই সম্ভবপর ছিল সুতরাং ভবিষ্যতে দেশীয় ভাষায় কৃষিবিজ্ঞান প্রচার যাহাতে সহজ হয় এইজন্য তৎকালে ইংরাজীতেই ভারতবাসিদিগকে শিক্ষা প্রদান করা যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু একটি অভাব পূর্ব্বের মতই রহিয়া গেল। উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত এবং জমীর তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া দুঃসাধ্য হইল। পরিশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, যদি উক্ত কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষাটাকে রাজস্ব বিভাগে কার্য্য পাইবার একটা প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত করা যায় তবে অনেক ছাত্র এইদিকে আকৃষ্ট হইবে। ভবিষ্যতে তাহা হইলে শিক্ষকের অভাব হইবে না।

পুসা কলেজের বিষয়ে গভর্মেণ্টের এই ধারণা যে ফলবতী হয় নাই তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি; কারণ পুসাই এখন তত্ত্বানুসন্ধান সমিতির প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার সহিত শিক্ষার কোনরূপ সংশ্রব সম্প্রতি

নাই বলিলেও চলে। যদি ভবিষ্যতে ইহা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয় তখন এখানে শিখিবার অনেক বিষয় থাকিবে।

গভর্মেণ্ট সুদক্ষ পরামর্শকারীদের দ্বারা কৃষি-কার্য্যের ক্রমোন্নতির জন্য যে মুসাবিদা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন তাহাতে প্রথমতঃ কার্য্যদক্ষ লোকদিগকে উপযুক্ত যায়গায় একখণ্ড জমি বিশেষ কার্য্যের জন্য প্রদান করিবার জন্য সংকল্প করা হইয়াছিল। যাহাতে অন্যান্য তত্ত্বানুসন্ধান সুচারুরূপে এবং বিস্তৃতরূপে আরম্ভ করা যায় তাহারই জন্য এইরূপ পন্থা অবলম্বন করা গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ কৃষি কার্য্য এবং তত্ত্বানুসন্ধান কার্য্য শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য একটি কৃষি কলেজ স্থাপনের কল্পনা হইয়াছিল। উহাতে যাহারা শিক্ষা লাভ করিবে পরিশেষে তাহারাই অন্যকে শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষি কলেজ তত্ত্বানুসন্ধান কার্য্যের সাহায্যকারী না হইয়া প্রকৃতপক্ষে উহার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উত্তর ভারতে অন্ততঃ দুইটি প্রদেশে কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক বরং সংক্ষেপ করা হইয়াছে, এবং উদ্বৃত্ত সমস্ত টাকা চূণ সুরকীতেই ব্যয় হইয়াছে।

যে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা না করা হইবে, সে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কৃষি বিজ্ঞান প্রচারের উদ্যম ব্যর্থ হইবেই, তদ্ব্যতীত তাহা উন্নতির পক্ষেও প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক এবং কলেজ সংসৃষ্ট শিক্ষারও বাধা জন্মিবে। প্রাথমিকদের জন্য সাধারণ নিয়মাবলীই যথেষ্ট হইতে পারে কিন্তু কলেজের জন্য আরও উন্নতভাবের শিক্ষা প্রয়োজন এবং সেই শিক্ষা যে যাবত না উপাদান সংগ্রহ হইয়াছে সে পর্য্যন্ত কোন রূপেই প্রদান করা যাইতে পারে না।

আমরা দেখিতেছি যে কোন প্রদেশে কৃষি বিভাগের অঙ্গ বর্দ্ধিত হইতে থাকে সেই প্রদেশই কৃষি কলেজকে প্রত্যেক অঙ্গের কেন্দ্রস্থল করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। এবং সমস্তই কৃষি-শিক্ষার অধিকারভুক্ত বলিয়া গণ্য হয়। কর্ত্তৃপক্ষগণ অবশ্য ইহা দ্বারা নিজেদের সুবিধা কিছুই করেন নাই। ১৯০৬ খৃঃ যে পুস্তক সকল নির্ব্বাচিত হইয়াছিল ১৯০৮ খৃঃ তাহারই আবার সংশোধন করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে প্রত্যেক বিষয়ের প্রয়োজন অংশাদি সেই বিভাগের অভিজ্ঞ লোক দ্বারা নির্ব্বাচিত হইত, ফল ইহা হইল যে পাঠ্য পুস্তকাবলী

কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ঘটিত পুস্তক লইয়াই সংগঠিত হইত। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সংযোগ ছিল না। অন্যভাবে পুস্তকাবলী নির্ব্বাচিত হইলে যে কত উপকার সাধিত হইত কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বিবেচনা করা সঙ্গত মনে করেন নাই। এই পদ্ধতি পরিশেষে বাধ্য হইয়া উঠাইয়া দিতে হইল। যদিও কোন যায়গায় কোনরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়া থাকে তবে তাহা শুধু উন্নতভাবের শিক্ষা এবং শিক্ষকদের তৎপরতার জন্যই হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ ১৯১৩ খৃঃ উপরোক্ত নিয়মের প্রত্যাহার করিলেন। নিয়ম বিশেষের অনুবর্ত্তী হইয়া এখন আর চলিতে হয় না সুতরাং প্রত্যেক বিভাগই স্বকীয় শিক্ষার অনুপাতে নিজ নিজ প্রদেশে কৃষি বিজ্ঞান বিস্তারের জন্য উপযুক্ত নিয়মাবলী প্রচলিত করিতে পারেন।

মোটের উপর কথা হইতেছে যে নিজেদের উদ্দেশ্য সম্যকরূপে উপলব্ধি না করিতে পারিলে আমরা প্রকৃত উন্নতিলাভ কখনও করিতে পারিব না। প্রথমতঃ আমাদের দেশে কৃষিজীবি বলিয়া যে সম্প্রদায় আছে, তাহারা একরূপ অশিক্ষিত বলিলেই হয়। তাহাদের পুস্তকের ভাষায় শিক্ষা প্রদান করিলে যে বিশেষ লাভ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের বুদ্ধি বৃত্তির উন্নতিলাভ করাও সময় সাপেক্ষ। সুতরাং তাহাদের পাঠ্য পুস্তক দ্বারা জ্ঞান জন্মান অসম্ভব। শুধু প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঘটিত উন্নত প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে গভর্মেণ্ট তাহাদিগকে বাধ্য করিতে পারেন। তাহাতে কতকটা সুফল হইতে পারে।

তারপর অপেক্ষাকৃত উচ্চ শিক্ষিত ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারিদিগের সন্তানগণ নিজের জমির তত্ত্বাবধান নিজেরাই করে। তাহাদের পক্ষেও উচ্চভাবাপন্ন পুস্তক কেন কার্য্যকরী হইবে না? বরং যদি সহজবোধ্য দুই এক খানা-পুস্তক তাহারা পাঠ করে তবে তাহাতেই তাহাদের লাভ হইতে পারে। তাহাদের শিক্ষানুযায়ী উপযুক্ত পুস্তকও নির্ব্বাচন করা উচিত। 'বম্বেতে দেশীয় ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন করিয়া শিক্ষা প্রদান করায় কতক পরিমাণে সুফল লাভ হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে ১৪ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদিগকে ভর্ত্তি করা হইয়া থাকে। সাধারণ বিদ্যালয়ে ৪র্থ কি ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াই তাহারা এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পারে এখানে অধিকাংশ ছাত্রই গ্রামের

প্রধান ব্যক্তি কিংবা নিম্ন শ্রেণীর জমিদারদিগের বংশধর। এখানে কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। দুইবৎসরে পাঠ সমাপ্ত হয়। উপরন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

পরিশেষে কৃষি বিভাগের জন্য উপযুক্ত লোক গঠন করিবার মানসে কলেজেও শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যটি ছিল উচ্চবংশীয় ভূম্যধিকারিদের বংশধরদিগকে এই কলেজে শিক্ষা প্রদান করা। কিন্তু তাহারা এপর্য্যন্ত কেহই অগ্রসর হয় নাই। ১৯০৪ খৃঃ পর্য্যন্ত অন্য রকম নিয়ম ছিল। পরিশেষে তাহার সংস্কার করা হয়। ভূম্যধিকারিদের সন্তানদিগকে সাধারণ বিদ্যার সঙ্গে কিছু কিছু কৃষি বিজ্ঞান, জরিপ, হিসাব পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ ধরণের স্কুল স্থাপিত করা উচিত। বম্বের বিদ্যালয়ে এই নিয়মানুসারেই শিক্ষা প্রদান হইতেছে। কলেজ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চবংশীয় ভূম্যধিকারিদের সন্তানদিগকে পাইবার আশা হইয়াছিল কিন্তু সে আশা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু ইহাতে বিশেষ নিরাশ হইবার কারণ নাই। অনেক যুবক সম্প্রতি শুধু কার্য্য পাইবার উদ্দেশ্যেই বিলাতে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছে। এই বিষয়ে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ উভয়ই সমান। অবশ্য ইংলণ্ডে এখন অধিকাংশ ভূম্যধিকারিদের বংশধরগণ অক্সফোর্ড কিম্বা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া অপেক্ষা কৃষিবিভাগে অভিজ্ঞতা লাভ করাই প্রকৃষ্ট মনে করিতেছে। আমাদেরও আশা আছে, ভারতেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত হইবে। যদিও তাহারা কেহ এখন অগ্রসর হইতেছে না তথাপি আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। উপযুক্ত শিক্ষক সম্প্রদায় গঠন করিতে পারিলে কলেজের উৎসাহ বাড়িবে এবং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রণালীরও উন্নতি লাভ হইবে। শিক্ষকেরা নিম্নশ্রেণীর জন্য ক্ষুদ্র অথচ সহজ বোধ্য পুস্তক প্রণয়ন বা প্রণয়নে সহায়তা করিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নিয়ম বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া এখন আর চলিতে হয় না। বিভাগস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত নিয়মাদি নিজেরাই প্রচলন করিতে পারেন।

কৃষিকলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য কিরূপ বিদ্যা সম্পন্ন হওয়া দরকার তাহা কর্ত্তৃপক্ষগণ নিরূপণ করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রিপোর্টগুলি

সেই অনুযায়ী হয় না। স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করা কাহারও দ্বারা হইয়া উঠে না। বিচক্ষণতার অভাবও আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

উচ্চ শিক্ষিত না হইলে শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত বিবেচনা না করাই ভাল হয়ত ইহাতে ছাত্র সংখ্যা কম হইবে এবং সম্পন্ন ভূম্যধিকারিদের সহানুভূতিও ইহার জন্য থাকিবে না। পরিশেষে যদি অবস্থা তাহাই হয় তাহাদের জন্য অবস্থানুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা করিলেই চলিবে।

শ্রীযামিণীমোহন সেন।

মনের বাঘ।

(১)

'আঃ, এখন এখানে কেন? কাজের সময়ে গোলমাল ভাল লাগে না।'

"আমি কাছে এলেই অমন ভাবে রাগে গর্ গর্ করে ওঠ কেন? আমি কোন্ অপরাধে তোমার চোখের বালি হয়ে উঠেছি, তাত কিছুতেই বুঝ্তে পার্‌ছিনে। আমায় দেখ্‌লেই যেন তোমার মনে অসুখ অশান্তির বাণ ডাকে! পাঁচ বছর পার হল তোমার পায়ের দাসী হয়েছি, এর ভিতর একদিনের তরেও বুঝ্‌তে পারলুম না, আদর সোহাগ মিষ্টি কথা কাকে বলে? আমি তোমার কাছে কোন দিন কোন রকম অপরাধ করেছি ব'লে আমার মনে পড়ছে না। আমি কিছু না করলেও আমার ঘাঁড়ে দোষের বোঝাটি চাপাবার জন্য তোমার যত্নের তিলমাত্র ত্রুটি হচ্ছে না। এই আমি এসে তোমার পাছে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি, 'টু' শব্দটি করেছি ব'লেত মনে পড়ছে না, অথচ তুমি দয়া ক'রে বল্‌ছ,—'কাজের সময় গোলমাল ভাল লাগে না।' আমায় দেখ্‌লে তোমার মনের ভিতরে একটা গোলমালের হাট বসে,—না? আমি কি অদৃষ্ট ক'রেই সংসারে এসেছিলুম"—ইহা বলিতে বলিতে একটি বিকাশোন্মুখযৌবনা সহসা ছিন্নতার-বীণার মত নীরব

---

* James Mackennaর হইতে উদ্ধৃত।

হইল। স্বামীপ্রেমেবঞ্চিতা কিশোরী প্রণয়বিমুখ পতির বিরক্তিতিক্ত-বাক্যের উত্তর দিতে গিয়া উচ্ছ্বসিত দুঃখরাশির প্রতিকূলতায় প্রবলরূপে বাধা প্রাপ্ত হইল। মর্ম্ম-যাতনায় তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইল, সঞ্চিত অশান্তি মনস্তাপের আগুনে গলিয়া নয়ন-পথে বন্যার মত ছুটিয়া বাহির হইল। তখন সেই পতি-ব্যবহারক্লিষ্টা কিশোরী বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুপ্লাবিত নয়নদ্বয় আবৃত করিয়া বসিয়া পড়িল। পতি-প্রভুর ইহাতে আরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। স্বামী দ্বাবিংশ বৎসর বয়সের নবীন যুবক, বয়সের দোষে কি স্বভাবের দোষে বলিতে পারি না, এই পতি-রত্ন পতিত্বের গৌরবে সর্ব্বদাই যেন বিভোর হইয়া আছে।

সরলা স্ত্রীর অবিরল বিগলিত অশ্রুধারায় এই পতিদেবতার বিরক্তিবহ্নি কিছুমাত্র নির্ব্বাপিত হইল না বরং ঘৃতাহুতিতে কৃষ্ণবর্ত্মের ন্যায় প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল। উত্তরে তাহার যে ব্যবহার মাধুর্য্য ও ভাষালালিত্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এইরূপ ;—"তোমার মধুমাখা মুখখানি ও প্রাণজুড়ান চোখের জল আমায় পাগল করে তুলেছে। দিন নাই, রাত নাই, নিদ্রা নাই, চব্বিশ ঘণ্টা একই রাস্তায় একই দীর্ঘনিঃশ্বাস ও চোখের জলের মাল বোঝাই ক'রে বকাউল্লার ছেক্ড়াগাড়ী ঘটর ঘটর শব্দে চলেছে। সত্যি বল্‌ছি, তোমার দুঃখের চড়কার কড়কড়ানিতে আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছি। কথাটা কি বুঝলে,—কাজ কর্ম্মের সময় লোক সাম্‌নে আস্‌লেই গোলমাল বোধ হয়, কথা বলার দরকার হয় না। এইত হ'ল কথা, এর জন্য এমন কালবৈশাখীর ঝড় বৈছে কেন? তারপর সত্যি কথা বল্‌তে কি তিলোত্তমা, তোমার ঐ বেগমবাহার চেহারাখানা দেখ্‌লে আমি আর ঠিক থাক্‌তে পারিনে। কি গজবরনিন্দিত কাল কি গোলআলুচেরা আঁখি, কি ধুতুরা ফুলজিনি নাসা, কি পটোলগঞ্জিত ওষ্ঠাধর, কি তালজটাগঞ্জিত কেশদাম, সবার উপর—কি দুধে আলকাত্রা মিশ্রিত রঙ্‌, এই রূপরাশির উপর দৃষ্টি পড়্‌লে চোখ্‌ ঝল্‌সে যায়, ফের আর চাওয়া চলে না। তোমার সৌন্দর্য্যের ঐ তীব্র আলো আমার চোখে মোটেই সয় না, তাই—বলছিলুম, ঐ রূপের ডালি নিয়ে আমার কাছে যখন-তখন এস না। এতে এমন কি ব্রহ্মহত্যা পাপ যা করে বসেছি, তা'ত বুঝ্‌তে পারছি না।"

"তা বুঝ্‌বার জন্য তোমাকে আর মাথার ঘাম পায়ে ফেল্‌তে হ'বে না। এই রূপের জাহাজ যখন-তখন যাতে তোমার চরণতীরে ভিরাইতে না হয়, তার জন্য

যতদূর পারি চেষ্টা কর্‌ব। ভগবান্ তোমার এই কষ্ট কবে দূর কর্‌বেন জানিনে, দিনরাত কত ক'রে যমবেটাকে ডাক্‌ছি, কালাটার কাণে আমার কান্না ত কিছুতেই পৌঁচ্‌ছে না।" ইহা বলিয়া চোখের জল দু'হাতে মুছিতে মুছিতে পতিপ্রেমবঞ্চিতা কিশোরী স্থানান্তরে চলিয়া গেল। এই পতি পত্নীর নাম শোভনা ও হীরেন্দ্রকান্ত।

(২)

'হীরেণের পড়ার খরচটা বন্ধ করাই স্থির করিতেছ না কি?'

'স্থির আবার কি? গত মাস থেকে টাকা ত আর পাঠাচ্ছিনে।'

'মেয়েটা একে জামাইর দু'চোখের বিষ, তাতে খরচটা বন্ধ করে দিলে, কালী জানেন, ওর অদৃষ্টে কি আছে?'

'ওর অদৃষ্টের ফলাফল জানবার জন্য কালীর কাছে যেতে হবে না, জিজ্ঞেস কর্‌লে আমিই সব বলে দিতে পারি। শোভনার কপালে সুখ নেই, টাকা দিলেই কি জামাইয়ের মন ফির্‌বে? পাঁচ বছর খরচ দিয়েত দেখ্‌লুম, সুফল কি কিছু ফলেছে? একবার নয়, দু'বার নয়, তিনবারে শ্রীমান্ এফ-এ পাশ দিয়েছেন, তারপর আরও দু'বছর মাসে মাসে ৩০।৩৫৲ টাকা জলে ফেলে বাবাজীবনকে বি-এ পর্য্যন্ত পার করালুম, এতে কিছু কি শোভনার সৌভাগ্যের পরিবর্ত্তন ঘটেছে? মিছামিছি আর অর্থ নষ্ট করে লাভ কি? এই বোকা দণ্ডটা মেয়ের নামে রেখে দিলে ওর পরকালে উপকার হবে। 'এম্-এ' পড়াতে গেলে বিস্তর খরচ হ'বে। তিন বছরের কমত নয়, দু'এক বছর ফাউ ধরে নেও। মাষ্টারি ক'রেও 'ল' পড়া যায়। এরজন্যে শ্বশুরের বুকের রক্ত চুষে খাওয়ার প্রয়োজনই বা কি? সমাজের এই অপকর্ম্মের বাড়াবাড়িতে প্রশ্রয়ও দিতে নেই। এসব চারি দিক্ চিন্তা ক'রেই দশম গ্রহটির পড়া-খরচ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি।

'তা যেন হ'ল, আমি কিছু মোটামুটি বুঝি, এতদিনই দিতে পেরেছ, অল্পের জন্য সব নষ্ট কর্‌তে বসেছ কেন? মেয়েটার জন্য আমার বড়ই চিন্তা হচ্ছে।'

'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী' তোমার কথায় চলা হচ্ছে না। মেয়েটার কপালে যাই থাক্ আমি আর খরচ দিচ্ছি নে। ওরা যদি শোভনার সাথে ভাল ব্যবহার কর্‌ত তা হ'লে আমি যাবৎজীবন খরচ দিয়ে ওদের মন যোগাতে চেষ্টা কর্ত্তুম। জামাই

থেকে আরম্ভ ক'রে বেয়াই, বেয়াইন, এমন কি বাড়ীর মশামাছিটি পর্য্যন্ত যেন ওর নামে মূর্চ্ছা যায়, শোভানা সকলেরই চক্ষুঃশূল।

শোভনার মত কুৎসিত কদাকার বউ নাকি আর কারো ঘরে কস্মিনকালেও যায় নি? ওর মত বোকা হাবা মেয়েও নাকি সমস্তখানি বাঙ্গালায় জন্মায় নি? কোনকালে জন্মাবে কিনা, সন্দেহ। শোভনার মত সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মেয়ের নামে এ সকল কথা উঠ্‌লে, ও তা বাপ্‌মার কাণে সর্ব্বদা এলে কেমন লাগে, একবার ভেবে দেখ দেখি।'

'তা দেখ্‌তে পাচ্ছি, তবু—'

'তবু টবু আমাদ্বারা আর হ'য়ে উঠ্‌বে না।' তুমি এতটা ভাবনাতেই বা পড়্‌ছ কেন? মোল্লার দৌড় মস্‌জিত পর্য্যন্ত, এর বেশীত আর নয়? শোভনাকে হয়ত আর ছেড়ে দিবে না, নয়ত বাবাজীবন আবার কলাতলায় যাবেন, এই তোমার ভয় ভাবনা? ওদের এই পর্য্যন্তইত ক্ষমতার দৌড়? এর বেশী আর কি করবে। এই অপরাধে তোমাকে ও আমাকে নিশ্চয়ই ফাঁসী কাঠে ঝুলাতে পার্‌বে না। যাক্, আফিসের বেলা হ'ল, স্নানাহারের উদ্যোগ দেখা যাক্। ইহা বলিয়া বক্তা ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন, অপর জন একমনে আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

এই দুইজন কে? একজনের নাম শ্রীকণ্ঠ কর, ইনি বয়সে পঞ্চাশেরদ্বারে আসিয়া হাজির হইয়াছেন। অপর জন তাঁহার স্ত্রী স্বর্ণপ্রভা বয়ঃক্রমে তিন যুগ পার করেছেন। শ্রীকণ্ঠ বাবুর নিবাস হরিহরপুর। হরিহরপুর 'দক্ষীণা' খালের তীরে অবস্থিত, দক্ষীণায় বারমাস জল থাকে। এই পল্লীতে লোকের সংখ্যা বড় কম, গাছ গাছড়ার আধিপত্যই খুব বেশী। বাঙ্গালার সমস্ত বৃক্ষ লতারই বংশধরেরা সম্ভবতঃ মান্ধাতার আমল হইতে নিরাপদে পরম সুখে এখানে বসবাস করিয়া আসিতেছে। পাঁচ সাত কানি ভুঁই লইয়া এক একজনের বাড়ী। এই সুবিস্তৃত জমির অধিকাংশ ভাগই আম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি বাঁশ, বেত প্রভৃতি বৃক্ষলতার অধিকারভুক্ত। সেকালের রীতি নীতি হাল চালগুলা বোধ হয় সমস্ত গ্রাম হইতে 'অর্দ্ধচন্দ্র' লাভ করিয়া এই পল্লীর পদতলে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের কোনও প্রকার উন্নতির জ্যোতি এই ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষরাজির পত্রপুঞ্জ ভেদ করিয়া এই পল্লীর প্রাঙ্গণ আলোকময়

করিয়া তুলিতে পারে নাই। হরিহরপুরে শিরোমণি, তর্কালঙ্কার, স্মৃতিপঞ্চানন ঠাকুরের টোল আছে, এই তিন টোলে প্রায় পঞ্চাশ জন দেশী বিদেশী ছাত্র সেকেল কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য ও স্মৃতি প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য জীর্ণ শাস্ত্রগুলার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। যে শিক্ষায় স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের সমস্ত তত্ত্ব পাওয়া যায়, এই পতিত পল্লীটির একটি প্রাণীও সেই নব শিক্ষার সহিত পরিচিত হইতে পারে নাই। বিধাতার অভিসম্পাতগ্রস্ত এই গ্রামে এখন পর্য্যন্ত একটিও 'সাহিত্য-হিতৈষিণী 'সমাজ-সংস্কারিণী,' 'নীতিধর্ম্ম প্রচারিণী,' 'বরপণ নিবারণী' 'বিধবারক্ষিণী স্ত্রীশিক্ষা প্রচারিণী' প্রভৃতি সভা সমিতির একটিও এই গ্রামে দর্শন দিতে আজ পর্য্যন্ত সাহস পায় নাই। প্রয়োজনের অভাবে এই স্থানের বাসেন্দাদিগকে চাকুরির উমেদারিতে কোনদিনও বাড়ীর বাহির হইতে হয় নাই, ইহার ফলে ইহারা আজিও বিলাসী বাবু সাজিয়া অর্থ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করিবার অবসর পায় নাই।

হরিহরপুরের প্রায় গৃহস্থেরই ক্ষেত্রে ধান, পুকুরে মাছ ও গোশালায় প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ রহিয়াছে। বিলাস-বিভ্রম ওরফে আদব কায়দার আড়ম্বর এই পাদপাচ্ছাদিত পল্লিভবনে প্রবেশ করিতে এখন পর্য্যন্ত সাহস পায় নাই। সুতরাং মোটা ভাত মোটা কাপড়ের জন্য কাহাকেও এদিক্ সেদিক্ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হয় না। শ্রীকণ্ঠ কর হরিহরপুর বাসীদের মধ্যে একজন সম্পন্ন গৃহস্থ, তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারে কোনওরূপ অভাবের তাড়না নাই। বিধাতার আশীর্ব্বাদে একটি কন্যারত্ন লাভ করিয়া শ্রীকণ্ঠবাবুও স্বর্ণপ্রভা দাম্পত্যজীবনের সরসতা ও মধুরতায় নিমগ্ন হইয়াছেন। তাঁহাদের আদরের একমাত্র কন্যার নাম শোভনা।

এক দুই করিয়া নয়টি বৎসর শোভনার জীবনের উপর দিয়া অতীতে গড়াইয়া পড়িল। শোভনার শুভ বিবাহ তখনও হয় নাই, চেষ্টা চলিতেছে। গ্রামের দশজন শ্রীকণ্ঠবাবুকে একমাত্র আদরের কন্যা বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নবযুগের সংস্কারসমীর এই পল্লীতে প্রবাহিত হয় নাই। এই গৌরী ও রোহিনীদানের দেশে আটের ওপিঠে পা ফেলিতে না ফেলিতে শোভনাকে কেন পরের ঘরে পাঠানের ব্যবস্থা করা হইতেছে না, সে জন্য শ্রীকণ্ঠবাবুকে কিছু কিছু নিন্দার আঘাত সহ্য করিতে হইল। কন্যার বয়ঃক্রমের নবম বছটির অর্দ্ধ অঙ্গ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ-মৃত্তিকার

উপরে থাকিলেও অর্দ্ধ অঙ্গ অতীতের গঙ্গাজলে নিপতিত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীকণ্ঠবাবু বিচলিত হইলেন,—আশা আকাঙ্ক্ষার অর্চ্চনায় নির্ভরশীলতার পরিচয় দিতে পারিলেন না। শেষে ব্যস্ত হইয়া তিনি একবার বরের বাহিরের অবস্থাতেই তৃপ্ত হইলেন, ভিতর অনুসন্ধান আর আবশ্যক বোধ করিলেন না। শ্রীনিবাস গ্রামের রূপকান্ত রায় মধ্যমশ্রেণীর জমিদার। সুদে খাজানায় ষাট হাজার টাকার কারবার চলিতেছে। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হীরেন্দ্রকান্ত রায় এফ্-এ পড়ে,। সৌন্দর্য্যেও দরিদ্র নয়। ঘরে শ্বশুর শাশুড়ী ননদ দেবর প্রভৃতি বর্ত্তমান। সুতরাং বার শত টাকা নগদ ও মাসিক অন্যূন ত্রিশ টাকা পড়ার খরচ প্রদানের চুক্তিতে শ্রীমান হীরেন্দ্রর শ্রীকরকমলে শোভনাকে সমর্পণ করিয়া শ্রীকণ্ঠবাবু নিজকে সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করিলেন। অবস্থাদর্শী শ্রীকণ্ঠবাবু রূপকান্ত ও হীরেন্দ্রকান্তের স্বভাব চরিত্রের কোনই খোঁজ খবর লইলেন না। হীরেন্দ্রকান্ত কলিকাতায় কলেজে এফ্-এ পড়ে। বাসা সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে। কলিকাতার আলো বাতাসে হীরেন্দ্রের প্রকৃতি কতকগুলা নাটকীয় ভাবে ও ঔপন্যাসিকরসে কেমন এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। চেহারাখানিকে এমন নটবর নন্দদুলালী ঠাঁটে গঠিত করিয়াছে যে, দেখিলেই মনে হয়, পায়ের নখ হইতে মাথার কেশাগ্র পর্য্যন্ত কৃত্রিমতায় ভরপূর; চলনে চাহনিতে নায়কদের ভাব রসগুলা যেন দর বিগলিত ধারে গলিয়া পড়িতেছে। তুলনা রহিত উপমাশূন্য নানাভঙ্গি তরঙ্গায়িত কেশ কলাপের উপরে যাঁহার দৃষ্টি একবার পড়িয়াছে, তিনি আঁখিকে কিছুতেই ফাঁকি দিয়া দৃষ্টি অন্যত্র পাঠাইতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে এমন ফ্যাসন, এমন কায়দা, এমন বাহার, এমন আড়ম্বর সে কালের নটবর শ্যামসুন্দরের চাঁচর-চিকুর যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন। এই নট-লীলার সময় যুবক সুন্দরের চিক্কণ চিরুনী আঁচড় বিলাসিত কেশগুচ্ছের সেই চাঁচর চিকুরের তুলনা হয় :কি না? সপ্তাহে অন্ততঃ সাতবার কলিকাতার বাছাই ক্ষৌরকারদিগকে হীরেন্দ্রের কাছে বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে হয়। কেহ কেহ বলেন,—কেশাধার মস্তক ও চিবুক ক্ষৌরকারদিগের খুরশিল্প পরীক্ষার সিনেট হল। পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্যও কেশনাট্যের সম্মান সামঞ্জস্য রক্ষায় কোনও রকম শিথিলতার পরিচয় দিতেছে না। প্রায় ভূমি চুম্বিত বাত্যান্দোলিত চাদর অঞ্চলে সযত্নকৃত

অসাবধানতা, সর্ব্বদা দর্শকগণের নয়ন-মন মুগ্ধ করিতেছে, ইহার কাছে শত বঙ্কিমের উপন্যাসরস, হাজার কালিদাসের কাব্যভাব পরাজয় করিতেছে। এহেন রসগুণধাম নাগারিকের সহিত আলোহীন অনাড়ম্বর পল্লিভবন-প্রসূতা স্নিগ্ধশীতল বৃক্ষচ্ছায়াবর্দ্ধিতা সেকেলে সাদাসিধা ধরণে গঠিতা গ্রাম্য বালিকা শোভনার মাল্য বিনিময় সঙ্ঘটিত হইল। প্রজাপতি ঠাকুরের কি নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র! কি মর্ম্মস্পর্শী উপহাস!

'শুভদৃষ্টিতেই' নবম বৎসরের বালিকা শোভনাকে দেখিয়া নবযুগের নবভাবের আকর হীরেন্দ্রকান্ত বুঝিয়া লইল। পিতামাতা অর্থ লোভে তাহার প্রেম-জীবন-পারিজাত-মূলে বিষম কুঠারাঘাত করিলেন। শুভ বিবাহের আনন্দকোলাহল নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই সাত দিনের ভিতরে পল্লী-বালিকা শোভনার রোদন সম্বলতা, তদুপরি নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা হীরেন্দ্রকান্তকে জোর করিয়া বাড়ী ছাড়া করিল। অদৃষ্ট প্রতারিত হীরেন্দ্রকান্ত পড়ার ছল করিয়া ছুটি থাকিতেই কলিকাতার প্রবাস বাসে আসিয়া হাজির হইল। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল,—তাহার দাম্পত্য-জীবন উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেই নির্দ্দয় প্রজাপতি এক দোয়াত দুর্ভাগ্য কালী ঢালিয়া ফেলিয়াছেন। এই পাঁড়াগেঁয়ে বালিকা মেয়ের সহিত ভালবাসা? অসম্ভব! তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করা!—তাও কি হয়? হীরেন্দ্র পরিষ্কার বুঝিল,—পিতার অভিসম্পাতে 'সাধকি সাগর হৃদিপর শুকা'ল'।

হীরেন্দ্রের রসাল সৌখীন বসন্তের প্রফুল্লতাজড়িত জীবন সহসা নিরাশ বর্ষার বিষাদ বাদলে মলিন সৌন্দর্য্যহীন হইয়া পড়িল।

এ ভাবে তাঁহার জীবন তরণি
চলিল, প্রণয়-সাগর পথে
আশা প্রফুল্লতা বিদায় করিয়ে,
বিষাদ নৈরাশ্য লইল সাথে।

রূপকান্ত রায়ের হাতে একখানি চিঠি, তিনি কম্পিতপদে বিষাদ ব্যাকুলচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া বিষাদ মলিন বদনে গৃহিণী সারদাসুন্দরীকে বলিলেন,— 'তোমার দাদা ত' আমাদের এক সর্ব্বনাশের কথা লিখেছেন, হীরেন্দ্র আজ চার দিন বাসার কাকেও কিছু না বলে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে, গত দুইবার

পরীক্ষার ফল ফেল্ হয়েছে, হীরেন এবারও ফেইল, তাই দুঃখে ও লজ্জায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে।'

"অ্যাঁ অ্যাঁ, বল কি ? এখন উপায় ?" এই কথা কয়টি মাত্র আকাশ বিদারী স্বরে বলিয়া নন্দীগৃহিণী অবসন্ন শরীরে বসিয়া পড়িলেন।

রূপকান্ত ও সারদাসুন্দরীর মধ্যে কেহই কিছুকাল কোন কথা বলিতে পারিলেন না। শেষে দুর্ভাবনাক্লিষ্ট দম্পতীর মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল,—

রূপকান্ত।—এখনই কলিকাতার দিকে যাত্রা করতে হচ্ছে। তোমার দাদা গোপালবাবুর কাছে গিয়ে সব শুনে, তার সাথে পরামর্শ ক'রে উপস্থিত বিপদ হ'তে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা দেখতে হবে।

সারদাসুন্দরী। কোথা থেকে একটা অলক্ষণে মেয়ে ধ'রে এনেছ, সেজন্যইত আমার এ'সর্ব্বনাশ! মন ভাল থাকলে কি আর হীরেনের মত ছেলে ফেল হয় ? দু'বার ফেল হওয়াতে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না ব'লেইত বাছা নিরুদ্দেশ হয়েছে। ভাল করে দেখলে না শুনলে না, হীরেনের মত ছেলের জন্য বউ আন্‌তে গেলে হরিহরপুরের জঙ্গলে। ঐ বাঘ বানরের দেশেও মানুষ যায় ?

রূপকান্ত। আমায় এখন মন্দ বলছ কেন ? আমি কি তোমার সাথে পরামর্শ না ক'রে কাজ করেছি। এমনটা যে হ'বে, তা কি করেই বা বুঝব বল। ভবিতব্যের নির্ব্বন্ধ আর অদৃষ্টের ফের।

সারদা। তুমিত বেশ লোক, এখন বুঝি আমার ঘাড়ে দোষের বোঝা চাপাবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছ ? বল্লে যে, আমার সাথে পরামর্শ ক'রে কাজ করেছ, আমি কি মেয়ে দেখেছিলাম ? চোখে দেখে এমন মেয়ে আনে কে ?

রূপকান্ত। থাক, অদৃষ্টে যা আছে তাই হয়েছে, সেজন্য কেউ দোষী নয়। এখন আর সময় নষ্ট করা যায় না। আমার সব ঠিক করে দাও আমি রওয়ানা হব।

ইহা বলিয়া রূপকান্ত রায় বহির্ব্বাটীতে গেলেন, সারদাসুন্দরী অবশহৃদয়ে স্বামীর আহারাদির উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন।

শোভনা পার্শ্বের ঘর হইতে সবই শুনিল, শুনিয়া বহুক্ষণ কাঁদিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ মুখ ফুলাইল। রায় বাড়ীতে ইহা কেহ দেখিল না, অথবা

দেখিলেও ইহার চোখের জল মুছিবার জন্য কাহারও দয়ার হস্ত প্রসারিত হইল না। রূপকান্ত রায় কলিকাতায় গিয়া পুত্রের অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। জলের মত অর্থব্যয় করিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র ফল ফলিল না।

(৪)

এক মাস পরে শ্রীকণ্ঠবাবু গুণধর জামাতার চিঠি পাইয়া জানিতে পারিলেন, শ্রীমান্ নাইনিতালে বিরাজ করিতেছে।

পত্রখানি এই,——

নাইনিতাল, ব্যাসকুটীর।
৭ই বৈশাখ।

শ্রীচরণেষু—

এখানে আছি, ইহার পর কোথায় যাব, এখনও ঠিক করিতে পারি নাই। দেশে যে আর ফিরিবনা, ইহা নিশ্চিত। কোন্ সুখের আশায়, কোন্ শান্তির খোঁজে বাড়ী যাব? আমার জীবনটাকে আপনারাই বিষময় করিয়াছেন। বাবাকে পড়ার খরচ ও কিছু বেশী নগদ টাকার লোভ দেখাইয়া অচল না চালাইলে এই হতভাগার এই দশা ঘটিত না। আপনারা স্বার্থের সেবা করিয়াছেন, তার ফল এখন ভোগ করুন, এজন্য আমি অপরাধী নই। বোকা মেয়ের জন্য পরের ছেলের সর্ব্বনাশ করিতে গেলেন কেন? যদি কোনও কলেজে পড়ুয়া ছেলেকে জামাই করিতে আপনার সাধ ছিল, তবে নিজের মেয়েটাকে লেখা পড়া শিখা'য়ে মানুষ করিলেন না কেন? তারপর, এমন কুৎসিত কদাকার মেয়েকে বিয়ে না দিলেইবা ক্ষতি ছিল কি? বিয়ে করিয়া অবধি শান্তি কাকে বলে জানিনা, এমন মনস্তাপের আগুণে দগ্ধ হ'য়ে কি কেউ পরীক্ষায় পাস করিতে পারে। দু'বছরে আপনার কতগুলা টাকা নষ্ট করিয়াছি, ক্ষমা চাই। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, ভাবিয়া শান্তি লাভ করুন।

ভরসা করি ভাল আছেন। যদি কখনও সুদিন ফিরিয়া আসে তবে আপনার ঋণ পরিশোধ করিব। ইতি—

প্রণত—
হীরেন।

এই পত্রের প্রত্যেকটি অক্ষর নব্য শিক্ষা হইতে দূরে অবস্থিত প্রাচীন পল্লীর শ্রীকণ্ঠ বাবুর মর্ম্মে মর্ম্মে দারুণ শেলের মত বিদ্ধ হইল, কিন্তু পাঁড়াগেঁয়ে সমাজের মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সেই ধীর স্থির কর মহাশয় জামাতার শিষ্ট সাধু মধুময় অনুযোগ বিনাবাক্যব্যয়ে হজম করিলেন। বুদ্ধিমান্ শ্রীকণ্ঠ বাবু পত্রের আর এক উদ্দেশ্য বুঝিলেন, 'এখন একবার সাধিলেই খাব'! শ্রীকণ্ঠ বাবু একমুহূর্ত্ত সময় নষ্ট কর্ত্তব্য মনে করিলেন না। তিনি পর দিনই প্রয়োজন মত টাকা কড়ি সঙ্গে লইয়া পত্নী স্বর্ণপ্রভাকে খবরমাত্র বলিয়া জামাতৃ সন্ধানে বহির্গত হইলেন।

(৫)

"যদিও আপনার কন্যাটির দোষেই এই সব বিশৃঙ্খলা ঘটছে, তবু গেল বছর আপনি বিশেষ ক্লেশ ও যন্ত্রণা স্বীকার করে হীরেনকে যে হিমালয়ের কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন এবং মাসিক ৪০৲ টাকা খরচ দিয়ে ওকে ওর ইচ্ছামত কলেজে পড়া'য়েছেন, এজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। অদৃষ্টের কি খেলা, হীরেন এবারও ফেল হয়েছে। এবার যাতে পালাতে না পারে প্রথম থেকেই তার চেষ্টা হচ্ছে। এখন আপনি একটু চেষ্টা কর্লেই আর কোন কিছু ঘট্‌বে ব'লে মনে হয় না।" রূপকান্ত বাবু মধুর কণ্ঠে এই কথা বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় বৈবাহিক শ্রীকণ্ঠ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীকণ্ঠ বাবু কিছুকাল কি ভাবিলেন, পরে কিঞ্চিৎ বিরক্তি কিঞ্চিৎ অপ্রসন্নতা দেখাইয়া বলিলেন, "শক্তি সামর্থ্যের অতীত না হ'লে হীরেনের জন্য আমার অকরণীয় কি আছে? এজন্য আপনার অনুরোধের কোনও প্রয়োজন আছে বলেওত মনে হচ্ছেনা। হীরেনের মঙ্গলে আমার একমাত্র কন্যা শোভনার কল্যাণ, উহার হিতের জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি।"

রূপকান্ত। প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হবে না, বেয়াই মশাই, গোটা কয়েক টাকা খরচ করলেই হবে। কথাটা কি জানেন,—যে কারণেই হোক্, হীরেনত এবারও ফেল হল, ওর মনের অবস্থাটা ভাল নয়। শ্রীমান্ নাকি প্রকাশ করেছে, একজন প্রাইভেট টিউটার রাখলে কলেজে পড়্‌তে পার্‌বে—এবার সে নিশ্চয় পাশ কর্‌তে পার্‌বে। টিউটার রেখে পড়্‌লে মাসিক ৬০৲ টাকার দরকার, এ বছর এই টাকা দিলেই হীরেন প্রফুল্ল থাক্‌বে।

শ্রীকণ্ঠ বাবু। (উত্তেজিত স্বরে) শ্রীমান্ এক এক বছর ফেল হচ্ছেন আর প্রণামীর মাত্রা ও আমার মেয়ের উপর রাগটা সঙ্গে সঙ্গে বাড়্‌ছে, দেখছি। এবার ষাট টাকা দূরের কথা, আমি ষাট আনা পয়সাও দিতে পারবনা। আমি জমিদার কি তালুকদার নই, ছোট বড় কোন রকমের চাকুরিও করিনা, একখানি সাজানো বাড়ীর উপস্বত্ব ও কয়েকখানা ক্ষেতের ফসলের উপরে আমার সম্পূর্ণ নির্ভর। যে ভাবেই হউক তিন বছর এফ্-এ পড়ায়েছি। আর খরচ দেওয়া এ গরীবের চলে উঠ্‌বে না।

শ্রীকণ্ঠ বাবুর এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক নিষেধ উক্তি শ্রবণ করিয়া বৈবাহিক রূপকান্ত বাবু আহুতিপ্রাপ্ত অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি কর্কশকণ্ঠে বলিলেন—"আমি আপনার পায়ে ধ'রে খোসামোদ ক'রে খরচ আদায় কর্‌তে এসেছি,—মনে কর্‌বেন না। যদি লাঠি মেরে টাকা বের্ করতে পারি, তবে জান্‌বেন আমার নাম রূপকান্ত রায়। মেয়ে দিয়ে এত তেজ, এত বড়াই,"- -এক নিঃশ্বাসে ইহা বলিয়া রূপকান্ত রায় রাগে গর গর করিতে করিতে সে স্থান ত্যাগ করিল। রূপকান্ত রায়ের প্রতিজ্ঞাই—স্থির রহিল। তিনি নিজে এক বৎসর পুত্রকে পড়াইলেন। শ্রীমান্ পিতার টাকার কদর বুঝিল, তাই সেবৎসর মনোযোগ দিয়া পড়িয়া এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কন্যা ছাড়িয়া দেয়না দেখিয়া সারদাসুন্দরী কান্নাকাটি আরম্ভ করিলেন কাজেই শ্রীকণ্ঠ বাবু বৈবাহিকের নিকট ক্ষমা চাহিয়া জামাতার পড়ার খরচ আবার দিতে আরম্ভ করিলেন হীরেনের চিত্র পাশের ঘটনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

(৬)

একটা প্রবল মৃত্যু বিভীষিকা গ্রামখানিকে সম্পূর্ণরূপে যেন গ্রাস করিয়াছে। এই পল্লীর ধনী দরিদ্র সকলেরই অন্তরে বাহিরে কি যেন একটা বিষম আশঙ্কা, মারাত্মক উদ্বেগ, প্রাণ কাঁপানো উদাস উদাস ভাব ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কতজনের বাড়ীতে শোকের আগুণ জ্বলিয়াছে, চোখের জলে তাহা নির্ব্বাপিত করিবার কাহারও অবসর নাই, সম্মুখে আবার বিপদ্, আর এক বিয়োগের আয়োজন! দিন রাত্রি চারিদিকের 'বল হরি' এই অস্থির-পঞ্জরভেদী ভীষণ শব্দে বালক বৃদ্ধ নরনারীর হৃদয় মন কম্পিত মথিত ও আলোড়িত হইতেছে।

রাত্রি গভীর, পল্লী নীরব নিস্তব্ধ নহে, কোথাও রোগীর অস্ফুট কাতর-ধ্বনি, কোথাও মৃতের কক্ষে আকুল আর্ত্তনাদ, কোথাও মহামারী-ভীত ব্যক্তিগণের সম্মিলিত কণ্ঠে হরিসঙ্কীর্ত্তন, কোথাও কালী পূজার আসরে সমাগত পল্লীবাসীদের ততোধিক কোলাহল। এই সময়ে সমস্ত 'দেবগঞ্জের' পল্লীকে আলোড়িত করিয়া উত্তরপাড়ার দত্ত বাড়ীতে উচ্চতম রবে রোদন রোল পড়িয়া গেল। এই আকস্মিক ভীষণ মৃত্যু-কান্নায় গ্রামের অধিকাংশ লোকের অন্তর ত্রাসে কাঁপিয়া উঠিল। এই সময়ে একমাত্র উত্তরাধিকারী ষোল বছরের ছেলে শচীন্দ্রপ্রসাদ আত্মীয় স্বজনকে শোক সাগরে ভাসাইয়া অকালে লোকান্তরে প্রস্থান করিল।

রায় বাড়ীর এক কক্ষে একটি যুবক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'উঃ, কি সর্ব্বনাশ।' তখনই এক নারীকণ্ঠে ইহার উত্তর প্রতিধ্বনিত হইল—'যাহারা বাঁচলে কত লোকের কত সুখ, কত শান্তি, কত আনন্দ, কত উপকার হয়, যারা মরিলে কত লোকের বুকে রাবণের চিতা জ্বলিয়া উঠে, চোখে বর্ষার ধারা ছুটতে থাকে, চারিদিকে হাহাকার পড়ে যায়, তারা মরে কেন? ভগবান্ এ সকলকে মা বাপ আত্মীয় স্বজনের প্রাণে ছুরি মেরে নিয়ে যান কেন? আর, যারা বাঁচলে অন্যের বুকে হাহাকারের বাজার বসে, জীবনভ'রে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাসের কেনা বেচা হয়, মরলে চাপা পড়া সুখ সোয়াস্তি আমোদ আনন্দ ওসব আবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠ্‌তে পারে, তারা বেঁচে থাকে কেন? যম এ সকলকে চোখে দেখেন না কেন? ভগবানের কি অন্যায় অবিচার! সত্যি বল্‌ছি, এই ক'দিনে দেবগঞ্জের কত লোক চলে গেল, আমার কেন মরণ নাই!' প্রথম ব্যক্তি গম্ভীরস্বরে বলিল, 'আমিও ত তাই ভাবছি' এই সহানুভূতিশূন্য কঠোর বাক্য কোমলপ্রাণার অস্থি পঞ্জর যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'সন্তপ্তের সন্তাপহারী প্রভু, তোমার শান্তিময় কোলে আমায় একটু স্থান দাও।'

যম যেন এই দম্পতীর শয়ন কক্ষের পশ্চাতে আঁড়ি পাতিয়া ছিল, এই পতি-ব্যবহার ব্যথিতা বালিকার কাতর প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ তাহার কাণে পৌছিল। রায় বাড়ীর পুরাতন আমগাছের শত পুরুষযাবৎ বাসেন্দা কাকগুলা ভোর কীর্ত্তন করিতে না করিতেই সেই প্রথম ব্যক্তি জানিতে পারিল, তাহার

পত্নীর কলেরা হইয়াছে। বেলা ১০টা পর্য্যন্ত রোগিনীর চিকিৎসার বিশেষ কিছু ব্যবস্থা হইল না। এই রোগিনী আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা শোভনা, আর প্রথম ব্যক্তি তাহার পতিরত্ন হীরেন্দ্রকান্ত।

শোভনার অবস্থা ক্রমশঃই সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। রায় বাড়ীর বৃদ্ধ ভৃত্য রমানাথ রোগিনীর অবস্থা দেখিয়া—নির্ম্মম মনিবের অনুমতি ব্যতীতই যুবক ভাগিনেয় চিন্তাহরণকে হরিহরপুরে পাঠাইয়া দিল। ভাগিনেয়কে বলিয়া দিল, 'বাবা ছুটে চলে যাও, প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখ শ্রীকণ্ঠ বাবুকে তার একমাত্র মেয়েটাকে দেখাতে পার কিনা।' বৃদ্ধ বেশী কিছু বলিতে পারিল না চোখে যেন শ্রাবণের আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিন্তাহরণ উচ্চকুলে জন্ম ও উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ না করিলেও হৃদয়ের মহত্ত্বে ভাগ্যহীন নহে। সে বায়ুবেগে ছুটিয়া হরিহরপুরে উপস্থিত হইল। শ্রীকণ্ঠবাবু বিপদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না। উভয়ে রাত্রি ৮টার সময়ে দেবগঞ্জে পৌঁছছিলেন।

সাংসারিক জীবনের সুখশান্তি আমোদ আহ্লাদ স্নেহ মমতার জীবন্ত মুকুলটি অকালে ঝরিয়া পড়িতে বসিয়াছে, তাই কে যেন শ্রীকণ্ঠবাবুর বুকে উদ্বেগের পাহাড় চাপিয়া ধরিল। তিনি এই পাহাড় ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, জমিদার দত্ত বাবুদের বাড়ীতে শচীন্দ্রপ্রসাদের চিকিৎসার জন্য সহরের বিখ্যাত শ্যামলাল ডাক্তার আসিয়াছেন। শচীন্দ্রপ্রসাদের মৃত্যুর পরেই তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন, হরিপ্রসন্ন ভৌমিকের কন্যার ব্যারাম হওয়াতে তাহারা ইঁহাকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠবাবু শ্যামবাবুকে উপযুক্ত দর্শনী দিয়া শোভনাকে দেখাইলেন। রোগী দেখিয়া ডাক্তারবাবু দুঃখিতভাবে বলিলেন,—'অযত্ন অবহেলায় এ মেয়েটি মারা যাচ্ছে। এ বাড়ীতে এর কি কেউ নেই?'

"বল্‌তে আছে সব, কাজে কেউ আছে কিনা দেখ্‌তেইতো পাচ্ছেন, যাক্, সেকথা আর তুলবেন্ না, এখন একবার প্রাণপণে চেষ্টা করে দেখুন, মেয়েটাকে বাঁচাতে পারেন কিনা। টাকার জন্য ভাব্‌বেন না, যথাসর্ব্বস্ব বিক্রী ক'রে আপনার দেনা শোধ করব। মনে রাখ্‌বেন রোগিনী এ হতভাগ্যের একমাত্র মেয়ে।' ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হইল, বিশেষ মনোযোগের সহিত রোগীর চিকিৎসায়

নিযুক্ত হইলেন। শ্যামলাল বাবু শ্রীকণ্ঠ বাবুকে বলিলেন,—'দেখ্‌তে পাচ্ছেন রোগী কেমন অপরিষ্কার অবস্থায় পড়ে আছে, এই নোংরা বিছানাটা ফেলে দিন। এ সকল রোগীর ভালমন্দ সেবাশুশ্রূষার উপরে ষোল আনা নির্ভর করে।'

যুবক চিন্তাহরণ ও তাহার বৃদ্ধ মাতুলের আন্তরিক সাহায্য পাওয়াতে শ্রীকণ্ঠ বাবুকে বেশী কিছু বিপদে পড়িতে হইল না। রাত্রিটা আশা নৈরাশ্যের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইল।

চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষারগুণে অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতে লাগিল পরদিন বেলা ৯ টার সময় ডাক্তার বাবু "রিয়েএকসন" হইয়াছে এই আশার বাণী সর্ব্বত্র প্রকাশ করিলেন। অন্যান্য দিকে আশাপ্রদ লক্ষণ পাইলেও বেলা ৩টা পর্য্যন্ত কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন না হওয়াতে ডাক্তার বাবু একটু ব্যস্ত হইয়া রহিলেন। আশঙ্কা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে বিকার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সন্ধ্যার কিছু পরে বিকারপূর্ণ মূর্ত্তিতে দেখা দিল। রাত্র ৯টার সময় সব শেষ! দীপ নির্ব্বাপিত হইল।

সারাদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সন্ধ্যার পর হইতে মেঘের রাজ্যে যেন দেব দানবের যুদ্ধ চলিল। প্রকৃতির সংহার মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে তাড়াতাড়ি শোভনাকে খাল পারের শ্মশানে লইয়া গেল। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী।

খেওয়া ঘাটে।

দুদিনের তরে আসা
দুদিন ধরিয়ে আশা,
দুদিনের তরে ঘর বাড়ী।
পর বাস, পর দেশ
পলকে সকলি শেষ,
যাইতে হইবে সব ছাড়ি।

কেন যে পেতেছ খেলা
গগনে নাহিক বেলা,
ওই যে আসিছে কালরাতি।
লোভ মোহের পরশে
এখনো আছ হরষে,
চ'লে যায় যত তব সাথী।
আকাশেতে কাল মেঘ
তুফানের ভারি বেগ,
কেমনে হইবে তুমি পার?
হ'য়ে গেছে খেওয়া বন্ধ
আঁধারেতে আখি অন্ধ,
ঘরে ফিরা হইয়াছে ভার।
করিলে কাজের কাজ,
ঠেকিতে না তুমি আজ,
ঠেকিয়াছ নিজে নিজ দোষে।
আসিয়ে বণিক বেশে
বেচা কিনা করি শেষে,
চলে যেতে আপনার দেশে।
ভুলে পড়ি মায়া জালে
পড়িয়াছ এ জঞ্জালে,
একা তুমি মহাসিন্ধু পারে।
আলো পাবে আর পথে
ডাক সে অনাথ-নাথে
যে জন পতিত জনে তারে।

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আইভ্যান্ হো।

প্রথম অধ্যায়।

যীশুর পবিত্র জন্মভূমি প্যালেষ্টাইনে তুর্কীদিগের হস্তে খ্রীষ্টানদিগের লাঞ্ছনা ঘটিয়া আসিতেছিল। ইহার প্রতীকারের জন্য খ্রীষ্টান রাজন্যবর্গ ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা করেন, এবং ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম রিচার্ড সসৈন্যে যাইয়া প্যালেষ্টাইনে উপস্থিত হন। ফরাসী-রাজ এবং অস্ট্রিয়ার ডিউক্ লিওপোল্ডও তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন। কিন্তু অচিরেই ইঁহাদিগের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হয়, এবং শত্রুর সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া রিচার্ডকে ইংলণ্ডের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। কিন্তু এমনই দৈবের ঘটনা যে পথি মধ্যে তাঁহার জাহাজ জলমগ্ন হইল, এবং কোনও প্রকারে প্রাণে রক্ষা পাইয়াও তিনি যাইয়া অস্ট্রিয়ার ডিউকের হাতে বন্দী হইয়া পড়িলেন। সুযোগ পাইয়া লিওপোল্ড্ তখন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে উপযুক্ত মূল্য না পাইলে রিচার্ডকে মুক্তি দেওয়া হইবে না।

এই সময়কার ঘটনা অবলম্বন করিয়াই আমাদের উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে। রিচার্ডের রাজত্বের তখন প্রায় অবসান সময়। তাঁহার অনুপস্থিতে কনিষ্ঠ সহোদর রাজকুমার জন্ রাজ-প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতেছিলেন এবং তলে তলে সিংহাসনটিকে একেবারে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। কাজেই রিচার্ডের মুক্তির মূল্য প্রদানের জন্য কোনই চেষ্টা হইতেছিল না।

এদিকে প্রজারঞ্জক বিশাল-হৃদয় রাজার অনুপস্থিতিতে প্রকৃতিবর্গকে স্বল্পাধিক পরিমাণে নানাপ্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে। রাজার প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় তাহারা পথ চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ক্রমেই সে আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়িতেছে। রাজা ষ্টিফেনের আমলেই আমীর-ওমরাহদিগের প্রতাপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় হেন্‌রির বুদ্ধি কৌশলে ও দূরদর্শিতার গুণে ইহাদিগকে রাজ-মুকুটের নিকট কথঞ্চিৎ বশ্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন আবার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, আত্মপ্রতিষ্ঠায় তৎপর রিচার্ডের অনুপস্থিতিরূপ সুযোগে তাহারা পূর্ব্ববৎ স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছেন। দেশের এইরূপ অরাজক অবস্থায় একটা জাতীয় বিলোড়ন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া

বোধ হইতেছিল। যাহাতে সেই বিলোড়নের সময় আপনাদিগের স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাহারা প্রত্যেকেই, মন্ত্রী-সভার দুর্ব্বল বাধায় ভ্রুক্ষেপও না করিয়া, আপনার দুর্গাদি সুদৃঢ় এবং ফৌজ ও তোপেদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। প্রত্যেকেই দুর্ব্বলতর প্রতিবেশিদিগকে আপনার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। তখনকার দিনে শাসন-তন্ত্র এবং রাজবিধান এই উভয় অনুসারেই প্রধান প্রধান আমীর-ওমরাহদিগকে যুদ্ধের সময়ে লোকজন দিয়া রাজাকে সাহায্য করিতে হইত। ইহারা প্রত্যেকেই যেন এক একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। এবং যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহও করিতে পারিতেন। ইহার ফলে এই হইত যে হৃদয়ে তেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকিলে ইহারা রাজ-শক্তির বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। এইরূপ যাহাদের সুযোগ ও লালসা, তাহারা যে রাজার অনুপস্থিতিতে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দিতায় কি প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার অনুসরণ করিতেছিলেন তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে?

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের সম্বন্ধে কিন্তু অন্যপ্রকার ব্যবস্থা ছিল। তাহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইনতঃ কেহই তাহাদিগকে যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য বল প্রয়োগ করিতে পারিত না। কিন্তু এখন অরাজকতার রাজত্ব—শাসন-তন্ত্র এবং রাজ-বিধি আর কে গ্রাহ্য করে? কাজেই ইহাদিগের দুরবস্থার অবধি ছিলে না। প্রবল প্রতিবেশী 'সামন্ত' রাজাগুলি তাহাদিগকে 'উপসামন্ত' করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইহাদিগের 'উপসামন্তত্ব' স্বীকার করিলে, অগত্যা পরস্পরের রক্ষাকার্য্যে ও সাহায্য-করণে প্রতিশ্রুত হইলে সাময়িক শান্তি অবশ্য পাওয়া যাইতে পারে—কিন্তু তাহাতে যে একেবারে সর্ব্বনাশ! যে স্বাধীনতা ইংরাজ হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তু, সেই স্বাধীনতাই বিসর্জ্জন দিতে হয়।—কিন্তু, হায়, তাহাতেও অব্যাহতি কৈ? দুর্লোভের বশবর্ত্তী হইয়া রক্ষাকর্ত্তা ও আশ্রয়-দাতা যে কখন কোন্ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বসিবেন, কে বলিতে পারে? তখন যে প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইহাদিগকেও গলা বাড়াইয়া দিয়া তাহার সঙ্গে যোগদান করিতে হইবে। ইহার ফলে যে সমূলে বিনাশ ঘটিবে না তাহার কোন নিশ্চয়তা আছে কি?

কিন্তু, ফলাফল যাহাই হউক না কেন, যোগদান না করিয়া চাড়া কৈ? প্রবল জমিদারের হাতে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিবার এতই অস্ত্র রহিয়াছে যে একবার তাহার কোপানলে পড়িলে, দুর্ব্বল প্রতিবেশীর আর অব্যাহতি নাই। আপনার সাধুতা এবং সচ্চরিত্রতার উপর নির্ভর করিয়া মানুষ অনেক সময় বিপদের সম্মুখীন হইয়াও পরিত্রাণ পাইতে পারে বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাধুতা, সচ্চরিত্রতা কিম্বা রাজবিধি, কিছুই দুর্ব্বলকে প্রবলের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহার পক্ষ হইয়া যুদ্ধে যোগদান না করিলে, প্রবল দুর্ব্বলকে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবেন—ইহাতে তাহার মনে এতটুকুও সঙ্কোচ বা দ্বিধা আসিবে না কিম্বা তাহাকে এতটুকু বেগও পাইতে হইবে না!

ইতিহাসে যিনি প্রথম উইলিয়াম বলিয়া খ্যাত। তিনি ছিলেন নরমাণ্ডীর ডিউক। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর চক্রান্তে কালে তিনিই আসিয়া ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। তখন দলে দলে নরমাণ্ডী হইতে "রাজ-বংশীয়েরা" আসিয়া ইংলণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকেন। তাঁহারা হইলেন অভিজাত—বিজেতা; আর ইংলণ্ডের অধিবাসীরা হইল অন্ত্যজ—বিজিত। কাজেই তখন হইতেই সম্রান্তদিগের অত্যাচার ও দুর্ব্বলের লাঞ্ছনার মাত্রা বিশেষ-রূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিজেতার জাতি স্বভাবতঃই আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং বিজিতেরা ইহাতে মনে মনে খুবই ক্ষুন্ন বোধ করিতেন। কাজেই আজ চারিপুরুষ একত্রে—একই আবহাওয়ায় ও একই দেশ-জননীর অঙ্কে—বাস করা সত্ত্বেও বিজেতা নরম্যান্ এবং বিজিত এংগ্লো- স্যাক্সন্‌দিগের মনে পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সদ্ভাব সঞ্চারিত হইতে পায় নাই। কিম্বা একটা সাধারণ ভাষার সাহায্যে অথবা পরস্পরের স্বার্থসাধন-চিন্তা প্রণোদিত হইয়া এই দুই বিভিন্ন জাতি আসিয়া যে সম্মিলিত হইয়া একটা মহাজাতিতে পরিণত হইবে, এখনও তাহার কোনই সূচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। একপক্ষ এখনও বিজয় গৌরবে স্ফীত ও উল্লাসিত; অপর পক্ষ পরাজয় জনিত সর্ব্বপ্রকার কুফল ভুগিয়া ভুগিয়া এখনও পূর্ব্ববৎ ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। হেষ্টিংসের রণ-ক্ষেত্রে—এখানেই ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী ডিউক্ উইলিয়ামকে বরণ করেন—সর্ব্বপ্রকার প্রভুত্ব এবং আধিপত্যই নরম্যান্ সম্রান্তদিগের করতলগত

হইয়াছে; এবং তদবধি সে প্রভুত্ব, সে আধিপত্য যে বড় কোমল হস্তে পরিচালিত হইতেছে না, ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। স্যাক্‌সন্ রাজবংশ এবং সম্ভ্রান্ত ঘরগুলি প্রায় নির্ম্মূল অথবা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে। জমিদারীকরাত, দূরের কথা, পিতৃপিতামহের দেশে তালুকদারী কিম্বা জোৎদারী করিয়া খাইতেছে, এমন পরিবারের সংখ্যাও আজ বড় বিরল। বিজেতাদিগের প্রতি দুর্দ্দমনীয় বিদ্বেষ পোষণ করিতেছে বলিয়া যাহাদিগের উপর সন্দেহ হইতেছে, তাহাদিগকেই দুর্ব্বল করিতে ন্যায়ান্যায়নির্ব্বিচারে রাজ-শক্তি প্রযুক্ত হইতেছে। নরম্যান্ বংশের সকল রাজাই নরম্যান্ প্রজার প্রতি অপ্রচ্ছন্ন প্রীতি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। যুদ্ধের সময় লোকবল ও অর্থবল দিয়া ভূম্যধিকারীর সাহায্য করিতে হইবে, এই মর্ম্মে আইনজারি করিয়া স্যাক্‌সন্ প্রজাকে একেবারে যেন বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে। ইহারা অপেক্ষাকৃত শান্ত ও স্বাধীনতাপ্রিয়, কিন্তু আরও এমন সব আইন-কানুন্ বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে তাহাতে তাহাদের এই শান্তি এবং স্বাধীনতা-প্রিয়তারও বাধা পড়িতেছে, তাহাদের মানসিক স্ফূর্ত্তিও ক্ষুণ্ণ ও প্রতিহত হইতেছে। সর্ব্বদাই তাহাদের চিত্ত যেন একটা দুর্ব্বহভাবে প্রপীড়িত হইয়া রহিয়াছে। এখন তাহারা ইচ্ছামত শিকারটি পর্য্যন্তও করিতে পারে না। রাজদরবারে এবং সম্ভ্রান্তদিগের রাজোচিত প্রাসাদ ও দুর্গে একমাত্র নরম্যান্-ফরাসী ভাষাই ব্যবহৃত হইতেছে; আদালতেও ব্যবহারজীবী সেই ভাষায়ই বক্তৃতা করেন—বিচারকের রায়ও সেই ভাষায় প্রকাশ হয়। মোট কথা ফরাসী ভাষাই গৌরবের ভাষা, বীরত্বের ভাষা, এবং ধর্ম্মাধিকরণের ভাষা হইয়া পড়িয়াছে; আর যে এংগ্লো-স্যাক্‌সন্ ভাষার অন্তরে এত তেজ ও গাম্ভীর্য্য, যে এংগ্লো-স্যাক্‌সন্ ভাষায় হৃদয়ের সকলগুলি ভাব এমন সুন্দর ঝঙ্কার দিয়া উঠে—সেই এংগ্লো-স্যাক্‌সন্ আজ কিনা শুধু কৃষকের ও পল্লীবাসীর দয়ায় জীবিত রহিয়াছে, সেও অন্য ভাষায় হৃদয়ের ভাব খুলিয়া বলিতে তাহারা অসমর্থ বলিয়া!

যে ঘটনা-বৈচিত্রের উপর আমাদের আখ্যানটি প্রতিষ্ঠিত, ইংলণ্ডের প্রাচীন ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়টুকু মনে রাখিলে, তাহা বুঝিতে পাঠকের কোনই বেগ পাইতে হইবে না।

চিরপ্রফুল্ল ইংলণ্ডভূমির যে অঞ্চল বিধৌত করিয়া ডন্‌-নদ প্রবাহিত, প্রাচীনকালে সেই মনোরম অংশে একটি বিশাল অরণ্যানী দৃষ্টিগোচর হইত। সেফিল্ড্ এবং ডংকাষ্টার সহরের মধ্যবর্ত্তী সুন্দর সুন্দর পাহাড় ও উপত্যকা গুলির অধিকাংশই এই অরণ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংলণ্ডের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কাহিনীর ভিত্তিই এই অরণ্যে প্রতিষ্ঠিত। "গোলাপফুলের সংগ্রাম" নামক আন্তর্জ্জাতিক সংগ্রামের অনেকগুলি ভীষণ খণ্ড যুদ্ধই এখানে সংঘটিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালের যেসকল উদারহৃদয় বীরপুরুষ দস্যুসর্দ্দারের কীর্ত্তি-কলাপ গীতি-কবিতার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে সর্ব্বসাধারণের আদরের ও উপভোগের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল, সেই দস্যুসর্দ্দারেরা দলবল লইয়া এই অরণ্যানীই 'গুল্‌জার' করিয়া তুলিয়াছিল। আবার অগ্ন্যুদ্গারী দানবের লীলাভূমি বলিয়াও এই অরণ্যই অভিলক্ষিত হইত।

এই অরণ্য-বক্ষে তৃণপত্রে সুশোভিত অনেকগুলি মনোরম উপত্যকা ছিল। ইহাদেরই একটির মধ্যে আমাদের আখ্যায়িকার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। তখন দিবা অবসান হইয়া আসিয়াছে—অস্তগামী রবির রক্তিম রশ্মিপাতে তরুলতা-সমাকীর্ণ এই মনোহর উপত্যকাটি এক অপূর্ব্ব সুষমায় ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। পদতলে, সতেজ, সবুজ তৃণের নয়নাভিরাম আস্তরণ; ঊর্দ্ধে, মস্তকের উপর, ওক্ প্রভৃতি বিশাল প্রাচীন বৃক্ষের পরস্পর বিজড়িত শাখাপ্রশাখার চন্দ্রাতপ, কোথাও শাখাপ্রশাখা পত্রলতাগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে, পূর্ব্বাহ্ন ও অপরাহ্ণের সূর্য্যরশ্মি আর তাহা ভেদ করিয়া নীচে অবতরণ করিতে পারে না।

স্থানটি নির্জ্জন, শান্ত, কোলাহল বিরহিত—মাত্র দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাদের বেশভূষা সাবেকী কৃষকদের মত বন্যধরণের। যেটি বয়োবৃদ্ধ তাহার আকারে প্রকারে একটা অমার্জ্জিত পরুষতা বিমিশ্রিত, ইহার গায়ে পশুচর্ম্মের জামা—লোমগুলি প্রায় ঝরিয়া পড়িয়াছে। গলায় একটি লোহার হাঁস্‌লি। হাঁস্‌লির উপরে এই কয়টি কথা খোদিত রহিয়াছে—"গার্থ—বিউল্কেরপুত্র, এবং রদারউডের মালিক কেড্রিক্ সাহেবের জন্ম-নফর"। সে প্রভুর শূকররক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে এবং আজও শূকর লইয়াই বনে আসিয়াছে।

ইহার পার্শ্বে আর একটি লোক বসিয়া রহিয়াছে; আকৃতি দেখিয়া মনে হয় তাহার বয়স ইহার অপেক্ষা দশবৎসর কম। বেশভূষা অপেক্ষাকৃত ভাল উপাদানে গঠিত হইলেও, প্রায় একই ধরণের। তাহার বাহুতে সুচিকণ রৌপ্য চুড়ি এবং গলদেশে সেই ধাতুরই হাঁস্‌লি। হাঁস্‌লির উপরে লেখা রহিয়াছে—"উইট্‌লেসের (আহাম্মকের) পুত্র ওয়াম্বা,—রদারউডের কেড্রিক্ সাহেবের নফর।" ইহার মাথায় একটি টুপীও আছে, এবং সেই টুপীর প্রান্তভাগে কয়েকটি ছোট ছোট ঘণ্টা ঝুলান রহিয়াছে। মাথাটি নাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই এইগুলি টুন্ টুন্ ঝুম্ ঝুম্ করিয়া বাজিয়া উঠে। তাহার দৃষ্টিতে ধূর্ত্ততা ও ভ্যাবাচ্যাকার ভাব একত্রে বিজড়িত। বেশভূষা এবং এইরূপ অদ্ভুত চক্ষুর ভাব দেখিয়া মনে হয়, এ একজন ভাড় বা বিদূষক। তখনকার দিনে বড় লোকের গৃহে এইরূপ একজন ভাড় থাকিতেই হইত। নানাবিধ রসের গল্প, হাস্যপরিহাস ও অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গিমা দ্বারা শ্রান্তক্লান্ত প্রভুর মনোরঞ্জন করা ছিল তাহার কার্য্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

লতাকস্তুরী।

(Vegetable musk mudow).

লতাকস্তুরী আমাদের দেশীয় ঢেড়স অথবা পাটের ন্যায় সূত্র-প্রদ এক প্রকারের গাছ। এই গাছ সাধারণতঃ দুই কি আড়াই হাত অপেক্ষা অধিক উচ্চ হইতে দেখা যায় না। উপযুক্তরূপ বড় হইলে কাটিয়া জলে ভিজাইয়া ঢেড়স অথবা পাট গাছের ন্যায় ইহা হইতে আঁস অথবা সূত্র বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই গাছ উপযুক্তরূপ বড় হইলে ইহাতে কামরাঙ্গার ন্যায় পাঁচ শির বিশিষ্ট একপ্রকার ফল জন্মিয়া থাকে। এই ফলের শির চিড়িলে ইহার মধ্যে একপ্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ বাহির হয়। সাধারণতঃ এক একটী ফলে আধ

তোলা হইতে এক তোলা আন্দাজ বীজ পাওয়া যায়। এই বীজ হস্তে লইয়া ঘর্ষণ অথবা মুখ মধ্যে ফেলিয়া চিবাইলে মৃগনাভি অথবা কস্তূরীর ন্যায় আঘ্রাণ পাওয়া যায়। এই গাছের বীজে কস্তূরীর আঘ্রাণ পাওয়া যায় বলিয়াই লোকে সাধারণতঃ ইহাকে লতাকস্তূরী বলিয়া থাকে।

কবিরাজগণ নানাবিধ তৈলে ও ঔষধে এবং অনুপানে লতাকস্তূরীর বীজ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রকৃত মৃগনাভি অথবা কস্তূরীর অভাবে কস্তূরীর পরিবর্ত্তে ও কেহ কেহ সময় সময় উত্তেজক, বায়ুনাশক ও স্নায়বিক ক্রিয়ার নিমিত্ত এই বীজ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন কোন সময়ে কোন কোন ব্যক্তিকে পান সহ এই বীজ ভক্ষণ করিতে দেখিয়া এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছি যে এই বীজ পানসহ ভক্ষণ করায় তাহাদের বেশ একটু উত্তেজনা ও কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুগন্ধি মসল্লার সহিত তামাকেও এই বীজ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে গন্ধ বণিক্যেরা এই বীজ অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। সাধারণতঃ এই বীজের সের বাজারে ২৲ হইতে ৪৲ পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হইতে দেখা যায়।

যে সকল উচ্চ ভিটী ভূমিতে পাটের চাষ হয় সেই সকল জমীতেই এই লতা-কস্তূরীরও চাষ করা যাইতে পারে। পাটের সূত্র অপেক্ষা ইহার সূত্রে বেশী সাদা ও চিক্কণ এবং কোমল, সেইজন্য বাজারে পাট অপেক্ষা ইহার সূত্র বেশী মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে; অধিকন্তু ইহার বীজও অতিশয় মূল্যবান। দেখা যায় পাট হইতে কেবল সূত্র পাওয়া যায়; পাটের বীজ পাওয়া গেলেও তাহা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় না। এই গাছ হইতে সূত্রে এবং বীজ এই দুই দ্রব্যই পাওয়া যায়, দুই দ্রব্যেরই মূল্য অধিক। সুতরাং বিবেচনাপূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে দেখা যায় গরপরতায় কমবেশীতে লতাকস্তূরীর চাষও পাট অপেক্ষা কম মূল্যবান হইবে বলিয়া মনে হয় না।

লতা কস্তূরীর চাষও ঠিক পাটেরই অনুরূপ। বীজের জন্য গাছ রক্ষা করিলে এক গাছ হইতেই ২।৩ বৎসর বীজ পাওয়া যায়। ইহার চাষে বিশেষ কোনরূপ ব্যয় অথবা পরিশ্রম নাই। বীজ সংগ্রহপূর্ব্বক ভিটা উত্তমরূপ কোপাইয়া, জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া বপন করিলেই হইল। মধ্যে মধ্যে গোড় কোপাইয়া জলাদি বাহিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার জন্য অন্য কোন বিশেষ তদ্বিরের

আবশ্যক দেখা যায় না। আবার নার্শারী বাগানে গাছ হইতে বীজ পড়িয়াই স্থানে স্থানে গাছ জন্মিয়া থাকে। অযত্নসম্ভূত গাছের ফল এবং সূত্র আশানুরূপ না জন্মিলেও যাহা হয় তাহাও একরূপ মন্দ নহে। আমি বীজ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি তাহা মৃগনাভির ন্যায় গন্ধপ্রদ। পান সহ উক্ত বীজ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে সাময়িক উত্তেজনা জন্মে। জলে না ভিজাইয়া ইহার ছাল দ্বারা বাগানের বেড়া বান্ধিয়া দেখিয়াছি ইহা পাট অপেক্ষা অধিক টিকসই শক্ত।

শ্রীনিবারণচন্দ্র মজুমদার।

আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা।

(৪র্থ বর্ষ ৭ম সংখ্যাতে প্রকাশিত অংশের পর)

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পরীক্ষা কার্য্যে আমি সে সময় ব্যাপৃত ছিলাম। লোনা মাটি হইতে সোরা প্রস্তুতও সে সময় করিয়াছিলাম এবং তদ্দারা আতস বাজিও করা হইয়াছিল। এই প্রকারে আমার বল্যকালের বিজ্ঞান শিক্ষার পরীক্ষা সমাপ্ত হয়। এস্থলে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি যে কেহ যেন অনুগ্রহ করিয়া আমার ঐ উক্তিগুলিকে ভুল না বুঝেন। উহা দ্বারা আমার আত্ম-প্রশংসার কিছুই নাই তবে আমার বাল্যকালে ঐ বিষয়ে যখন ঐ রূপ উৎসাহ ও একাগ্রতাছিল, যদি সে সময় আমাকে উপযুক্ত উৎসাহ দিবার এবং সুপথে চালাইয়া লইবার কোন উপযুক্ত শিক্ষক বা প্রদর্শক মিলিত, তাহা হইলে হয়ত আমার চেষ্টা আরও অগ্রসর হইতে পারিত।

যাঁহারা নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহারাও প্রথমে সামান্য সামান্য বিষয় লইয়াই আরম্ভ করিয়াছিলেন তারপর ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াছিলেন। আর এক একটি সাধনাতে সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনেক বিফলতার কণ্টকময় পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল একদিনেই বা এক বৎসরেই তাঁহারা সিদ্ধি লাভ করেন নাই।

বিজ্ঞান শিক্ষা যে দেশের উন্নতির একটা প্রধান উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই শিক্ষা এরূপ হওয়ার দরকার যে তাহা দ্বারা উত্তরকালে দেশের উপকারের আশা থাকে। আমি যতদূর অবগত আছি তাহাতে আমাদের বিজ্ঞানের পাঠ্য গ্রন্থাদির মধ্যে সিদ্ধান্ত ঘটিত বিষয়ই বেশী, কার্য্যকরী শিক্ষা ঘটিত বিষয়ক পুস্তক অতি কম। Organic chemistry বা জৈব রসায়ন, ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রভৃতি B. Sc. পাঠ্য তালিকাতে এরূপ নাই বলিলেই চলে, বিশেষজ্ঞগণের নিকট এইরূপ শুনিয়াছি। সুতরাং রসায়ন শাস্ত্রের কতকগুলি সূত্র এবং সঙ্কেত শিক্ষা করিয়া যাঁহারা উপাধি লাভ করিয়া আসেন তাঁহাদের সে বিদ্যা আর কতদিন স্থায়ী হইবে আর সে বিদ্যার সাহায্যে ব্যবহারিক জগতে তাঁহারা কি উপকার করিতে পারিবেন?

বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারা দেশের উন্নতি করিতে হইলে যে যে বিষয়ের গবেষণা এদেশে করিতে পারা যায় সেই সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য যেরূপ পাঠ্য পুস্তকাদির প্রয়োজন সেইরূপ পাঠ্য পুস্তকাদির ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই শিক্ষা নানা শাখাতে বিভক্ত হওয়া উচিত।

ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, খনিজতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, ইত্যাদি: নানা রূপ শাখাতে ইহার বিভাগ করিয়া যিনি যে তত্ত্ব ইচ্ছা তাহার সম্বন্ধে পরীক্ষা, আলোচনা ও গবেষণা করিতে পারেন। বিশেষজ্ঞ হইতে হইলে দশ বিশ বিভাগে ঘুরিয়া বেড়াইলে চলে না।

একটি বিষয় লইয়া জীবনব্যাপী সাধনাতে তাহাকে আয়ত্ত্ব করিতে হয় এবং তাহার উপর নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে হয়। ভারত-গৌরব আচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র এবং শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র এক এক বিভাগেই লিপ্ত আছেন, তাহা লইয়াই তাঁহারা আজীবন গবেষণা করিতেছেন এবং ভগবদিচ্ছায় কতকগুলি নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে সংস্কৃত শিক্ষার পদ্ধতিও এইরূপই ছিল। যাঁহারা সাধারণ মেধা বিশিষ্ট তাঁহারা কিছু কাব্য, স্মৃতি আদি দেখিয়া সংসার চালানের মত জ্ঞান লাভ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন আর যাঁহারা তীক্ষ্ণধী, তাঁহারা নিজের প্রিয়তম বিষয়ের চর্চ্চা ও আলোচনাতেই জীবনপাত করিতেন এই কারণেই কি ব্যাকরণ, কি কাব্য, কি দর্শন, কি স্মৃতি, কি উপনিষদ—প্রত্যেক বিভাগেই বিশেষজ্ঞগণের

আর্বিভাব হইয়াছিল কিন্তু আজ কালকার শিক্ষার্থীর দলে সেরূপ কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়?

তারপর আমাদের আরও একটা দোষ হইয়াছে, আমরা একটাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। একজন গদ্য লেখক ভাল হইলেন ত তিনি পদ্যেও নিজের হাত দেখাইতে ছাড়িবেন না, গল্প রচনাও তার চাই, ইতিহাসের বিষফলেও দুই একটা চঞ্চাঘাত করিবেন, আবার সমাজ ও ধর্ম্ম—তাহাও বাদ যাইবে না। একজন ঐতিহাসিক বলিয়া একটু প্রখ্যাত হইলেই তাঁহার কাব্যরসরসিক হইবার অদম্য ইচ্ছা দেখা যায়, কিন্তু ইঁহারা মনে করেন না যে সকলেই রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভা লইয়া জন্মে না, বা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহাসনের যোগ্য নহে।

একজন গদ্য সাহিত্যে বিখ্যাত হইলেন তিনি যদি পদ্য লিখিতে না পারেন তবে তাহাতে তাঁহার অপমান নাই। আম, আমড়া যদি না হইতে পারে অথবা বেল, কণ্টকী ফলের যোগ্যতা লাভ না করিতে পারে সেজন্য দোষ কাহারও থাকিলে সে সৃষ্টিকর্ত্তারই! এই ত গেল এক দিক্। তারপর বিজ্ঞান বিষয়ে আমাদের দেশে যাহা আলোচনা হইতেছে তাহাও বেশীর ভাগ সিদ্ধান্ত ঘটিতই।

তাহার কৃত কর্ম্মতাতে আমাদের ঘৃত, লবন, তৈল, তণ্ডুল, বস্ত্রেন্ধন, চিন্তার কথঞ্চিৎ শান্তিরও কোন আশা নাই। অথচ বিজ্ঞান জগতে তাহা দ্বারা দেশের প্রতিপত্তি হইবে সেটা একটা বড়ই গৌরবের কথা এবং যাঁহাদের চেষ্টায় অক্লান্ত সাধনায় তাহা সাধিত হইতেছে তাঁহারা আমাদিগের বরেণ্য! কিন্তু জীবনসমস্যার সমাধান কেমন করিয়া হয়? বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ ধনবৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক উপায়ের রহস্যগুলির তত্ত্ব এমনই করিয়া উহা নিহিত রাখিয়াছেন যে তাহা ত পুঁথি পাঁজিতে পাওয়া অসম্ভব।

শুনিয়াছি আমাদের দেশের সঙ্গীতের ওস্তাদগণের নিকট হইতে এক একটি রাগ রাগিণীর স্বরূপ-খাঁটিরূপ এবং তাহার বিশেষত্ব আদায় করিয়া লইবার জন্য সাক্‌রিদ্‌দিগকে ওস্তাদজির অনেক গাঁজা টিপিয়া দিতে হইত, অনেক হস্ত পদ সংবাহন করিতে হইত—তবে যদি ওস্তাদজি প্রসন্ন হইতেন সেও যাকে তাকে দিতেন না—তাঁহার বিশেষ স্নেহ ও কৃপাপাত্র সাগ্‌রিদ্‌কেই তাহা দিবেন! সেজন্য

আমরা তাঁহাদিগকে কত ঠাট্টা করি, বিদ্রূপ করি কিন্তু এই সব ওস্তাদেরা কি করেন? পাশ্চাত্য দেশের লোক অবশ্য এইরূপ ওস্তাদদিগকে রীতিমত অর্থ দানে পোষণ করেন। একশ্রেণীর ওস্তাদ আছেন, তাঁহারা গবেষণা দ্বারা একটি নূতন ব্যবহারিক তথ্য আবিষ্কার করিলেন। তারপর কার্য্যক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ করিয়া কিরূপে অল্প খরচে উহাদ্বারা অর্থাগম হয়—তাহা নির্ব্বাচন করিবার জন্য আর একজন ওস্তাদ আছেন। তাঁহারা যখন এইরূপ পরীক্ষাতে সাফল্য লাভ করিলেন তখন উহা বাজারে বাহির করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল।

কারণ সময় সময় দেখা যায় যে একটি আবিষ্কার অকুণ্ঠিত হইলেও তাহাতে যে খরচ হয় তাহা এতবেশী যে বাণিজ্যের হিসাবে সে আবিক্রিয়া লাভজনক হয় না। তখন চেষ্টা চলিতে থাকে যে কিরূপে এই নূতন জিনিষ সহজে প্রস্তুত হইতে পারে।

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে আমি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে আমাদের আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আলকাতরা হইতে একরূপ গন্ধদ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সে নমুনার আঘ্রাণও আমি 'সঞ্জীবনী' আফিসে বসিয়া লইয়াছিলাম কিন্তু বাজারে তাহা বাহির হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই; ইহার কারণও হয় ত এইরূপই হইতে পারে যে উক্ত গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে এরূপ শ্রম ও ব্যয়ের আবশ্যক যে বাণিজ্য হিসাবে তাহাতে লাভের আশা নাই। আমি জানি না যে আচার্য্যপ্রবর উহার উপর আরও পরীক্ষা করিতেছেন কি না।

আমাদের দেশে এইরূপ সব ব্যবসাঘটিত জিনিসের আবিষ্কার করিবার প্রযত্ন মোটেই দেখা যায় না। ভারতে আলোচনা ও পরীক্ষার উপযোগী ধাতু উদ্ভিদাদির অভাব নাই। কিন্তু সেদিকে কাহারও চেষ্টা নাই আর বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রদান করেন তাহাতে ঐরূপ চর্চ্চা আলোচনা ও গবেষণার উপযোগিতাই হয় ত জন্মে না। বিজ্ঞানের কেন্দ্র অতি প্রশস্ত। আর দেশের ধনবৃদ্ধির পক্ষে সকলেরই বিশেষ উপযোগিতা আছে কেবল শিক্ষা ও উৎসাহের অভাবেই যে তাহা হইতেছে না—এই সব বিজ্ঞান শিক্ষা কার্য্যতঃ বিফলই হইতেছে।

দেশ হইতে কত চর্ম্ম বিদেশে যাইতেছে, আবার সংস্কৃত হইয়া এই দেশেই ফিরিয়া আসিতেছে কিন্তু এদেশে চর্ম্ম-সংস্কার নাকি ভাল হয় না। যাঁহারা বিলাতে

এই বিদ্যা শিক্ষার্থে গিয়াছেন তাঁহারাও ইহার গূঢ় রহস্য বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে পারেন নাই তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একজন বৈজ্ঞানিক যদি নিজ জীবনব্যাপী সাধনা এই কার্য্যেই নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহার এই সাধনার উপযোগী বস্তুজাত সংগ্রহের খরচ যদি কোন ধনী বহন করেন তাহা হইলে হয়ত তিনি সফলকাম হইতে পারেন। তিনি না হউন, তাঁর পরবর্ত্তী কেহ আবার তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আরও অগ্রসর হইতে পারেন। অর্থ অপব্যয় হইল, তাহা মনে করিলে ত চলিবে না। পাশ্চাত্য-প্রদেশে রাজার পক্ষ হইতে অথবা দেশের পক্ষ হইতে এই সব বৈজ্ঞানিককে উপযুক্ত বৃত্তি দান পূর্ব্বক এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত রাখা হয়।

আমাদের দেশেও পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রচর্চ্চা করিবার সুযোগ প্রদানের জন্য পূর্ব্বকালে বৃত্তি, ভূমি প্রভৃতি দান করা হইত। এইরূপ না করিলে বিজ্ঞান শিক্ষার কোন সুফলের আশা দেখি না।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমার বক্তব্য বিশদ করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের প্রথম বয়সের সময় হিঙ্কসের লণ্ঠনগুলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল এবং সকলের বাড়ীতেই উহা দেখা যাইত।

আমাদের দেশেও ঐ লণ্ঠনের অনুকরণে লণ্ঠন হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে কিন্তু সেগুলি টিনওয়ালাদিগেরই কৃত। সুতরাং সেগুলি জঘন্যই হইয়াছিল। যদি ঐ তত্ত্বসম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোন বৈজ্ঞানিক উহা লইয়া নানারূপ পরীক্ষা করিতেন এবং উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিস প্রস্তুত করিবার জন্য অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় অন্ততঃ উহারই মত একটা কিছু করিতে পারিতেন। কিন্তু তখন বোধ হয় উহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু হইতে পারে সে কল্পনাও কেহ করেন নাই।

কিন্তু পাশ্চাত্যদেশ নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহার ফলে আজকাল সর্ব্বত্র প্রচলিত ডিট্‌জ মার্কা লণ্ঠন আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিঙ্কস্‌এর পূর্ব্বের লণ্ঠন অপেক্ষা উহা অনেক বিষয়েই শ্রেষ্ঠ সুতরাং হিঙ্কস্‌কে হটিতে হইয়াছে তার সে পসার প্রতিপত্তি আর নাই।

আমাদের দেশের নীল পূর্ব্বে দেশ বিদেশে রপ্তানী হইত। অথচ সে নীলের কুঠিয়ালও সাহেবই ছিলেন, আমরা নহে—যাহাহউক জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকের কৃপায়

আলকাতরা হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নীল আবিষ্কৃত হইল—আমাদের দেশের নীলকে পাততাড়ি গুটাইতে হইল।

আমাদের দেশের পাটের রাজত্ব বিদেশ হইতে উঠাইয়া দিবার জন্যও প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে, হয়ত কিছু দিনের মধ্যে তাহাকেও আর বিদেশে যাইতে হইবে না।

এইরূপ সব ধনাগমের উপায় বৈজ্ঞানিকের ঐন্দ্রজালিকমায়াযষ্টির প্রভাবেই হইতে পারে। প্রকৃতির গুপ্তভাণ্ডারের চাবি অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারাই তন্নিহিত রত্নাবলী বাহির করিতে পারেন কিন্তু তাহা করিতে একান্ত সাধনারও প্রয়োজন, আবার অর্থেরও প্রয়োজন। আমাদের দেশে দুইএরই অভাব।

দেশের ধনীগণের অধিকাংশই বোধ হয় এইরূপ ভাবে অর্থ ব্যয় করাকে অপব্যয় বলিয়া মনে করেন, নতুবা তাঁহারা এদিকে দৃষ্টিপাত করিতে কাতর কেন? যে দেশে লক্ষ লক্ষ টাকার চাঁদাও উঠিতেছে দেখা যায়, এক এক জন ধনীই কেহ দুই লক্ষ, কেহ চারি লক্ষ পর্য্যন্ত চাঁদা দিতেছেন, সে দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কয়জন কতগুলি টাকা দানের প্রস্তাব করিয়াছেন জানিতে ইচ্ছা হয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধোপলক্ষে ভারতবর্ষ নানারূপ ফণ্ডে চাঁদা দিতেছে আমি তাহাতে দোষ দিতেছি ইহা যেন কেহ মনে না করেন এটা ত ভারতের কর্ত্তব্যের মধ্যে! ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই এক অংশ, সুতরাং তাহার বিপদের সঙ্গে ভারতেরও বিপদ জড়িত সুতরাং যাহার যাহা সাধ্য তাহা দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য! আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে দেশের প্রতি কর্ত্তব্যের দিকেও সকলের লক্ষ্য থাকা উচিত নহে কি!

আমাদের দেশ পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশ অপেক্ষা বেশী দরিদ্র এই কথাইত শুনিতে পাই, সেই দেশের দারিদ্র্য দূর বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কারের দ্বারাই সাধিত হইবে সুতরাং তাহার জন্য দেশের লোক যদি উদ্যোগী না হন তাহা হইলে চিরকালই ভারতকে দরিদ্রই থাকিতে হইবে।

বিদেশের লোক বৈজ্ঞানিক উপায়ের সাহায্যে কৃষির কি আশ্চর্য্য উন্নতিই সাধন করিয়াছেন! যেখানে পূর্ব্বে ১বিঘা জমিতে ৪০মণ জিনিস উৎপন্ন হইত, বৈজ্ঞানিক স্বীয় গবেষণার ফলে তাহাতে ১০০ মণ জিনিস উৎপাদন

করিতেছেন। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক কেহ সে বিষয় কোন চেষ্টা করিতেছেন কি?

বিদেশের লোকে তাঁহাদের জমিতে যাহা করিতেছেন উপযুক্ত উপায় প্রযুক্ত হইলে আমাদের দেশের জমিতে কি তাহা অসম্ভব! বিদেশীয় প্রথা আমাদের দেশে ঠিক খাটিতে পারে না। মৃত্তিকা, জল বায়ু ও আর আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্য নিবন্ধন উপায়েরও পার্থক্য হইবে! সেইগুলি প্রথমে বিশেষরূপ প্রণিধান করা আবশ্যক। নানা স্থানের মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের উপাদানের পার্থক্য ভেদে বর্ষণ, সার, সেচন প্রভৃতির পার্থক্য নির্ব্বাচন করতঃ তদনুযায়ী পরীক্ষা করা উচিত।

আমি বৈজ্ঞানিক নহি—আমি যাহা বলিতেছি তাহার মধ্যে অনেক দোষ থাকিতে পারে কিন্তু আমার মত আনাড়ী ব্যক্তির এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া যাহা ধারণা হইয়াছে তাহাই এখানে বলিতে চেষ্টা করিলাম মাত্র। বিজ্ঞান-শিক্ষা ব্যতীত দেশের ধনাগমের উপায় নাই সুতরাং দেশের আর্থিক উন্নতি এবং রাজ-নৈতিক উন্নতির আশা করিতে হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা অত্যাবশ্যক কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রণালীতে এই বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহাতে কার্য্যকরী বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ কোন উপকার হইতেছে বলিয়া আমার মনে হয় না, আর এ সম্বন্ধে দুই চারিজন বিজ্ঞান জানা গণ্য মান্য লোকের সঙ্গে যে আলোচনা করিয়াছি তাঁহাদের এইরূপই মত। প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় এবং স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত মহাশয়দ্বয়ের দানশৌণ্ডতায় এবং পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মহাত্মাগণের চেষ্টায় যে বিজ্ঞান শিক্ষার কলেজ কলিকাতাতে স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে যদি সেইরূপ শিক্ষা, আলোচনা ও গবেষণার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইবে। যে সমুদয় মহামনীষা-সম্পন্ন পণ্ডিতগণের হস্তে উহার পরিচালনা ও শিক্ষা দানের ভার গচ্ছিত হইয়াছে তাঁহারা যদি বিজ্ঞানশিক্ষাকে দেশের ধনাগমের উপযোগী করিয়া গঠন করিবার ব্যবস্থা করেন দেশের প্রকৃত কাজ হইবে এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত উপকার দেশের মধ্যে বিস্তৃত হইবে; আর তাহা হইলেই একদিন ভারত আপনার দুঃখ দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হইয়া জগতের বাণিজ্য সভায় নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে বিদেশে যে কোটি

কোটি টাকা ভারতবর্ষ হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে চলিয়া যাইতেছে তাহা দেশেই থাকিয়া দেশের লোককে ধনী করিবে এবং এমন কি বিদেশ হইতেও ভারত ধনসংগ্রহ করিয়া স্বীয় পূর্ব্ব প্রতিপত্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে পারিবে।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

কালবৈশাখী।

বৈশাখী ঝড় এসেছে মোর প্রাণের কিনারায়,
আজ্‌কে আমি আসন পাতি কোন্ পাহাড়ের গায় ?
আজ নদীর জলে বান ডেকেছে, প্রাণের মাঝে বান ;
তাইত ভাবি কোন্ সুরে আজ সুরু করি গান।
আজ তড়িৎ আঁকা বজ্র ডাকা ছোটে মেঘের দল,
মাথার উপর মত্ত হাওয়া উড়ায় ঝড়ের জল।
আজ পাতায় পাতায় মাতামাতি লড়াই ডালে ডালে,
ভাঙ্গা ডানা পাখী লুটায় ভাঙ্গা ঘরের চালে।
আজ ঈশান বাজায় বিষাণ তার প্রলয় কালের তান
কি সুরে আজ সুরু করি পাগ্‌লা হাওয়ার গান।
সকল ধরা পাগলপারা ভয় কি তবে আজ
যদি পাগল বলে পড়িস্ ধরা তাতেই বা কি লাজ ?
ওরে বাহির হয়ে পড়্‌না তবে ঝড়ো হাওয়ার সাথে
হোক—বাজের সাথে কোলাকুলি শিলা পড়ুক মাথে।
আজ মেঘের সাথে হাওয়ার সাথে মিলিয়ে নে তোর তান,
বানের তালে শেষ করে দে প্রলয় কালের গান।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

ভিক্ষার ঝুলি।

শীতল বায়ু-প্রবাহ ও স্বাস্থ্য বিধান।

(Scientific American. Dec. 9th, 1916.)

বিশুদ্ধ বায়ু যে স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত দরকার একথা আমরা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু আবার এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহারা ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে খোলা হাওয়ায় বড় একটা বাহির হন না; শীতকাল হইলে ত কথাই নাই—গলায় কম্ফর্টার জড়াইয়া, আপাদমস্তক গরম কাপড়ে ঢাকিয়া, গাড়ীতে চলিতে হইলে দরজা জানালা বন্ধ করিয়াও মূর্ত্তিমান আতঙ্কের মত উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন। আবার এমনও অবশ্য অনেকে আছেন যাঁহারা শীত গ্রীষ্মে সর্ব্বদাই মুক্ত বায়ু ভালবাসেন,—ঘরের কোণে বসিয়া থাকা তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর। এখন কথা হইতেছে ঘরের বাহিরে ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা কতটা এবং এ সম্বন্ধে দুই বিরুদ্ধ মতের মধ্যে কোন্‌টা খাঁটি।

শীতপ্রধান দেশের লোকেরা সাধারণতঃ ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে অধীর হয় না, কারণ শৈত্যে তাহারা অভ্যস্ত। খোলা হাওয়ায় ভ্রমণ করিলে যে ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা বেশী হয় একথা বলা যায় না। ভ্রমণে যে পরিশ্রম হয় তাহা শরীরের তাপ বৃদ্ধি করিয়া ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় দূর করিয়া দেয়। কিন্তু যেখানে বায়ুর চলাচল বেশী এমন ঘরে কিম্বা ট্রেণের কামরায় বসিয়া থাকিলে সহজেই ঠাণ্ডা লাগিতে পারে, কারণ পরিশ্রম না করাতে তখন শরীরে যথেষ্ট তাপ উৎপাদিত হয় না। ঠাণ্ডায় বসিয়া থাকিলে নানারোগের বীজাণুও শরীরে প্রবিষ্ট হইবার অবসর পায়, শৈত্যের জড়তা তাহাদের সাহায্যকারী হয়। সুতরাং পরিশ্রম অপেক্ষা আলস্যই যে ঠাণ্ডা লাগিবার অধিকতর কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য অতিরিক্ত মাংসাহার, মদ্যপান, শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতির জন্যও সর্দ্দি লাগিতে পারে।

আবদ্ধ ঘরে দূষিত বায়ু শরীরের পক্ষে কতটা অনিষ্টকর এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। বদ্ধ ঘরের বায়ু অনিষ্টকর হইলেও অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় অনিষ্টের সম্ভাবনা অনেক বেশী। যাহা হউক, একদল লোকের বিশ্বাস যেখানে বায়ুর

চলাচল বেশী এমন ঠাণ্ডা জায়গায় বসিয়া থাকিলেই অসুস্থ হইবার আশঙ্কা বেশী অপর দল বলেন যে জলপূর্ণ বদ্ধ ঘরে বসিয়া থাকিলে তাঁহাদের সর্দ্দি হয়।

আমাদের ঘরের জানালার দোষে আমরা অনেক সময় অসুস্থ হইয়া পড়ি। শীতের সময় ঠাণ্ডা হাওয়া যাহাতে ঘরে প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য জানালা খুব ভাল করিয়া বন্ধ করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকেই ঘরে বায়ু চলাচলের পক্ষপাতী, এজন্য অধিকাংশ গৃহেই জানালার বন্দোবস্ত ভাল নয়। এজন্য ঘরের ভিতর আগুন জ্বালিয়াও সেখানে ঘর যথেষ্ট গরম করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু সুইডেন, রুষিয়া প্রভৃতি দেশের ব্যবস্থা অন্যরূপ। সুইডেনে প্রবাসকালে Scientific Americanএর প্রবন্ধ লেখক যে কয়দিন দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন সে কয়দিন তাঁহার কোনও অসুখ হয় নাই, কিন্তু একদিন শীত একটু কম অনুভব করিয়া ইংলণ্ডের অভ্যাস মত জানালা খুলিয়া গরম কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলেন,—পরদিন তাঁহার ভয়ানক সর্দ্দি হয়।'

মোট কথা শীতের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত না হইয়া একটু সাবধানতা অবলম্বন করিলেই নিরাপদ হওয়া যায়। শীতের সময় ঘরে যাহাতে বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়া বেশী প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য দরজা জানালা বন্ধ রাখিলে ঘরও গরম থাকে অসুস্থ হইবার আশঙ্কাও তিরোহিত হয়। বাহিরে যাইবার সময় গরম জামা কাপড় পরিধান করা কর্ত্তব্য এবং সর্দ্দির আক্রমণ হইতে শরীর নিরাপদ রাখিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

হৃদয়বাণী।

প্রাতঃকাল ১৯।১১।১৬।

অনেক দিন হইতে ফরাসী ঔপন্যাসিক Balzacর নাম শুনিয়া আসিতেছি। নাট্যজগতে Shakespeareর যে স্থান, উপন্যাসক্ষেত্রে Balzacর অনেকটা তেমনি প্রতিপত্তি। কিন্তু কি বলিব, আমার না লাগিল Shakespeareকে তেমন ভাল না লাগিল Balzacকে। Hamlet, Othello, Macbeth,

King Lear ইত্যাদি নাটক আমার কাছে অনেক সময় ছেলেপেলের গল্প বলিয়াই মনে হয়। তাহাদের ভিতর এমন বিশেষ কোনও গভীর ভাব দেখি না, এমন কোনও জীবনাদর্শ বা সামাজিক জটিল সমস্যার আলোচনা দেখিনা, যাহাতে আমার প্রাণ আলোড়িত বিলোড়িত হইতে পারে, গভীর আনন্দরসে পূর্ণ হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে Hamletই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও দর্শনে পুষ্ট লোকের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার ইহাতে এমন কি আছে? বরং Goetheর Faust এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—বর্ত্তমান যুগের মানবের অশান্তিও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ভাব তাহাতে কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমানে জগৎব্যাপী ইংরাজের রাজত্ব, Shakespearর ও সঙ্গে সঙ্গে এত প্রতিপত্তি। ইহার শতাংশের একাংশও তিনি সমসাময়িক লোকের নিকট পান নাই—তাই তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অনেকে সন্দিহান হইতেছেন। বোধ হয়, তাহার প্রতিপত্তির দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। Tolstoi তাহাকে তেমন উচ্চাসন পাইবার উপযুক্ত নয় বলিয়াই মনে করিতেন, খুঁজিলে অন্যান্য গ্রন্থকার কর্ত্তৃকও ঈদৃশ মত ব্যক্ত হইয়াছে দেখা যাইবে। Shakespeareর সমস্ত নাটক অপেক্ষা কালিদাসের শকুন্তলাই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। ইহা ভারতের প্রাচীন যুগের শান্তিপূর্ণ সমাজের অপূর্ব্ব আদর্শ চিত্র। ভারতে আর তপোবন কেহ দেখিবেনা। তাহার সংস্রবে যে জীবনাদর্শ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল জগতের বক্ষ হইতে তাহা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। দাড়িম্ব বীজের ন্যায় স্নেহরসে পূর্ণ-কোমল-কঠিন প্রাণ সেই কণ্বমুনিকেও আর কেহ দেখিবেন না। তাঁহার শিষ্যবৃন্দও অদৃশ্য হইয়াছে। প্রকৃতির কোলে পালিতা শকুন্তলা, তাহার সখীদ্বয়—তরুলতা পাতা মৃগ শিশুগণের সহিত একপ্রাণা, সরলতা ও পবিত্রতার মূর্ত্তি—বালিকা-গণকেও আর কেহ দেখিবে না। জগতের বক্ষ হইতে তাহারা চিরকালের জন্য অপসারিত হইয়াছে। কিন্তু যতদিন মানুষ বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিনই তাহার সংসারের জ্বালাযন্ত্রণাদগ্ধ শান্তি ভিখারী প্রাণ—এই শান্ত তপোবনের চিত্রের দিকে চাহিয়া আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইবে। Shakespeare ষোড়শ শতাব্দীর ইয়ুরোপের কবি, সে দেশ সুলভ তামসিক ভাব সমূহে তাহার গ্রন্থাদি পরিপূর্ণ। কালিদাস সমস্ত জগতের সকল যুগের কবি, সাত্ত্বিক ভাবে প্রণোদিত শান্ত রসস্নিগ্ধ তাঁহার শকুন্তলা চিরকালের জন্য।

ইতিপূর্ব্বে Balzacর Eugenie Graudet পড়িয়াছিলাম, এবার Fragedy of a genius পাঠ করা গেল। কোনটাই তেমন ভাল লাগিল না—অথচ এই দুইখানাই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। Graudetএ কৃপণের চরিত্র চিত্র করা হইয়াছে। এখনকার দিনে তেমন কৃপণও দেখা যায় না, আর দৃষ্ট হইলেও সে সমাজের এমন কিছু নয়, যার চরিত্র বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দেখিবার জন্য লোক সমুৎসুক। কৃপণ—নিজ কার্পণ্যহেতু অকর্ম্মণ্য সমাজের সে কিছু নহে, বর্ত্তমান সমাজ তাহার জন্য চিন্তিত নয়—চিন্তা করিবার অবসর নাই।

Fragedy of a geniusএ প্রকৃত প্রতিভাশালী ব্যক্তি তাহার খেয়ালের (Hobbey) বশবর্ত্তী হইয়া কেমন সর্ব্বস্ব পণ করিয়া নিজ অভিষ্ট লক্ষ্য সাধনায় প্রবৃত্ত হয় এবং যত দিন পর্য্যন্ত সাফল্য তাহাকে বরণ না করে, ততদিন সমাজের লোকের কাছে কি প্রকার উপহাসাস্পদ ও বিড়ম্বিত এবং সময় বিশেষে নির্য্যাতিত হইয়া থাকে তাহাই দেখান হইয়াছে। Balthazar নামক এ গ্রন্থে যে প্রতিভাসম্পন্ন Chemist রাসায়নিক পণ্ডিতের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—তাহার চরিত্রটা ফুটিয়াছে ভাল, কিন্তু তাহা তেমন চিত্তাকর্ষক নয় অন্ততঃ তাহাতে এমন ভাবে দেখান হয় নাই, যাহাতে লোকে তাহার পথ ভবিষ্যতে অনুসরণ করিতে প্রলুব্ধ হইবে। Genius প্রতিভা এক প্রকার ব্যাধি বিশেষ অনেকটা madness পাগলামির ন্যায়। Balthazar জগতের আদি দ্রব্যের The absoluteর অনুসরণ করিতে যাইয়া, তাহার অগাধ সম্পত্তি, যশ মান প্রতিপত্তি সব হারাইলেন। তাহার অবহেলায় ও একপ্রকার তাহার মমতাবিহীন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য পূর্ণ ব্যবহারে, তাহার সাধ্বী পতিপরায়ণা স্ত্রী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, কিন্তু তথাপি তিনি স্বীয় লক্ষ্য সাধনে পূর্ব্বেরই ন্যায় অক্লান্তকর্ম্মা অবিচলিত চিত্ত। পত্নীর মৃত্যুকালের কথাগুলি হৃদয় বিদারক, কিন্তু মধুর এবং অতিসত্য। তিনি স্বামীকে বলিয়া গেলেন, "প্রতিভা উন্মাদকতার ন্যায়। তোমার জীবদ্দশায় তুমি সুখী হইবে না, তোমার সন্তানগণের তুমি সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া যাইবে। জগতের যত প্রতিভাশালী লোকদিগেরই ঈদৃশ অবস্থা—যশ মৃতের প্রাপ্য। বিজ্ঞানই তোমার প্রাণ। প্রতিভাশালী ব্যক্তির Great-menর স্ত্রী পুত্র কেহ নয়। কর, তুমি তোমার দরিদ্রতার পথই অনুসরণ কর। তোমার যাহা চরিত্র সম্পদ তাহা সাধারণ লোকের আয়ত্বাধীন নহে। তুমি

স্ত্রী কিম্বা পরিবারের জন্য নও—তুমি সমস্ত জগতের। বৃহদাকার বৃক্ষের ন্যায় তুমি চতুঃপার্শ্বস্থ মৃত্তিকার রস আত্মসাৎ কর,—আমি সন্নিকটের ক্ষুদ্রলতা তোমার ন্যায় উপরে মাথা তুলিতে পারিলাম না। তাই, অর্দ্ধমৃতাবস্থায় জীবন যাপন করিতেছিলাম, আজ শেষ সময় সব বলিয়া গেলাম। তোমার স্ত্রী মরিতে চলিল, তোমার সন্তানদের দিকে চাহিও, তাহাদিগকে অবহেলায় মারিও না, তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিও না।" Balthazar স্ত্রীর মৃত্যুকালের অনুরোধও রাখিতে পারিলেন না অথচ স্ত্রীর প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। কোনও প্রকৃত Geniusই পারেন নাই। অবশেষে সন্তানগণই তাহার একপ্রকার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, জ্যেষ্ঠা কন্যা সংসারের কর্ত্রী হইল। তাহার ইচ্ছানুসারেই তাহাকে চালিত হইতে হইল, ধন ঐশ্বর্য্য অর্থ সমাগম হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, তথাপি মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি তাহার Hobbeyর চর্চ্চা করিয়া গেলেন। লোকের কাছে তিনি শেষ-কালে ঘৃণ্য পাগল বলিয়াই বিবেচিত হইয়া গেলেন—তাহার প্রকৃত মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য কেহ বুঝিল না। জগতে এমনই হয়। একযুগে যিনি পাগল, অন্য যুগে তাহারই মূর্ত্তি পূজিত হয়। কয়জন প্রতিভাশালী ব্যক্তি জীবদ্দশাতে যশোমাল্যে ভূষিত হইয়া থাকেন ?

কিন্তু যাহার হৃদয়ে স্বীয় অভিষ্ট সাধনে এই Geniusর ন্যায় উন্মাদকতার একাগ্রতার ভাব দেখা দিয়াছে তাহারই জীবন যাপন সার্থক। যে দেশে, যে জাতিতে ঈদৃশ লোক সমূহের আবির্ভাব হয়, সে দেশ ও সে জাতির ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। কখনও অর্থ চিন্তায় কখনও বা লোকনিন্দার বা মানভয়ে, আমরা সাধারণ লোক না মিটাই আত্মার, প্রাণের ক্ষুধা, না যোগাই দেহের আহার তাই আজীবন সর্ব্ববিষয়ে Stunted growth অর্দ্ধ মানুষই থাকিয়া যাই। Balthazarর চরিত্রে যে জীবনাদর্শ প্রকটিত হইয়াছে, বঙ্গের অদ্বিতীয় Genius বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের শিরোভূষণ আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের মুখেও সে দিন সে কথাই শুনিতেছিলাম। বিক্রমপুরবাসিগণকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিতে ছিলেন, "ভয় করিতেছ সমস্ত জীবন দিয়াও অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে না ? তোমার কি কিছুমাত্র সাহস নাই ? দ্যূতক্রীড়কও সাহসে ভর করিয়া জীবনের ধন পণ করিয়া নিক্ষেপ করে। তোমার জীবন কি এক মহাক্রীড়ার জন্য ক্ষেপণ করিতে পার না ? হয় জয় কিম্বা পরাজয়।" বাঙ্গালী! সকল কাজে এই

মহাপুরুষোক্ত জীবনাদর্শ গ্রহণ কর, তোমরা নিজে ধন্য হইবে, জগৎসভায় তোমাদের মাতৃভূমিকেও বরণীয়া দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত।

অবচ্ছেদে।

আমি শুধু শুনেছিলাম
তোমার চরণ ধ্বনি বাতায়নের পাশে।
ভোরের হাওয়ার উতরোলে
মর্ম্মরিত তরু-দোলে,
বকুল যুঁথীর পরাগ ওড়ে গন্ধ গুরু বাসে;
বিজন পথে দীঘির ধারে
নিশির কুসুম পড়ে ঝরে,
নীড়ে বিহগ ঝাড়ে পাখা
শুষ্ক পত্র খসে—

আমি যেন শুনেছিলাম
চরণ ধ্বনি মৃদু বাতায়নের পাশে!
দ্বিপ্রহরে রৌদ্র তাপে
ক্লিষ্ট চতুর্দ্দিক, খিন্ন বসুন্ধরা।
দিবার চক্ষে শ্রান্তি জাগে,
শিথিল তনু আলস লেগে
মুদে আসে ঘুমের ঘোরে ক্লান্ত আঁখি তারা;
সুপ্তি—সাগর বেলার পরে
হঠাৎ জাগি কিসের ঘোরে,
আবেগভরা কণ্ঠ তোমার দিল ব্যাকুল সাড়া—
দ্বিপ্রহরে রৌদ্র তাপে
ক্লিষ্ট চতুর্দ্দিক খিন্ন রথন ধরা।

নিঃঝুম রাতি আঁধার নভে
ঝলকে তারাবলী, স্তব্ধ দশ দিশি,
সুপ্তি মগন নিখিল বিশ্ব
তিমির লুপ্ত সকল দৃশ্য
গভীর যাম বিরাম ভরা শব্দহীন নিশি,
মেদুর বাতাস মৃদুল আসে
তারি সাথে এল ভেসে
হঠাৎ তোমার আকুল শ্বাস
বহি বেদন রাশি,—

নিঃঝুম যখন নীরব রাতি
গভীর গহন যাম,
স্তব্ধ দশ দিশি!

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

কাছাড়ের বিক্রমপুর।

যখন কোনও কিছু প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে, তাহার অনুকরণ তখন একটা ফ্যাশান হইয়া পড়ে। ধরুন 'বঙ্কিম' এই নামটি; অদ্বিতীয় প্রতিভাবান্ সেই ঔপন্যাসিক মহাত্মার আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই নাম বঙ্গীয় সমাজে ছিল কিনা, সন্দেহ; আর এখন—সে কথা বলাই বাহুল্য।

পরগণা বিক্রমপুর বাঙ্গালার এক অতি বিশিষ্ট স্থান; বিক্রমপুরের লোক পদে, পদার্থে, ধনে, বিদ্যায়—সর্ব্বত্র সমাদৃত; বিশেষতঃ এমন স্থান বড় নাই, যেখানে বিক্রমপুরের কেহ চাকরী বা ব্যবসায় অবলম্বনে না আছে। এই বিক্রমপুরের অনুকরণে জায়গার নামকরণ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি, বিক্রমপুরীয়দেরও ইহাতে কোনও অগৌরবের কথা ত নাই-ই বরং শ্লাঘারই কারণ আছে।

তবে বিক্রমপুরের যাহা গৌরবের কারণ—যে জন্য বিক্রমপুর "বিক্রমপুর, তাহা নিয়া যদি টানাটানি হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিক্রমপুরবাসীর বিচলিত

হইবার কথা। তাই প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় যখন পশ্চিমবঙ্গে বিক্রমপুর আবিষ্কার করিয়া তাহাই সেনরাজগণের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রচার করিলেন, তখন প্রতিবাদের তীক্ষ্ণবাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল—এবং তাহা খুবই স্বাভাবিক। মহাকবি যথার্থই বলিয়াছেন—

> "Who steals my purse steals trash * *
> * * * * *
> But he that filches from me my good name
> Robs me of that which * * *
> makes me poor indeed."
>
> Othello, iii—3

যাহাহউক কাছাড়ের বিক্রমপুর কদাপি মূল বিক্রমপুরের গৌরবাপহারক নহে পরন্তু সেই স্থানের সঙ্গে নামতঃ সম্বন্ধ বলিয়াই নিজকে শ্লাঘ্য মনে করিতেছে।

আসামবেঙ্গলরেলওয়ের কল্যাণে এখন কাছাড় শ্রীহট্টের প্রায় সংযোগ স্থলে অবস্থিত 'বদরপুরে'র নাম অনেকেই অবগত আছেন। বদরপুরের কাছ দিয়াই বরাক নদী প্রবাহিত হইতেছে—ঐ নদীর অপর পারে কাটিগড়া গ্রাম; এখানে থানা ইত্যাদি থাকায় স্থানটি কাছাড় জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই কাটিগড়া পরগণারই সংলগ্ন উত্তরপূর্ব্বে কাছাড়ের 'বিক্রমপুর' পরগণা অবস্থিত।

এই পরগণার মধ্যদিয়া আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের হিল-সেক্‌সন চলিয়া গিয়াছে। যখন ইহাতে একটি ষ্টেশন হইল, তখন ইহার নাম "বিক্রমপুর" রাখা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ষ্টেশনটির নাম 'বিহারা' হইয়াছে। শুনা যায় যে রেলওয়ের কয়েক জন বিক্রমপুরীয় ক্ষমতাবান্ কর্ম্মচারীই নাকি আন্দোলন করিয়া নামটির পরিবর্ত্তন করাইয়াছেন। আমার বোধ হয় কাজটি সমীচীন হয় নাই; ভারতবর্ষে কত 'রামপুর,' কত 'শ্রীনগর' রহিয়াছে; একাধিক 'পাটনা,' অসংখ্য 'ফতেপুর' রহিয়াছে। তাহাতে যায় আসে কি? সামান্য একটি রেল ষ্টেশন দ্বারা তাহাদের মাতৃভূমির উজ্জ্বল নাম হীনপ্রভ হইবে এটা যদি মনে করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা দেশবৎসল হইলেও গরীয়সী জন্মভূমির মাহাত্ম্যে প্রকৃত আস্থাবান নহেন।

'বিক্রমপুর' নাম কিরূপে হইল, সেই সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ স্যর উইলিয়ম হাণ্টার তৎপ্রণীত ষ্টেটিষ্টিকেল একাউণ্ট্‌স্‌ অব্‌ আসাম (Statistical Accounts of Assam) দ্বিতীয় খণ্ডে কাছাড়ের বিবরণীতে লিখিয়াছেন :—

"The first settlement of the Hindus in the district is placed about 200 years ago in the reign of Raja Suradarpa chandra The tradition runs that in his reign, an Assam, Hindu named Bikram Rai, was sent from the Capital of Dimapur into that part of Cachar now known as Bikrampur to encourage the settlement of Bengali immigrants from the west." (১)

কিন্তু ইহা হাণ্টার সাহেবের গবেষণা প্রসূত নহে; তিনি এই উক্তির অব্যবহিত পূর্ব্বেই লিখিয়াছেন :—

"The following paragraphs are mainly condensed from the Annual·Report on the Revenue Administration of Cachar for 1871-72" (২)

বর্ত্তমানে মিঃ এলেন সাহেব আসাম ডিষ্ট্রীক্ট্‌ গেজেটিয়ার (Assam District Gazetteer) সঙ্কলন করিয়াছেন ; তাহাতে কাছাড় খণ্ডে (vol. I) ৭ম অধ্যায় তিনি হাণ্টার সাহেবের কথাগুলিই উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, কোনও রূপ গবেষণা প্রয়োগ করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয় করেন নাই।

তৎপর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ প্রণীত "কাছাড়ের ইতিবৃত্তে" আছে :—

"অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আহম যুদ্ধে পরাজিত রাজা তাম্রধ্বজ বিক্রমপুর গড়ের ভিতর নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেন। তখন ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুরস্থ সোণারঙ্গ গ্রাম নিবাসী জনৈক রাজকর্ম্মচারী কাছাড়ের সমতল ভাগে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় মাতৃভূমির নামানুসারে কাছাড়ে বিক্রমপুর পরগণাও সোণাপুর মৌজা স্থাপন করেন।" *

অধুনা কাছাড়ের অধিবাসীরা বিক্রমপুর বা নবদ্বীপ হইতে সমাগত বলিতে পারিলেই শ্লাঘা মনে করেন। দৃষ্টান্ত স্থলে হাইলাকান্দির স্বর্গীয় রায় হরিচরণ শর্ম্মা বাহাদুরের বংশধরগণের কথা বলিতে পারি। তাঁহারা বিক্রমপুর কাঁচাদিয়া

(১) Statisttcal Accounts of Assam, Vol ii p 414.

(২) Ibid.

(৩) "কাছাড়ের ইতিবৃত্ত," ১১৯—২০ পৃষ্ঠা।

হইতে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ এই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার করিতেছন। ঐ গ্রাম নাকি পদ্মার গর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়াতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাঁহাদের পাঁচ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী রামজীবন শর্ম্মা এতদঞ্চলে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। কিন্তু রায় হরিচরণ শর্ম্মা বাহাদুর জীবিত থাকিতে তিনি শ্রীহট্ট বাণিয়াচঙ্গ কৌণ্ডিল্য বংশীয় বলিয়া তদ্‌গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, একথা আমরা অবগত আছি। *

তাই আজকাল 'বিক্রমপুর' সম্বন্ধে এই মতই প্রচারিত হইতেছে যে "বিক্রমরায় নামক এক ব্যক্তি সোণারঙ্গ বিক্রমপুর হইতে কাছাড়ে আসেন।" এটা গেজেটিয়ার প্রভৃতি অফিসিয়েল মতের সঙ্গে আধুনিক প্রবাদের (অর্থাৎ যাহা "কাছাড়ের ইতিবৃত্তে" প্রচারিত হইয়াছে) একটা সমন্বয় বলিয়াই বোধ হয়।

এখন এই সকল মতের সমালোচনা করা যাউক। হাণ্টার সাহেবের সময়ে এতদঞ্চলের ঐতিহাসিক তথ্যাবিষ্কারের কোনও প্রযত্ন হয় নাই—তিনিও'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" গোছের বিবরণী দিয়া কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এলেন সাহেবের এইরূপ হাণ্টার লিখিত কাহিনী মাত্র উদ্ধৃত করা সঙ্গত হয় নাই। তিনি গেজেটিয়ারের প্রথমাংশে কাছাড়ীগণের এক ইতিহাস দিয়াছেন, তাহাতে আছে—"It was about this time (1536) that the king decided to abandon Dimapur and removed his capital Southwards to Maibang." * ফলতঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই আহোমদের দ্বারা উপক্রুত হইয়া কাছাড়ীরাজ চিরতরে ডিমাপুর অঞ্চল পরিত্যাগ করেন। তাহা হইলে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে) ডিমাপুর রাজধানী হইতে

(৪) পদ্মা নদীর সর্ব্বধ্বংসকর ভাঙ্গনের ব্যাপার আজ বড় জোর তিন পুরুষের কথা। বিক্রমপুরের কৌণ্ডিল্য গোত্রের ব্রাহ্মণ যদি থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদের একশাখা যে কাছাড় চলিয়া গিয়াছে একথা জ্ঞাত আছেন কিনা জানিনা।

(৫) শিলচর নর্ম্যাল স্কুলের জনৈক ছাত্র লিখিত মৎসমীপে প্রেরিত একটি রচনা হইতে উদ্ধৃত।

(৬) Assam District Gazetteer Vol ii, Cachar—

আসামী বিক্রমরায়ের আগমন সম্ভবে কিরূপে? তারপর আসামীদের মধ্যে 'বিক্রমরায়" নাম থাকা সম্ভাব্য নহে—'রায়' উপাধি ঐ অঞ্চলে কদাপি চলিত নহে। অপিচ এই আসামী ভদ্রলোক আসিয়া বাঙ্গালীর উপনিবেশ কার্য্যে উৎসাহ দিবেন, ইহাই বা কেমন কথা? ফলতঃ ঐ কাহিনী সমস্তই গ্রহণের অযোগ্য।

তবে ইহা ঠিক্ যে তাম্রধ্বজের সময়ে যখন আহোম আক্রমণে মইবঙ্গ হইতে পলাইয়া আসিতে হইল তখন কাছাড় রাজগণ বরাক বা সুরমা উপত্যকায় সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীদের সম্পর্কে আসিতে বাধ্য হইলেন। সম্ভবতঃ তখনই বাঙ্গালী কাছাড় রাজ্যে জায়গা পাইয়া ও রাজকার্য্য লাভ করিয়া ঐ অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হইতে আরম্ভ করিল।

তারপর বিক্রমপুর সোণারঙ্গ হইতেও প্রকৃতই কেহ আসিয়াছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। "বিক্রম রায়" নিজ নামে পরগণার নাম করেন—কিংবদন্তীর ইহাই বোধ হয় যথার্থ কথা। তাহা হইলে তাঁহাকে আর "বিক্রমপুর"-নিবাসী করিবার দরকার কি থাকে, বিক্রমরায়ের নিবাস প্রকৃত পক্ষে বিক্রমপুর হইলে, হাণ্টার সাহেব যে রিপোর্ট হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বিক্রমপুরবাসীই বলা হইত, কেননা বিক্রমপুর সর্ব্বদাই সুপ্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া খ্যাত। সোণারঙ্গের নামানুকরণে "সোণারঙ্গ" নামই থাকা উচিত ছিল, 'সোণাপুর' হইবে কেন? তবে তিনি 'বিক্রমনগর' বা 'বিক্রমবাদ, এইরূপ নাম না দিয়া যে 'বিক্রমপুর' নামকরণ করিয়াছিলেন, তাহা খুব সম্ভব সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুরের অনুকরণে। বিক্রমরায় কাছাড় রাজার অধীনে খুব উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন—তাঁহার উপাধি মজুমদার, হইয়াছিল। বংশানুক্রমে এই উপাধি চলিয়াছিল—অল্পদিন হইল এই শ্রেষ্ঠ বংশের লোপ ঘটিয়াছে। সোণাপুরে এখনও তাঁহাদের নির্ম্মিত দেবমন্দির, পুষ্করিণী ইত্যাদি বর্ত্তমান আছে। এই বিক্রমপুরের কিঞ্চিৎ বিবরণ জানিবার কৌতূহল হইতে পারে। এই নিমিত্ত সংক্ষেপে তাহা বর্ণিত হইতেছে। অতঃপর যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার অনেক কথা শিলচর নর্ম্মাল স্কুলের একটি ছাত্রের রচনা হইতে সংগৃহীত। ঐ স্কুলের এসিষ্টেণ্ট হেড্মাষ্টার শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব ইহা প্রেরণ করিয়াছেন।

এই পরগণা পূর্ব্বপশ্চিমে গড়ে ৫॥০ মাইল দীর্ঘ, এবং উত্তরদক্ষিণে গড়ে ৫ মাইল প্রস্থ। অতএব পরিমাণ ফল প্রায় ২৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা মাত্র ৮৫০০ আন্দাজ। এখানে ব্রাহ্মণ-ভদ্রলোক কয়েক ঘর এক প্রকার ভাল অবস্থায়ই আছেন। মোসলমানও আছে। কাছাড় জেলাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। সম্প্রতি আসামের অনুকরণে এখানে 'মৌজাদারী' প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সমগ্র পরগণার খাজনা সংগ্রহ করিবার ভার একজন মৌজাদারের উপর অর্পিত। তিনি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব গভর্মেণ্টকে দেন। সমৃদ্ধ হিন্দু বসতি থাকিলে যাহা হয়, পূর্ব্বে বিক্রমপুরে তাহাই হইয়াছিল—অনেক ইষ্টকস্তূপের সামান্য-চিহ্ন আজিও দেখা যায়। বিহারা রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছেই একটি প্রাচীন মন্দির দেখা যায়। এইখানেই নাকি অপর এক মজুমদারের বাড়ী ছিল।

সুরদর্প রাজার জননী চন্দ্রপ্রভার নামে একটি দীর্ঘিকা আজিও সেই স্থলে রাজপরিবারের সাময়িক অবস্থান সূচনা করিতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রহ্মদেশীয়েরা কাছাড় আক্রমণ করিয়াছিল—তখন বহুলোক স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তদবধি এই অঞ্চলের শ্রী আর ফিরিয়া আসিল না। আজ রেলওয়ে লাইন আসিয়াছে, চাবাগান হইয়াছে, নূতন কবলা সেট্‌ল্‌মেণ্টও লোকে নিতেছে—কিন্তু তথাপি যাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবেনা।

ফলতঃ কাছাড়ের 'বিক্রমপুর' শোচনীয় অবস্থায়ই নিপতিত হইয়াছে।

শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ।

কবি-জীবনী।

কবির জীবন, কেবলমাত্র তার জন্মের বিবরণ নয়। কবে কোন্ সময়ে কি নক্ষত্রে, সে জন্মগ্রহণ করেছিল, সে সংবাদ, ঘরের ভিতর দরকার হলেও, বাইরে সেটার প্রয়োজন নেই। মানুষের মোটামুটী পরিচয় জানতে গেলে, তার উপরের অংশের, শুধু চেহারাটার, একটা ছাপ পাওয়া যায়। কিন্তু এতে কবির যে আসল ছবি, সেটা ফুটে উঠ্‌তে পারে না।

ইংরাজ কবি গোল্ডস্মিথের চরিত্র আদর্শ ছিল, কি হীন ছিল, কাব্য বিচারের দিক দিয়ে, তার অনুসন্ধানের কোন মূল্য নেই।

কবির যে মন, সেইটাই তার পরিচয় পত্র। সেই খানেই তাঁর সুরের কেন্দ্র; এই উৎস থেকেই, তাঁর সুরের ধারা চারদিকে উৎসারিত হতে থাকে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তাঁর দেশের আবহাওয়ার বাইরে বাস করতেন। তাঁর স্বভাবের, বাইরের দিক থেকে যদি কেউ তাঁর পরিচয় সংগ্রহ করতে যান, তবে তাঁকে হতাশ হতে হবে। মাইকেলের প্রকৃত রূপ, তাঁর কাব্যের মধ্যে, ধরা পড়েছে; সেইটাই তাঁর সত্য পরিচয়।

কবি প্রকৃতি, কোন একটা বিশেষ উদ্দেশের মধ্যে, কোন ধরা, বাঁধা, নিয়মের ভেতর বদ্ধ নয়। বিশ্বে তার অবাধ গতি। জলের স্রোত, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট রেখাকে মেনে চলতে পারে না; সে চার পাশে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং কবি, বিশ্ব বিধান মেনে চলতে বাধ্য, একথা বলা যেতে পারে না। সে, দেশ, কালকে, অতিক্রম করে চলবেই।

সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ, গেটে, সিলার, এঁরা কেউ তাঁদের দেশের সামগ্রী নন; তাঁরা বিশ্বের।

কবির জীবনের সঙ্গে, তাঁর কাব্যের কোন মিল থাকতে পারে না, কেন না জীবন আর কাব্য দুটা বিভিন্ন সুরে গাঁথা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—'কবির জীবন মানুষের কি কাজে লাগিবে? তাহাতে স্থায়ী পদার্থ কি আছে? কবির নামের সঙ্গে তাহাকে উচ্চে টাঙাইয়া রাখিলে, ক্ষুদ্রকে মহতের সিংহাসনে বসাইয়া লজ্জিত করা হয়। চরিত মহাপুরুষের, এবং কাব্য মহাকবির।' সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নয়। কেবল সাহিত্য কেন, কোন কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নয়। প্রকৃতিতে, প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্য এবং ললিতকলায়, অপ্রত্যক্ষ, আমাদের কাছে প্রতীয়মান। অতএব এস্থলে একটি অপরটীর আরশি হয়ে কোন কাজ করতে পারে না। এমন অবস্থায়, কবির কাব্য, আর তাঁর জীবন, একই পথে চলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতিতে', জীবনের কথা অল্প, কল্পনার আলো বড় বেশী। ফুল পাতা, প্রদীপের মালা এবং সোনারূপার থালি দিয়ে যদি ভোগের জায়গা সাজাতে পারা যায়, সেত

ভালই, কিন্তু নিমন্ত্রিত যদি যজ্ঞকর্ত্তার কাছ থেকে, সমাদর না পায়,—হৃদ্যতা না পায়, তবে সে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য তাঁর কাছে রোচে না, কারণ এই হৃদ্যতাই অন্তরের ঐশ্বর্য্য, অন্তরের প্রাচুর্য্য। হৃদ্যতার মিষ্ট হাসি, মিষ্ট কথা মিষ্ট ব্যবহার এমন সুন্দর যে, তা কলার পাতাকেও সোনার থালার চেয়ে বেশী মূল্য দেয়। কবির কাব্য, এই হৃদ্যতা; সেখান থেকে যে সত্য লাভ করা যায়, তা জীবনের, ফুল, লতা, পাতার চেয়ে অনেক বড়।

"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কি বাদ দেয় কত কি রাখে। কত বড়কে ছোট করে, কত ছোটকে বড় করে তোলে। সে আগের জিনিষকে পাছে ও পাছের জিনিষকে আগে সাজাইতে কিছু মাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুতঃ তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।" রবীন্দ্রনাথের, এই কথা তাঁর "জীবনস্মৃতির" সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এখন যদি কেউ তার থেকে জীবন কথা জানতে যান, তবে তাঁকে হতাশ হতে হবে।

মাইকেলের জীবন, কোন অংশেই বৃহৎ বা বিচিত্র ফলশালী নয়। তাঁর জীবনী, তাঁর কাব্যের সঙ্গে সমান ওজন রাখতে পারে না। মাইকেলের কাব্যে, যে অংশে সঙ্কীর্ণতা আছে, বিশ্বব্যাপকতার অভাব আছে, আধুনিক বিলাতী সভ্যতার দোকান কারখানার সন্ত গন্ধ কিছু অতিমাত্রায় আছে, জীবনের মধ্যে সেই অংশের প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়, কিন্তু যে ভাবে তিনি বিরাট, যে ভাবে তিনি মেঘনাদকে সৃষ্টি করেছেন, এবং যে ভাবে তিনি মানুষের সহিত মানুষকে, সৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টিকর্ত্তাকে একটা উদার সঙ্গীতরাজ্যে সমগ্রকরে দেখিয়েছেন, তাঁর সেই বৃহৎ ভাবটী তাঁর জীবনের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করেনি।*

* (ব্রাহ্মিকা সভায় পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ)

শ্রীসুজাতা ঘোষ।

পরশমণি।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি :—বিজয়কান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, এম্, এ উপাধিধারী—রূপবান ও গুণবান যুবক ; তাহার সহিত শ্যামনগরের জমিদার রাধাকান্ত বাবুর রূপসী ও শিক্ষিতা কন্যা কমলার বিবাহ হয়—রাধাকান্ত বাবু কমলাকে দরিদ্র স্বামীগৃহে দিতে অনিচ্ছুক—বিজয়ও তাহার পত্নীকে গৃহে আনিবার জন্য শ্বশুরকে পত্র লিখিয়া ব্যর্থকাম হয় ; বিজয়ের শ্বশুর কমলার অসুখের সংবাদ জানাইয়া তাহাকে তথায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন—এইরূপে উভয় পরিবারের মধ্যে অশান্তির কারণ ঘটে ; বিজয়ের পিতা শিরোমণি মহাশয় পুত্রবধূকে কোনরূপেই নিজ গৃহে আনিতে সক্ষম না হওয়ায় মৃত্যুকালে পুত্রকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া যান যে যতদিন পর্য্যন্ত না কমলা স্বেচ্ছায় পতিগৃহে আসিয়া বাস না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার সহিত বিজয় কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে না। বিজয়ও পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া শ্বশুর বাড়ীর সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করে, যথাসময়ে সে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতির জন্য স্থান নির্ব্বাচনের নিমিত্ত নানাস্থানে বেড়াইতে বেড়াইতে অবশেষে ওয়ালটেয়ারে উপনীত হয় ; সেখানে একদিন অপরাহ্নে সমুদ্রের তীরে বেড়াইতে যাইয়া দেখিতে পাইল একজন স্নানার্থিনী রমণী সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে, বিজয় ঐ রমণীকে উদ্ধার করিবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে—সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন ধীবর পরে তাহাদের উভয়ের দেহ খুঁজিয়া পায়, সেবা-শুশ্রূষাগুণে বিজয়ও ঐ রমণী উভয়েই রক্ষা পায়।]

(১১)

লীলা কলিকাতা হইতে ওয়ালটেয়ার চলিয়া আসিলে, অমলের কাছে কলিকাতা সহরের সকল সৌন্দর্য্য যেন নিমেষমধ্যে মুছিয়া গেল! গাড়ীর ঘর্ ঘর্ শব্দ, দিনরাত্র লোকজনের কোলাহল, এমন জায়গায় কি মানুষ থাকে? বন্ধুজনের প্রীতিসম্ভাষণও তাহার আর তেমন ভাল লাগিত না ; অরুণার সঙ্গে মিশিবার জন্য সে বড় একটা উৎসুক ছিল না, আর মিশিবার তেমন সুযোগও হইত না, অরুণা যে ব্রাহ্মভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকিত তিনি মেয়েদের বাহিরের লোকজনের সঙ্গে মেলা মেশাটা তত বেশী পছন্দ করিতেন না, নেহাৎ কার্ড পাঠাইয়া অনুমতি লইয়া সেই বৃদ্ধের উপস্থিতিতে সরল সহজভাবে কোন কথারই আলোচনা হইতে পারিত না। এজন্য অরুণা রুদ্ধ রোষে ফুলিয়া উঠিত, আর অমল অরুণার নিকট হইতে লীলার সংবাদ সংগ্রহের জন্য দুই এক

বার যাইয়াই নিজকে অপমানিত মনে করিয়া সেখানে যাওয়া একেবারে ক্ষান্ত করিয়া দিল; কাজেই অরুণার কোন উদ্দেশ্যই ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। অমল—লীলার নিকট হইতে কোন দিন কোন বাক্যে কিংবা ব্যবহারে প্রণয়ের সামান্য আভাষ না পাইলেও লীলা কলিকাতা আছে, ঐ লালরঙের সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাড়ীটাতে তার জীবন বসন্তের প্রথম প্রণয়-পারিজাত পুষ্পটি ফুটিয়া রহিয়াছে, এ বিশ্বাসটা তাহার প্রাণে যে একটা আশার কুঞ্জ রচনা করিয়া দিত এখন আর তাহা নাই। সেখানে নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়াছে। সে বাড়ীর মেয়েদের সাড়ীগুলো ছাতের উপর হইতে রাস্তার ধারে দুপুর বেলা ঝুলিতে থাকে, কক্ষের জানালাগুলো হাওয়ায় দোলাদুলি করে—এ দৃশ্যটা প্রতিনিয়ত দেখিয়াই তার আনন্দ। কেমন যেন একটা আকর্ষণে তাহাকে ঐ বাড়ীর পথ দিয়া লইয়া যায়, সে জানে—যাহার দর্শন লালসায় তাহার চিত্ত ব্যাকুল—সে ওখানে নাই, তবু—তবু সে ঐ পথটার আকর্ষণ ছাড়িতে পারে না!

কয়েক মাস চলিয়া গেল,—আগের মত তাহার আর আমোদ প্রমোদ উল্লাস বিলাসে মন ভাল লাগে না, সে যেন দিন দিনই নূতন মানুষ হইতে চলিল। ইয়ার বন্ধুরাও একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিল, "কি জানি ভাই অমল কবে কৌপীন পরিয়া লোটা কম্বল লইয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়ে, কেহবা দুটা ছড়া কাটিয়া শ্লোক আওরাইয়া তাহার এই কাপুরুষত্বের জন্য বিদ্রূপের তীব্রবাণ ছুড়িতে লাগিল। অমল কিন্তু কিছুতেই কোন কথা কাহাকেও প্রকাশ করিয়া কহিল না। বাহিরের যে পিশাচমূর্ত্তি তাহাকে ভোগ-লালসার দিকে পরিচালিত করিয়া কেবলি পোড়াইয়া মারিয়াছে, সহসা তাহাতে কিসের এ শীতল চন্দন প্রলেপ! তাহার তপ্ত জীবনেএ মলয়ের মধুর বাতাস কোথা হইতে আসিয়া চিত্ত পুলকিত করিয়া দিল! ভক্ত যেমন তাহার নিগূঢ় জপমন্ত্রটী কোন রকমেই বাহিরে প্রকাশ করিতে চাহে না, তেমনি অমল হৃদয়-মন্দিরে যে প্রেমের প্রদীপ জ্বালাইয়াছে তাহার সেই আলোক-রশ্মি বাহিরের বাতাসে পাছে নিভিয়া যায় সে ভয়ে অতি সন্তর্পণে প্রতিনিয়ত ঢাকিয়া রাখিয়াছে, বিলাসের তরল চঞ্চল-চিত্ত বন্ধুগণকে কোন কথা বলিয়া সে মধুর পুণ্য চিত্র পরিম্লান করিতে ত প্রাণ তাহার চাহে না!

কেন সে তাহাকে পাইবে না? ধ্যানে দেবতার আসন টলে,—আর প্রেমের মোহন-মন্ত্রে সে কি তাহার অতীতকে মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া পবিত্র ঋত্বিক বেশে পুণ্যমন্ত্রের উদ্বোধন-গীতে তাহার আরাধ্যা দেবীর চিত্তরাজ্য জয় করিতে পারিবে না? মন কহিল—নিশ্চয়ই পারিবে! আর যদি সে বাধা পায়ই—তবুত তাহার দেখিবার সাধ মিটিবে! না না—সে আর পারে না। জেলের কয়েদীর মত তাহার প্রাণ কলিকাতার পাষাণ প্রাচীর ঘেরা গণ্ডী ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এ ইচ্ছা বুকে লইয়া সে একদিন ওয়ালটেয়ার চলিয়া গেল।

(১২)

কয়েক দিনের মধ্যেই বিজয় ও লীলা তাহাদের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। পরের জন্য যে নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সমুদ্রের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে সে যে সাধারণ মানুষ নয়—এটা খুবই ঠিক। ওয়ালটেয়ারের প্রবাসী বাঙ্গালীর দল বিজয়কে নানাভাবে তাহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। কেহ বা খবরের কাগজে তাহার ছবি পাঠাইয়া "বীর বাঙ্গালী যুবক" নামে প্রবন্ধ ছাপাইলেন, কেহ গান বাঁধিলেন, কেহ কবিতা রচনা করিলেন। কয়েক দিন এই একটা অভিনব ব্যাপারে সেখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীর দল মাতিয়া উঠিয়াছিলেন! বিজয়ের কাছে এ সকলটা যেন কেমন কেমন লাগিত! বাহিরের সমাজের সঙ্গে যে কোন দিন মিশে নাই, মেসের বাসার সামান্য অভিজ্ঞতাই যাহার জীবনের প্রথম সম্বল, শিক্ষিত, উন্নত সমাজের সহিত যাহার মেলামেশার এই সবে প্রথম সুরু, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ধন্যবাদের পুষ্পমালা ও বাহিরের এতটা বাড়াবাড়ি চলিলে সে যে কেমন হইয়া পড়ে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বিজয় ইহাতে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে দিন বরদাবাবু যখন বিজয়ের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে কহিলেন—"আপনি আপনার জীবনকে যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলেছেন,—আশীর্ব্বাদ করি সে ভাব চিরদিনের জন্য অক্ষুণ্ণ থেকে আপনার জীবনকে চির মধুময় করে তুলুক। আপনি আমার মেয়েকে ফিরিয়ে এনে আমার প্রাণে যে শান্তি দিয়েছেন, তেমনি আপনার জীবন যেন চির শান্তিময় ও সুখময় হয়।"

বৃদ্ধের এই কথাগুলির মধ্যে স্নেহের এমনি একটা করুণসুর বাজিতেছিল—সে কথাগুলির মধ্যে এমনি হৃদয়ের একটা অনাবিল স্নেহের ধারা প্রবাহিত হইতেছিল যে বিজয় কোন মতেই আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না, সে বরদাবাবুর চরণ ধূলি মাথায় লইয়া গদগদকণ্ঠে কহিল, "জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনার আশীর্ব্বাদ যেন আমার জীবনে সফল হয়।"

প্রথম স্রোতের বেগটা কাটিয়া গেলে যখন বিশেষরূপে তাহার পরিচয় পাইবার জন্য সকলের মধ্যেই একটা উদ্বেগ চঞ্চলতা দেখা গেল—সকলেই বাহিরের দিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন তাহার অন্তরের দ্বারে আঘাত করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাহার সকল রকমের পরিচয়টা পাইবার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন সে চঞ্চল হইয়া উঠিল,—পরিচয়, কাহাকে সে তাহার পরিচয় দিতে যাইবে! সেত সকলেরই পরিচয় পাইয়াছে, কিন্তু সে যদি নিজের পরিচয় দিতে যাইয়া ধরা পড়ে, যদি ইহাদের মধ্যে এমন কেহ থাকে যাহার সহিত রাধাকান্ত বাবুর পরিচয় আছে, তাহা হইলে যে বড় অন্যায় হইবে!

একদিন নরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে চায়ের অড্ডা বসিয়াছিল। সহরের প্রবাসী বাঙ্গালীরদল সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন, লীলা ও নীরজা সেদিন সেই অল্প সংখ্যক অতিথির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। অন্দরে বিমলা পরমানন্দে আহার্য্য জোগাইতেছিল, এখন সে নানা কাজের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া প্রাণে অনেক শান্তি অনুভব করিতেছে। বিজয় একখানা ছোট টেবিলের পাশে বসিয়া অপলকে সমুদ্রের দিকে তাকাইয়াছিল! এই শান্ত সুন্দর সুনীল সিন্ধুর বুকে মরণ বুঝি বাস্তবিকই বড় সুখের! বিজয়ের মেলা-মেশার মধ্যে যে একটা বেশ গাম্ভীর্য্য ও কেমন একটা দূরত্বের ভাব ছিল, সেটা কিন্তু কাহারও লক্ষ্য ছাড়া হয় নাই; আর যুবকটীর খুঁটিনাটি পরিচয় চাহিলেই যে তাহার মুখ কেমন একটা বিবর্ণ শ্রীধারণ করে তাহাও কিন্তু অনেকের চক্ষুই এড়ায় নাই। তথাপি সে তাহার পরিচয়টা এবং কর্ত্তব্যের কথাটা বলিতে কোন গোপনতার ছদ্মবেশ অবলম্বন করে নাই—সে শুধু সেখানেই ক্ষান্ত দিয়াছিল, যেখান হইতে তাহার জীবনের মাঝখানে একটা প্রবল বন্যা বহিয়া গিয়াছে। বিজয়ের মন কেবলি এখান হইতে ছুটিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু চারিদিক হইতে স্ত্রী ও পুরুষের দল সকলে মিলিয়া যখন কৃতজ্ঞতাভরে তাহার

ঐরূপ অন্যায় কল্পনাটার উপর কঠোর বজ্র তুলিয়া দাঁড়ায়, তখন সেও চুপ করিয়া হাত পা ছাড়িয়া দেয়, যে মনের জোরে সে আপনাকে সবলে কমলার নিকট হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে, যেমনের বলে সে মুমূর্ষু পিতার চরণ তলে বসিয়া বিবাহিতা পত্নীর সঙ্গে সম্বন্ধ দূরে রাখিবার জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে মনের জোরে সে এখানে চলিয়া আসিয়াছিল, ঠিক এখানে তেমন মনের জোরে উন্নত কণ্ঠে সে "না" বলিতে পারে নাই; কিন্তু বেশী দিনত আর এভাবে চলে না। আজ তাই একে একে সকলে চলিয়া গেলে বিজয় বরদা বাবুকে কহিল, "দেখুন, কাল আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই, অনেক দিন হয়ে গেল! কি বলেন?" লীলা বিজয়ের মুখের দিকে নয়ন দুটী ন্যস্ত করিয়া পিতার উত্তরের অপেক্ষায় ফিরিয়া চাহিল! বরদাবাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া স্নেহ গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "তা আপনাকে আর কি করে ধরে রাখি বলুন! আপনার ঋণ আমি ও লীলা জীবনে কখনও ভুল্‌তে পার্‌বোনা, কি বলিস্ মা?" লীলা মিনতির স্বরে কহিল,—"বিজয়বাবু, আপনাকে বাধা দিবার শক্তি আমাদের নেই"; বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ যেন চাপিয়া আসিতেছিল,—সেই সমুদ্র তরঙ্গে ভাসিয়া যাওয়ার ভীষণ দৃশ্যটি সেই বিজয়কে আশ্রয় গ্রহণ—সবই যেন নিমেষ মধ্যে তাহার চ'খের সাম্‌নে ছবিরমত ফুটিয়া উঠিতেছিল,—"আপনি যখন যে ভাবে যেখানে থাক্‌বেন, আমাদের চিঠি লিখতে ভুলবেন না যেন!"

বিজয় ধীরে মৃদুমধুস্বরে কহিল, "নিশ্চয়ই! আপনাদের অতুলা স্নেহ আমি জীবনে কখনো ভুলতে পার্‌বোনা, যে সেবা ও যত্ন করে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন সে দেবতার কাজ! কাল ভোরের গাড়ীতেই আমি ওয়ালটেয়ার ছাড়্‌ব।" বরদাবাবু কহিলেন—"এখন কোন্‌দিকে যাওয়া" ঠিক্ কল্লেন? "এখনও কিছু ঠিক করে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। ষ্টেশনে গিয়ে যা'হয় একটা ঠিক কর্‌বো।" "এ ঠিক নয় বিজয় বাবু; জীবনটাকে এমন ভাবে শাসন-শৃঙ্খলার হাত এড়িয়ে ছেড়ে দিবেন না। উশৃঙ্খলতাই আমাদের জাতীয় জীবনের অধঃপতনের কারণ। আর ভোরের গাড়ীতে যাওয়া হচ্চেনা, সে কথাও বলে রাখছি, বিমলা কি আপনাকে এতদিন পর না খাইয়ে বিদায় দিবে?" "আমরাই কি তা দোবো!"—একথা বলিয়া লীলা একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মানুষ যত বড় চতুরই হউক না, যত বড় কপটই হউক না কেন, মনের

অভিব্যক্তিগুলির ক্রিয়া কোন রকমেই সে গোপন রাখিতে পারিবে না, ভাষা তখন মৌনভাবে আকৃতির ভিতরে তার বিকাশ সাধন করিবে, স্বর তার স্বাভাবিকতা কোন রকমেই রক্ষা করিতে পারিবেনা! ইহা অতি সহজ সরল কথা! লীলার দৃষ্টি, লীলার কথা—কোনটাই বিজয়ের চক্ষু বা কর্ণ এড়ায় নাই, সে সব কথা যে তাহার কানে বসন্তের কোকিল ঝঙ্কারের মত বড় মধুময় বোধ হইতেছিল। তাহার এ দুর্ব্বলতা কেন? সে যে এই দুর্ব্বলতাটুকু হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে চায়! কেন তাহার মন বিক্ষিপ্ত হইবে? সে যে হইতেই পারে না! প্রথম যৌবনে প্রাণ যখন ভালবাসার জন্য লালায়িত হয়, তখন যদি তাহার বিকাশ না ঘটে—তবে—তবে সেই মুকুলিত পুষ্পটিকে যতই চাপিয়া রাখনা কেন, কোন শুভ মুহূর্ত্তে সে নিশ্চয়ই সুন্দরীর অলক্ত-চরণ-স্পর্শে প্রস্ফুটিত অশোক স্তবকের ন্যায় কোন না কোন তরুণীর করুণ কোমল চাহনীতে ফুটিয়া উঠিবেই! সেখানে বিদ্রোহী হইলে চলিবে না, আর বিদ্রোহী হইয়া পারিবেও না, বিবেক ভ্রূকুটি কটাক্ষ করিলেও তাহাতে ফল ফলিবে না। বিদ্রোহী চিত্তই বিজয়ী হইবে। নানা কথা কাটাকাটির পর শেষটায় ঠিক হইয়া গেল—পরদিন বিকেল বেলার গাড়ীতে বিজয় চলিয়া যাইবে। (ক্রমশঃ)

প্রসঙ্গ-কথা।

গভর্মেণ্টের ঋণ।

ভারত গভর্মেণ্ট যুদ্ধের সাহায্যার্থ ১৫০ কোটি টাকা দান করিবেন। গভর্মেণ্টের হাতে এখন এত বেশী পরিমাণ টাকা মজুত নাই বলিয়া এ টাকা ঋণ করিয়া দিবেন। কিরূপ ভাবে ঋণ গৃহীত হইবে এখানে তাহার বিবরণী প্রদান করিলাম।

ভারত গভর্মেণ্ট পাঁচ টাকা সুদে ঋণ গ্রহণ করিবেন। এই ঋণ ১৯২৯ সালের পূর্ব্বে শোধ করা হইবে না; কিন্তু ১৯৪৭ সালে ১০০ টাকার কাগজের মূল্য ১০০ টাকা দিয়া শোধ করা হইবে। এখন ৯৫ টাকা দিলেই ১০০ টাকার

কাগজ পাওয়া যাইবে। ৫৷৷০ টাকা সুদেও টাকা ঋণ করা হইবে। ইহা ১৯২০ সালে বা ১৯২২ সালে শোধ করা হইবে।

এতদ্ব্যতীত পোষ্টাফিসে ৭৸০ দিলে ১০ টাকা, ১৫৷৷০ দিলে ২০ টাকা. ৩৮৸০ আনা দিলে ৫০ টাকা এবং ৭৭৷৷০ দিলে ১০০ টাকার সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে। এই টাকা পাঁচ বৎসর পরে পাওয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ ৫ বৎসরের পূর্ব্বেই টাকা ফিরাইয়া লইতে চান, তবে এক বৎসর পরে ৮৴ দুই বৎসর পরে ৮।০ তিন বৎসর পরে ৮৸৵, চারি বৎসর পরে ৯৵ এবং পাঁচ বৎসর পরে ১০ টাকা পাইবেন। আশা করি দেশের জনসাধারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী গভর্মেণ্টকে ঋণ দানে সাহায্য করিবেন।

"পয়সা ফণ্ড।"

সেদিন "বাঙ্গালী" পত্রে মহারাষ্ট্রের "পয়সা ফণ্ডের" বিষয় পড়িলাম। এই পয়সা ফণ্ডের ইতিহাস এইরূপ "১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দেশীয় শিল্পের উন্নতি কল্পে শ্রীযুত আনতাজী দামোদর কেল 'পয়সা ফণ্ডের' প্রতিষ্ঠা করেন। দুইচারি আনা লইয়া প্রথমে এই 'ফণ্ডের' কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে—১৭ বৎসরে এই ফণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৮ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। অতঃপর এই "ফণ্ড" হইতে ৩০ হাজার টাকা লইয়া পুণাজেলার তেলিগাঁওে নামক স্থানে একটী কাচের কারখানা স্থাপিত হয়। প্রথমে জাপান হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া কারখানার কার্য্য আরম্ভ হয়; তাহাদের অধীনতায় কয়েকজন দেশীয় যুবক শিক্ষানবীশ থাকে। এখন ইহারা পাকা হইয়া কারখানার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারখানার কাচের জিনিষপত্র বোম্বাই গভর্মেণ্ট এবং বরোদা ও নিজাম সরকার ব্যবহার করিতেছেন। এখন 'পয়সা ফণ্ডের' কর্ত্তৃপক্ষ একটী 'পটারী' খুলিবার সঙ্কল্প করিতেছেন।" এ প্রসঙ্গে বিলাতের 'পেনি বেঙ্কের' কথা মনে পড়ে; উহাও প্রথমে একজন দীনবান্ধব মহাজন মিঃ জে, এম, স্কটের চেষ্টা যত্নে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া বহু দীন দুঃখীর অভাব ক্লেশ মোচন ও দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সহায়তা করিয়াছিল ও করিতেছে। আমাদের দেশেও "স্বদেশীর হুজুগের সময় এইরূপভাবে নানা সম্প্রদায় অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'ন্যাশন্যাল ফণ্ডের' টাকাও কম

ছিল না। তাঁহার কর্তৃপক্ষীয়েরা কি দামোদর কেল মহাশয়ের ন্যায় কোনও শিল্পদ্রব্যের কারখানা প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পারিতেন না? কিন্তু হায়! কিছুই হইল না, হইবে যে সে ভরসাও নাই। এই পয়সার ফণ্ডের অনুকরণে অর্থ সংগৃহীত হইলে বহু গ্রামেরই উন্নতি সংসাধিক হইতে পারে। উত্তর বিক্রমপুরস্থ কামারখাড়া গ্রামের শুভকরী সভা এই সামান্য একটা পয়সা দুইটা পয়সা সংগ্রহ করিয়াই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে নিজ গ্রামের প্রভূত উন্নতি সংসাধন করিয়াছেন। প্রতিবৎসর তাঁহারা গ্রামের হিতার্থে চারি পাঁচশত টাকা ব্যয় করেন। যদি সাধুতা, সদেচ্ছা এবং প্রকৃত প্রাণ থাকে তাহা হইলে জগতে কোন কার্য্যই অসম্পন্ন থাকে না।

বিক্রমপুর সম্মিলনের কার্য্য।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার কর্তৃপক্ষগণ এবার দেশের জল কষ্ট নিবারণের জন্য বিশেষরূপে ব্রতী হইয়াছেন। সেখরনগরের নিকটবর্ত্তী গোপালপুর একটী ক্ষুদ্র পল্লী, এই পল্লীতে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী; গ্রামে একটী পুষ্করিণীর জল ও পানের উপযোগী নহে, মুন্সীগঞ্জস্থ বিক্রমপুর সম্মিলনীশাখার উদ্যোগে দানবীর মহাত্মা রাজা শ্রীনাথ রায়ের অর্থব্যয়ে এবার তথায় একটী পুষ্করিণীর সংস্কার সংসাধিত হইয়াছে। শুনিতেছি, আরও ৩।৪টা পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা হইতেছে। কাজ একদিনে হয় না ধীরে ধীরেই হয়, গত বৎসর সম্মিলনী ওলাউঠার উপদ্রবের সময় গ্রামে গ্রামে চিকিৎসক পাঠাইয়া চিকিৎসাও পথ্যের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবার পুষ্করিণী কাটার কার্য্য আরম্ভ করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আমরা বিগত বর্ষের পৌষ-সংখ্যায় সম্মিলনীর তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলাম, এখন তাহাদের কার্য্যকারিতায় পরমানন্দ অনুভব করিতেছি। আশা করি আগামী বর্ষ হইতে আমরা মুন্সীগঞ্জশাখার ও দক্ষিণপার শাখার কার্য্যাদির সাফল্য দেখিতে পাইয়া ধন্য হইব।

আমাদের চরিত্রের প্রধান দোষ আমরা একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারি না; মতান্তরেই মনান্তর ঘটে, প্রত্যেকেই প্রভুত্ব-প্রয়াসী, এজন্য অনেক সময়ে সম্মিলনের কর্তৃপক্ষগণকে ও নেতৃবৃন্দের নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা সহিত হইবে,

সেজন্য কেহই সঙ্কল্প পথ হইতে বিচলিত হইবেন না। যদি সঙ্কল্প দৃঢ় থাকে তাহা হইলে সুফল অনিবার্য্য। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি সম্মিলনীর শুভ সঙ্কল্পগুলি সিদ্ধির বরমাল্যে ভূষিত হউক।

লোক-রঞ্জন- লোকগঞ্জন না করি দৃক্‌পাত,
যাহা শুভ-যাহা ধ্রুব তাহাতেই কর দেহ পাত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষে ছাত্রগণের কর্ত্তব্য।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে। সম্মুখে সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ এই সুবিস্তৃত অবসার সময়ে যুবকগণ আপন আপন গ্রামের শিক্ষা বিস্তারে অগ্রসর হইতে পারেন।'

'সাধারণ শিক্ষা স্কুল, কলেজ, টুল, বেঞ্চ ও ম্যাপ ইত্যাদির সাহায্য ব্যতীত-গল্প, আলাপ, ভ্রমণ, পুস্তক বা পত্রিকা পাঠ করিয়াও শুনাইয়া প্রচার করা যাইতে পারে।

"প্রথমতঃ অন্তঃপুর বা স্ত্রীশিক্ষার কথা ধরা যাউক। আমাদের দেশে সামাজিক দুরবস্থার অর্দ্ধেকই বোধ হয় স্ত্রী-শিক্ষা অভাবজনিত। গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের কথা যদিও সুন্দর শুনায় তথাপি উহা কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে অনেক অন্তরায় রহিয়াছে। এদেশের স্ত্রীলোকের শিখিবার, শুনিবার ও জানিবার অনেক আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পারিবারিক শিক্ষার কোন প্রকার বন্দোবস্ত না থাকায় তাহারা উহা লাভ করিতে পারে না। ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে দেশের ও সমাজের এক মহান্ উপকার সাধন করিতে পারেন। তাঁহারা বাটিতে অবসর সময়ে আত্মীয়া স্ত্রীলোকগণের নিকট রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদি পাঠ করিয়া এই সকল অমূল্য গ্রন্থের তত্ত্বরাশি তাহাদিগকে অবগত করাইতে পারেন।

"সুশীলার উপাখ্যান" নামক একখানি অতি সরল স্ত্রী পাঠ্য পুস্তক আছে। এই পুস্তক একটি সপ্তম শ্রেণীর বালকও বাটীতে মাতা ভগিনীদিগকে নিঃসঙ্কোচে পড়িয়া শুনাইতে পারেন। এইরূপ একটু সামান্য পরিশ্রম করিলেই বিবিধ উপাদেয় গ্রন্থের বিষয়গুলি পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণকে শুনাইতে ও বুঝাইতে পারেন। ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে ইতিহাস ভূগোল, বিজ্ঞান ও পত্রিকা প্রভৃতি পাঠ

করিয়া যে যে বিষয় শিক্ষা করিয়াছে, উহা কথা প্রসঙ্গে বা গল্পছলে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের নিকট বর্ণনা করিলে তাঁহাদের অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইতে পারে।

বলা বাহুল্য এরূপ শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে কেবল দেশের নহে—ছাত্রগণের নিজেরও মহৎ উপকার হইতে পারে। কেননা শিক্ষালাভ করা ও শিক্ষাদান করা দুইটী পৃথক জিনিষ। শিক্ষাদান কার্য্যে নিজের অন্তর্নিহিত কতগুলি শক্তিবিশেষের বিকাশ করিতে হইবে। নতুবা লোকে তাহার কথায় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। প্রথমতঃ তোমাকে সংযমী, চরিত্রবান ও সত্যবাদী হইতে হইবে। একমাত্র চরিত্রবলে লোকসমাজে যেরূপ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে পারা যায় অর্থ বা বিদ্যাবলে তাহার এক সহস্রাংশও হয় কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয়তঃ কথা বলিবার ও মনোযোগ আকর্ষণ করিবার কৌশল শিক্ষা করা আবশ্যক। কাহারও নিকট কোন কথা বলিবার সময় উহা কিরূপে হৃদয়গ্রাহী হইবে তাহা শ্রোতার মানসিক অবস্থার বিষয় বিচারপূর্ব্বক নির্ণয় করিতে হইবে এবং দেশকাল পাত্র বিচারপূর্ব্বক নির্ণয় করিতে হইবে এবং দেশ কাল-পাত্র বিচারপূর্ব্বক আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। "সদসিবাক পটুতা" এই বিংশ শতাব্দীর ত্রস্ত ও কর্ম্মব্যস্ত জীবনেও কম প্রয়োজন হইতেছে না তবে এই বাক্‌পাটুতা বলিতে ইহা বুঝা উচিত নহে যে কেবল একদিক হইতে ক্রমাগত "আবকা বকিয়া" যাইতে হইবে। আলোচ্য বা কথিত বিষয়টী সম্বন্ধে নিজের সম্যক জ্ঞান থাকা চাই এবং পূর্ব্বে ভাবিয়া উহাকে বেশ করিয়া গুটাইয়া প্রকাশ করা চাই। প্রয়োজন হইলে সরল ও সহজবোধ্য উদাহরণ ও যুক্তিপ্রদর্শনও করিতে হইবে।

আশা করি বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই এই মহতী চেষ্টায় ব্রতী হইবে। প্রথমতঃ যদিও তাহাদের অনেক বাধাবিঘ্ন ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে হইবে তথাপি পথ যে ক্রমশঃ সুগম ও নির্ব্বিঘ্ন হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইসকল কার্য্যে ধৈর্য্য ও মনের বল একান্ত আবশ্যক। (সঞ্জীবনী)

...　..

ঢাকা বিভাগের পুষ্করিণী খননের কথা।

বিক্রমপুর সেখরনগর নিবাসী মাননীয় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বি, এল মহোদয় বিগত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে ঢাকাবিভাগে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের অর্থব্যয়ে

মোট কয়টা পুষ্করিণীর খনন কার্য্য ও সংস্কার সাধিত হইয়াছে তাহা জানিতে চাহিয়া প্রশ্ন করেন,—তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে মাণ্যবর মিঃ ডোনাল্ড (Mr. Donald) নিম্নলিখিত রূপ বিবরণী প্রদান করিয়াছেন।

ঢাকা জেলা।

সদর মহকুমা	৪
মুন্সীগঞ্জ (বিক্রমপুর)	৫
মাণিকগঞ্জ	২
মোট	১১

ময়মনসিংহ জেলা।

জামালপুর (মহকুমা)		...	...	০
সদর	ঐ	...	...	১
নেত্রকোণা	"	...	...	১১
টাঙ্গাইল	"	...	...	২
কিশোরগঞ্জ	"	...	...	৩
			মোট	১৭

ফরিদপুর জেলা।

সদর মহকুমা		...	...	১৪
গোয়ালন্দ	"	...	...	২১
মাদারিপুর	"	...	...	৭
গোপালগঞ্জ	"	...	...	৩৪
			মোট	৫৬

বাখরগঞ্জ জেলা।

সদর মহকুমা	"	...	...	২
পিরোজপুর	"	...	...	৫
পটুয়াখালি	"	...	...	৪
			মোট	১১

এই চারি জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ পঁচানব্বুইটী পুষ্করিণীর সংস্কার ও খনন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। অন্য জেলার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই; কিন্তু মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ১৯১৫—১৬ সনে মাত্র পাঁচটা পুষ্করিণীর সংস্কারও খনন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা কি সমুদ্রে গোষ্পদ তুল্য নহে? বিক্রমপুরের প্রধান অভাব জল, সে জলের জন্য যদি ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড এইরূপ ধীর মন্থর গতিতে কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হন, তাহা হইলে জানি না কত যুগ যুগান্তরে বিক্রমপুরের জলকষ্ট নিবারিত হইবে! এ বৎসর এখন হইতেই ওলাউঠার উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, এ সময়ে অপরিষ্কৃত তড়াগ, পুষ্করিণী ডোবার কর্দ্দমাক্ত মলিন পঙ্কিল জলসেবনে পীড়া না হইবে কেন? ঢাকা ডিষ্ট্রিকবোর্ড বিক্রমপুরের জন্য বিগত দশবৎসরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন কার্য্যই করেন নাই। শ্রীনগরের ভাঙ্গা রাস্তাও মেরামত হইল না! খালের প্রশ্ন ত ধামা চাপা পড়িয়াই গেল? মেদিনীপুরের Canal Companyর পরিচালকগণকে আহবান করিয়া তাহাদের পরামর্শমত কি এ কাজটার কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না? ঐরূপ কোন কোম্পানীর উপর ভার দিলে বোধ হয় দেশের একটা মহৎকার্য্য সুসম্পাদিত হয়। আজ দুই তিন বৎসর যাবত বরং যুদ্ধ—বিগ্রহ, তাহার পূর্ব্বে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড কি করিলেন? বিক্রমপুরবাসী অনেকেইত ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের মেম্বার আছেন, তাহারাই বা বিক্রমপুরের জলকষ্ট নিবারণের জন্য এবং খালের সম্বন্ধে কি করিতেছেন? লোকেল বোর্ডের দ্বারাই বা কোন কার্য্য সাধিত হইলে? আমরা এ সকলের বিস্তারিত বিবরণ শীঘ্রই প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের দেশের লোকের এমনি দুর্ভাগ্য যে যাহারা দেশের নেতা তাহারা ভুলেও একবার দেশের কল্যাণের জন্য ফিরিয়া চাহেন না। যদি কৃতবিদ্য সম্প্রদায় এ সকল দিকে একটু মনোনিবেশ করেন, তা হইলে কি এত দুর আলস্য-জড়তা প্রভাবে আমাদের কাজ অসমাপ্ত রহিয়া যায়?

কলমা লক্ষ্মীকান্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়।

গত সরস্বতী-পূজার সময় উক্ত বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুক ও সভাসমিতি হইয়াছে। ১৬ই মাঘ মধ্যাহ্নে বিদ্যালয়ের বার্ষিক সভা ও পুরস্কার বিতরণ হয়। এতদঞ্চলের বহু বিশিষ্ট

ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিবিধ আবৃত্তি ও সঙ্গীতাদি হয়। অবসর প্রাপ্ত সবজজ রাউৎভোগ নিবাসী শ্রীযুক্ত জগন্মোহন সরকার এম, এ, বি, এল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাশগুপ্ত বি, এ, মহোদয় যে বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন তাহা হইতে জানা যায় যে স্কুলের স্বত্বাধিকারিগণ নূতন স্থানে নূতন-গৃহ-নির্ম্মাণের আয়োজন কল্পে আলোচ্য বর্ষে দুই হাজার নয়শত টাকা ব্যয় করিয়াছেন। পনর বৎসর যাবৎ স্কুল চলিতেছে—এই পনর বৎসরে স্বত্বাধিকারিগণ মোটের উপর উনিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। শিক্ষকদের মধ্যে বর্ত্তমানে চারিজন বি, এ, আছেন। স্কুলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম, এ, মহোদয় এ বৃদ্ধ বয়সেও স্কুলের জন্য যেরূপ শ্রমস্বীকার করেন তাহা অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। যেসব স্থানে ঐতিহাসিক বিশেষত্ব বা ভৌগোলিক বৈচিত্র্য বর্ত্তমান স্কুলের অনেক ছাত্র ও শিক্ষক একত্র হইয়া প্রতিবৎসর সেইরূপ কোনও স্থানে বেড়াইতে যান। আলোচ্য বর্ষে নানা কারণে তাহা ঘটিয়া ওঠে নাই। বিদ্যালয়ের কতকগুলি আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান আছে। সাহিত্যালোচনার উৎসাহ প্রদানার্থে "সাধনা" নামক একখানি হস্তলিখিত পাক্ষিক সাহিত্য-পত্র বাহির করা হয়। নৈতিক উন্নতি সাধনের সাহায্যকল্পে "ছাত্রসভা" নামে একটী সভা আছে। দরিদ্রদিগকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য "বান্ধবভাণ্ডার" নামে একটী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত আছে। বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করিবার স্পৃহা যাহাতে বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য একটী আলোচনা সভাও আছে। এতদ্ব্যতীত ক্রিকেটক্লাব ও ফুটবলক্লাব বর্ত্তমান। এই সব অনুষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত আলোচ্যবর্ষে ইহাদের কাজ ভালই চলিয়াছে।

বার্ষিক বিবরণী পাঠ শেষ হইলে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনেকগুলি পুরস্কার স্থানীয় ভদ্রলোক ও স্কুলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদের প্রদত্ত। ইহাতে স্কুলের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে সভাপতিমহাশয় একটী অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন—"বিক্রমপুরবাসী লোকেরা শিক্ষায় দিন দিন অধিকতর উন্নত না হইতে পারিলে, তাহারা সমগ্র বঙ্গীয় সমাজে তাহাদের প্রভাব অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবে না। বিশেষতঃ জল ও বায়ুর ন্যায় শিক্ষা ব্যতীত আমাদের জীবন

ধারণই একরূপ অসম্ভব। কাজেই বিক্রমপুরে বিদ্যালয়াদির সংখ্যাধিক্য আমাদের পক্ষে আশার কারণ। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা হইলে আরও ভাল হয়। চরিত্রগঠন শিক্ষা লাভের অন্যতম মুখ্যউদ্দেশ্য একথা ছাত্রদের মনে রাখা কর্ত্তব্য। এই স্কুলের motto দেখিলাম "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" আমি এই সঙ্গে যোগ করিতে বলি "তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" ছাত্রগণ যদি সংযমশীল হইতে অভ্যাস করেন তবে দেশের ঘোর অনিষ্টকারী এই বিপ্লববাদ দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে রাজভক্তি শিক্ষা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য।

নিব হোল্ডার বা কলমের হ্যাণ্ডেল।

যুদ্ধের দরুণে আমাদের দেশে এক্ষণে বিদেশের অনেক জিনিষই আসিতেছে না। যে সকল আসে না, সে সব অধিকাংশই আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয়, প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার পক্ষে সকলেরই আবশ্যক। 'স্বদেশীর' সময় উজীরপুরের (বরিশাল) প্রস্তুতি নিবের খুব প্রচলন ছিল, এখন সেরূপ নাই, কেন উহা পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে পাইনা, তাহার কারণ অবগত নহি। তারপর কলমের হ্যাণ্ডেল, ইহাও আমাদের দেশের অনেকেই প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেন কিন্তু এখন তাহাও পূর্ব্বের মত দেখিতেছি না, চট্টগ্রাম অঞ্চলের শ্রীযুক্ত নন্দকুমার চক্রবর্ত্তীর নির্ম্মিত কঞ্চির হ্যাণ্ডেল বাজারে বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল, বিক্রমপুরের ও নানাগ্রামে অনেকেই পেন হোল্ডার তৈরী করিতে জানেন, এক্ষণে তাহারা সে সকল বিষয়ে এত উদাসান কেন? যাহারা বেগার বসিয়া আছেন, কিংবা চাকরীর জন্য অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাহারা যদি এ সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে কালি, পেন হোল্ডার, নিব ইত্যাদি প্রস্তুত করেন তাহা হইলে বেশ দু'পয়সা পাইতে পারেন। সময় ও সুযোগ উপেক্ষা করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

বঙ্গে বঙ্গবাসীর কারবার।

'বিজ্ঞান' পত্রে বঙ্গে বঙ্গবাসীর কারবার সম্বন্ধে যে মন্তব্যটুকু প্রকাশিত হইয়াছে আমরা এখানে তাহা প্রকাশ করিলাম—"অনেক দিন হইতে বঙ্গে স্বদেশী

আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে কারখানা বা কারবার কয়টা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইলে হতাশ হইতে হয়। শাঁখা বা চুড়ীর কারখানা, বোতাম বা নিব হোল্ডারের কারখানা, এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানার কথা বলা হইতেছে না। যাহাতে দশজনের অর্থ খাটিতেছে, যে কারবার দেখিয়া দেশের লোকে বলিতে পারে ইহা "আমাদের" এমন কারখানা একটীও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। "পটারি ওয়ার্কশ" চলিতেছে কিনা তাহা জানাই দায়! তা ছাড়া তাহাতে দেশের যে খুব একটা উপকার হইয়াছে তাহা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? "বঙ্গলক্ষ্মী কটন্‌মিলস্‌" বোম্বাই এদেশের শত শত কাপড়ের কলের সমকক্ষ নহে। এত হাঙ্গামা, এত বক্তৃতা, এত অর্থ-ব্যয়ের উদ্দেশ্য, সমস্তই পণ্ড হইয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে দুইটা দেশীয় কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, প্রতিষ্ঠা করিবার সময় ইহাদের কর্ত্তৃপক্ষগণ তুমুল হৈ চৈ করেন নাই। প্রথমতঃ—বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল রেলওয়ে; ইহার সমস্ত বাঙ্গালী; এই ক্ষুদ্র রেল বিভাগের কার্য্যে বাঙ্গালীর বিশ্বাস হইয়াছে। ইহার কর্ত্তৃপক্ষগণ রীতিমত লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি শুনিতেছি এই রেল লাইন আরও বিস্তৃত হইবে—ইহা খাঁটী বাঙ্গালীর কৃতিত্ব। অন্যটি বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফারমাসিউটীক্যাল ওয়ার্কস—এই কারখানার কার্য্যে—এক্ষণে সমস্ত বাঙ্গালীর বা সমগ্র ভারতবাসীর অগাধবিশ্বাস। সমস্ত বঙ্গে মাত্র উল্লেখযোগ্য এই দুইটা যৌথ কারবার রহিয়াছে।"

আমাদের দেশে যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হয় না কেন তাহার মূল কারণ, আমাদের অসাধুতা, ও অমনোযোগীতা। কথা কয়টী শুনিতে কটু হইলেও অতি সত্য কথা। যোগ্য ব্যক্তির উপর কার্য্যভার অর্পিত হয় না,—উকীল হইলেই যে ব্যবসায়ে সুদক্ষ হইবে, ঐরূপ কল্পনা করাও যে অন্যায়। আমাদের দেশে তাহাই হইতেছে। যাহারা ডিরেক্টার বা ম্যানেজিং এজেণ্ট নিযুক্ত হন তাহারা অধিকাংশ স্থলেই সে ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ থাকেন, ফলে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। অংশীদারগণের অর্থ ও ব্যবসায়টী লুপ্ত হইয়া চিরদিনের জন্য দেশবাসীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা লোপ পায়। ঢাকাতে "ট্যানারী" স্থাপিত হইল, কিন্তু হায়! তাহার কার্য্য আরম্ভ হইতে না হইতেই তাহা চিরলুপ্ত হইল।

এইরূপ ভাবে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে চলিতে পারে না, এক্ষণে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের হিতকল্পে বিশেষরূপে মনোযোগী হইতে হইবে। নচেৎ উপায় নাই। পূর্ব্ব-বঙ্গে বহু খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী ও ধনী মহাজনের বাস, কিন্তু এ অঞ্চলে যে কিছুই হইল না। এ দুঃখ ও লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়? বিক্রমপুরে বহুধনী সম্প্রদায়ের বাস, তাহারাই এমন কি করিলেন যাহাতে বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা বিক্রমপুরের গৌরব বৃদ্ধি পাইতে পারে।

আমরা অসাধু, আমরা অকর্ম্মণ্য, আমরা নির্জীব অলস এই দুর্ণাম ঘুচাইবার আয়োজন করিতে হইবে। আজ যে জাপান আমাদের বাণিজ্যক্ষেত্র দখল করিয়া বসিল! তুচ্ছ রেস্‌মিচুড়ী দিয়া যে বহু অর্থ লুটীয়া লইল! সামান্য চুড়ী প্রস্তুতের মাথাও কি হে বাঙ্গালী রসায়নবিদ্ পণ্ডিত! হে বৈজ্ঞানিক তোমার নাই। আজ যে জাপান দিয়াশলাই দিয়া প্রচুর অর্থ লুটিতেছে, তোমাদের এই ভারতবর্ষের মাটিতে কি এমন গাছ নাই যাহার সাহায্যে তোমরা মেচ্‌কাঠি প্রস্তুত করিতে পার? আজ আমাদের কাগজের অভাব, আজ আমাদের লিখিবার কালির পর্য্যন্ত অভাব, এসব অভাব মোচনের জন্য আমরা কি করিয়াছি? শুধু বক্তৃতায় দেশ জাগিবে না,—শুধু চাকুরীতে দেশ উন্নত হইবেনা, যদি এসকল দিকে আমরা লক্ষ্য করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের উন্নতি হইতে পারে না। এখন আমাদের কার্য্যকরি-শিল্পের উন্নতির জন্য শক্তি নিয়োগ করা চাই। যাহাতে দেশের পয়সা দেশে থাকে তাহা করিতে হইবে। আজ সদাশয় গভর্ণমেণ্ট আমাদের উন্নতির জন্য ব্যবসার সাহায্যের জন্য পশ্চাতে আছেন। এখন যদি আমরা কিছু না করিতে পারি তাহা হইলে অদৃষ্টের দোষ দেওয়া ভিন্ন গত্যান্তর থাকিবে না।

গোধূলির তারা।

গোধূলির তারা ওই—বুঝিতে না পারি
অজানিত-দেশে কোন্ বিরহিনী নারী,
নিতি সাঁঝে জ্বালি দীপ পথ চেয়ে রয়
দয়িত আসিবে কবে—কখন হৃদয়
জুড়াবে মিলন-ছায়! হায়, সে কোথায়,—
ভুলে আছে কার ছলে প্রেম-প্রতিমায়
বুঝিয়ে বারেক কভু নাহি পড়ে মনে
কোথা ক্ষুদ্র জুঁই ফুল কুটীর-অঙ্গনে
ফুটে আছে অযতনে! বুক ভরা মধু
বিমল সৌরভ আর অফুরন্ত মধু
লয়ে বালা জাগি' রয় আশায় আশায়
স্বপনের কোলে যেন। যায়, কাল যায়,
ঘিরে আসে নিশীথিনী, অভাগিনী হায়,
বিষাদে হতাশে বুঝি কোথায় লুকায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

—:•:—

গ্রন্থ-সমালোচনা।

হিন্দুর জীবনসন্ধ্যা—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বি, এ, প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান পোঃ রায়পুরা, ঢাকা। মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র। ডবল ক্রাউন ষোলপেজি ৩১২ পৃষ্ঠা। ইহা একখানা কাব্য। এই গ্রন্থে পৃথ্বীরাজের পতন কথা বিবৃত—হইয়াছে। একাব্যগ্রন্থ খানা অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত। পৃথ্বীরাজ সংযুক্তা ও জয়চন্দ্রের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে বহুনাটক কাব্য ও উপন্যাস বিরচিত হইয়াছে। অল্প কয়েকদিন হইল এবিষয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ, মহাশয়

একখানা বিরাট কাব্যগ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন। যোগীন্দ্রবাবুর পৃথ্বীরাজ কাব্য ও যোগেশ বাবুর "হিন্দুর জীবনসন্ধ্যা" প্রায় একসময়েই প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক একাদশ সর্গে-এই গ্রন্থখানা প্রণয়ন করিয়াছেন। যবন শব্দ বহুস্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে। লেখক এসম্বন্ধে—কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে যবন শব্দ বিদ্বেষসম্মত নহে, পদ্যের ছন্দ-চালাইতেও এশব্দ বিশেষ উপযোগী। এইজন্য তিনি মুসলমান শব্দ ব্যবহার না করিয়া যবন শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। স্বর্গীয় সাহিত্যসম্রাট কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় "যবন" শব্দ সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন—"যবন" শব্দ সংস্কৃত মূলক ও জাতিবাচক; বিদ্বেষ প্রকাশক নহে। পূর্ব্বতন আর্য্যেরা সিন্ধুনদের পশ্চিমবর্ত্তী পারসিক ও আরব প্রভৃতি বহু জাতিকে "যবন" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। মোসলমান ধর্ম্মের প্রচার অবধি "যবন" আর "মুসলমান" প্রায় একার্থ বোধক শব্দ।" তাহা হইলেও যাহাতে আমাদের মোসলমান ভ্রাতৃগণের হৃদয়ে কোনরূপ ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হয়, এইরূপ কোন শব্দ ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। হিন্দু মোসলমানের বিষয় সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ রচনা করিতে গেলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। 'যবন' শব্দের পরিবর্ত্তে মোস্লেম শব্দ ব্যবহার করিলেই কাব্যের সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে। আশা করি, ভবিষ্যতে লেখক এবিষয়ে সতর্কতাবলম্বন করিবেন। গ্রন্থমধ্যে কোন বিশেষ বৈচিত্র্য নাই। মাঝে মাঝে অনুকৃতি বিশেষরূপে পরিস্ফুট। আমাদের কাছে কয়েকটী চরিত্র বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। যেমন—পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তা, জয়চন্দ্র ও সেনাপতি মৈজুদ্দিন।

পূর্ব্ববঙ্গের অল্পসংখ্যক কাব্য লেখকগণের মধ্যে তিনি যে একখানি উচ্চাসন গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, ইহা অতীব আনন্দের কথা। তাঁহার কাব্যখানা সুরচিত, সুখপাঠ্য কবি-প্রতিভা পরিচায়ক। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। আশা করি তিনি তাঁহার এই স্বভাব-দত্ত কবিত্ব শক্তি অনুশীলন দ্বারা উত্তরোত্তর যশস্বী হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবেন।

সতীর গৃহধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত সুখেন্দুরঞ্জন ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহীরালাল দত্ত, কটন লাইব্রেরী, ঢাকা। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১৭৬ পৃষ্ঠা।

মূল্য—সিল্কে বাঁধাই, ১৲ একটাকা মাত্র। ইহা একখানি স্ত্রী-পাঠ্য গ্রন্থ। ইহাতে ১৭টী প্রস্তাব আছে। কি করিয়া নব বিবাহিতা বধূ স্বামীগৃহে যাইয়া যশঃ ও কর্ত্তব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারে, ইহাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—গৃহ-সেবা। গৃহ-ধর্ম্মদ্বারাই নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়। সে বিষয়টীরদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই লেখক প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থের কলেবর পূর্ণ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা একটু সেকেলে ধরণের। দৃষ্টান্তগুলিও পুরাতন। চিরকাল সীতা সাবিত্রীর আদর্শ অনুকরণ করিয়া চলিতে পারে না। অতীত ও বর্ত্তমানে সামঞ্জস্য অসম্ভব। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আদর্শ ও জীবন যাত্রার পথ ভিন্ন ভাবে পরিচালিত হইতেছে। চিরদিনই যে সীতা সাবিত্রীর আদর্শই আমাদের নারীকুলের একমাত্র আদর্শস্থল হইবে তাহা ঠিক নহে। বর্ত্তমান যুগের মহিয়সী মহিলাকুলের জীবন চিত্রও কি আদর্শরূপে ফোটাইয়া তোলা উচিত নহে? আর এসকল বহির ভাষা যেরূপ সরল ও সরস হওয়া উচিত, এগ্রন্থের ভাষাও তেমন নহে। উদ্ধৃত কবিতা কয়টীর একটীও আমাদের ভাল লাগে নাই। "সতী রাধাকিশোরী"র জীবন চিত্রটী অতি সুন্দর ও আদর্শস্থানীয়। কিন্তু বিষয়ের হিসাবে ভাষার জটিলত্ব ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার নিমিত্ত আমরা তেমন আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমাদের দেশের এমনি দুর্ভাগ্য দাঁড়াইয়াছে যে আজকাল বৈষ্ণব পদাবলীরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হয়! ভাটিয়ালী ও বাউলের গানেরত কথাই নাই! মোটের উপর আমরা এই নবীন লেখকের সাহিত্যানুরাগের বিশেষ প্রশংসা করি। ইহাই তাহার প্রথম গ্রন্থ।

প্রহ্লাদ—শ্রীমধুসূদন মজুমদার প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা, ৬০ পৃষ্ঠা। লেখক মৈমনসিংহ—মুক্তাগাছা উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র। পদ্যে ভক্তবীর প্রহ্লাদের আখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা এগ্রন্থ মধ্যে লেখকের ভক্তি ও শ্রদ্ধার যথেষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। ভাষা সরল ও সহজ। শিশুদের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইবে। শ্রীমান্ মধুসূদন একটী পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালক। তাহার এমন কেহ আত্মীয় স্বজন নাই যাহার সাহায্য লইয়া সে পড়াশুনা করিতে পারে। গ্রন্থের ভূমিকা

পাঠে জানিতে পারি যে বালক মধুসূদন এই ক্ষুদ্র কাব্য-কুসুম পাত্র লইয়া সকলের নিকট ভিক্ষার্থীরূপে উপস্থিত। যাহারা এই গ্রন্থ ক্রয় করিবেন তাহারা দীন বালকের ভবিষ্যৎ জীবনের একটা উপায় করিয়া দিবেন। আশা করি প্রত্যেক কৃতবিদ্যব্যক্তি এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া দীন বালককে সাহায্য করিবেন। যাঁহারা এইরূপ অনুগ্রহ করিবেন তাহাদের সেই দান অপাত্রে ন্যাস্ত হইবে না। কারণ মধুসূদন উক্ত স্কুলের একজন কৃতী ছাত্র।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৩ সন। মুখপত্রে শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত "বস্তুতান্ত্রিক কাব্যরসিক" নামক কিম্ভূত কিমাকার তিনরঙ্গে মুদ্রিত একখানা চিত্র। চিত্রপরিচয় পড়িয়া জানিলাম "আমাদের দেশের সাহিত্য কুঞ্জবনে জন কতক এই রকমের সাহিত্য রসিক সমালোচকের ভীষণ উপদ্রব হইতেছে, ইহা তাহার ইঙ্গিত।" কাব্য সমালোচনায় চির দিনই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে ও আসিবে। পৃথিবীতে এমন সৌভাগ্যশালী কবি বা লেখক জন্মগ্রহণ করেন নাই যিনি সর্ব্বজন-প্রিয়। মতভেদের সহিত মনান্তর হওয়া কোনরূপেই সঙ্গত নহে। এইরূপ বিদ্রূপাত্মক চিত্র দ্বারা এক শ্রেণীর সমালোচকগণকে উপহাসাস্পদ করিবার চেষ্টা চিত্রকরের হৃদয়হীনতা ও অক্ষমতার পরিচায়ক। "প্রবাসীর" ন্যায় শ্রেষ্ঠ মাসিকে এইরূপ চিত্র মুদ্রিত হওয়ায় আমরা বিস্মিত হইয়াছি। "বিবিধ-প্রসঙ্গ"—"প্রবাসীর" গৌরব স্তম্ভ। ইহাতে স্বাধীনভাবে যে সকল মতামত প্রকাশ করা হয়, এমন বাঙ্গালার একখানা মাসিকেও হয় না। 'বিবিধ-প্রসঙ্গে' অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন

* আমরা এতদিন স্থানাভাবে প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সমালোচনা করিতে পারি নাই। এখন হইতে নিয়মিতভাবে প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সমালোচনা বাহির হইবে।

লিখিত "দেশের সেবা" এবারকার "প্রবাসীর" একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। আমরা এখানে একটু উদ্ধৃত করিলাম। নরেশ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন, "আসল কথা এই যে আমাদের প্রধান দোষ যে আমরা কোনও কাজের ভিতর ডুবিয়া পড়িতে পারি না, কেবল ভাসিয়া বেড়াইতে চাই। আমাদের সে একাগ্রতা, সে শ্রমপটুতা নাই—যাহা ছাড়া কোনও কাজই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। গায়ে ফুঁ দিয়া সৌখীন ভাবে কাজ করিলে কাজ সুসম্পন্ন হয় না। নেতা হইবার জন্য সখের যাত্রার দলে রাজা সাজিবার ইচ্ছায় দেশের সেবার সখ করিলে চলিবে না। কিন্তু যাহার ভিতর থাকে সেই হোমবহ্নি—যাহাতে দেশের পূজার জন্য নিজের যথাসর্ব্বস্বকে আহুতি দিতে প্রস্তুত করে, যাহার থাকে সেই পণ যাহাতে যে যে-পথে আসিতেছে তাহার শেষ না দেখিয়া ছাড়িবে না, যদি এ সংকল্প থাকে যে পর্ব্বতের চূড়ায় না যাইয়া ফিরিবে না, তবেই তাহার এই ব্রত ধারণের জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত। সম্মুখে বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র, আমাদের কাঙ্গাল দেশ প্রভূতভাবে ত্যাগী কর্ম্মপটু নিষ্ঠাবান বীর সেবকের জন্য সজল নয়নে প্রতীক্ষা করিতেছেন, পণ করিতে হইবে মায়ের সে অশ্রু আমরাই মুছাইব; আমাদের দেশবাসী দুঃখে কষ্টে জর্জ্জরিত; প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে তাহাদের দুঃখ আমি দূর করিব; আমাদের দেশ জগতের সভ্যসমাজে ধনে মানে জ্ঞানে অন্ত্যজ-তুল্য হইয়া রহিয়াছে; প্রতিশ্রুত হইতে হইবে যে গৌরবের শীর্ষস্থানে তাহাকে আমরাই উঠাইব। পরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, আমাদের দেশের দুঃখ অপরে দূর করিতে পারিবে না, এক ভগবানকে আশ্রয় করিয়া, ধর্ম্ম সম্বল করিয়া, নিজেদের সাধ্যের সীমা পর্য্যন্ত দেশের সেবা করিব—এই সংকল্প করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে; আমাদের দেশমাতৃকা আমাদিগকে নিরন্তর আহ্বান করিতেছেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" এসংখ্যার "পরগাছা" শেষ হইল "শ্রীযুক্ত জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা পদ্ধতি" নামক প্রবন্ধ "Emilesnart" ফরাসী হইতে অনূদিত। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত গোপীনাথ রাও এর "প্রাচীন ভারতের রাজা, মুকুট ও সিংহাসনের লক্ষণ" "নামক ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়াছেন।

ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নন্দদুলাল দত্তের "অবোধ" কবিতাটি প্রবাসীতে স্থান পাইল কেন বুঝিলাম না। "কষ্টি-পাথর" প্রবাসীর নিজস্ব। ইংরেজী মাসিকপত্র ছাড়া এরূপ বহুজ্ঞাতব্য বিষয় পরিপূর্ণ সংগ্রহ প্রবন্ধ বাঙ্গালার আর কোন মাসিকে প্রকাশিত হয় না। উহাতে অনেক জানিবার ও শিখিবার জিনিষ আছে। শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "শিল্প ও সাহিত্য" নামক প্রবন্ধে লেখক পাশ্চাত্য লেখকগণের রচনার আদর্শের সহিত আমাদের দেশের কবি ও লেখকগণের রচনাদর্শ, শিল্প, সঙ্গীত, চিত্র, নৃত্য, নাটক কবিতা গান ইত্যাদি বহু বিষয়েরই তুলনায় সমালোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বলিবার দোষে ও ভাষার ঘুর্ণিপাকে কোনও বিষয়ই প্রস্ফুটিত হয় নাই। এ প্রবন্ধটীতে লেখকের উদ্দেশ্য কি এবং তিনি কি মীমাংসায় উপনীত হইলেন, তাহার সার উদ্ধার করা অনেকের পক্ষে কষ্টকর। শ্রীমতী সীতাদেবী ব্রেটহার্টের একটী গল্প অনুবাদ করিয়াছেন। এরূপ মেরুদণ্ডহীন ভাষার যাহারা আদর করেন তাহাদের নিকট ইহার আদর হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা ইহা হজম করিতে পারিলাম না। মথি লিখিত সুসমাচারের ভাষাও ইহার নিকট হার মানিয়াছে। "হারামনির" মধুর সঙ্গীতটী উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বন্ধু এবার খেলবে হোরি শুধু তোরি আঙিনায়,
ওরে তোর দুয়ারেই ফুল ফুটেছে
আর কোথায়ও ফুল যে নাই।
ওরে আগে যে তার খবর এসেছে,
ওরে, ফুলের ফুলের গন্ধে যে তার ধারা লেগেছে,
এবার পিচকারী সেই গন্ধেতে চলে,
তুই বার না হলে বন্ধু যে তোর যাবেরে চলে,
ওরে আর না রে ভাই খেলবি হেথার
আর যে এবার সময় নাই॥

প্রচলিত বাঙ্গালা মাসিকের মধ্যে "প্রবাসী" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

চিত্র-পরিচয়।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত 'বিক্রমপুরের বিবরণ' নামক যন্ত্রস্থ পুস্তক হইতে এই চিত্র দুইটা সংকলিত হইল। (১) শ্যামসিদ্ধির মঠ—এই মঠটী ৺শম্ভুনাথ মজুমদার মহাশয় শকাব্দা ১৭৫৮, সন ১২৪৩ সালে নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে এই মঠটী বিক্রমপুরের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ মঠ, রাজাবাড়ীর মঠও উচ্চতায় ইহার সমকক্ষ নহে। মঠটীর গায়ে একটী খোদিত লিপি আছে তাহা এই "শ্রীশম্ভুনাথ বাসার্থং দাসঃ শ্রীশম্ভুনাথকংশাকে গজেন্দু সপ্তেন্দৌপায়ো-নির্ম্মাপয়েম্মকং শ্রীহালখুবিওস্তাগর।" মঠটীর বয়স মাত্র ৮৩ বৎসর। ষ্টীমারে চড়িয়া পদ্মাবক্ষ দিয়া যাতায়াতের সময় ইহার সৌন্দর্য্য সহজেই জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

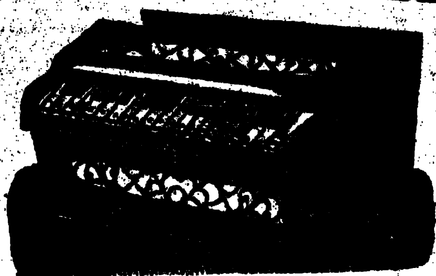
(২) পুরুয়ার ঝিকুটী ঘর—ইহা একটী দোচালা দালান। কারুকার্য্য মণ্ডিত ইষ্টকসমূহ দ্বারা সুশোভিত, প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন। পুরুয়া গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় দুর্গাচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে বিদ্যমান আছে। বিঃ সঃ সঃ

যুদ্ধের ঋণ।

ঢাকা সহর হইতে যুদ্ধের ঋণ সংগ্রহের জন্য একাধিক সভা হইয়া গিয়াছে; এ দুঃসময়ে রাজভক্ত ভারতবাসী মাত্রেরই যে গভর্ণমেণ্টকে ঋণদান সঙ্গত তাহাতে কোনও কথাই নাই। এ পর্য্যন্ত ঢাকা হইতে প্রায় তিন লক্ষ টাকার উপর যুদ্ধ-ঋণের টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে; ঢাকা সহরের বিভিন্ন শ্রেণীর সকলেই নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্যানুযায়ী ঋণদান করিয়াছেন। স্বর্গীয় লালমোহনসাহা ঢাকা নগরীতে দানশীল মহাত্মা বলিয়া খ্যাতনামা ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণও সে সুনামের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। অধুনা শ্রীযুক্ত গৌরনিতাই সাহা শঙ্খনিধি এই পরিবারের পরিচালক; গৌরনিতাই বাবু তাঁহার স্বর্গীয় ভ্রাতাগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সর্ব্বত্র যশস্বী হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে গৌরনিতাই বাবু ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়—শ্রীযুক্ত ভগবৎপ্রসন্ন শঙ্খনিধি ও শ্রীযুক্ত ললিতপ্রসন্ন শঙ্খনিধি একযোগে এক পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণদান করিয়াছেন, শুনিতে পাই ঢাকায় এ পর্য্যন্ত তাহাদের ন্যায় এত বেশী টাকা একযোগে কেহই দান করে নাই। ভগবান এই পরিবারের কুশল ও রাজভক্তি পূর্ব্ববঙ্গে আদর্শ করুন। গৌরনিতাই বাবু কর্ম্মী, ধার্ম্মিক ও সাধুসজ্জন তাহার চেষ্টা যত্নে দিন দিন এই পরিবারের কল্যাণ ও দানশীলতায় ইহা পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করুক ইহাই প্রার্থণীয়। এরূপ ব্যক্তির রাজসম্মান লাভ প্রার্থনীয়।

Regd. No. C. 800.

Printed by J. M. Dass at the Wari Printing Works, Dacca and
Published by J. N. [illegible], Editor, 8 Patuatuli, Dacca.





বৃটিশ্ গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারীকৃত।

সমগ্র ভারতে বিখ্যাত

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।



একদিনে জ্বর সারে, তিন দিনে সুস্থ ও সবল হয়।

সপ্তাহে প্লীহা, যকৃৎ আরোগ্য হয় ; নূতন মানুষ গড়িয়া তোলে।

ছোট বোতল ৸৹ আনা।

বড় বোতল ১।৹ আনা

ডাক্তার শ্রীঅমরচাঁদ মিত্রের

সর্ব্বজ্বরহর পাচন।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বরের মহৌষধ।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। এজেণ্টগণের বিশেষ সুবিধা ; পত্রে বিস্তারিত জ্ঞাতব্য।

ক্ষত নিসূদন ঘৃত।

কোন অবস্থায়ই অস্ত্র করার প্রয়োজন হয় না। বিনা অস্ত্রে ও বিনা ক্লেশে, মাত্র বহির্মালিসে সর্ব্বপ্রকার ক্ষত নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ॥৹ আট আনা, ডজন ৫৲ পাঁচ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

দন্তসংস্কার চুর্ণ।

দন্ত পীড়ার মহৌষধ, হিন্দু টুথ পাউডার। মূল্য ১ কৌটা ৶৹ আনা ডজন ১॥৹ দেড়টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

সুধা চুর্ণ।

সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক, মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যে ও স্মৃতিহীনতা, অনিদ্রা, মাথাধরা, মাথাঘোরা এবং কোষ্ঠবদ্ধাদির মহৌষধ।

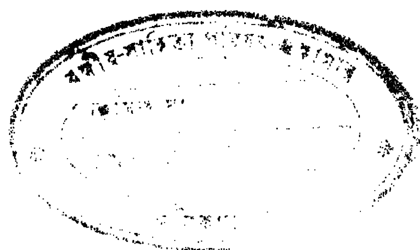
মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ভিঃ পিঃ তে ১।৹ আনা। ৩ তিন শিশি ২৸৹, ভিপিঃতে ৩৲ টাকা।

তারকনাথ ঔষধালয়।

প্রপ্রাইটার, ডাক্তার—শ্রীঅমরচাঁদ মিত্র।

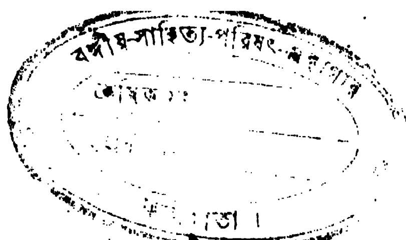
হলদিয়া—ঢাকা।

জ্যৈষ্ঠের সূচী।





পূজ্যপাদ পরমহংস সোঽহংস্বামী।



বিক্রমপুর

৫ম বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ { ২য় সংখ্যা।

ভোলানাথ।

একি মত্ততা হৃদয়ে আমার?
একি উন্মাদ জীবনে?
হর্ষ-গহন একোন অকূলে
ছুটেছি মধুর মরণে?
ওগো ভোলানাথ, বাজাও পিণাক
খর্পরে ঢালগো সুরা,
মত্ত তাণ্ডবে বাজাও বিপুল
প্রাণেরি তানপুরা!
তোমারি নৃত্য-তরঙ্গ-তালে
দমকি উঠুক ধমনী,
হৃদয় স্পন্দে প্রাণে ছন্দে
শিহরি উঠুক ধরণী!
তব কটাক্ষ দক্ষিণ-পাতে
জ্বলুক নেশার জ্বালা,
শিরায় ছুটুক তীক্ষ্ণ সুরার
শাণিত দীপ্তি জ্বালা!

বিহ্বল তব তাণ্ডব তার
ওগো শঙ্কর, ওগো ভোলা,
রয়েছে পড়িয়া জীব হৃদয়ের
সকল দুয়ার খোলা!
এস রূপসীর রূপ-যৌবনের
সিংহতোরণ-পথে;
তব ঢুলু ঢুলু গলিত প্রাণের
অবশ অচল রথে
তব বিভূতি-গৌর দেহের
কান্তি রজত-গলা
বর-সুন্দরীর ললাটে জ্বালুক
রূপের অগ্নিফলা!
রুক্ষ পিঙ্গল জটাজুট তব
সেও যে নেশায় সিক্ত,
প্রেম মন্দাকিনী ছুটায়ে নিখিলে
এখনো হয়নি রিক্ত!
বিশ্ব-নিখিলের জননী উরসে
তা'রি সনাতন ধার,
কি নেশা গহন রেখেছে জ্বালায়ে
অনন্ত সুরাসার!
লক্ষ অর্ব্বুদ মানব-গলায়
ঢালিছ, হে ভূতনাথ!
স্নেহ প্রীতির মায়া মমতার
তপ্ত মদিরা পাত!
চরাচর ভরি, যা কিছু মোহন
রঞ্জন, কমনীয়,
সকলেরি শিরে পতাকা তোমার,
উড়িছে উত্তরীয়!

তুমি কাপালিক, চিতার অনলে
করি পরিপূত স্নান,
শ্মশানের তপ্ত ভস্ম নিঙারি
ঢালিছ নেশার বান।
সিদ্ধির গহন মুগ্ধ ধূমজালে
মজাইয়ে আপনায়
কোথায় ভাসায়ে দিয়েছ তোমার
অপরূপ প্রাণকায় ?
এই চরাচর স্থাবর জঙ্গম
অণ্ডজ জরায়ুজ।
সে নেশার তলে ডুবায়ে রাখিতে
দিবানিশি শুধু খুঁজ !
ঢালিছ মুমূর্ষু জীবন দীপের
শিখায় মূর্চ্ছাতুর,
ক্ষণিক আশার বিপুল মদিরা
হে মাতাল, ক্ষুধাতুর !
খুঁজিছ বসিয়া কোন্ জীবাণুর
হৃদয় পেয়ালা খালি,
তুলিছ তাহার মর্ম্ম ভরিয়া
তপ্ত মদিরা ঢালি !
অপরূপ তুমি, মায়াবী, সন্ন্যাসি ;
ছেড়েছ সকলি নিজে
তবুও নেশার বিপুল অতলে
মত্ত রয়েছ কি যে !
সৃষ্টির গোপন গুহায় বসিয়া
কি তৃষায় লোভাতুরা,
কেবলি ঢালিছ, ভরিছ আবার
প্রাণ-পাত্রে শুধু সুরা !

একি সুরা শুধু—কি মত্ত একি সুধা
বুঝিলে এ মায়াজাল,
হেরি দিবানিশি তা'রি বশে শুধু
বিশ্ব সেজেছে মাতাল।
তাহারি উচ্ছল উচ্ছাস ঘাতে
কত লীলা জ্যোতির্ম্ময়ী,
কত রৌদ্র ছায়ে সুবিচিত্র হয়ে
তোমারে করেছে জয়ী।
কখনো দ্বিধা-জড়িত চিত্তে
বলি' উঠি তুমি মায়া
কভু আনন্দ-বলিষ্ঠ-বয়সে
কহি, সত্যেরি তুমি কায়া!

শ্রীগঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত।

যুগ চতুষ্টয়।

যুগ চতুষ্টয় পৌরাণিক, বেদাদি আর্যশাস্ত্রে ইহার সময় এবং লক্ষণাদির বিবরণ দৃষ্ট হয় না; সুতরাং "বৈশাখশুক্লপক্ষীয়াক্ষয়তৃতীয়ায়োং রবিবারে সত্য-যুগোৎপত্তিঃ" এবং "তৎপরিমাণং ১৭২৮০০০ বর্ষাণি" এবং "তত্রাবতারাশ্চত্বারঃ" এই সকল তত্ত্বের পৌরাণিক বাক্য ভিন্ন অপর প্রমাণ নাই। প্রতিবাদী বলিবেন পুরাণকর্ত্তা মুনিগণ ত্রিকালদর্শী ছিলেন, অথবা যোগবলে তাহারা এই তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। ঈদৃশ পুরাণভক্তের বিবেক-নেত্র উন্মীলনার্থেই এই প্রবন্ধ।

হিন্দুগণ বেদের অনাদিত্ব, অপৌরুষেয়ত্ব, বা ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন, পরবর্ত্তী শাস্ত্রকর্ত্তৃগণেরও ইহাই অভিমত, সুতরাং সত্যযুগ বৈদিক সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, বিশেষতঃ "সামবেদস্যাধিকারঃ" বাক্যে যুগকর্ত্তৃগণ ও সত্য যুগসহ বৈদিককালের একতা স্বীকার করিতেছেন। এমতাবস্থায় বৈদিক

ঋষি এবং পরবর্ত্তী বৈদান্তিক ঋষিগণ সত্যযুগের উৎপত্তি এবং অবতারাদির বিবরণ অপরিজ্ঞাত ছিলেন কেন? সত্যযুগের উৎপত্তি এবং লক্ষণাদি বিচারে যুগপ্রবর্ত্তকগণের জ্ঞান ও যোগবল প্রতিপন্ন হয় কি না তাহা এইক্ষণ দ্রষ্টব্য। মহাপ্রলয়ান্তে জগদুৎপত্তি সহ যুগোৎপত্তিই সমীচান সিদ্ধান্ত, কারণ ঘটনা ভিন্ন কাল নিরূপিত হয় না; ভূতাদির ক্রমবিবর্ত্তনে স্থাবরাদি জীবোৎপত্তির বহুকাল পরে মানবোৎপত্তি—বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত; সুতরাং সত্যযুগোৎপত্তির দ্রষ্টার অসদ্ভাব প্রমাণিত হয়, এমতাবস্থায় সত্যযুগের জন্মতিথি নক্ষত্রাদি কিরূপে নিরূপিত হইল? সত্যযুগে মৎস্য ও বরাহাবতার স্বীকৃত হইলে তৎসহ অপর দুইটী প্রলয়কালও স্বীকার করিতে হয়, নতুবা মীন ভগবানের জীবরক্ষা এবং বরাহ ভগবানের পৃথিবী উদ্ধার প্রমাণিত হয় না, প্রথম প্রলয়ে জীব রক্ষিত হইয়াছিল, সুতরাং সত্যযুগোৎপত্তির কাল সম্বন্ধে কষ্ট-কল্পনা সম্ভবপর, কিন্তু দ্বিতীয় প্রলয়ান্তে বরাহভগবানোদ্ধৃত পৃথিবীতে মানবাদি জীবের অভাব ও নবজীবের উৎপত্তিই যুক্তিসঙ্গত, অতএব নব-জীবের বংশধর বহুপরবর্ত্তী পুরাণকর্ত্তার সত্যযুগের জন্মতিথি ও বৎসরগণনা বিচারবানের অবজ্ঞার যোগ্য।

পুরাণকর্ত্তা বলিতেছেন সত্যযুগে "পুণ্যং পূর্ণং পাপং নাস্তি।" সত্যাবধি দ্বাপরান্ত গোহত্যাদিদ্বারা যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মও অনুষ্ঠিত হইত; সুতরাং ঐ সকল কর্ম্মে "পাপং নাস্তি" নিতান্ত অযৌক্তিক নহে; কিন্তু বেদাধ্যায়ী সত্যযুগের পাপাভাব স্বীকারে সক্ষম কি? "হে ইন্দ্র আমাদের বিদ্বেষ-কারিগণকে বধকর, আমাদের শত্রুবধ কর, ছিন্নমস্তক সর্পের ন্যায় আমাদের অমিত্রগণ অন্ধ হউক, যাহারা আমাদের সহিত শত্রুতা করে, দম্ভ করে, আমাদিগকে নিন্দা করে, দ্বেষ করে, হে অগ্নি তাহাদিগকে ভস্ম কর। (১)

১। "ভিন্দি বিশ্বা অপদ্বিষঃ পরিবাধো মৃধঃ জহী।
অস্তাসি শত্রবে বধং যোন ইন্দ্র জিঘাংসতি"।
অন্ধা অমিত্রা ভবতাশীর্ষানোহহয় ইব।
যো অস্মভ্য মরাতীয়াদ্যশ্চ নো দ্বেষতে জনঃ।
নিন্দ্যাদ্যো অস্মান্ ধিপ্সাচ্চ সর্ব্বং তং ভস্মসাকুরু॥" ঋক্, যজু ও সামবেদমন্ত্র

ইত্যাকার শত শত প্রার্থনাবাক্যে বেদচতুষ্টয় পূর্ণ; সুতরাং সত্যযুগে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পরস্পর শত্রুতা, হিংসা, নিন্দা, দ্বেষ, দম্ভাদিবৃত্তির ক্রিয়া এবং তাহার আনুষঙ্গিক পাপকর্ম্ম প্রমাণিত হইতেছে।

শত শত মন্ত্র তাৎকালিক যুদ্ধ ও দস্যুতার সাক্ষ্য দিতেছে, এবং 'গচ্ছন্ জারোন যোষিতাম্' ইত্যাদি সামমন্ত্র এবং অপর বহু বেদমন্ত্রে প্রমাণিত হয় যে ব্যাভিচারদ্বারা তৎসময়ের সমাজ অস্পৃষ্ট ছিলনা; যজুর্ব্বেদের ত্রয়োবিংশাধ্যায়ের ত্রয়োদশটী মন্ত্র কুলস্ত্রী ও পুরোহিতের রসিকতাসূচক, 'অশ্লীলভাষণং সমাপ্তম্' বলিয়া মহীধর ইহার ভাষ্য শেষ করিয়াছেন। ঐ সকল মন্ত্র সত্যযুগের সুরুচির পরিচায়ক নহে, সুতরাং সত্যযুগে "পুণ্যং পূর্ণং পাপং নাস্তি" পুরাণকর্ত্তার কল্পনা মাত্র। পাপনাশহেতু বহু প্রার্থনা-বাক্য বেদচতুষ্টয়ে দৃষ্ট হয়। (২) "পূতং পবিত্রেণে বাজ্যমাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ" ইত্যাদি বেদমন্ত্র বর্ত্তমান সময়েও সন্ধ্যাবন্দন সময়ে উচ্চারিত হয়। পাপাভাবে পূতিপ্রার্থনা কি প্রলাপ নহে? বেদমন্ত্রের ইত্যাকার প্রার্থনা বাক্যই সত্যযুগে পাপের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে।

তৎপর বিচার্য্য "একবিংশতি হস্ত পরিমিতো মানবদেহঃ।" বর্ত্তমান সময়ে মানব মাত্রই স্বীয় সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত, সত্যযুগের নরদেহ কি স্ব স্ব হস্তের একবিংশ হস্ত পরিমিত ছিল? তাহা হইলে তাহাদের হস্তের পরিমাণ বর্ত্তমান মানব হস্তের একষষ্ঠাংশ মাত্র প্রমাণিত হয়, এরূপ ক্ষুদ্র হস্তদ্বারা তাহারা কিরূপে সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন? অহো! শৌচাদি কর্ম্মও যে অসম্ভব ছিল। যদ্যপি প্রতিবাদী বলেন যে উক্ত পরিমাণ তাহাদের স্বীয় হস্তের নহে, তবে কাহার হস্তে সত্যযুগের নরদেহ পরিমিত হইয়াছিল? কলির পুরাণকার বা পঞ্জিকাকার স্বীয় হস্তে পরিমাণ করিয়াছিলেন কি?

অপর বিচার্য্য বিষয় "নরাণাং লক্ষবর্ষ পরমায়ুঃ" এবং "ইচ্ছামৃত্যুঃ" বেদ-বেদান্ত মন্ত্রে সম্যক প্রমাণিত হয় যে সত্যযুগে মানবের আয়ু বর্ত্তমানাপেক্ষা অধিক ছিল না। শতবর্ষ আয়ু কামনায় যজ্ঞ ও প্রার্থনাসূচক বহুমন্ত্র বেদচতুষ্টয়ে

২। "অবস্তুতং মুঞ্চতং যন্নো অস্তি তনুষুবদ্ধংকৃতমে নো অস্মাৎ"। ৬ মঃ ৭৪সূ ৩ মঃ ঋগ্বেদ
"পাপ্মাহতো ন সোমঃ" অ ৬ কঃ ৩৬ মঃ ৩৫ যজুর্ব্বেদ।

ও বেদান্তশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় (৩)। উহা পৌরাণিক আয়ুকল্পনা নিরাস করিতেছে। লক্ষবর্ষ যাহাদের স্বাভাবিক আয়ুর পরিমাণ, তাহাদের শতবর্ষ কামনা কি সম্ভবপর? শতবর্ষ হউক কিংবা লক্ষবর্ষ হউক, আয়ুষ্কাল নৈসর্গিক বিধানে নিয়মিত হইলে ইচ্ছামৃত্যু কি যুক্তিতে সম্ভবপর? লক্ষবর্ষ পরমায়ু এবং ইচ্ছামৃত্যু এই বাক্যদ্বয় কি পরস্পরবিরোধী নহে? পিতা পত্নী পুত্র এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের মৃত্যুভয়ে সশঙ্ক ঋষির রুদ্রাদি দেবোদ্দেশ্যে প্রার্থনাসূচক বেদমন্ত্র (৪)। এই কল্পনা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে যুগ-চতুষ্টয় প্রবর্ত্তক ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মগণ কি এই সকল বেদবেদান্ত মন্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন কিংবা অভিজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপার্থে এই মিথ্যা জল্পনা করিয়াছিলেন?

সর্ব্বশেষে বিচার্য্য—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, সত্যযুগের এই অবতারচতুষ্টয় পুরাণ বলিতেছে যে মনু নামক রাজার পিতৃতর্পণ সময়ে অঞ্জলিমধ্যে জল-সংযুত শফরী মৎস্য পতিত হইয়াছিল, এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বিংশতি অযুত যোজনব্যাপী বৃহদাকার ধারণ পূর্ব্বক সমুদ্রমধ্যে অবস্থান করিয়াছিল; প্রলয়কালে জলমগ্না পৃথিবীর স্বেদাণ্ডজোদ্ভিজ ও জরায়ুজ সকল প্রাণী পৃষ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিল অর্থাৎ বাইবেলের "নোয়ার আর্কের" প্রয়োজন পুঁটী ভগবান স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াছিলেন। দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন সময়ে কূর্ম্মাবতার মন্থনদণ্ডরূপ মন্দারপর্ব্বত পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, "শতপথ ব্রাহ্মণে" বিদ্বান পুরুষের মনোরূপ সমুদ্র খনন বা মন্থনের উল্লেখ আছে, বোধ হয় ইহাই দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন কল্পনার ভিত্তি এবং কচ্ছপটী পুরাণকর্ত্তার

৩। "সংমিমীতে দীর্ঘায়ুত্বায় শত শারদায়।" অথর্ব্ববেদ।
"শতায়ুষা হবিষেমং পুনর্দুঃ" শতং জীব শরদো বর্দ্ধমানঃ।" ঋগ্বেদ।
"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমা" যজুর্ব্বেদ।
"য এবং বেদ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি' ছান্দোগ্য।
"শতায়ুষঃ পুত্র পৌত্রান্ বৃণীষ।" কাঠক।

৪। মানো মহান্তমুত মানো অর্ভকং মান উক্ষন্তমুত মান উক্ষিতম্।
মানোবধীঃ পিতরং মোত মাতরং মানঃ প্রিয়াস্তন্বোরুদ্ররীরিষ।
অর্ভকং বালং মাবধীঃ। উক্ষন্তং—তরুণং মাবধীঃ। যজুর্ব্বেদ ১৬।১৫
উক্ষিতং গর্ভস্থং চ মাবধীঃ॥ মাহীধর ভাষ্য।

মনঃ সমুদ্রজাত জন্তুবিশেষ। বরাহাবতার দন্তদ্বারা জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার, হিরণ্যাক্ষ বধ এবং পৃথিবীগর্ভে নরক নামক অসুর উৎপাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু জল পৃথিবীতে স্থিত কিংবা পৃথিবী জলে ভাসমানা? জল হইতে পৃথিবী উত্তোলন সম্ভবপর কি না? পৃথিবীর উপর দণ্ডায়মান হইয়াই পৃথিবী উত্তোলন করিয়াছিলেন কিংবা অপর আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছিলেন? এতদ্বিষয়ের মীমাংসা পুরাণে দৃষ্ট হয় না, সুতরাং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ ইহার মীমাংসা করিবেন। পৃথিবীর গর্ভে ও বরাহভগবানের ঔরসে নরকাসুরের জন্ম নিতান্ত সম্ভবপর, কারণ ব্যাকরণানুসারে পৃথিবী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। নৃসিংহাবতারের উদ্দেশ্য দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বধ, ভগবান কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলে নৈসর্গিকবিধানেই দৈত্যরাজের অন্তকাল উপস্থিত হইত, অথবা কোন ব্যাধিকীটের প্রতি অনুজ্ঞা করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত, ইত্যাকার বিকটাকার ধারণ পূর্ব্বক স্তম্ভ হইতে বহির্গত হইয়া দৈত্যরাজের বক্ষ বিদারণের কি প্রয়োজন ছিল? বোধ হয় ভক্তবাৎসল্য বা অবমাননাজনিত ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়াই দয়াময় হরি এই বীভৎস কর্ম্ম করিয়াছিলেন। বাইবেলের "জিহোভা" হইতে পৌরাণিক ভগবানের হৃদয়ে রাগ দ্বেষ ক্রোধাদি বৃত্তির স্বল্পতা রিলক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ ডারুইনের মতানুসারে তখনও অবতারের পূর্ণমনুষ্যত্ব বিকশিত হয় নাই, সুতরাং ঈদৃশ কর্ম্মই স্বাভাবিক। উল্লিখিত শব্দপ্রমাণ ও যুক্তি অনুসারে পুরাণকর্ত্তার ত্রিকালদর্শিত্বের এবং যোগবলের পরিবর্ত্তে সত্যনিষ্ঠা এবং বুদ্ধিমত্তার অভাবই প্রতিপন্ন হয়। "অজ্ঞানমলপূর্ণত্বাৎ পুরাণং মলিনং স্মৃতং" এই বাক্য যে অলীক নহে, ইহা বিচারবানের সহজবোধ্য। অহো ইত্যাকার পুরাণই বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের বন্ধমোক্ষনিয়ামক ধর্ম্মশাস্ত্র।

বর্ত্তমান সময়ে বেদ বেদান্তদর্শনাদি শাস্ত্রের বহুল প্রচার হেতু জনসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকে পৌরাণিক তত্ত্বদর্শন করিয়া অনেকেই হাস্যসম্বরণে অক্ষম, সুতরাং বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ পৌরাণিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ পঞ্জিকা এবং স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ সংস্কার পূর্ব্বক সমাজে স্বীয় গৌরব রক্ষা করিলে আমরা তাঁহাদিগের গৌরব দর্শনে আনন্দিত হইব।

"প্রধানমল্লনিবর্হণ" ন্যায়ে সত্যযুগের কাল ও লক্ষণাদির পৌরাণিক বর্ণনাখণ্ডনে পরবর্ত্তী যুগত্রয়ের বর্ণনাও খণ্ডিত হইতেছে, তথাপি সর্ব্বসাধারণের

বোধসৌকর্য্যার্থে ত্রেতাদি যুগের বিবরণও যথাসম্ভব বিচার কর্ত্তব্য। ত্রেতাযুগের প্রথমাবতার কশ্যপনন্দন বামন, ছলনাই তাঁহার কর্ত্তব্যরূপে কল্পিত হইয়াছে। তিনি অসীম সত্যনিষ্ঠ, স্বধর্ম্মনিরত, বিশ্ববিজয়ী, বদান্যবর বলিকে যাচকবেশে ছলনা করিয়াছিলেন, এবং তাহার সাম্রাজ্য কাপুরুষ, গুরুপত্নীগামী পাষণ্ড ইন্দ্রকে প্রদানপূর্ব্বক পৌরাণিক ভগবানোচিত সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎপরে স্বয়ং বিষ্ণু পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন (১)। তাঁহার জীবদ্দশায়ই বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশে রাম, চতুর্থাংশে ভরত এবং অপর চতুর্থাংশে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অথচ বিষ্ণুর দ্বিত্ব বা বহুত্ব স্বীকৃত হয় নাই। এস্থলে গণিতসহ পুরাণাদি শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ বিরোধ দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করিলে গণিতবিদ্যার নরকভোগ অবশ্যম্ভাবী। অবতারগণের পরস্পর সাক্ষাৎ মাত্র তুমুলকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। অবতারগণ স্বতন্ত্র দেহে বিষ্ণুত্ব অনুভবে অক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার কারণ ভগবানের আত্মবিস্মৃতি, কিংবা শাস্ত্রকর্ত্তার ত্রিকালজ্ঞতা,—তাহা সহজবোধ্য নহে। বৃদ্ধ ভগবানের যুবক ভগবানকৃত পরাজয় অসম্ভব নহে, কিন্তু বিষ্ণু ভগবানের কর্ম্মফল নাশ বা স্বর্গপথ রোধের রহস্যভেদ মানব বুদ্ধির অসাধ্য; এই অভ্রান্ত সত্য বর্ণন সময়ে গ্রন্থকার পরশুরামের বিষ্ণুত্ব বিস্মৃত হইয়াছিলেন কি? ত্রেতাযুগে মুনির তপোবনে ও শাস্ত্রবিহিত গবার্ঘ্য এবং মৈরেয়সহ বরাহকুক্কুটাদি ব্যবহৃত হইত (২)। রামসীতা একাসনে মদ্যপান ও মাংসাহার করিতেন (৩)। পাশ্চাত্য

১। পশ্চাত্তস্যাং স্বয়ংজজ্ঞে ভগবান্মধুসূদনঃ॥

২। আজৈশ্চাবিক বারাহৈ নিষ্ঠান রস সঞ্চয়ৈঃ।
ফলনির্য্যূহ সংসিদ্ধৈঃ সূপৈর্গন্ধ রসান্বিতৈঃ॥
বাপ্যো মৈরেয় পূর্ণাশ্চ মৃষ্টমাংস চয়ৈর্বৃতাঃ।
প্রতপ্তপেঠরৈশ্চাপি মার্গমায়ূর কৌক্কুটৈঃ॥

৩। কুশাস্তরণ সংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিষসাদহ।
সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি॥
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ।
মাংসানিচ সুমৃষ্টানি ফলানি বিবিধানিচ॥　　(রামায়ণ

সমাজে এখনও ইত্যাকার আহার ব্যবহার পাপজনক নহে, কিন্তু অবতার-কৃত স্ত্রীহত্যা, গুপ্তহত্যা ভক্তের বিচারে দূষণীয় না হইলেও ঈদৃশ হন্তা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বসমাজে ঘৃণিত দণ্ডার্হ। রামরাজ্যে কীদৃশ নিরপেক্ষ বিচার ছিল, অন্ত্যজবর্ণ কিরূপ সুখে বাস করিত তৎকৃত শম্বুক বধই তাহার দীপ্যমান প্রমাণ, বলপূর্ব্বক পরস্ত্রী হরণ ব্যভিচারাদি তৎসময়ে সঙ্ঘটিত হইত সুতরাং বর্ত্তমানকালাপেক্ষা তৎসময়ে পাপের অল্পতা প্রমাণিত হয় না। প্রতিবাদী বলিতে পারেন, রাবণাদি রাক্ষসগণই পাপী ছিল, তদুত্তরে বক্তব্য যে রাবণও ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত, অবতার দৃষ্টান্তদ্বারাই জনসাধারণের অবস্থা অনুমিত হইতে পারে, বিশেষতঃ বর্ণগত, জাতিগত বা ব্যক্তিগত পাপপুণ্যাদি এই প্রবন্ধে বিচার্য্য নহে, যুগধর্ম্মই বিচার্য্য; সুতরাং রাক্ষসহীন বর্ত্তমানকালাপেক্ষা তৎকালের পুণ্যাধিক্য এবং পাপের অল্পতা অপ্রামাণ্য। শাস্ত্রানুসারে দ্বাপরযুগের অবতার হলধর বলরাম। তিনি কাদম্বরীমদিরা পানে প্রমত্ত থাকিতেন, নিরীহ সূতহত্যা ব্যতীত অপর কোন শূরোচিত কর্ম্ম তিনি সম্পাদন করেন নাই; একমতে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার মতান্তরে পূর্ণভগবান। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত এবং ভাগবতাদি শাস্ত্রানুসারে উভয়েরই অবতারত্ব সন্দেহ-জনক, "ভগবান পরমেশ্বর সিতকৃষ্ণ কেশদ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন, তাহাই রোহিণী এবং দেবকীর গর্ভে রামকৃষ্ণাকারে উৎপন্ন হইয়াছিল," ইহা নিতান্ত যুক্তিযুক্ত, কারণ ভগবানের বয়ঃক্রম নিতান্ত অল্প নহে, সম্ভবতঃ প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রান্তা সুতরাং পক্কাপক্ক উভয়বিধ কেশে মস্তক সুশোভিত। অহো ত্রিকালদর্শী মহাত্মগণের যোগলব্ধ ইত্যাকার মহান্ তত্ত্বই হিন্দুজাতির ধর্ম্ম পথের সম্বল! কিন্তু পুরাণপ্রোক্ত পদাবলী স্পষ্টতঃ প্রমাণ করিতেছে যে রামকৃষ্ণ ঈশাবতার ছিলেন না, তাঁহারা কেশাবতার মাত্র। সত্য ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে আহার ব্যবহারের বিশেষ পার্থক্য প্রত্যক্ষ হয় না, তাৎকালিক সমাজে সূর্য্য ইন্দ্র বায়ু অশ্বিনীকুমারাদি দেব মহিমায় অসতীত্বাপবাদের অসদ্ভাবস্বত্বেও ব্যভিচারের প্রাচুর্য্যই প্রমাণিত হয়, গবাদিহরণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রাদি উচ্চবর্ণ এবং রাজন্যগণও পাপ বোধ করিতেন না, দ্যূতক্রীড়ায় পত্নী পর্য্যন্ত পণকারী যুধিষ্ঠিরই তাৎকালিক ধর্ম্মরাজাখ্য আদর্শ পুরুষ ছিলেন। ভীষ্ম দ্রোণাদি বীরেন্দ্র এবং বিদুরাদি ধীরেন্দ্রপরিবৃত সম্রাট্ সভায় কুলবধূর বস্ত্রহরণ তাৎকালিক রুচি,

রাজনীতি এবং রাজ শাসনের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক, সুতরাং বর্ত্তমান কালাপেক্ষা দ্বাপরযুগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না।

যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালেই কলিযুগের প্রারম্ভ, তৎপর পরীক্ষিতের সময়ে কলিকাল মানবাকারে প্রকটিত হইয়া পুরাণ কর্ত্তার জল্পনা মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছিল, কিন্তু বিবেক ইহা অভ্রান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে কি? মতান্তরে "তত্রাবতারৌ দ্বৌ শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধৌ"। সুতরাং বৌদ্ধকালও দ্বাপরের অন্তর্ভূত। আমরা শঙ্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত দ্বাপরের প্রসার স্বীকার করিব।

যে শাক্যসিংহ সিংহবিক্রমে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া প্রিয়তমা পত্নী, সদ্যঃপ্রসূত পুত্র, এবং রাজসিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যানুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলেন, কেবল স্বীয় অনুগতজনের জন্য নহে, স্বীয় সমাজ সম্প্রদায় বা স্বদেশীর জন্য নহে, যাহার করুণ হৃদয় সমগ্র মানব জাতির দুঃখে বিগলিত হইয়াছিল; মানব সহ পশু পক্ষ্যাদি পর্য্যন্ত যাহার উদার হৃদয়ে সমভাবে স্থানলাভ করিয়াছিল, যিনি স্বীয় তীব্র তপস্যালব্ধ সত্যদ্বারা মানব জাতির এবং বহুল ভক্ষ্যাভক্ষ্য জীব ক্ষয় কারি যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম নিরাসন পূর্ব্বক পশ্বাদির কল্যাণ সাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান সময়ে জগতের সভ্যাসভ্য তৃতীয়াংশ মানব যাহার পদানুসরণকারী, তাঁহার সময় কি একপাদধর্ম্মী কলিকাল? যে ওজস্বী বৌদ্ধাচার্য্যগণ নির্ব্বাণ ধর্ম্মনীরে ভারতব্যাপী যজ্ঞবহ্নি নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন, যে নিঃস্বার্থ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ব্রহ্ম তিব্বত চীন জাপানাদি সুদূর দেশ সৌগত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, এবং যে বৌদ্ধের ভারতব্যাপী ভাস্কর-শিল্প চিহ্ন তাৎকালিক সভ্যতা সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান-পূর্ব্বক জাতীয় গৌরব বর্দ্ধন করিতেছে, তাঁহাদের সময় কি কলিকাল? যে শঙ্কর ভাস্কররূপে উদিত হইয়া জ্ঞানকিরণ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, যাঁহার একাত্মবিজ্ঞানপ্রভায় কর্ম্মতমোময় ভারত দীপ্তিমান্ হইয়াছিল, যিনি স্বীয় প্রতিভাবলে লুপ্ত প্রায় নিগূঢ় বেদান্ততত্ত্বোদ্ধারপূর্ব্বক জগদ্ব্যাপী যশোলাভ করিয়াছেন, যিনি মোক্ষমার্গসংস্কারপূর্ব্বক মুমুক্ষুর হিতসাধন করিয়াছেন, তাঁহার সময় কি একপাদধর্ম্মসমন্বিত কলিকাল?

দক্ষিণালোলুপ পুরোহিত বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডলোপকারি বুদ্ধের নাস্তিক আখ্যা এবং শঙ্করের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ আখ্যা প্রদান করিতে পারে, ইহা স্বাভাবিক,

এবং কর্ম্মী ও অবিবেকী স্বার্থহানিজনিত বিদ্বেষমূলক উক্ত বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতে পারে, কিন্তু "যথাহিচোরঃ স তথাহি বুদ্ধ" ঈদৃশ বাক্য কবির বা প্রক্ষেপকারীর মহিমাবর্দ্ধন করিতেছে, কিংবা তাহাদের বিদ্বেষ বিকলিত হৃদয়োত্থিত পাংশুস্পর্শে রামায়ণ গ্রন্থ কলুষিত হইয়াছে তাহা নিরপেক্ষ জনের বিচার্য্য।

জগতে অনুপম, মূর্ত্তিমান বৈরাগ্যস্বরূপ বুদ্ধের এবং ব্রহ্মাত্মবাদি শঙ্করের অদ্বৈত জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত সময় একপাদ ধর্ম্মী কলিকাল ইহা বিবেকী স্বীকার করিবেন কি ?

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছে যুগচতুষ্টয় ভারতভিন্ন অন্যত্র বিবর্ত্তিত হয় না * সুতরাং প্রলয়, অবতারের আবির্ভাব, যুগভেদে পাপ পুণ্যাদির তারতম্য, ভারত ভিন্ন অন্যত্র অসম্ভব; নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে এই বাক্যের যাথার্থ্যই প্রতিপাদিত হয়। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য অপর কোন দেশই বর্ত্তমানে কলিকবলিত নহে, কালবিবর্ত্তনে কিংবা সমদর্শী ভগবানের বিশেষ কৃপা হেতু ভারতে যুগ এবং যুগাবতারের আবির্ভাব হয় নাই, এই বিশেষত্ব এবং তাহার পরিণাম অজ্ঞতা, দাস্য এবং দৈন্যের জন্য ভারতবাসী স্বীয় অন্ধ-বিশ্বাস এবং ত্রিকালদর্শী পুরাণকর্ত্তা মহাত্মগণের চরণে চিরঋণী। কি সুযোগে কোন্ সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কলি প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, আহার ব্যবহার ও সামাজিক রীতি নীতি কিরূপে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল, এবং সঙ্কীর্ণতাপ্রাপ্ত বিভিন্ন সমাজ কিরূপে কলিকবলিত হইয়াছিল, কিরূপে ধর্ম্মের যে কর্ম্ম জ্ঞানাখ্য পাদত্রয়ছিন্ন হইয়া ভক্ত্যাখ্য একপাদ মাত্র অবশিষ্ট ছিল, কিরূপে এক পাদে অবস্থিত ধর্ম্মবৃক্ষের অনন্ত শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং গুরু-ভারাক্রান্ত বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল, কিরূপে অশ্রুতপূর্ব্ব অবতার পূজক অগণিত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল, কিরূপে ভারতের সভ্যতা শিল্প বাণিজ্যাদি লুপ্ত হইয়াছিল, "সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যাচ মেদিনী। তদর্দ্ধং নহি দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব।" এই ওজস্বিনী বাণী বক্তা সিংহবিক্রম শূরগণের বংশধরগণ

---

* চত্বারি ভারতেবর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে।
কৃতং ত্রেতাদ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন কচিৎ॥

কিরূপে শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিরূপে প্রাণভয়ে স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি যবনকরে অর্পণ করিয়াছিল, কিরূপে চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজন্যগণ ভগ্নী কন্যা প্রভৃতি যবনরাজচরণে উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিল, এবং কিরূপেইবা বংশগর্ব্বে গর্ব্বিত ধর্ম্ম-মদমত্ত হিন্দু সন্তান অনুগত সারমেয়বৎ যবন পদলেহন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে স্থানাভাব, সুতরাং অতি সংক্ষেপে কেবল বঙ্গের বিবরণই বিবৃত হইবে।

যুগ চতুষ্টয় অবৈদিক এবং পুরাণ মূলক, পৌরাণিক পাপপুণ্যাত্মক বিধি-প্রতিষেধেই যে ভারতে কলির আবির্ভাব হইয়াছিল—তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে, সেই সুযোগেই বঙ্গদেশও কলিকবলিত হইয়াছিল, সমুদ্রযাত্রা প্রতিষেধ হেতু বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক রীতি নীতি ও শিল্পবিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের পথরুদ্ধ হইয়াছিল, দূরদেশ গমন প্রতিষেধ হেতু অপর প্রদেশ সহ সর্ব্বসম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছিল, স্পর্শদোষসন্ত্রাসিত ধর্ম্ম রন্ধনশালায় আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ও বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রাধ্যয়নের পরিবর্ত্তে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল, তখন অধিকাংশ বঙ্গবাসীরই তালপত্রে এবং রম্ভাপত্রে বর্ণমালা শিক্ষা সহ বিদ্যাভ্যাস সমাপ্ত হইত, কন্যাপক্ষ হস্তলিপি দর্শনে বরের যোগ্যতা এবং বিদ্যার পরীক্ষা করিতেন, অত্যল্প সংখ্যক যাহারা সংস্কৃত শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতেন তাহারা ব্যাকরণ সমাপ্তির পূর্ব্বে পিতৃ পদে এবং সাহিত্য, স্মৃতি, জ্যোতিষাদি সমাপ্তির পূর্ব্বে পিতামহ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন, কারণ দুর্ব্বিনীতা তিথী সহ সরস্বতী দেবীর বিসম্বাদ হেতু পাঠের বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইত। বংশগত বর্ণভেদ ব্যাধিগ্রস্ত সমাজে কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ এবং কুলীন কন্যার আমরণ কৌমার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়া শ্লীপদোপরি বিস্ফোটকবৎ বঙ্গের অশেষ শোভাসম্পাদন করিয়াছিল, অনেকেই শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে ও সদক্ষিণ ব্রাহ্মণভোজনে সর্ব্বস্বান্ত হইত, জলাশয় খনন হইত সত্য, কিন্তু জনসাধারণের মঙ্গলার্থে নহে, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে বা পারলৌকিক ফলাশায়। পূর্ত্তকর্ম্মাপেক্ষা বহুগুণ অর্থব্যয়ে উৎসর্গাদি কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইত, সংক্ষেপতঃ স্বদেশ, সমাজ বা স্বজাতির প্রতি প্রায় কাহারও কর্ত্তব্য বোধ ছিল না। সকলেই স্ব স্ব পারিবারিক এবং পারলৌকিক মঙ্গল চিন্তায় ব্যস্ত ছিল, অনেকেই কুলক্রিয়ায় কপর্দ্দক হীন হইত, কেহ বা ঈদৃশ উপায়ে বংশমর্য্যাদা রক্ষা বা বৃদ্ধি করিয়া অবশেষে

অর্থাভাবে নির্ব্বংশ হইত, কিন্তু ধনিগণ ও দেশের বা সমাজের মঙ্গলার্থে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন বোধ করিতেন না, এই স্বধর্ম্মনিরত মহাপুরুষগণই "ম্লেচ্ছারাজন্যরূপিনঃ" ইত্যাদি পৌরাণিক বাক্য ও যুগধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক স্বীয় বা শত্রুর বিন্দুমাত্র রক্তপাত ব্যতীত জন্মভূমি পাঠান পদে সমর্পণ পূর্ব্বক কাপুরুষতার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিল; অহো জগতের ইতিহাসে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পুরুষত্ব অনুপমেয়! মুসলমান রাজত্বকালে স্মার্ত্ত ও সামাজিকগণ সমাজের পবিত্রতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন, সংসর্গ দোষে স্পর্শদোষে, আঘ্রাণদোষে, কিংবা বিনাদোষে লক্ষ লক্ষ হিন্দুসন্তান সমাজচ্যুত হইল। সেই সদনুষ্ঠানের ফলে ক্রমশঃ হিন্দুসমাজ ক্ষীণ এবং মুসলমানসমাজ পুষ্ট হইল, অহো! ইহাদের আচার নিষ্ঠার বলেই বর্ত্তমানে অর্দ্ধাধিক বঙ্গসন্তান মুসলমান! কলির জীব নিস্তারের জন্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইল, তিনি ধর্ম্মের পাদত্রয় খণ্ডন পূর্ব্বক ভক্ত্যাখ্য একপাদে কলিকালোচিত ধর্ম্মস্থাপন করিলেন। ভক্তগণ "জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্ম কাণ্ড-সকল বিষের ভাণ্ড" বলিয়া খণ্ডিত পাদত্রয় দূরে নিক্ষেপ করিলেন, হীনবীর্য্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে "বেদ-বিধির অগোচর" নবপ্রেমরসের উৎস প্রবাহিত হইল। অহো! তাহাতেই "শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়!" স্বীয় প্রতিষ্ঠা এবং দেশের পরিণাম যুগপৎদর্শনে অক্ষম কাণ রঘুনন্দন যখন পুরাণের জীর্ণসূত্রে নবীন স্মৃতি-রজ্জু প্রস্তুত পূর্ব্বক সমাজের হস্তপদ সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছিলেন তখনই কলিযুগ পূর্ণ হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময় কলি ও সত্যের সন্ধিস্বরূপ উষাকাল, সুসভ্য ইংরেজ-রাজত্বসহ নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে, যুগধর্ম্মানুরূপ তরুণ তপন ভারতগগণ প্রান্তে উদিত হইয়া বিদ্যাবিজ্ঞানাখ্য কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করিতেছে, নবীনালোকে উৎফুল্ল বঙ্গসন্তানগণ স্মৃতিনিগড়-চ্ছেদন পূর্ব্বক সমুদ্রপথে দূরদূরান্তর ভ্রমণ করিতেছে, এবং বৈদেশিক বিদ্যা বিজ্ঞানাদি অদৃষ্টপূর্ব্ব অমূল্য রত্ন আহরণ করিয়া মাতৃভূমির শোভাসম্পাদন করিতেছে, অসংখ্য বঙ্গসন্তান দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে, প্রদেশান্তরবাসী সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত মানবের শুশ্রূষার জন্য স্বীয় মৃত্যু উপেক্ষা করিয়া ধাবমান হইতেছে, বন্যাবিপ্লাবিত

প্রদেশান্তরবাসীর জন্য বঙ্গীয় যুবক প্রাণপণ করিতেছে, দুর্ভিক্ষক্লিষ্টের জন্য অকাতরে অর্থদান করিতেছে। পল্লিতে পল্লিতে বিদ্যালয় স্থাপন, পুস্তকালয়-প্রতিষ্ঠা, বালকের পাঠোপযোগী গ্রন্থপ্রণয়নপূর্ব্বক সাধারণ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতেছে। কৃতবিদ্য বঙ্গবাসীর প্রযত্নে বঙ্গভাষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া ভারতের ভাষারাজ্যে সর্ব্বোচ্চাসন অধিকার করিয়াছে। সামাজিক পীড়নে নিষ্পেষিত হীন জাতিও নবযুগের নবীনালোকে নবজীবন লাভ করিয়া আত্মোন্নতির জন্য যত্নবান হইতেছে। কেহবা আজীবন অর্জ্জিত ক্লেশলব্ধ অর্থরাশি স্বদেশের কল্যাণার্থে অকাতরে দান করিতেছে, শতশত বঙ্গসন্তান মোক্ষ-কামনায় সন্ন্যাসী হইতেছে, কেহবা পৃথিবীর অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত আর্য-ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছে, কন্যাপণ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্য-প্রথার অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে, স্পর্শদোষে মৃতকল্প হিন্দুধর্ম্ম তরুণ তপন-তাপে নবজীবন লাভ করিয়া সোৎসাহে অবিদ্যাধূমময়ী রন্ধনশালা পরিত্যাগ করিতেছে, বঙ্গীয় যুবকগণ গুণকর্ম্মানুরূপ ক্ষত্রিয়ত্ব লাভে বদ্ধ-পরিকর হইয়া ভীষণ সমরক্ষেত্রে ধাবমান হইতেছে, শিল্পবাণিজ্যের প্রসারসহ বৈশ্যধর্ম্মেরও ক্রমোন্নতি হইতেছে, সংক্ষেপতঃ স্মৃতি ও পুরাণপ্রোক্ত কলিযুগ লক্ষণ "যদা সদানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসাদিসাধনম্। শোকমোহৌ ভয়ং দৈন্যং সকলিস্তমসিস্মৃতঃ" প্রাকৃতিক বিধানে ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া নবযুগের লক্ষণ সকল আবির্ভূত হইতেছে। প্রাত্যূষিক তপনকিরণ সর্ব্বত্র প্রবেশ লাভ করে না, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডরশ্মিই কূপপ্রবেশেও সক্ষম, সুতরাং অনেক বঙ্গবাসীর সংস্কার ও স্বার্থতমসাবৃত হৃদয়কূপে কলির অন্ধকার বিরাজিত, কিন্তু "নমোব্রহ্মণ্যদেবায়গোব্রাহ্মণ হিতায়চ" বাক্যে যাহারা ব্রহ্মণ্য দেবের একমাত্র কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেন, গোব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের হিতকামনা যাহাদের নমস্যদেবেরও ছিলনা, এরূপ স্বার্থপর বর্ত্তমানে অতিবিরল, এবং তাহাদের হৃদয়ও অচিরে নবযুগালোকে আলোকিত হইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী, কারণ "অলঙ্ঘনীয়ং প্রকৃতের্ব্বিধানং"। যদ্যপি এই শুভসময়ে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ কলির কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কালোচিত উদারতা অবলম্বন করেন, এবং সমাজের আবরণস্বরূপ শতগ্রন্থিময়ী জীর্ণকন্থা উন্মোচন পূর্ব্বক উপযোগী নববসনে

সুশোভিত করেন, তবে তাহাদের শ্রেষ্ঠবর্ণোচিত মর্য্যাদা-রক্ষা এবং বঙ্গের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়।

প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, শেষাবতার কল্কির আবির্ভাব ভিন্ন কলিযুগের অন্ত কল্পনা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তদুত্তরে বক্তব্য যে পুরাণাখ্য কাব্য-গ্রন্থের স্থানে স্থানে অভ্রান্ত তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বত্বেও উহা কল্পনা ও ভ্রমপূর্ণ, শ্রুতিবিরোধী কোন স্মৃতিই শাস্ত্রবাচ্য নহে। গত কতিপয় শতাব্দিমধ্যে বঙ্গদেশে বহু অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে কোন্‌টী কল্কি তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য, "অশ্বমাশুগ মারুহ্য" অসিনাসাধুদমনং" এই বাক্যবক্তা পুরাণকর্ত্তৃগণের কিঞ্চিন্মাত্রও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ছিল না। নতুবা তাঁহারা বর্ত্তমান কঠোর পিনালকোড এবং ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে অশ্বারোহী অসিধারী অবতারের আবির্ভাব কল্পনায় সাহসী হইতেন না। অহো! ইতিমধ্যেই কেচিৎ উদ্ধত অবতার পিনালকোডের প্রতাপে শান্ত হইয়াছেন। অসিহস্তে বর্ত্তমান আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখীন হওয়ার পরিণাম বর্ণনা বাহুল্যমাত্র।

সোঽহং স্বামী।

অমৃতের উৎস।

আনন্দস্বরূপ হইতে প্রাণিসমূহ উৎপন্ন, তাহাতে সঞ্জীবিত, প্রাণীসমূহ তাহার অনুগমন করে ও অবশেষে তাহাতে প্রবেশ করে।

তিনি রসস্বরূপ, তাহাকে লাভ করিয়া জীব সুখী হয়।

যদি এই আকাশে আনন্দ স্বরূপ না থাকিতেন তবে কেইবা শরীর চেষ্টা করিত কেইবা জীবন ধারণ করিত? ইনিই সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন।

ইনিই জীবের পরমগতি, ইনি জীবের পরম সম্পদ এবং ইনিই পরম লোক। ইনিই জীবের পরম আনন্দ।

মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে যিনি সেই ব্রহ্মের আনন্দ জানেন তিনি কিছুতেই ভীত হন না।

বেদের মুকুটমণি ও ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি উপনিষদের এই সূক্তগুলি পাঠ করিলে শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আমাদের চিত্ত যেন ক্ষণেকের

তরে সেই আনন্দামৃত উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ঋষিগণের ধ্যানগম্ভীর কণ্ঠস্বর যেন দূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় আমাদিগকে চকিতে চঞ্চল করিয়া তুলে। আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই প্রাচীন ঋষিদিগের সাধনরূপ কমণ্ডলুর মধ্যে যেন এই অমৃতের উৎস নিহিত রহিয়াছে এবং যে আনন্দলাভ করিবার জন্য আমরা এত ব্যাকুল ও এত চঞ্চল, যে সুধা লাভ করিবার জন্য আমরা অবিশ্রান্ত কঠোর কর্ম্মময় জীবন যাপন করিতেছি; যে সুখ শান্তি লাভ করিবার জন্য আমরা আজীবন কত চেষ্টা, কত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি এবং বাসনার উপভোগই যাহার চরিতার্থতা কল্পনা করিয়া বৃথাশ্রম করিতেছি, তাহার উৎস যে অন্যত্র রহিয়াছে, বাসনার উপভোগে নহে, তাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই।

আজন্মকাল লক্ষ বাসনা আমাদিগকে লক্ষ দিকে টানিতেছে। আমরা মনে করি বাসনার চরিতার্থতাই অমৃতের সোপান। বিষয় বাসনার সফলতাই আনন্দ লাভের উপায়, আত্মপ্রতিষ্ঠা, ঐশ্বর্য্য, জনবল আমাদের আত্মার ক্ষুধা নিবারণ করিবে সাধারণতঃ ইহাই আমাদের সামাজিক জীবনের শিক্ষা ও দীক্ষা। চিরকাল আমরা এই আদর্শ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াই সংসার-যাত্রা উদযাপন করি, কত আগ্রহে, কত উৎসাহে আমরা বিষময় পথ অনুসরণ করি, যাহা চির কল্যাণকর, যাহা শ্রেয়ঃ, যাহা ঐহিক ও পারত্রিক শুভকর, যাহা কৈবল্যের জননী—তাহা ভ্রমভরে পদাঘাত করিয়া কত যত্নের সহিত প্রেমপথ অনুসরণ করি এবং বাসনার উপভোগ দ্বারা যখন বাসনার শান্তি হয় না দেখি তখনই আমরা সুপ্তোত্থিতের মত জাগিয়া উঠি এবং পরিতপ্ত হই। আমরা তখন বুঝিতে পারি "নজাতু কাম কামানাং উপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এব অভিবর্দ্ধতে।"

কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার শান্তি হয় না—প্রত্যুত ঘৃত প্রবৃদ্ধ অগ্নির ন্যায় আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

হায়! এই কামনার আসক্তি কত দেশ; কত রাজ্য, কত পরিবার ছারখার করিল, কত মানবকে বিনাশ করিল। ইহার শান্তির জন্য কত বেদ, কত উপনিষদ; কত সংহিতা, কত পুরাণ, কত মন্ত্র, কত তন্ত্র রচিত ও প্রচারিত হইল, তবু মানব এই আসক্তির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিল না।

পতঙ্গ যেমন রূপতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রজ্বলিত হুতাশনে আপনাকে আহুতি প্রদান করে, সেইরূপ মনের সাধারণ বাসনার বাহ্য চাক্‌চিক্যে প্রলুব্ধ হইয়া নিজ নিজ জীবন বাসনা-বহ্নিতে আহুতি প্রদান করে।

কিন্তু হায়! আমরাত অমৃতের সন্তান, অমৃতে যে আমাদের চিরপ্রতিষ্ঠা, সেই অমৃততত্ত্ব বুঝিতে না পারিলে আমাদের যে শান্তি নাই। তাহার কারণ প্রতিমুহূর্ত্তে যে আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে। আমরা অপেক্ষা না করি কি উপেক্ষা করি, তাঁহার প্রেমস্পর্শ আমাদিগকে অভিভূত করিতেছে। আমরা যখনই তাঁহার দিকে তাকাই সকল দ্বন্দ্ব যে মিটিয়া যায়। শোক দুঃখের কঠোর কষাঘাতের মধ্যেও যে তিনি বিগলিত করুণার মূর্ত্তি। তাঁহার করুণার প্রবাহ গঙ্গার স্রোতের মত আমাদিগকে যখন প্লাবিত করে, যখন বন্ধন একটু শিথিল হয়, আসক্তি টুটিয়া যায় আমাদের শোক তাপ প্রশমিত হয়। তখন আমাদের দৃষ্টি পবিত্র হয়। আমরা তখন দেখিতে পাই শোক সন্তাপের মধ্যেও কত যত্নে, কত স্নেহে আমরা তাঁহারই বক্ষে লালিত পালিত হইতেছি। চরাচর বিশ্বভবন তখন এক নূতন সাজে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, তখন আমরা উপলব্ধি করি :—

> স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্ঠাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ
> স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বং।

তিনি অধঃতে, তিনি ঊর্দ্ধে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে তিনি উত্তরে তিনিই এই সমস্ত।

তখন আমরা আর কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিব না, তিনি প্রাণের মধ্যে "প্রাণস্য প্রাণম্" রূপে প্রতিভাত হন। আমরা তাঁহার অমৃত স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হই। এই যে প্রেমস্পর্শ ইহা আমাদের নিত্য অনুগামী। আমরা অন্ধ, চক্ষু থাকিতেও দৃষ্টিহীন। তথাপি আমরা সুখের মধ্য দিয়া কি দুঃখের মধ্য দিয়া কোন কোন মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হই। তাঁহার করুণা হস্তস্থিত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ করি। তিনি যে অসীম রহস্যের আধার তাহা বুঝিয়া ধন্য হই। করুণার দান যেমন তাঁহার দান, বেদনার দানও তেমনি তাঁহারই দান, এই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হই।

এই তত্ত্ব বুঝিতে হইলে অমৃতের উৎস কি, তাহা কিরূপে উৎসারিত হয় এবং আমরা সেই অমৃত প্রবাহ কিরূপ অনুভব করি ইত্যাদি প্রশ্ন আনুষঙ্গিক ভাবে উদিত হইতে পারে।

যিনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা তিনিই অমৃতের উৎস। ঋষিগণ তাঁহাকে "আনন্দ রূপমমৃতং যং বিভাতি" রূপে বর্ণনা করিতেছেন, তিনি বিশ্ব ভুবনের আত্মা অথচ কলারূপে প্রতি মানবের হৃদয় উহাতে প্রতিষ্ঠিত; যাহারা তাঁহাকে জানে তাহারা তাঁহার স্পর্শে অমৃতময় হইয়া যায়। তিনি রসস্বরূপ, ভূমময়মহান্, সকল সুখের অক্ষয় ও অফুরন্ত ভাণ্ডার। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" নিখিল বিশ্ব তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে। নিখিল বিশ্ব তাহারই অনুগমন করিতেছে, অবশেষে তাহাতেই লীন হইবে। মণিসমূহ যেমন সূত্রের মধ্যে গ্রথিত হইয়া দ্বৈতাদ্বৈতভাবে শোভা পায় সেইরূপ সমস্ত বিশ্ব তাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। বিশ্বভুবন তাহার স্বত্তাতেই স্বত্তান্বিত, বালুকণা হইতে সৌরজগৎ—সমস্তই তাহার অপরিসীম স্বত্তা প্রকাশ করিতেছে।

যিনি এই অমৃতের উৎস বিশ্বাত্মা তিনিই একাধারে স্বগুণ ও নির্গুণ। শিবং সুন্দরং অনন্তং শুদ্ধং। তিনিই সেই মঙ্গলদাতা, নির্গুণ—তাই নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন অনন্ত ও চির পুণ্যময়, তিনি স্বগুণ—তাই পরম কল্যাণ-কর। নির্গুণ—তাই বাক্য ফলের অগোচর। নিষ্কাম ও নির্ব্বিকল্প। আমরা যোগ প্রভাবেই মাত্র তাঁহার প্রকাশ অনুভব করিতে সমর্থ হই। তিনি আমা-দিগকে শাশ্বতসুখ প্রদান করিতেছেন। তিনি আত্মাতে প্রকাশিত হন। অথচ নিজে অপ্রকাশ ও অকাম। যখন আমরা আত্মা ও পরমাত্মার এই শুভ সম্মিলন বুঝিতে পারি, তখন আমাদের চিত্ত সংশয়-বিবর্জ্জিত ও পুণ্যময় হয়। তখন আমাদের প্রাণ বলিয়া উঠে, হে হৃদয়ের দেবতা তুমি বড় মিষ্টি, তুমি বড় সুন্দর। তুমি প্রাণস্য প্রাণম্ শ্রোত্রস্য, শ্রোত্রং, উত বাচহ বাচঃ। তুমি অমৃত তুমি চিরন্তন প্রেম, তুমি সর্ব্বস্ব। যখন সাধক এই অবস্থায় উপনীত হয় তখন তাহার জীবন অমৃতময় হইয়া যায়। আত্মার ও পরমাত্মার এই মিলন সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে একটী সূক্ত আছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অস্তিত্ব তাহাদের সখ্যভাব, পরস্পর পরস্পর সম্বন্ধ, পরিচয় ব্যবহার প্রকাশক, এম প্রভৃতি

পৃথিবীর কোন স্থানে আছে কিনা সন্দেহ। অমৃত তত্ত্বজ্ঞ তাহার উপাদান এমন সুন্দর ভাবে এমন সরল বিবৃতি আছে কি আছে জানিনা।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে আমরা এই অমৃতের উৎস কিরূপে উপলব্ধি করিতে পারি এবং সংসারে ইহার কোন আদর্শ দেখিতে পাই কিনা? ইহার সহজ উত্তর এই, "সাধন ও ব্রহ্ম কৃপা ভিন্ন ইহা লাভের আর অন্য উপায় নাই। তাহার কৃপায় প্রাণে যদি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সঞ্জাত হয়, তবেই আমাদের প্রাণের মধ্যে তাহার অসীম প্রকাশ অনুভব করিতে পারি এবং আমরা অমৃত হইয়া যাই। কিন্তু ব্রহ্ম কৃপা লাভের পূর্ব্বে আমাদের সংযম সাধন আবশ্যক। চিত্ত পবিত্র, দৃষ্টি পবিত্র, আহার বিহার পবিত্র, বসন ভূষণ পবিত্র না হইলে কেহই "শুদ্ধংঅপাপবিদ্ধং" দেবতার অর্চ্চনার অধিকারী হয় না। এই স্থানেই সাধকের কঠোর পরীক্ষা। আমি অন্তরের সহিত এই প্রার্থনা করি ঈশ্বর তাঁহার প্রেম-স্পর্শে আমাদিগকে বলিষ্ঠ করুন আমরা যেন জীবনের সকল অবস্থায় মধ্যে পবিত্রভাব, পবিত্র আকাঙ্ক্ষা, পবিত্র উদ্দেশ্য লইয়া চলিতে পারি।

এই কথা মনে রাখিতে হইবে চিত্ত শুদ্ধিই ধর্ম্ম সাধনের প্রধান ও প্রথম অঙ্গ, তিনি শুদ্ধং, অপাপবিদ্ধং, তাঁহার সহিত সম্মিলন বাঞ্ছিত হইলে, আত্মাকে তদোপযোগী শুদ্ধ ও পবিত্র নির্ম্মল সংযত করিতে হইবে, যে সাধক যে পরিমাণে পবিত্র সে ততটুকু তাঁহার বিভূতি অনুভব করিতে সমর্থ। যিনি শুদ্ধচিত্ত, যাঁহার আকাঙ্ক্ষা পবিত্র, যিনি সত্যব্রত, তিনিই এই সংসারে ধন্য। আত্মপ্রসাদরূপ সম্পদ কৃপণের ধনের মত তৎকর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত। অবস্থা বিশেষে শোক তাপ ও মানবের চিত্তকে পবিত্র করিয়া থাকে। শুচি বা বিশুদ্ধ করে বলিয়া শোককে "শোক" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শোকের বজ্র প্রহারে মানবের যখন বিষয় বাসনা নির্ম্মূল হইয়া যায়, শত বৃশ্চিক দংশনে যখন সে অভিভূত হইয়া উঠে—রাবণের চিতার মত যখন বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, যখন মানব দেখে যে সে একান্তই নিরাশ্রয়, তখন মানবের অহমিকা চূর্ণ হইয়া যায়, তখন সে আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়, যখন সে পার্থিব সুখ সম্পর্কে অসারতা হৃদয়ের অন্তস্থলে অনুভব করিতে সক্ষম হয় এবং বাসনা কুটীল পথ পরিহার করিয়া সহজ সরল পথে জীবনতরণী চালাইতে প্রবৃত্ত হয়। তখনই ভগবৎকৃপায় শোকসন্তপ্তনরনারী

অমৃতের দূর শ্রুত আহ্বান শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠে, তখন নরনারী বুঝিতে পারে, শোক দুঃখ তাঁহারই দয়ার বিধান। করুণাময় বিশ্বপতি করুণাকণা বিতরণের জন্যই যেন দারুণ শোকের বজ্রপ্রহারে তাহাদের মোহ তমসাচ্ছিন্ন দৃষ্টি খুলিয়া দিলেন, এবং ভক্তকে স্বকীয় কৃপাকণা দান করিলেন। অমৃতের উৎস আত্ম-তত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া নচিকেতা, মৃত্যু-কর্ত্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। "নয়মাত্মা প্রবচনান লভ্যঃ, নঃ মেধয়া—ন বহুনা শ্রুতেন যামবৈষ, বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈস আত্মা বৃণুতে তুনংস্বাম্। এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন বা মেধা বা বহু শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। যাহাকে পরমাত্মা বরণ করেন তাহা দ্বারা এই পরমাত্মা লভ্য। তাহার নিকট তিনি স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন। মানব যখন চিত্তশুদ্ধি বলে এবং তাঁহার কৃপাস্পর্শে তাঁহার মহিমা দর্শন করে, তখন সে বুঝিতে পারে, তিনিই সুখ, তিনিই শান্তি, তিনিই কৈবল্য লাভের একমাত্র উপায়—তখন মানব বুঝিতে পারে, তিনি এই চরাচর বিশ্বভুবনের মধু স্বরূপ—ইদংসত্য সর্ব্বেষাং ভূতানা মধু, অস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চয়ং আস্মিনমাভ্যাতেজোময় অমৃতসমঃ পুরুষেযশ্চায়মাধ্যাত্মম সত্যতেজোময়ঃ মৃতময়ঃ পুরুষোয়েমেব স যোঽয়ম্ সত্যোদং অমৃতামিদং ব্রাহ্মদং হো এই সত্য স্বরূপ পরমেশ্বর সমুদয় প্রাণীর মধুস্বরূপ, সমুদয় প্রাণীও এই সত্যের নিকট মধুরূপে প্রকাশ পান। যে অমৃতসম জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ সৎস্বরূপ এবং যিনি শুদ্ধ সৌম্য সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরই এই পরমাত্মা—তিনিই অমৃত, তিনিই ব্রহ্ম। বাক্যদ্বারা এই অমৃত-স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করা যায় না, সাধক যখন আত্মহারা হইয়া এই অমৃত সাগরে ডুবিয়া যান, অমৃতের অতলসাগরে নিমগ্ন হন তখন সে নির্ব্বাক হইয়া সেই ভূমার অতুল আনন্দ উপলব্ধি করে এবং বুঝিতে পারে। তিনিই পরম লোক, তিনিই পরম শান্তি, তিনিই পরম সম্পদ। তখন সাধকের প্রার্থনীয় কি সম্ভোগনীয় আর কিছুই থাকে না। তখন তাহার চিত্ত সমাহিত হয়, মন প্রেমানন্দে মাতিয়া উঠে। তখন হৃদয় গ্রন্থি তাহার ছিন্ন হয়, সংশয় নিরস্ত হয় কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! সময় থাকিতে কেন আমাদের সংশয় ছিন্ন হয় না, আসক্তির গ্রন্থি ভিন্ন হয় না? যতদিন দেহে শক্তি থাকে, ইন্দ্রিয়গ্রাম সবল থাকে, ততদিন আমরা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করি, কেবল জীবন সন্ধ্যার সময় মানব সময় সময় জীবনের ব্যর্থতা ও নিজের দুরবস্থা স্মরণ

করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে এবং অনুভব করে। কেবল ব্যর্থতার মধ্যে সে জীবন উদযাপন করিয়াছে। উপসংহারে আমরা কয়েকটী চরিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া ভক্তের জীবনে অমৃতের উৎস কিরূপ উৎসারিত হয় তাহা প্রদর্শন করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রথম চিত্রে বঙ্গের স্বদেশী কবি, স্বর্গীয় রজনীকান্ত আজ জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। কবির একপা' ইহলোকে, অপর একপা' পরলোকে। রোগের দারুণ যাতনায় সংসার বন্ধন তাহার শিথিল হইয়াছে। তিনি আজ আকুল হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া কলিকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগ-যাতনায় অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। ইহকালের যশ, অর্থ, মানের লালসা এখন তাঁহার নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন দেহের অভিমান বৃথা। পার্থিব জীবনের নশ্বরত্ব স্মরণ করিয়া আজ তাঁহার অহঙ্কার প্রস্থান করিয়াছে। দেহের পরিণাম ভাবিয়া আজ তিনি বড়ই কাতর—বড়ই দীন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য রহস্য! এই ভীষণ রোগ যাতনার মধ্যেও তিনি অচল অটল শান্ত, সমাহিত! এই অবস্থা কি কবির ক্ষণিক শ্মশান বৈরাগ্য? ইহা কি কবির ক্ষণস্থায়ী অমৃতের স্ফূর্ত্তি?—কখনই নয়। ভক্ত কবি রজনীকান্ত অমৃতের স্পর্শে ইহপরকালের পার্থক্য একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, পরলোক ইহলোক হইতে লোভনীয় ও হৃদ্য। এই অনুপ্রাণনা তাঁহাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া কবি গাহিলেন।

"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে?
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল
তোমারি করুণা চন্দনে।
কবে তোমাতে হয়ে যাব আমার আমি হারা
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা।
এ দেহ শিহরিবে ব্যাকুল হবে প্রাণ
বিপুল পুলক স্পন্দনে।

কবে ভবের সুখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া
চরণ কাঁপিবে না হৃদয় গলিবে না
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।"

কবির এই সঙ্গীত আমি বহু সুগায়কের কণ্ঠে শুনিয়াছি কিন্তু শ্রবণেচ্ছায় তৃপ্তি হয় নাই। কবিতাটীর বর্ণে বর্ণে প্রেমিক কবির অন্তর্ম্মুখতা, ঈশ্বর প্রেম কেমন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। তিনি যে অমৃত রস পানে বিভোর হইয়াছিলেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরাও একটু অভিভূত হইয়া পড়ি। দেশের দুর্ভাগ্যে রজনী অকালে রজনীর অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছেন। না—না-দেশের দুর্ভাগ্য বলিব না। আমাদের দেশ ধন্য হইয়াছে। রজনী আজ 'রসাল নন্দন কাননের' অমৃত পান করিয়া সেই অজানা দেশে অবস্থিতি করিতেছেন। এ দেশের জরা মৃত্যু, শোক, তাপ, বিরহ, বিচ্ছেদ তাঁহাকে আর চঞ্চল করিতে পারিতেছে না। রজনী আজ সে দেশে গিয়াছেন, যে দেশে পিতা পুত্রের জন্য, পুত্র পিতার জন্য, স্ত্রী স্বামীর জন্য, স্বামী স্ত্রীর জন্য, মা সন্তানের জন্য, সন্তান মার জন্য, ভ্রাতা ভ্রাতার জন্য, বন্ধু বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যে দেশে গেলেনাকি লোকান্তরিত পুনঃ আপনার হয়, সে দেশ কাহার না বাঞ্ছিত?

দ্বিতীয় চিত্র—এক বৃদ্ধের প্রথম পুত্রটীর বয়স ২৫ বৎসর। সে সবল সুন্দর, প্রিয় দর্শন, বিদ্বান, পিতার অমূল্য ধন। পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছে। সে আজ চির নিদ্রায় নিদ্রিত। সেইদিন বৃদ্ধের বাড়ীতে একটী সভা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কি অলৌকিক দৃশ্য! এইরূপ যোগ্যপুত্রের মৃত্যুতেও বৃদ্ধের শোককাতরতা নাই। এইরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য দুর্লভ। বৃদ্ধ দূরাগত ব্যক্তিগণকে বলিলেন, "আজ চলুন, আমরা অন্যত্র সভা করিয়া আসি।" বাস্তবিক যাহারা ভদ্র, অমৃতের আস্বাদন লাভ করিয়াছেন, এইরূপ উক্তি তাঁহাদের পক্ষে বিস্ময়কর নহে। পরে ঐ বৃদ্ধের অপর একটী পুত্র ও একটী কন্যা মারা যায়; সেই অবস্থায়ও তিনি ঐরূপ অবিচলিত থাকিয়া তাঁহার আনুগত্যের সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। "রসো বৈ সঃ" ইহা যে উপলব্ধি করে সে তাঁহারি প্রেরণায় জীবন ধারণ করে এবং জীবনমরণে তাঁহাকেই অমৃতের প্রস্রবণ জানিয়া সঞ্জীবিত থাকে। শেষোক্ত ব্যক্তির অবস্থাকে

শ্রীমৎভাগবৎ গীতায় আত্যন্তিক সুখের অবস্থা বলা হইয়াছে। সুখে দুঃখে তুল্যাবস্থায়, ইহার সমভাব। লোকে অমৃতের আস্বাদন পাইলে হর্ষ বিষাদের অতীত হয়। তখন মানব বোঝে—সুখ যেমন তাঁহার দান, দুঃখও তেমনি তাঁহারি দান। দান গ্রহণে কি বহনে তাহার কোন বাছাবাছি করিবার অধিকার নাই। সে অবিচলিতচিত্তে আনন্দ ও বেদনা সমভাবে আলিঙ্গন করে। গীতায় এই অবস্থার প্রকাশক সুন্দর একটী উক্তি আছে, সংলব্ধা চাপরংলাভং মন্যতে নাহধিকং ততঃ, যস্মিন স্থিতোন দুঃখেম করুণাপি বিচাল্যতে। মুক্তাত্মা যে অবস্থা লাভ করিয়া অন্য লাভকে অধিক লাভজনক মনে করেন এবং যে অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া কোনরূপ দুঃসহ দুঃখেই বিচলিত হন না। আধ্যাত্ম রাজ্যের শাশ্বত ভাণ্ডার মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে এই শ্লোকটির আমরা প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। "নাভি নন্দত মরণং নাভি নন্দত জীবনং, কালমেব প্রতীক্ষাত নিদেশং ভৃকে যথা। "জীবন মরণ কিছুই ইচ্ছা করিবেনা।" ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশ পালন করে, তুমি সেইরূপ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিবে।

তৃতীয় চিত্র—আপনারা অনেকেই বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত ধ্রুবোপাখ্যান জ্ঞাত আছেন। পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুব বিমাতা সুরুচির কঠোর বাক্য বাণে বিদ্ধ হইয়া জননী সুনীতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মা, আমাদের দুঃখ দুর হওয়ার উপায় কি?" সুনীতি বলিলেন,"বাছা, শ্রীহরি সমগ্র দুঃখ নিবারণের উপায়। তিনি বিপদ ভঞ্জন।" জননীর কথায় প্রবুদ্ধ হইয়া মা'র অঞ্চলের ধন অভিমানী শিশু ধ্রুব রাত্রিযোগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, "কোথা হে, শ্রীহরি! আমাকে দেখা দাও। আমার মা'র সমস্ত বেদনা মুছিয়া দাও।" এই বলিয়া ব্যাকুল হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে অরণ্যের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে ক্রমে ক্রমে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বহুবিধ হিংস্রজন্তু সেই জনপ্রাণীহীন বনভূমির মধ্যে ধ্রুব তাহাদিগকেই পদ্মপলাশ-লোচন হরি জ্ঞানে তন্ময় ভাবে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। হিংস্রজন্তুগণ বিস্ময় চিত্তে ধ্রুবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে চলিয়া গেল। ধ্রুব সারানিশি হরির অনুসন্ধানে ব্যাকুল চিত্তে "কোথায় হে দয়াময় হরি, কোথায় হে দয়াময়! একবার আমাকে দেখা দাও। আমার মা'র দুঃখ দুর কর" বলিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উপাখ্যানে এইরূপ বর্ণিত আছে, শ্রীহরি তথায় আবির্ভূত

হইয়া ধ্রুবকে বাঞ্ছিত বর দিতে চাহিলেন। তখন ধ্রুব সাংসারিক কোন সম্পদই চাহিলেন না। যাহা আশু সুখকর, যাহা প্রেয়—তাহা পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন হে সুন্দর, হে প্রিয়, হে চিরনবীন,! পরশমণি, রাজ্যধন সহায় সম্পদ আমি কিছুই চাহি না। অমূল্য ধন তোমাকে পাইয়াছি। আমার সমস্ত ক্ষুধা মিটিয়াছে। আমি তোমাকেই চাই। হে দেব! অনেক প্রার্থনা করিয়া তোমাকে তপস্যা করিয়াছিলাম, এখন আমি যোগীগণের দুষ্প্রাপ্য ধন তোমাকে পাইয়াছি। কাঁচ অনুসন্ধান করিতে গিয়া উজ্জ্বলমণি তোমাকে পাইয়াছি। প্রভো! আমার জীবন সার্থক হইয়াছে। আমি কোন বর প্রার্থনা করি না।" শ্রীহরির প্রেমস্পর্শে ধ্রুব অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাঁহার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। ধ্রুব অমৃত সাগরে ডুবিয়া গেল। সে অমৃতের স্পর্শে অমৃত হইয়া গেল। তাঁহার প্রাণে অমৃতের উৎস উৎসারিত হইল। ধ্রুবের তন্ময়তা, তাঁহার চিত্ত শুদ্ধি, তাঁহার প্রেমধর্ম্ম জগতে অতুলনীয়।

চতুর্থ চিত্র—আপনারা অনেকেই ভক্তবীর চৈতন্যের কথা শুনিয়াছেন। তিনি একদিন ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীনিবাস! কৃষ্ণ কোথায়?" চৈতন্যের জননী শচীদেবী তখন নিকটে ছিলেন। শ্রীনিবাস বলিল, "কেন? কৃষ্ণত তোমার প্রাণের মধ্যে রহিয়াছেন।" চৈতন্যদেব অতি বলশালী গৌরকায় বিপুল বপু পুরুষ ছিলেন। এই কথা শুনিবা মাত্র ধারাল নখ দ্বারা নিজ বক্ষ বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বক্ষের মধ্যে কৃষ্ণকে পান কি না? গৌরাঙ্গের তখন সমাধির অবস্থা। জননী শচীদেবী ও শ্রীনিবাস না ধরিলে চৈতন্যের কি দশা হইত বলা যায় না। কথিত আছে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া রক্তময়ী গঙ্গা প্রবাহিত হইল বটে কিন্তু চৈতন্যদেব সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। কি ব্যাকুলতা! কি প্রেমোন্মত্ততা! অমৃত প্রবাহ যখন শিরার শিরায় প্রবাহিত হয়, জীবন তখন অতি তুচ্ছ হইয়া দাঁড়ায়। হায়! আমরাত কত জ্ঞানের বড়াই করি, আমরা কি একবার অনুসন্ধান করিয়াছি জীবনের সার্থকতা কি? জীবনের অনেক দিনত চলিয়া গিয়াছে, সুখ সম্পদ অনেকত ভোগ করিয়াছি, একবার কি লক্ষ্য করিয়াছি—এজীবনের উৎস কি? আমাদের সুখ-স্বপ্ন কি ভাঙ্গিবে না? আমরা যে অমৃতের সন্তান, অমৃত পারাবারের কূলে বসিয়া কতকাল বদ্ধ ভাবে

জীবন যাপন করিব ? কবে মোহযুক্ত জীবন মুক্ত হইয়া বলিবে "যো মে ভূমা, তদ্‌সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

পঞ্চম চিত্র অর্থাৎ শেষ চিত্র—আসুন আমরা সুদূর স্মৃতির গহ্বর হইতে অপর একটি চিত্র আহরণ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করি। অনেক চিন্তাশীল দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞ বলিয়াছেন," সময়ে উপনিষদের এই প্রার্থনা সর্ব্ব দেশের, সর্ব্বকালের সার্ব্বভৌমিক প্রার্থনা হইয়া দাঁড়াইবে। পৃথিবীর সমস্ত নরনারী এই প্রার্থনা অনুসরণ করিবে

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বানপ্রস্থ অবলম্বনের সময় তাঁহার সাংসারিক সমগ্র উপকরণ তদীয় পত্নীদ্বয়কে বিভাগ করিয়া দিতে চাহিলেন। তখন অন্যতমা পত্নী মৈত্রেয়ী বলিলেন, "স্বামিন! এই সমস্ত উপকরণ দিয়া আমি কি করিব?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, কেন? "সংসারীর মত এই সমস্ত উপকরণ দ্বারা তোমার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে।" মৈত্রেয়ী বলিলেন "যে নাহম্ নামামৃতস্যেন্ কিমহংতেন কুর্য্যাম্' যাহাতে আমি অমৃতের আস্বাদন পাইব না এমন বস্তু দিয়া আমি কি করিব? সংসারের উপকরণত ক্ষণস্থায়ী উহাত আমাকে অমৃতের অনুসন্ধান বলিয়া দিবে না? উহা আমার বাঞ্ছিত নহে। আমি এমন কিছু চাই যাহাতে আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়," এই বলিয়া তিনি অশ্রু প্লাবিত নয়নে উর্দ্ধ দিকে তাকাইয়া এই প্রার্থনা করিলেন—এমন অমৃতময়ী প্রার্থনা আর কোনও দেশ হইতে কখনও কি উত্থিত হইয়াছে? যাহা আশু সুখকর, যাহা বিষয় বাসনা চরিতার্থ করে, মৈত্রেয়ী পার্থিব এমন কিছুই চাহিলেন না, চাহিলেন, অধ্রুবের মধ্যে যাহা ধ্রুব, অসত্যের মধ্যে যাহা সত্য—সেই শাশ্বত সম্পদ।

আশা করি ব্রহ্ম কৃপাবলে আমাদের দেশের নরনারীর শিক্ষা ও দীক্ষা হইবে।

শ্রীউমাচরণ সেন।

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ।

কনকসার।

কনকসার গ্রামে একটী বহু পুরাতন মঠ আছে। এই মঠ হইতে "মঠবাড়ী" বা "মঠপাড়া" নাম হইয়াছে।

"মঠটী" কালসহ্যাতে নিতান্ত জরাজীর্ণ ও বৃহৎ বট বৃক্ষাচ্ছাদিত; তদভ্যন্তরস্থ "শিব" অতিকষ্টে শৈত্য, উষ্ণত্ব সহ্য করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক পূজা গ্রহণ করিতেছেন। জনশ্রুতি এই—পূর্ব্বে "শিবের" দ্বারে পাপ ফলে দুইটী অজগর সর্প মঠ কোটরে বাস করিত। কয়েক বৎসর হয়, একটী সর্প লগুরাঘাতে নিহত হইয়াছে, অন্যটী এখনও নাকি "শিবের" রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। সম্প্রতি মঠের সংস্কার সাধন কল্পে প্রতিষ্ঠাতার বংশধরগণ যত্নপর হইয়াছেন এবং গ্রামস্থ অধিবাসগিণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। গ্রামে অনেক অবস্থাপন্ন লোক আছেন। এই পুরাতন কীর্ত্তিটী রক্ষা কল্পে তাহাদের সকলের চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিলে সংস্কার-কার্য্যটী অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতে পারে।

"মঠবাড়ী" বা "মঠপাড়ার" পূর্ব্বাধিকারী কাশ্যপ গোত্রপ্রভব কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী রাজারাম, রামগোবিন্দ নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। রাজারামেরও তিন পুত্র, যথা—রামনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও রূপনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণ "মঠ" প্রতিষ্ঠাতা নিঃসন্তান। রূপনারায়ণ নির্ব্বংশ। রামনারায়ণের চারি পুত্র, যথা ক্রমে কালীকিঙ্কর, কালীশঙ্কর, রামগোপাল এবং রামদাস। রামদাস অপুত্রক, তাহার দৌহিত্র জগচ্চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের পুত্র আদিত্য ও অক্ষয় পাড়ার উত্তর ভাগের পশ্চিম অংশের বাড়ীতে বাস করিতেছে। কালী কিঙ্করের রঘুনাথ, কমলাকান্ত নামে দুই পুত্র। রঘুনাথের দুই পুত্র, যথা রামজয় ও রামদুর্ল্লভ। রামজয়ের পুত্র আনন্দ ও হরিদাস। আনন্দের পুত্র অনাথ বর্ত্তমান। হরিদাস নিঃসন্তান। রামদুর্ল্লভের পুত্র নাই, কন্যা নৃত্যকালী বর্ত্তমান। আনন্দ ও নৃত্যকালী পাড়ার দক্ষিণাংশের পূর্ব্বভাগের বাড়ীতে বাস করিতেছে।

কমলাকান্তের পুত্রদ্বয় কালীকান্ত, কালীকমল। কালীকান্তের পুত্র কেদার; কালীকমল নিঃসন্তান। কেদার ও আনন্দ এক বাড়ী-বাসী। কালীশঙ্করের তিন পুত্র যথা—রাধানাথ, কৃষ্ণচন্দ্র ও বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথ নিঃসন্তান। রাধা নাথের পুত্র ত্রয়— বিশ্বেশ্বর, কালীপ্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন। বিশ্বেশ্বরের তিন পুত্র— বরদা, রাখাল ও যোগেশ বর্ত্তমান। কালীপ্রসন্নের পুত্র নলিনী জীবিত। তারা-প্রসন্নের চারি কন্যা বর্ত্তমান।

কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ। শ্যামাচরণ, গুরুচরণ এবং নিশি গঙ্গাপ্রসাদের সন্তান। রাধানাথ ও কৃষ্ণচন্দ্রের সন্তানসন্ততিগণ পাড়ার উত্তর ভাগের পূর্ব্বাংশের বাড়ীতে বাস করিতেছে।

রামগোপালের পুত্র রামসুন্দর নিঃসন্তান। ইনি মধ্যের বাড়ীতে বাস করিতেন এখন উহা জনশূন্য। কৃষ্ণবল্লভের পুত্র রামগোবিন্দ তৎপুত্র বাণীনাথ, তাহার পুত্র রমানাথ। রমানাথের তিন পুত্র যথা প্রাণকৃষ্ণ, রাধানাথ ও কালীনাথ। প্রাণকৃষ্ণ নিঃসন্তান। রাধানাথের এক পুত্র রামকিশোর। রামকিশোরের উত্তরাধিকারী পাঁচ কন্যা। কালীনাথের দুই পুত্র কালীচরণ এবং ঠাকুরদাস। কালীচরণের তিন পুত্র যথাক্রমে অম্বিকা, শ্রীনাথ ও রাজেন্দ্র। ঠাকুরদাসের একমাত্র পুত্র তারিণী। ইহারা "মঠপাড়ার" দক্ষিণ পশ্চিম অংশের বাড়ীতে বাস করিতেছেন। রামকিশোর ও কালীচরণ সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। ইহারা উভয়েই কৃতিমান লোক ছিলেন এবং বহু ব্যয় সাধ্য ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এই ক্রিয়া কলাপ মধ্যে, "দান-সাগর শ্রাদ্ধ," "মহোৎসব" এবং "কুলিনে কন্যা সম্প্রদান" সর্ব্বপ্রধান। এত-দুপলক্ষে রামকিশোর, কালীচরণ প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে এ বাড়ীর অবস্থা তত সুবিধাজনক নয়।

"উত্তর পাড়া" বা রাজকৃষ্ণের বাড়ী" জ্যোতিষবংশের এক শাখা উক্ত পাড়ায় বাস স্থাপন করেন। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ বাসদেব আচার্য্য।" বাসদেবের ছয় পুত্র যথাক্রমে রামচরণ, রামগোপাল, গঙ্গারাম, শিবরাম, রামজীবন ও কৃষ্ণ জীবন। রামচরণ ও কৃষ্ণজীবনের সন্তানসন্ততি নাই। রামগোপালের পুত্র রামকৃষ্ণজীবন। তৎপুত্র দুর্গারাম নিঃসন্তান। গঙ্গারামের পুত্র রামপ্রসাদের সন্তান নাই। শিবরামের পাচ পুত্র যথা রুদ্ররাম, রামকানু, রামশরণ, রাম

নারায়ণ ও রাজারাম। রুদ্ররামের পুত্র রামনাথ তৎপুত্র তৃতীয় মৃত্যুঞ্জয়, রতিকান্ত ও কালীকান্ত। রতিকান্তের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত তৎপুত্র রামকুমার। রামকুমারের পুত্র চন্দ্রমোহন ও কালীপ্রসন্ন। ইহাদের ব্যবসা যাজনিক ও বাসভবন "মঠ পাড়ার" উত্তর ভাগে। রামকানু নিঃসন্তান। রামশরণের পুত্র রামশঙ্কর তৎপুত্র সোণারাম তৎপুত্র রামকিঙ্কর। রামকিঙ্করের পুত্র তারিণী, রামচরণ। তারিণীর পুত্র শ্যামাচরণ (প্রকাশ্য রাখাল) বরদা, সারদা ও দুর্গাচরণ শ্যামাচরণ মৃত তাহার বিধবা পত্নী বর্ত্তমান। দুর্গাচরণ অবিবাহিত অবস্থায় পরলোকগত। বরদা, সারদা বর্ত্তমান। তারিণী রামচরণ পৌরহিত্য কার্য্য করিতেন এবং গ্রামস্থ প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী তাহাদের যজমান ছিলেন। বরদা, সারদা বিষয়ান্তর অবলম্বন করিয়া সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহ করিতেছে। রামচরণের পুত্র রাজেন্দ্র ও শৈলেন্দ্র। রাজেন্দ্র নিঃসন্তান। শৈলেন্দ্রের প্রকাশ্য নাম মনমোহন। বিধবাস্ত্রী ও একটী অল্পবয়স্ক পুত্র বর্ত্তমান। রামচরণ ও তারিণীর পিতা রামকিঙ্কর, "পাইকাড়া" গ্রামে বিবাহ করেন এবং তথায় বাস করিয়া পরলোক গমন করেন। তৎপুত্রদ্বয় তথায় বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, অতঃপর কণকসার—বাস স্থাপন করেন। ইহারা যে পাড়ায় বাস করেন তাহাকেই "পুরোহিত পাড়া" বলে। এই পাড়ার বিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।—

শিবরামের পুত্র পঞ্চকের মধ্যে রামনারায়ণের পুত্র কালিদাস, তৎপুত্র ১। শ্রীধরের, ২। রামসন্তোষ, ৩। রামসুন্দর, ৪। রামনিধি, ৫। পাঁচকড়ি, ৬। রামদুর্ল্লভ ৭। রামশির। শ্রীধরের পুত্র নিমাই, ভৈরব, ও উদয়। রাম নিধির পুত্র গোলোক। রামনারায়ণের ভ্রাতা রাজারাম তৎ পুত্র কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের পুত্র গঙ্গারাম, গদাধর ও কালীশঙ্কর। গঙ্গারামের পুত্র কাশীকান্ত নিঃসন্তান। গদাধরের সন্তান নাই। কালীশঙ্করের পুত্র চতুষ্টয় মধ্যে মহেশ নিঃসন্তান। হরচন্দ্রের পুত্র কালীকুমার ও শ্রীনাথ। কালীকুমার ও নবকুমার সন্তান বিহীন। শ্রীনাথের পুত্র বিমলাচরণ ও জ্ঞানদাচরণ বর্ত্তমান। ইহারাও পুরোহিত বংশ। বাড়ী উত্তর পাড়ার দক্ষিণে।

আদি পুরুষ রামদেব আচার্য্যের পুত্র রাম জীবনের পুত্র রামবল্লভ ও রামানন্দ। রামবল্লভের পুত্র মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র জীবনকৃষ্ণ ও রামজয়।

রামজয়ের পুত্র হৃদয়কৃষ্ণ। হৃদয়কৃষ্ণের দৌহিত্র প্রিয়মোহন, হরচন্দ্র ও ললিত। এই হৃদয়কৃষ্ণ অথবা হৃদয়কৃষ্ণ দারোগা একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন, তৎ সম্বন্ধে বিস্তারিত পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহারই কৃতকার্য্যে তৎবাসস্থান "বড় বাড়ী" নামে পরিচিত। জীবনকৃষ্ণের পুত্রগণ মধ্যে গৌরকিশোর নিঃসন্তান। গঙ্গানারায়ণের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র জগদ্বন্ধু ও স্বরূপ। মহেশচন্দ্রের পুত্র মহিম। মহিমের দৌহিত্র বরদাকান্ত। ঈশ্বরচন্দ্র, জগদ্বন্ধু ও স্বরূপ নিঃসন্তান গঙ্গারামের ভ্রাতা গোপালকৃষ্ণের পুত্র ভগবান ও রামচন্দ্র। ভগবান বহর মুন্সেফকোর্টে ওকালতী করিতেন। শান্তশিষ্ট ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাহার পুত্র রাজেন্দ্র ও দেবেন্দ্র। গোপাল কৃষ্ণের পুত্রগণ "বড়বাড়ীতে" বাস করিতেছেন এবং রাজেন্দ্র, দেবেন্দ্র ঐ বাড়ীতে বাস করিতেছে। রামবল্লভের পুত্র রঘু দেবেন্দ্র ও পুত্র যথা রবিলোচন, শ্রীকান্ত ও কৃষ্ণজীবন। রবিলোচনের দৌহিত্র কালীপাড়া নিবাসী ব্রজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীকান্তের পুত্র শম্ভুচন্দ্র তৎপুত্র প্রসন্ন ও রামনিধি নিঃসন্তান। "বড়বাড়ীর" দক্ষিণস্থ পুকুরের পশ্চিম পাড়ের দক্ষিণ ভাগে শম্ভুচন্দ্রের বাড়ী। শম্ভুচন্দ্রের খুল্লতাত কৃষ্ণজীবনের দৌহিত্র বংশজ শ্রীযুক্ত হিরণ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাড়ীতে বাস করিতেছেন হিরণ্য বাবু পূর্ণীয়ার জজ কোর্টের জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী। রামবল্লভের পুত্র রমাকান্তের পুত্র রাজেন্দ্র তৎভাগিনেয় নব কিশোর খাসনবিশ খাস নবিশের বাড়ী "বড়বাড়ীর" সংলগ্ন উত্তরভাগে। রতনকৃষ্ণ নিঃসন্তান। কাশীনাথের দৌহিত্র লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্তান। রামবল্লভের ভ্রাতা রামানন্দের পুত্র মনোহর ও শ্যামসুন্দর। মনোহরের পুত্র গোপীকৃষ্ণের ভাগীনেয় রামদুর্ল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্যামসুন্দরের প্রাণকৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ, শম্ভুনাথ ও কৃষ্ণমোহন নামে চারি পুত্র। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র যথা বৃন্দাবন, গোরাচাঁদ ও রামদয়াল। বৃন্দাবনের পুত্র গৌরিকান্ত, উমাকান্ত ও কৃষ্ণকান্ত। গোরাচাদের পুত্র কৃষ্ণকুমার। রামদয়ালের পুত্র চন্দ্রনাথ, শ্রীনাথ ও কালীনাথ শম্ভুনাথের পুত্র কালীচরণ, তৎ ভাগীনের জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার বাড়ী উত্তর পাড়ার মধ্যভাগে। জয়চন্দ্র কুলীন সন্তান, বহুকাল প্রথমতঃ নারায়ণগঞ্জ পরে মুন্সীগঞ্জ কোর্টে ওকালতি করিতেন। জয়চন্দ্র কয়েক জন দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক বাড়ী হইতে মুন্সীগঞ্জ যাইবার

পথে বর্ষাকালে রাত্রিযোগে নিহত হন। অশেষ অনুসন্ধানেও তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই। এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে খুনের মোকদ্দমা ঢাকা সেসন কোর্ট পর্য্যন্ত সংস্থাপিত হইয়াছিল। শম্ভুনাথের অপর পুত্র লোকনাথ নিঃসন্তান। রাজকৃষ্ণের ৫ পুত্র যথা রাধামাধব, চন্দ্রমাধব, নীলমাধব গৌরমাধব। নীলমাধব ও কমলমাধব নিঃসন্তান। এই রাজকৃষ্ণ হইতে "উত্তর পাড়া" "রাজকৃষ্ণের" পাড়া বলিয়া পরিচিত। রাধামাধবের পুত্র জগদ্বন্ধু, ব্রজনাথ ও সূর্য্যকুমার। জগদ্বন্ধু নিঃসন্তান ব্রজনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র রাজমোহন, শশিভূষণ ও অপূর্ব্ব। রাজমোহনের পুত্র উপেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্র। শশিভূষণের পুত্র যতীন্দ্র দীগেন্দ্র ও যোগেন্দ্র। অপূর্ব্ব নিঃসন্তান। ব্রজনাথ বহুকাল পুলিসে কর্ম্ম করিয়া পরিণত বয়সে পেন্‌সন ভোগ করিয়াছিলেন। সূর্য্যকুমার অথবা গুডিভ চক্রবর্ত্তী একজন খ্যাতনামা স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। সূর্য্যকুমার শৈশবকালে গ্রাম্য সরকার মহাশয় নিকট প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেন। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় কোন পাঠশালা ছিলনা। একমাত্র সরকার মহাশয়ই অধ্যাপক এবং তাহার বাস গৃহই একমাত্র পাঠগৃহ ছিল। সেখানে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, বানান, নাম লিখন, পত্র লিখন, তমঃসুক, কবালা লিখনের ব্যবস্থা, ও কড়া, কাহন, পোণ, পয়সা অঙ্ক, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া যোগ, বিয়োগ অধীত হইত। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ছিল একমাত্র "শিশুবোধ"। সরকার মহাশয় এতদ্ব্যতীত চাণক্যের, বিষ্ণুশর্ম্মার শ্লোক পাঠ করিতেন এবং ছাত্রবর্গ সে সমস্ত অভ্যস্তকরিত। শিক্ষকমহাশয় কোন নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক পাইতেন না। ছাত্রবর্গ যখন যাহা কিছু মনে করিত তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। এই দানের মধ্যে, ক্রিয়া কলাপ, পাইল পার্ব্বনে ছাত্রপ্রদত্ত "সিধা" (চাউল, ডাইল, তরিতরকারী ইত্যাদি) প্রধান। সূর্য্যকুমার এ হেন শিক্ষকের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং শৈশব অবস্থা হইতে শিক্ষনীয় বিষয় অতি নিবিষ্ট চিত্তে শিক্ষা করিতে থাকেন। সে সময় হইতেই তাহার স্থিরতা ধীরতা মনোযোগীতা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত এবং ভাবিত এ শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ হইয়া দাড়াইবে। তাহার শৈশব সহপাঠিরা নানারূপ শৈশব ধুলা খেলায় রত থাকিত, কিন্তু সূর্য্যকুমার তাহাতে আকৃষ্ট না হইয়া সর্ব্বদা পাঠে মনোযোগী রহিত।

সূর্য্যকুমার অল্পকাল মধ্যে গ্রাম্য সরকার মহাশয়ের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কোন বন্ধুর সাহায্যে কুমিল্লায় উপনীত হন এবং অর্থাভাব প্রযুক্ত কোন এক সাধারণ স্কুলে প্রবেশ লাভ করিয়া যথা সম্ভবশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকেন। অচীরে সূর্য্যকুমার তদানিন্তন প্রথিত যশা ডাক্তার গুডিব সাহেবের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন। ডাক্তার গুডিব বালকের আকৃতি প্রকৃতি ততোধিক আত্মোন্নতির চেষ্টা দেখিয়া তৎপ্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং যাহাতে তাহার শিক্ষা সৌকার্য্যের সুবিধা হইতে পারে তৎপ্রতি মনোযোগী হন এবং তৎকল্পে সমস্ত ব্যয় ভার আপন শিরে গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই বালক সূর্য্য কুমার ইংরেজি শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং তদর্থে ইংরেজি স্কুলে প্রবেশ লাভ করেন। কিয়ৎকাল গুডিব সাহেবের তত্ত্বাবধানে ও আনুকুল্যে শিক্ষালাভ করিয়া সূর্য্যকুমার তাহার পরম হিতৈষী এক প্রকার পিতৃ স্থানীয় ডাক্তার সাহেবের কলিকাতায় পরিবর্ত্তন প্রযুক্ত তৎসঙ্গে কলিকাতায় আগমন করেন এবং তাহার অনুকম্পায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া মহাত্মা গুডিভ সাহেবের সঙ্গে ইংলণ্ডে সমাগত হন এবং তত্রত্য মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ উইয়া M. D. আখ্যা প্রাপ্ত হন। সূর্য্যকুমার ইংলণ্ডে বাস কালিন একটী ইংরেজ মহিলার পাণি-গ্রহণ করেন এবং অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া তত্রত্য মেডিকেল কলেজের জনৈক অধ্যাপক পদে বরিত হন। অচিরে অধ্যাপকরূপে এবং ব্যবসায়ে সূর্য্যকুমার একজন কৃতিমান লোক হইয়া দাঁড়ান এবং অজস্রঅর্থ সঞ্চয় করিতে থাকেন। এস্থলে বলা আবশ্যক সূর্য্যকুমার ইংলণ্ডবাসকালীন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার পরম হিতৈষী ডাক্তার গুডিভ সাহেবের নাম যোগে "গুডিভ চক্রবর্ত্তী" নামে সাধারণ্যে পরিচিত হন।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কাউণ্ট মণ্টিক্রিষ্ট।

সূচনা।

ফরাসী দেশের অন্তর্গত মারসেলিস নগরে মরেল নামক জনৈক শ্রেষ্ঠি যুবক বাস করিতেন। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে অনতিকালমধ্যেই প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন। তাঁহার বহু অর্ণবপোত বাণিজ্যার্থ দেশ বিদেশে প্রেরিত হইত। মরেল অতি সজ্জন। ঐশ্বর্য্যের আনুষঙ্গিক দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার দান ধ্যান যথেষ্ট ছিল। এইজন্য সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রাষ্ট্র-বিপ্লবের অবসানে ফরাসী দেশের সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই। বীরকেশরী নেপোলিয়ান তখন কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরসহ এলবাদ্বীপে অবস্থানপূর্ব্বক প্রজাপুঞ্জকে উত্তেজিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। এদিকে ফরাসি-সম্রাট কঠোরহস্তে বিদ্রোহদমনে ব্যাপৃত ছিলেন। এমন কি সামান্য সন্দেহে প্রাণদণ্ড কিম্বা যাবজ্জীবন কারাবাসের বিধান করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না। মরেল প্রকাশ্যে নেপোলিয়ানের দলভুক্ত না হইলেও অন্তরে অন্তরে তাঁহার অভ্যুদয় কামনা করিতেন এবং গোপনে তাঁহার সাহায্য করিতে পারিলে কুণ্ঠিত হইতেন না।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এড্‌মাণ্ড ড্যানটীস।

এই সময়ে এড্‌মাণ্ড ড্যানটীস নামক ঊনবিংশ বর্ষীয় এক যুবক মরেল সাহেবের "ফেরাওন" নামক জাহাজে অধ্যক্ষের সহকারিরূপে নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকাল হইতে নাবিকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় ড্যানটীস নৌচালনবিদ্যায়

অতিমাত্রায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। এমন কি, তিনি পোতচালনকৌশলে কাপ্তান অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। ড্যানটীস লোকটী সাদাসিধা। ছল চাতুরী কাহাকে বলে জানিতেন না। জাহাজের সকল নাবিকেরাই এই কারণে তাঁহাকে ভালবাসিত।

এক বৃদ্ধ পিতা ভিন্ন এ সংসারে আপনার বলিতে ডান্‌টীসের কেহই ছিল না। ড্যানটীস পিতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন এবং প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন। বৃদ্ধেরও একমাত্র পুত্র ব্যতীত আর কেহই ছিল না। ড্যানটীসই বৃদ্ধের নয়নের মণি ও অন্ধের যষ্টি। ড্যান্‌টীস অধিকাংশ সময়ই কার্য্যব্যপদেশে সমুদ্র-বক্ষে বিচরণ করিতেন। পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের দিন গণনা করিয়া বৃদ্ধ একাকী অতিকষ্টে ক্ষুদ্র একটী কক্ষে দিন যাপন করিতেন। ড্যানটীসের পিতা যে বাটীতে থাকিতেন উহার সর্ব্ব নিম্নতলে ক্যাডারাউস নামে এক দরজী বাস করিত। ক্যাডারাউসের বয়স ২৫।২৬ বৎসর। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি। ক্যাডারাউস সময় সময় বৃদ্ধকে টাকা ধার দিত কিন্তু পরিশোধ সময়ে ফাঁকি দিয়া চতুর্গুণ আদায় করিয়া লইত। এই কারণে ড্যান্‌টীসের অনুপস্থিতিকালে ক্যাডারাউস তাঁহার পিতার সংবাদ লইত।

"ফেরাওন" জাহাজে ড্যাংগ্লার্স নামক অপর এক যুবক কেরাণীর কার্য্য করিত। এই ব্যক্তির আকৃতিতে কোনরূপ আকর্ষণীশক্তি বিদ্যমান ছিল না। বস্তুতঃ পক্ষে শঠতা, প্রবঞ্চনা এবং পরশ্রীকাতরতাই ইহার চরিত্রের ভূষণ। এই বিষধর সর্প কখন কাহাকে কোন সূত্রে দংশন করিবে সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করিত। জাহাজের কর্ম্মচারী কেহই ড্যাংগ্লার্সের ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিল না—পরন্তু তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিত। এ দিকে ড্যান্‌টীস নাবিকগণের প্রিয়পাত্র—ইহা ড্যাংগ্লার্সের নিকট নিতান্তই অসহনীয়।

ড্যানটীসের পিতা নগরের যে অংশে বাস করিতেন তাহার অল্প দূরে ক্ষুদ্র এক পল্লীতে স্পেন দেশীয় এক দল লোক উপনিবেশ স্থাপন করে। এই পল্লীর কোন এক লাবণ্যবতী যুবতীর সহিত ড্যানটীসের প্রগাঢ় প্রণয় জন্মে। যুবতীর নাম মারকেডিস। মারকেডিসের এক খুল্লতাত ভ্রাতা ভিন্ন সংসারে অপর কেহই ছিল না। ইহার নাম ফারণাণ্ড। ইহারা মৎস্য-জীবী। শৈশব হইতে একত্র প্রতিপালিত হওয়ায় মারকেডিস ফারণাণ্ডকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার

ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন। কালক্রমে মারকেডিস যখন যৌবনে পদার্পণ করিলেন, যখন তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে অনুপম লাবণ্যশ্রী ফুটিয়া উঠিল, তখন ফারণাণ্ডের ভগ্নীস্নেহ অপগত হইয়া অন্তরে প্রেমিকের অনুরাগবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। মারকেডিস তাঁহার সমগ্র হৃদয়খানি ড্যানটীসকে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি ফারণাণ্ডের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহার এ লালসা হৃদয় হইতে দূরীভূত করিবার জন্য বারবার সকাতরে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফারণাণ্ডের হৃদয়ে যে রূপবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা কি সহজে নির্ব্বাপিত হইতে পারে? ফারণাণ্ড মারকেডিসকে লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মারকেডিস তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিতা হইলেন না। এদিকে ড্যানটীসও উপযুক্ত অর্থ সঞ্চয়ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

এই সময়ে বাণিজ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে "ফেরাওন" জাহাজের কাপ্তেন পথিমধ্যে অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়েন। এমন কি তাঁহার জীবন সংশয় হয়। কাপ্তান স্বকীয় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ড্যানটীসকে আপনার নিভৃত কক্ষে ডাকিয়া কহিলেন, "ড্যানটীস তোমাকে আমি পুত্রবৎ স্নেহ করি। আমার শরীরের অবস্থা যেরূপ তাহাতে আমি যে মারসেলিস পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারি সে ভরসা খুব কম। যদি পথে আমার মৃত্যু হয় কাপ্তানের কাজের ভার তোমার উপরেই পড়িবে। তোমাকে একটী গুরুতর কাজের ভার দিতেছি—কর্ত্তব্যজ্ঞানে পালন করিতে কুণ্ঠিত হইও না।" এই বলিয়া কাপ্তান তদীয় উপাধানের নিম্ন হইতে একটী কাগজের তাড়া বাহির করিয়া বলিলেন, "তুমি কিছুক্ষণের জন্য এল্‌বাদ্বীপে জাহাজ লাগাইয়া এই কাগজের তাড়াটী স্বহস্তে নেপোলিয়ানকে দিয়া আসিবে।" ড্যানটীস কাপ্তানের আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কাগজের তাড়াটী গ্রহণ করিলেন।

এ দিকে কাপ্তান ড্যানটীসকে নির্জ্জন কক্ষে ডাকিয়া কি পরামর্শ করিতেছেন জানিবার জন্য ড্যাংগ্লার্স প্রবল কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিল, এবং কক্ষদ্বারে কান পাতিয়া কাপ্তানের সকল কথাই শুনিতে পাইল। ড্যানটীস বাহির হইবার সময় ড্যাংগ্লার্সকে চকিতের ন্যায় দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে

দেখিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে কোন সন্দেহই হইল না। ক্রমে কাপ্তানের অবস্থা শোচনীয় হইতে লাগিল, এবং পরদিন তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ড্যানটীস কাপ্তানের যথোচিত সৎকার করতঃ জাহাজ শোকসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। কাপ্তেন মৃত্যুসময়ে যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করা কর্ত্তব্য এই বিশ্বাসে যথাসময়ে জাহাজ এলবাদ্বীপে লাগাইয়া কাগজের তাড়াটী নেপোলিয়ানের হস্তে প্রদান করিলেন। নেপোলিয়ানও ড্যানটীসকে আর একখানি পত্র দিয়া তাহা ফরাসীর রাজধানা প্যারিসের কোন এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ড্যাংগ্লার্স পূর্ব্বাপরই বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিল। ড্যানটীস ফিরিয়া আসিবার কালে সে তাঁহার হাতের চিঠিখানি লক্ষ্য করিল, এবং ভাবিল এ চিঠিখানি নিশ্চয়ই নেপোলিয়ানের প্রদত্ত।

যথাসময়ে জাহাজ মারসেলিস বন্দরে পৌছিল। মরেল সংবাদ পাওয়া মাত্র সমুদ্রতীরে গমন করিলেন এবং জাহাজ শোকসজ্জায় সজ্জিত দেখিয়া বাণিজ্যদ্রব্যের অনিষ্ট আশঙ্কায় অতিমাত্র বিচলিত হইলেন। তিনি তীরস্থিত একখানি ক্ষুদ্র তরণী সহযোগে জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন এড্মাণ্ড ড্যানটীস দাঁড়াইয়া নাবিকগণকে যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতেছেন। ড্যানটীস তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য। রাস্তায় পীড়িত হয়ে হঠাৎ কাপ্তান সাহেবের মৃত্যু হয়েছে। আপনার মাল নিয়ে যে আমরা নির্ব্বিঘ্নে পৌছেছি এই ঢের।" বাণিজ্যদ্রব্য নিরাপদে পৌছিয়াছে শ্রবণ করিয়া মরেল সাহেব আশ্বাসিত হইলেন এবং একটী রজ্জু সাহায্যে জাহাজের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন। জাহাজে উঠিয়া কাপ্তানের মৃত্যুর বিষয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলেন। ইতিমধ্যে ড্যানটীস কার্য্যানুরোধে অন্যত্র গমন করিলে ড্যাংগ্লার্স মরেল সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। সে ভূমিকা করিয়া কহিল, "মশায়—কি ভয়ানক ঘটনা! শুনেছেন কি?" মরেল কহিলেন, "হাঁ, কাপ্তানের মৃত্যুর কথা শুন্‌লাম। নিয়তির গতি কে রোধ করবে বল?" এই বলিয়া মরেল সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ড্যাংগ্লার্স কহিল, "এমন লোক আর হয় না—যেমন বুদ্ধি তেমনি তাঁর স্বভাব। আর আপনার জিনিষ তাঁর গায়ের রক্ত। এই কাজ করেই মাথার চুল পেকে গেল। এঁর মত লোক পাওয়া

তার।" মরেল সাহেব অভিনিবেশ সহকারে ড্যানটীসের কার্য্যকলাপ দর্শন করিতেছিলেন। তিনি ড্যাংগ্লার্সের কথার উত্তরে কহিলেন, "ড্যাংগ্লার্স! কাপ্তানের মৃত্যুতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হলো তার আর সন্দেহ কি? তবু তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যাকে এ কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া যেতে পারে। আমার তো বোধ হয় ড্যানটীসই কাপ্তানের কাজ বেশ চালাতে পারবে। যদিও সে বুড়ো হয় নি, তবু সে অভিজ্ঞ নাবিক অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।" ড্যাংগ্লার্স ড্যানটীসের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপ-কটাক্ষ করিয়া কহিল, "ড্যানটীস ছেলে মানুষ—এখনও রক্তের গরম যায় নি। কাপ্তেন মরতে মরতেই কাউকে জিজ্ঞেস না করে নিজেই কাপ্তেন হয়ে বসেছে। তা ছাড়া দেখুন কি আক্কেল—খামখা জাহাজ দেড় দিন এলবাদ্বীপে লাগিয়ে রেখে সময় নষ্ট করেছে।" মরেল সাহেব কহিলেন, "তা ড্যানটীস ছাড়া এ গুরুতর কাজের ভার লওয়ার উপযুক্ত তো আর এখানে কেউ নেই? এতে তার আর অন্যায়টা কি হয়েছে? তবে জাহাজ কি জন্য এলবায় লাগিয়েছিল, তা আমি তাকে জিজ্ঞেস কচ্ছি।" এদিকে জাহাজ তীরস্থ করিবার জন্য ড্যানটীস উচ্চৈঃস্বরে নাবিকগণকে আদেশ করিতেছেন—নাবিকগণও আদেশমাত্র যন্ত্রবৎ তাহা প্রতিপালন করিতেছে—এই সমস্ত দর্শন করিয়া ড্যাংগ্লার্সের ঈর্ষানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে মরেল সাহেবকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মশাই দেখুন, ড্যানটীস ভাবছে সেই যেন জাহাজের কাপ্তান।" মরেল কহিলেন, "ড্যাংগ্লার্স! আমি ভেবে দেখলাম ড্যানটীসের বয়স অল্প হলেও, সে এ কাজের সম্পূর্ণ উপযোগী।" মরেলের এই কথায় ড্যাংগ্লার্সের মুখ ক্ষণেকের জন্য মলিন হইয়া গেল। জাহাজ তীরে সংলগ্ন হইলে ড্যানটীস মরেলের নিকট উপস্থিত হইলেন। মরেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ড্যানটীস! ড্যাংগ্লার্স বল্লে এলবাদ্বীপে নাকি দেড় দিন জাহাজ লাগিয়ে রেখেছিলে—মেরামতের জন্য বুঝি?" ড্যানটীস কহিলেন, "না—তা নয়, কাপ্তান সাহেবের অবস্থা যখন খারাপ হয়ে উঠলো তখন এলবাদ্বীপে নেপোলিয়ানের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটা কাগজের তাড়া আমার কাছে রেখে যান। তাঁর কথা মতই জাহাজ এলবাদ্বীপে লাগিয়েছিলাম।" মরেল এই বাক্যে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া ড্যানটীসের হাত ধরিয়া কহিলেন,—"মৃত ব্যক্তির আদেশপালন সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য হয়েছে। কিন্তু সাবধান—কথাটা খুব

গোপনে রাখিবে। এ সংবাদ যদি প্রকাশ হয় তা হ'লে বিপদ ঘট্‌তে পারে।" ড্যানটীস মরেলের এই কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, "এতে আমাদের বিপদের কি সম্ভাবনা? কাগজের তাড়ার মধ্যে কি ছিল তাতো আমি জানি না।" বস্তুতঃ পক্ষে ড্যানটীস বালক—অনভিজ্ঞ নাবিক মাত্র। রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি কখনও কোন চিন্তাই করেন নাই। তবে এতে তাঁর কি বিপদ হইতে পারে তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। ইতিমধ্যে ড্যানটীস কার্য্যান্তরে গমন করিতে বাধ্য হইলেন। ড্যাংগ্লার্সও সময় বুঝিয়া পুনরায় মরেল সাহেবের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জাহাজ এলবাদ্বীপে কেন লাগিয়ে রেখেছিল সে কথা তাকে জিজ্ঞেস করেছেন কি?" মরেল সাহেব উত্তর করিলেন, "হাঁ কাপ্তেনের আদেশেই জাহাজ এলবাদ্বীপে লাগান হয়। সেখানে বিশেষ প্রয়োজন ছিল।" ড্যাংগ্লার্স কহিল, "হাঁ ভাল কথা মনে হলো। কাপ্তেন আপনার নামে যে চিঠি দিয়ে গিয়েছিলেন তা কি আপনি পেয়েছেন?" মরেল সাহেব কহিলেন "আমার নামে কি কোন চিঠি ছিল? তুমি কোন্ চিঠির কথা বলছো?" ড্যাংগ্লার্স ইহার কোন উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে কহিল, "আমি কাপ্তেনের কামরার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম—দেখলাম কাপ্তেন সাহেব ড্যানটীসের হাতে একখানি চিঠি দিলেন—আমি ভাবলাম ওখানা বুঝি আপনাকেই লিখেছেন। আমার ভুলও হতে পারে। ড্যানটীসের কাছে আর এ কথা তুলবেন না।" মরেল এ কথার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। ইতিমধ্যে ড্যানটীস আবশ্যক সমস্ত কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া পুনরায় মরেলের নিকট উপস্থিত হইলেন। ড্যাংগ্লার্স ড্যানটীসকে দেখিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল। মরেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ড্যানটীস! কাপ্তেন কি আমার নামে কোন চিঠি দিয়েছিলেন?" ড্যানটীস কহিলেন, "না—কাপ্তেনের লিখবার শক্তি ছিল না। কাপ্তেনের কথায় আমার আর একটী কথা মনে হলো। আমি দু'সপ্তাহের ছুটী চাই।" মরেল হাসিয়া কহিলেন "তোমার বিয়ের জন্য বুঝি?" ড্যানটীস কহিলেন, "শুধু তাই নয়। আমার প্যারিসে যেতে হবে—সেখানে বিশেষ দরকার।" মরেল সাহেব কহিলেন, "জাহাজ খালাস করে মাল চালান দিতে অনেক সময় লাগিবে। সে সময় পর্য্যন্ত তোমায় আমি ছুটী দিলাম। দেখো ঠিক সময়ে হাজির হতে ভুলো না। বিনা কাপ্তানে তো আর জাহাজ

সমুদ্রে পাঠান যাবে না?" এই কথা শুনিয়া ড্যানটীস অতিমাত্র উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "আপনি কি সত্য সত্যই আমাকে কাপ্তেনের পদে নিযুক্ত কল্লেন?" মরেল কহিলেন, "ড্যানটীস! তুমি নাবিকের কাজে যেমন সুদক্ষ তাতে তোমার চাইতে ভাল কর্ম্মচারী পাওয়া অসম্ভব। তোমাকেই আমি আমার জাহাজের কাপ্তান নিযুক্ত কল্লাম।" ড্যানটীসের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি গদগদকণ্ঠে কহিলেন! "মহাশয় আপনার দয়ার সীমা নাই। বাবা এ খবর শুনলে কত খুসী হবেন!" মরেল বালকের এবম্প্রকার সরল ব্যবহারে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, "ড্যানটীস তুমি এখন বাড়ী যাও। তোমার বাবা পথ চেয়ে আছেন। আমি ড্যাংগ্লার্সের হিসাবপত্র পরীক্ষা করে পরে যাচ্ছি।" ড্যানটীস মরেলকে যথোচিত অভিবাদন করতঃ একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে উঠিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যতক্ষণ দেখা গেল মরেল সাহেব দাঁড়াইয়া ড্যানটীসের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর ড্যাংগ্লার্সের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়া তিনিও জাহাজ পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে ড্যাংগ্লার্সও কি মনে করিয়া জাহাজ হইতে নামিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ক্যাডারাউসের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পিতাপুত্র।

আজ ড্যানটীসের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না! এতদিন পর গৃহে ফিরিতেছেন পিতা তাঁহার পদোন্নতির কথা শুনিয়া কত সুখী হইবেন! ড্যানটীসের চিরপোষিত আশা অবশেষে পূর্ণ হইবার সময় উপস্থিত। তাঁহার কল্পলোকলক্ষ্মী মারকেডিস অচিরেই তাঁহার গৃহে অধিষ্ঠিতা হইবেন। এই সুখময় কল্পনায় ভাসিতে ভাসিতে রাজপথের জনস্রোত বহিয়া ড্যানটীস দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ "ফেরাওনের" আগমনবার্ত্তা তখনও শ্রবণ করেন নাই। ড্যানটীস উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বৃদ্ধ স্বহস্তরোপিত কতকগুলি পুষ্পতরুতে জলসেচন করিতেছেন। ড্যানটীস আসিয়াই পিতাকে নিবিড় আলিঙ্গন করিলেন।

অকস্মাৎ পুত্রকে সমাগত দেখিয়া আনন্দে বৃদ্ধের বাকস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি কেবল আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের হর্ষাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পিতাপুত্রে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ড্যানটীস্ তাঁহার পকেট হইতে তিন মাসের বেতনের সমস্ত টাকা বাহির করিয়া পিতার হাতে দিতে দিতে কহিলেন, "মরেল সাহেব অমোকে তাঁর জাহাজের কাপ্তান করেছেন। আপনাকে এখন থেকে আর এই ছোট্ট ঘরটীতে থাক্‌তে হবে না। আর একখানি আল্ বাড়ী করে দেব। সেখানে মারকেডিস আপনার সেবা কর্‌বে। আপনার আর একলাটী থাক্‌তে হবে না।" ইত্তিমধ্যে ক্যাডারাউস সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং বৃদ্ধের হস্তস্থিত রজতমুদ্রার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল "ড্যানটীস দেখ্‌ছি খুব বড় মানুষ হয়ে বাড়ী ফিরেছ?" ড্যানটীস্ কহিলেন, "না ভাই, এতে আমার তিন মাসের মাইনের টাকা আছে। আপাততঃ যদি তোমার দরকার থাকে কিছু নিতে পার।" ড্যানটীসের কথা তাহার বড় মনঃপুত হইল না। সে মনোভাব গোপন করিয়া কহিল, "আমার আর টাকার দরকার কি? কোন রকমে পেটটা পোষানো বৈ'ত নয়—গতর খাটিয়ে যা পাই সেই আমার ঢের।" মরেল সাহেব ড্যানটিস্‌কে কাপ্তান নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তিনি অচিরেই মারকেডিসকে বিবাহ করিবেন—এই সমস্ত শুনিয়া ক্যাডারাউস অতিশয় ক্ষুণ্নমনে সে গৃহ পরিত্যাগ করতঃ ড্যাংগ্লার্সের সহিত যাইয়া মিলিত হইল। ক্যাডারাউস যে ড্যানটীসকে ঘৃণা করিত প্রকৃতপক্ষে তা নয়; তবে ড্যানটীস্ তাহা অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিয়া সুখে থাকিবে ইহা মনে করিয়া তাহার হিংসানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

ড্যানটীস পিতার সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া মারকেডিসের সহিত দেখা করিতে গেলেন। এই সময়ে মারকেডিসের সহিত ফারণাণ্ডের বচসা হইতেছিল। ফারণাণ্ড কহিল "তুমি যার জন্য পাগল সে এতদিন কি আর তোমাকে মনে করে বসে আছে? তুমি তার আশা ছাড়।" ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ড্যানটীস্ মারকেডিসের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। মারকেডিস কহিলেন, "দেখ ফারণাণ্ড ড্যানটীস কি আমাকে ভুলিতে পারে?" এই বলিয়া দৌড়িয়া ড্যানটীসের সহিত আলিঙ্গনপাশে

পাশে বদ্ধ হইলেন। সে দৃশ্যে ফারণাণ্ডের বক্ষে শত শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ হইতে লাগিল। ফারণাণ্ড আর সেস্থানে তিষ্ঠিতে পারিল না, সে দ্রুতবেগে সেখান হইতে চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জাপানের কথা।

(২)

গুরুদেবের সঙ্গে জাপানের বড় বড় সহরগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজগুবি চিজ্, চারুকারু, চমৎকার চিত্র যেখানে যা' আছে, খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। দিন চারেক হলো আমরা কার্ণিজাওয়া এসেছি। এখানকার দেখা শুনা সব শেষ করে পরশু নাগাদ "ইচুরা" যাব। সেখানে Late Mr. Okakuraর বাড়ী। ললিতকলার অদ্বিতীয় ওস্তাদ ব'লে এর খুবই খোসনামি খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। ইনি গুরুদেবের একজনা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

কার্ণিজাওয়া সহরে একটা Women's Universityতে এখন আমরা আছি। বিস্তর জাপানী মহিলা এখানে থেকে লেখাপড়া শিখচেন। আজ সকাল বেলা অনেকক্ষণ ধ'রে দু'টী মেয়ের নিপুণ হাতের ফুল সাজানো দেখলুম। পুষ্প রচনা, এদেশের একটা সুকুমার কলা; মনের কথা এরা ফুলদল দিয়ে গাঁথতে খুব বাহাদুর। এদের প্রাণটা যেন পাপ্‌ড়ি দিয়ে গড়া। ভাব-ভঙ্গীতে, চালচলনে কথাবার্ত্তায় ফুলের গন্ধটুকু বেশ টের পাওয়া যায়। এই Universityর ছাত্রীদের দেখলেই একটা পুণ্য পবিত্রতার স্নিগ্ধ হাওয়া এসে প্রাণটাকে পরশ করে যায়।

আমরা যাঁর অতিথি হয়ে এখানে আছি, নাম তাঁর মিসেস মুচুই। তাঁর মেয়ে আমার কাছে কাল একটা সিল্কের টুক্‌রো এনে বল্লেন, তোমাদের দেশের কিছু একটা এঁকে দাও। আজ সকালে ঐ সিল্কের উপরে, আমাদের বোলপুরের তালীবনটা বড় বড় করে এঁকে দিয়েছি। সাদা সিল্কে খোলা মাঠের নীল ছবিটা বেশ খুলে ছিল। চিত্রখানি পেয়ে মেয়েটি ভারি খুসী—আহ্লাদে একেবারে ডগমগ। সঙ্গে সঙ্গেই তোফা বলে এক তরফা ডিক্রী! মিসেস মুচুইও

গুরুদেবের একটা portrait চেয়েছেন। দু'এক দিনের মধ্যে তাঁকে এঁকে দিব করে বলেছি। কতটা সফলকাম হই বলতে পারি নে। জাপানে যেখানেই যাচ্ছি, আমাকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে, ও গুরুদেবকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছেন— অনেকেই। তার মধ্যে মেয়ের ভাগই পনর আনা। গুরুদেবের হাতের লেখা ও আমার তুলির রেখা, জাপানের বহু জায়গায় এরকম ক'রে ছড়িয়ে পড়েছে।

জাপান যেন একটা মরক্কো-বাঁধানো বড় রকমের ছবির আল্‌বাম। এখানে প্রায় সবাই Artist ; "Art is concealing art" কথাটার মিহিমানে যাই থাকুক, এরা কিন্তু কিছু ঢেকে ঢুকে আঁকেনা। সব খোলাখুলি। পষ্ট পরিষ্কার। খাঁটি সত্য। কুহেলিকা কি প্রহেলিকা মোটেই পছন্দ করে না। "আলোছায়া" ছবির প্রাণ বটে, কিন্তু সেই আবছায়াটাকেও তুলির পোঁচ দিয়ে দিব্যি ফুটিয়ে তোলে। দশের কাছে দোষটা ধরা পড়ে পড়ুক—এরা যে যশের কাঙ্গাল নয়। ফুলের মত নির্ব্বিবাদে ফুটে যাচ্ছে—নদীর মত একটানা বয়ে যাচ্ছে—পাখীর মত উধাও হয়ে উড়ে যাচ্ছে। রসে মসগুল হয়ে, ভাবে বিভোর হয়ে, যোগীর মত সাধনা কচ্ছে। কুলীর কুটীর থেকে আরম্ভ করে, দরবারী দালানে, ভোজন ও ভজনালয়ে ছবির ছড়াছড়ি। তা' বলে আব্‌রুখাব্‌রু ভাবে নয়। পান-সিগারেটের দোকানের মত ঘেসাঘেসি—ঠেসাঠেসি করে, ছবিগুলিকে জ্যান্ত প্রেক বিঁধিয়ে, ফ্যাকাসেকরে, রুখিয়ে শুকিয়ে, অনাহারে মারে না। বেশ সিজিল-মিশিল করে, দেখে শুনে, কদর বুঝে—আরাধ্য দেবতার মত, একটা বিশেষ জায়গায় তার জন্য আসন পাতা হয়। যেন শ্যামসুন্দরের চির কিশোর বিগ্রহ মুর্ত্তি—ভক্তের অহেতুকী ভক্তি ও সেবকের সেবা অনুরক্তিতে অহোরাত্রি জ্বল্‌জ্বল্ কচ্ছে। নির্জীব একেবারে সজীব হয়ে—সার্থক হয়ে উঠেছে।

এখানে মেয়েদের রোজ বিকেলে গুরুদেব Lecture দিচ্ছেন। রাত্রের Dinnerটা মেয়েদের সঙ্গেই হয়। এই University থেকে ; পাঁচজনা মেয়ে, আমাদের দেশের মাইসোরে যাবেন। সেখানকার মহারাজা এদের invite করেছেন। সম্ভবতঃ এরা শীঘ্রই যাবেন। অনেক পাহাড় পর্ব্বত, টানেল নদী, বনবাদাড় পেরিয়ে এখানে এসেছি। আজ সকাল বেলা একটা খুব উচু পাহাড়ে উঠেছিলুম—volcano দেখতে ; মেঘ ছিল বলে—"ভাল করি পেখনু না ভেল।" জাপানের বড় বড় photographerকে দিয়ে আমাদের অনেকগুলি photo

তোলান হয়েছে। কল্‌কাতার ও জাপানের ফটোতে আশমান জমি তফাৎ। সামান্য রেখাটি, ক্ষুদ্র বিন্দুটিও বাদ পড়েনি। গুরুদেবের প্রত্যেক photoতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ব্যঞ্জনা—নব নব রসের সমাবেশ। চোখের ভেতর যেন আসল মানুষটা লুকিয়ে আছে।

গুরুদেবের প্রসাদে সর্ব্বত্র আমার অবাধ গতি। গুরুমন্ত্রে রাজ রাজ্‌রার ফটক আপনি খুলে যায়। জাপানের বড় বড় বুনিয়াদীর বাড়ী যাচ্ছি—সভাসমিতি, মজ্‌লিস মেলা, studio-museum তন্ন তন্ন করে দেখে বেড়াচ্ছি এমন সোণার সুযোগ বুঝি আর কখনো জীবনে ঘ'টে উঠ্‌বে না। দিন দিন আমার চোখ ফুট্‌চে। মিঃ হারার রাজপ্রাসাদে চরণধুলি দেওয়া যে সে খাঁপ্পাখাঁর কর্ম্ম নয়—আমিত Nonentity.

জাপানীদের গানটান আমার তত ভাল লাগে না। গান যেন gunএরি ছোট ভাই! বেজায় বেসুরে আওয়াজ! কলকণ্ঠের ঠন্ ঠন্ কসরতটাই বেশী রকমে কাণে বাজে। নাচটা কিন্তু নিতান্ত নধর নরম—নৃত্যকলার চূড়ন্ত বলে মনে হয়। আমাদের দেশের মত কুরুচির কুৎসিত কারদানী—আবিলতার আমেজ—আসর সরগরমের আপদ আদপে নেই। না আছে বারোইয়ারীর বেহায়াপনা—না আছে রঙ্গমঞ্চের জগঝম্প! "টা-রা-রা-রা-লা-লা-লা-লা লাফে লাফে তাল"কে এরা রেজেষ্টারী করে একেবারে তালাক দিয়েছে। চারুশীলাদের চটুলচঞ্চলচরণচালনে জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলী যেন চকিতে ফুটে উঠে। বাহুবল্লীর বিলোল বিলাস, মৃণাল ভুজের ললিত লীলা যেন হুবহু :—

"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে" কিন্তু, গানের বেলা "মধুকর-নিকরকরম্ব" খুঁজে মেলা ভার—শুধু—হ্রেষা আর হম্ব!

গুরুদেব জাপানী মেয়েদের হাতের বড়ই প্রশংসা করেন। বলেন "আমার ওদের হাতের কাজ দেখতে বড় ভাল লাগে। ওরা অই ছোট্ট ছোট্ট আঙুল গুলি কি আশ্চর্য্য রকম করে নাড়ে চাড়ে—গুছিয়ে গাছিয়ে কাজ করে, দেখ্‌লে অবাক হ'তে হয়। কি সুন্দর ওদের হাত! পৃথিবীর কোথাও এমন হাত দেখিনি। ওরা অই হাতটুকু দিয়ে যা কিছু করে সবই মধুর উজ্জ্বল হয়ে উঠে।"

আজ সারাদিন বড় সুন্দর সোণালী রোদ করেছে। ভোরের রোদ যেন কাঁচা সোণা—কখনো দুধের মত ধব্‌ধবে। আমাদের দেশের শরৎকালের কথা মনে হচ্ছে। আর প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। আকাশ—তার সব টুকু সোণা খয়েরাৎ করে দিয়েছেন—জলে থলে। প্রভাতের রোদটা সাগর জলে ঝিকমিক কচ্ছে—আর আমাদের গাঙের পাড়ের ভাঙা বাড়ীটার জন্য প্রাণটা হুহু কচ্ছে—দেশে ছুটে যাবার জন্য ইচ্ছে হচ্ছে।

৪টা বাজতে আর বেশী দেরী নেই। আর একটু বাদেই চায়ে যেতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি করে চিঠিখানি শেষ কচ্ছি।

মেয়েরা বাইরে, পাইন গাছের তলায় টেবিল-চেয়ার সাজাচ্ছেন। এই সমস্ত বিদুষী মহিলারা সম্প্রতি পাশ করে বেড়িয়েছেন। এরা রাতদিন আমাদের জন্য খাটচেন। সেদিন আমি ওদের সাথে এক সঙ্গে serve করেছিলুম। শেষে আমার একেলার খাবারের জন্য, পরে সকলে মিলে serve কল্লেন। কাজেই সাহায্য কত্তে গিয়ে, যখন কাজ আরো বেড়ে গেল, তখন অগত্যা বাধ্য হয়ে ক্ষান্ত দিলুম।

মিসেস টাইকণ, মিসেস হারা, মিসেস মুচুই আমাকে ঠিক ছেলের মত দেখেন—কত আদর--আব্‌দার করেন। কখনো বলেন "আমেরিকা গিয়ে আর বেশী কি শিখবে—এখানে বছর দুই থেকে জাপানী ধরাণটা বেশ করে আয়ত্ত করে নাও আর যদি নেহাৎ মার্কিনমুল্লুকে যাও, দেশে ফিরবার সময় অবশ্য জাপান হয়ে যেও।" এদের কথা শুনে বাড়ী হ'তে জাপান যাবার সময় মায়ের করুণ মুখখানি মনে পড়তে লাগলো।

জাপানটা যেন দিন দিন আমার জপমালা হয়ে উঠছে। একটা জীবনীধারা শিরার ভেতর দিয়ে অহরহ বয়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকিত জাপানে আর একবার আসতেই হবে। জাপানে এসে অনেক দিনের জড়তা থেকে হঠাৎ জেগে উঠে কেবলি শুনচি "অবাক জলপান।"

শ্রীমুকুলচন্দ্র দে।

স্নেহের বন্ধন।

(গল্প)

হরিদ্বারের চারিদিক বেড়িয়া কলনাদিনী জাহ্নবী কুলু কুলু নাদে বহিয়া চলিয়াছে। যশোবন্ত রাম গঙ্গাতীরবর্ত্তী গিরি-গৃহের ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে গঙ্গার নীল বারিরাশি ও তাহার উন্মাদ তরঙ্গলীলা নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার দৃষ্টি স্থির, অপলক—যেন অন্তরের অস্বস্তি চোখে ফুটিয়া উঠিতেছিল। অদূরে রাজপথে যাত্রীরদল আসিতেছে যাইতেছে। তাহাদের কলরব, ঝরণার ঝর্ ঝর্ শব্দ—কিছুতেই তাহার ব্যাকুল মনকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আজ তাহার অতীতের স্মৃতিগুলি কেবলি থাকিয়া থাকিয়া হৃদয়ে জাগিতেছিল। স্মরণ হইল—তাহার ক্ষুদ্র পল্লীর কথা, যেখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথম সে সূর্য্যালোক দেখিয়াছিল, শৈশবের কত মধুময় চিত্র; তারপর জীবনধারণের জন্য দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম; তাহার স্ত্রী—যে হতভাগিনী সংসারে একমাত্র তাহাকেই আশ্রয় অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে বন্ধুর সংসারপথে অগ্রসর হইতেছিল, এবং তাহার একমাত্র বংশের দুলাল, নয়নানন্দদায়ক বালক পুত্র—সকল ছাড়িয়া আজ সে ত্যাগী, সন্ন্যাসী! সবগুলি স্মৃতিই আজ একে একে উদিত হইয়া তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। এই সুদীর্ঘ বর্ষগুলি সে কেবলি মুক্তির অন্বেষণে কত স্থান, কত তীর্থ, কত গিরিগুহা পরিভ্রমণ করিয়াছে—স্ত্রীপুত্রের কোনই সংবাদ রাখে নাই। এবার তাহাদের অবস্থা সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবে। মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার সেই সোনার শৈশবের চিরপরিচিত দৃশ্যাবলী ও প্রিয়জনের মুখ দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিবে।

সন্ন্যাসী যশোবন্তের পক্ষে ভ্রমণ স্বভাবগত অভ্যাস। ভিক্ষার ঝুলিটি গিরিগৃহের একপার্শ্ব হইতে তুলিয়া অপর হস্তে যষ্টিখানা লইয়া তৎক্ষণাৎ সে যাত্রা করিতে উদ্যত হইল। তাহার সঙ্গী সন্ন্যাসিগণ বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছ?" বৃদ্ধ যশোবন্ত প্রশ্নকারীর দিকে ফিরিয়া ধীরস্বরে উত্তর করিল, "মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার জন্মেরমত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম। আমার বিশ্বাস জগদীশ্বরই

আমার হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছেন।" অপর সন্ন্যাসী যশোবন্তের দিকে চাহিয়া অর্দ্ধঅবজ্ঞার স্বরে প্রশ্নকারী সন্ন্যাসীকে বলিল, "দেখ দেখ বৃদ্ধের পা কিরূপ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। মনে হয় ওর দেহভার কিছুতেই এ পাছুখানি বহন করিতে পারিবে না। আত্মীয় স্বজনের এখানে আসাই উচিত, বৃদ্ধের শেষ আকাঙ্ক্ষাটা অন্ততঃ পূর্ণ হওয়া দরকার।" দৃঢ়সঙ্কল্প যশোবন্ত কিন্তু এ সকল উপহাসের দিকে দৃক্‌পাতও করিল না, যতই সে বন্ধুর পার্ব্বত্য ভূমির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে ভগবানের ইচ্ছা দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল। তাহার মনে যৌবনোচিত দৃঢ়তা আসিয়া তাহাকে পথবাহনে নূতন শক্তি প্রদান করিল।

সে একবার ফিরিয়া তাহার বহু বর্ষব্যাপী সাধনার স্থানটীকে শেষ দেখা দেখিয়া লইল, পরক্ষণেই অধিকতর আগ্রহ ও দৃঢ়তার সহিত গন্তব্যপথে চলিতে লাগিল। জনকোলাহলমুখরিত নগরের রাজপথে সে ক্ষণকালের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল—যাত্রীদের আনাগোনা, ব্যবসায়ী ক্রেতাগণের যাতায়াতে নগরের সমস্ত রাজপথটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। অদূরে পবিত্র হরপেরি ঘাটে স্নানার্থীগণ পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক স্নান করিতেছিল; দোকানে দোকানে নানাপ্রকার নয়নমনমুগ্ধকর দ্রব্য স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে; রক্তমুখ বানরযূথ আহারের সুযোগান্বেষণে এক বাড়ী হইতে অপর বাড়ীতে লাফালাফি করিতেছিল; একপাল গরু রাখালের দেহ লেহন করিতেছিল; ভিক্ষুকেরদল নিকটস্থ যাত্রীকে ভিক্ষার জন্য ঘ্যান ঘ্যান করিয়া উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু যশোবন্তের মন এসব বিষয়ে মোটেই আকৃষ্ট হইতেছিল না। তখন তাহার মন প্রশান্ত, অবিক্ষুব্ধ। সে নীরবে সংকীর্ণ হইতে হইতে সংকীর্ণতর গলিঘুঁজি ঘুরিয়া নগরের উপকণ্ঠে পৌঁছিল। তাহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল—নগরের দূষিত বায়ু ও জনকোলাহল!

(২)

হিমালয়ের গাত্র বাহিয়া যশোবন্তের বাড়ী যাইবার পথ। বৃদ্ধ যশোবন্ত বন্ধুর শিলাকীর্ণ পথে চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। পা যেন আর কিছুতেই চলিতেছিল না। তবু চুম্বক যেমন লৌহকে সবলে টানিয়া লয়, তেমনি দূর দেবদারু-তরু-কুঞ্জের ভিতর দিয়া যে পথ তাহার প্রিয়তম পল্লীভবনে

যাইয়া পৌঁছিয়াছে, সেই পথের দিকে সে তাহার শ্রান্তক্লান্ত দেহকে যুবকের ন্যায় অদম্য উৎসাহে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। এমনি করিয়া সে দিনের পর দিন পথ চলিতে লাগিল। সে দীর্ঘ পথ শেষ হইবার তখনও অনেক বাকী। একদিন সন্ধ্যার সময়ে যশোবন্ত এক উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আসিয়া পৌঁছিল। কি সুন্দর স্থান! কি মধুর শীতল বাতাস! দেবতার আশীর্ব্বাদের মত পর্ব্বতের স্নিগ্ধ-শীতল বায়ু এক নিমেষেই তাহার ক্লান্তি দূর করিয়া দিল।

একি! ঐ যে দূরে অস্তগামী তপনের লোহিত-রাগরঞ্জিত তুষার-ধবল শৃঙ্গের পদতলে সমতল ভূমির উপর তাহার পল্লীভবন! ঐ না সেই ছায়া-শীতল গ্রামখানির গাছপালাগুলি অস্পষ্ট মেঘের ন্যায় দেখাইতেছে, ঐ না পাহাড়ের ছায়াকে গাঢ়তর করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার গ্রামখানিকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে! ঐ যে ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট একটা বড় গাছ দেখা যাইতেছে, উহারই ছায়া-তলে না তাহার বাসগৃহ? আরও দূরে উহারই পাশ দিয়া না পুণ্যতীর্থ বদ্রিনাথের শীর্ণবক্র পথখানি আঁকিয়া বাঁকিয়া তুষারধবল-গিরিশৃঙ্গের পশ্চাতে যাইয়া লুকাইয়াছে? হায় মূর্খ সন্ন্যাসী! এত দিন কিসের ধ্যানধারণা করিয়াছ? "বাবা বদ্রিনাথ! একবার—একবার নিরাপদে এ অবসন্ন স্থবিরকে ঐ পরিত্যক্ত পল্লীভবনে পৌঁছাইয়া দাও, যেন যৌবনে যাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, আজ জীবন-সায়াহ্নে একবার তাহাদিগকে দেখিয়া শান্ত-শীতল মরণের কোলে আশ্রয় লইতে পারি। বৃদ্ধ নয়নজল মুছিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে একটা অরণ্য-পথ ধরিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এপথ তাহার চির-পরিচিত, শৈশবে এপথ দিয়া সে কতবারই না যাতায়াত করিয়াছে। এ সরল বন-পথে তাহাদের গ্রাম বড় বেশী দূর নহে।

গ্রামের সীমান্তে আসিয়াই সহসা যশোবন্তের মনে হইল, বরাবর বাড়ী যাওয়া উচিত হইবে না। সে স্থির করিল গ্রাম্য শিবমন্দিরের সেবায়েত ঠাকুরের নিকট স্ত্রীপুত্রের, আত্মীয়-স্বজনগণের এবং পল্লীর অবস্থাদি কৌশলে জানিয়া লইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবে। সঙ্কল্প করিয়া সে গ্রাম্যপথ ছাড়িয়া সোজাসুজি জঙ্গলাপথে যন্ত্রচালিতের ন্যায় মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং অবিলম্বে মন্দিরের ক্ষুদ্র চত্বরে আসিয়া পৌঁছিল। রাখাল বালক-গণ তখন গরু মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগুলিকে লইয়া সেদিনকার মত

যে যাহার ঘরের দিকে ফিরিতেছিল। গ্রামের কোলাহল ক্রমেই নীরব হইয়া আসিতেছিল। মাঠ হইতে কৃষকগণ সেদিনের মত দৈনিক কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। কিন্তু হায়! যশোবন্ত দেখিল মন্দির নীরব, নিস্তব্ধ! মন্দিরে আলো নাই, জনমানবের সাড়াশব্দও নাই। মন্দির পরিত্যক্ত ও দেবমূর্ত্তি ধূলি-ধূসরিত। বৃদ্ধ যশোবন্ত কিয়ৎকাল নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং অবিলম্বেই বুঝিতে পারিল, তাহাদের সেই পরিচিত পুরোহিত আর বাঁচিয়া নাই। একবিন্দু অশ্রু অলক্ষ্যে আপনা আপনি সন্ন্যাসীর নয়নযুগল হইতে ঝরিয়া পড়িল। সন্ন্যাসী একটা দীর্ঘ তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া সেইস্থানে বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকিয়া তাহার মন অনেকটা শান্ত হইল। নিকটস্থ পুষ্পোদ্যান হইতে পুষ্প ও বিল্বপত্র আহরণ করিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া, তাহার পথশ্রমে শ্রান্তক্লান্ত দেহভার দেবমূর্ত্তির পদতলে এলাইয়া দিল। অবিলম্বেই সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

(৩)

যশোবন্তের যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা অনেক হইয়াছে। চক্ষু মেলিয়াই সে অনুমান পনর বৎসর বয়স্ক একটী দীর্ঘাকার বালককে তাহার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিল। তাহাকে দেখিয়াই সে উঠিয়া বসিল। বালক তাহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, যশোবন্ত ইঙ্গিতে তাহাকে থামাইয়া বলিল, "বৎস, কোথা হইতে আসিয়াছ?"

বালকটী মাথা নীচু করিয়া প্রশ্নকারীকে মনোযোগের সহিত দেখিয়া বলিল "মহাশয়, ঐ যে অদূরে একটী ঝুলান সেতু দেখিতে পাইতেছেন, আমি ঐ সেতুর রক্ষক।" বৃদ্ধ দেখিল, দূরে পার্ব্বত্য তরঙ্গিনী বহিয়া যাইতেছে। মৃদু বায়ুভরে নদীর স্বচ্ছ বারিরাশি রূপার ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে; আর তাহারই উপরে একটী কাল রেখার ন্যায় অবস্থিত বালক বর্ণিত সেতুটী। বালকটী গর্ব্বভরে বলিতে লাগিল, "ইহা একটী ঝুলান পুল। শিকলের উপর অবস্থিত। আমি একাকীই ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করি। দেখুন অনেক ভারবাহী পশু ইহার উপর দিয়া আসা যাওয়া করে। এই পুলের অবস্থা সম্বন্ধে রোজই আমাকে বড়সাহেবের নিকট "রিপোর্ট" করিতে হয়।" যশোবন্ত বালকের দিকে ফিরিয়া, মৃদুহাস্য

করিয়া বলিল, "তুমি বালক হইয়া এরূপ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ চাকুরী গ্রহণ করিয়াছ? কিরূপে তুমি একাজ পাইলে?" প্রশ্ন শুনিয়া বালকের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। সে কাঁদকাঁদ স্বরে বলিল, "আমার হতভাগিনী মা'র জন্য। আমি ছাড়া তাঁহার আর কেহই ছিল না। আমি যখন খুব ছেলেমানুষ তখন আমার পিতা সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যান। আমি বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত মা আমার কঠোর পরিশ্রমে ও যত্নে আমাকে প্রতিপালন করেন। কিন্তু হায়! একদিন অকস্মাৎ একটা পাথর চাপা পড়িয়া তিনি একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়েন। আর উপায়ান্তর না দেখিয়া তখন আমি একদিন সাহেবের নিকট যাইয়া এই সদ্যনির্ম্মিত পুলটার রক্ষকের পদপ্রার্থী হইলাম।" "সাহেব কি বলিলেন?"—বৃদ্ধ বালকের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মনে মনে ভাবিল, এই কি তাহার পুত্র যাহাকে দেখিবার জন্য সে আজ এত দূরে উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়াছে? তাহার হৃদয় তখন আনন্দে, অনুতাপে অধীর হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে পিতৃত্বের গর্ব্বে তাহার লুক্কায়িত পুত্রস্নেহের উৎস উছলিয়া উঠিল। কোনপ্রকারে নিজকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে বালকের কাহিনী শুনিতে লাগিল। বালক বলিল, "সাহেব আমার প্রার্থনা শুনিয়া হাসিলেন, পরে বলিলেন, "তুমি বালক, একার্য্য তোমার অসাধ্য। এই কাজে একজন কর্ম্মঠ যুবকের প্রয়োজন।" আমি আমার ও আমার মাতার দারিদ্র্যের কথা, অনাহারের কথা বলিয়া একবার আমাকে চাকুরীটি দিয়া পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলাম। সাহেব অনেকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কত কি ভাবিলেন, পরে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। আমি চাকরী পাইলাম।" যশোবন্ত মৃদুস্বরে অথচ আগ্রহপূর্ণস্বরে প্রশ্ন করিল, "তোমার মা—তাহার কি হইল?" বৃদ্ধ আর বলিতে পারিলনা, তাহার স্বর উৎকণ্ঠায় কাঁপিতেছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হইল। বালক বলিল, "তিনি বাঁচিয়া নাই। যখন জীবনধারণ দুঃসহ হইয়া উঠে, শোকে দুঃখে অনাহারে, অনিদ্রায় শরীর নুয়ে পড়ে তখন আর লোকে কিরূপে বাঁচিতে পারে? আর আমার পিতা, যশোবন্তরাম, যে দিন হইতে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সেই দিন হইতে তাঁহার আর কোনই সংবাদ পাই নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে বালকের স্বর কাঁপিয়া উঠিল, বদনমণ্ডল রক্তিম আভা ধারণ

করিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজকে সামলাইয়া লইয়া যশোবন্তকে জিজ্ঞাসুর স্বরে বলিল, "আচ্ছা দেখুন, যাহাকে আশ্রয় করিয়া আমরা দু'টী প্রাণী বন্ধুর সংসারপথে চলিতেছিলাম, তিনি নিজ মুক্তির জন্য, সিদ্ধিলাভের জন্য আমাদিগকে সহায়হীন সম্বলহীন, দয়ার ভিখারী করিয়া চলিয়া যান, ইহা কি তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে?" এসকল শুনিয়া যশোবন্তের মনে ধিকার উপস্থিত হইল। তাহাকে যেন শত বৃশ্চিক একসঙ্গে দংশন করিল। এই সুদীর্ঘ বর্ষব্যাপী সাধনা—যাহা তাহাকে সিদ্ধির পথের শেষ প্রান্তে লইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার ধারণা ছিল তাহা যেন এক নিমেষে ব্যর্থ বলিয়া মনে হইল—তাহার ভুল ভাঙ্গিল। সে শুষ্কমুখে, অনুতপ্ত হৃদয়ে উত্তর দিল, "না বৎস, একখনও সঙ্গত হইতে পারে না। আমার বিশ্বাস তাহার সিদ্ধিলাভ হয় নাই।" যশোবন্ত সতৃষ্ণ নয়নে বালকের দিকে চাহিয়া রহিল।

বালকটী কিছুকাল মৌনভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, "মহাশয়, আর আমি বিলম্ব করিতে পারি না। আজ তবে আসি। এখন এই পুলটীই আমার একমাত্র আকর্ষণ স্থল। এই পুলটীই আমার সর্ব্বস্ব—আমার ইহকাল পরকাল, আমার যা'কিছু সবই এই পুলটী। ইহাকে ছাড়িয়া আমি বেশীক্ষণ অন্যত্র থাকিতে পারি না। তবে যদি বলেন, আর আমার সহায়তার অভিলাষী হন তবে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় আসিয়া, প্রাণপণে আপনার কাজ করিব।" ইহা বলিয়া বালকটী বৃদ্ধকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল তাহার কথাগুলি জনমানবহীন প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

যশোবন্ত স্নেহবিহ্বলনেত্রে তখনও বালকের দিকে চাহিয়া রহিল। কি প্রকারে যে আত্মপরিচয় প্রদান করিবে? এখন কেমনে সে বলিবে, হায় উপেক্ষিত বালক! আমিই তোর সে নির্ম্মম নিষ্ঠুর পিতা। এত বর্ষের অবিচার অনাদর কি করিয়াই বা সে পূর্ণ করিবে? সে ভাবিল, "আরও কিছু কাল অপেক্ষা করি। যখন দেখিব সে আমাকে অপরিচিত বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যখন উহার মন সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তে আসিবে তখনই আমি উহাকে পরিচয় দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। এই সরলচিত্ত বালক পিতার সকল অনাদর অবিচার নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাইবে।"

সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া গেল। বৃদ্ধ পুত্রের সাহচর্য্যে দিনগুলি অত্যন্ত সুখে কাটাইয়া দিতেছিল। প্রতিদিন দুইবেলা বালক পাহাড় হইতে নামিয়া মন্দিরে আসিত এবং আহারান্তে চলিয়া যাইত। কখনও বা যশোবন্ত অতিকষ্টে লাঠিভর করিয়া পাহাড়ের উপর সেতুপার্শ্বে রক্ষকের ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া যাত্রীদের আনাগোনা দেখিত। যখন সে দেখিত কোন পিতা পুত্র কন্যাদের জন্য খাদ্যাদি লইয়া ত্বরিত গতিতে দিনশেষে গৃহে ফিরিতেছে, তাহাদের মুখমণ্ডলে দিবসের কঠোর পরিশ্রমজনিত শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হইয়া গিয়াছে, প্রিয়জনের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাহারা সাগ্রহে পথ চলিতেছে তখন বৃদ্ধ নিজ অতীত জীবনের প্রতি ক্রমেই বীতরাগ হইয়া পড়িত। যশোবন্তের পল্লীতে একবার বিসূচিকার প্রকোপে অনেক লোক মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হয়, সেই সঙ্গে গ্রাম্য মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুরও মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুরোহিতের মৃত্যুর পর হইতে যশোবন্তের আগমনের পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত দেবতার দৈনিক পূজা হয় নাই। যে যশোবন্ত চৌদ্দবৎসর পূর্ব্বে দেশ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিল, তাহাকে আজ সম্মুখে পাইয়াও কেহই চিনিতে পারিল না।

দিন দিন যশোবন্তের ও বালকের মধ্যে প্রীতিশ্রদ্ধার ভাব গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল কিন্তু তবু সাহস করিয়া যশোবন্ত আত্মপরিচয় দিতে পারিল না। ভাবিল "আরও কিছু সময় অপেক্ষা করি। যে পর্য্যন্ত না বালকের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে পারি, সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব।"

গ্রীষ্মকালের শেষভাগে একদিন এই শান্তিময়ী পল্লীতে একটা সার্ব্বজনীন আতঙ্ক ও আশঙ্কার কথা প্রচারিত হইল। একদল ভুটীয়া ব্যবসায়ী পাহাড়ের উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া প্রচার করিল যে পাহাড়ের উপর একটা ভয়ঙ্কর ঘূর্ণীবাতাস বহিয়া গিয়াছে। পার্ব্বত্যহ্রদ জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, শীঘ্রই সেই জল সমতল ভূমিতে একটা সাংঘাতিক বন্যা আনয়ন করিবে। ক্রমশঃ জনরব চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। শান্তিপ্রিয় গ্রাম্য নরনারী ভীতত্রস্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল যখন জলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল নীচের দিকে প্রবাহিত হইবে তখন যে তাহাদের সাধের বাসভবন তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব ভাসাইয়া লইয়া যাইবে!

ক্রমে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আসিয়া একজন লোক দিয়া প্রতি পল্লীতে প্রচার করিয়া দিলেন, "যখন বর্ষা আরম্ভ হইবে, সকলেই যেন যার যার বাড়ী ঘর ছাড়িয়া, জিনিষপত্র সব ছাড়িয়া উচ্চতর পর্ব্বতে আশ্রয় লয়। এবার খুব ভয়ঙ্কর বন্যা হইবে। এমন বন্যা হইবে যে কিছুই রাখিয়া যাইবে না।"

সাহেবের এই আদেশের বিরুদ্ধে কেহ কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিল না। বাধ্য হইয়া দলে দলে নরনারী জীবন বাঁচাইবার জন্য সাধের পল্লীভবন ত্যাগ করিতে লাগিল। বালক সেতুরক্ষকও সজল নয়নে যশোবন্তের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমি কেমন করিয়া আমার এই প্রাণাধিক প্রিয় পুলটীকে বিপদের মুখে ফেলিয়া জীবন বাঁচাইব ?" সে কাঁদিয়া ফেলিল। "আমার হাত পা কর্ত্তব্যের নিগড়ে বাঁধা। যে আমাকে খাইতে দিতেছে তাহাকে বিপদের মুখে রাখিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিনা।"

বৃদ্ধ করুণস্বরে বলিল, "কিন্তু বৎস! আমি যে তোমাকেই চাই। তুমি যে আমার পুত্রাধিক প্রিয়তর।"

বালক নম্রভাবে উত্তর করিল, "মহাশয়! আপনি গৃহত্যাগী, সন্ন্যাসী, আমার ন্যায় একটা হতভাগার জন্য আপনার এত আশঙ্কা কেন? আমার অভাবে একবিন্দু অশ্রুত্যাগ করে এমনও যে কেহ নাই।" বৃদ্ধ অনুনয়ের স্বরে বলিল, "কিন্তু তুমি ত সেতুটা রক্ষা করিতে পারিবে না; তবে কেন জীবনটাকে এরূপ বিপদের মুখে ফেলিয়া দিতে চাও? জান ত আত্মহত্যা মহাপাপ।" বালক ভৎর্সনার স্বরে উত্তর করিল, "ইহা কি আমার কর্ত্তব্য নহে?"

বৃদ্ধ চুপ করিল। একদিন যাহাকে বিবেকের খাতিরে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে আজ তাহার উপর আর তাহার কি দাবী আছে? সে তো পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য পালন করে নাই?

তাহারা উভয়েই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া দূর পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গে পুঞ্জীকৃত মেঘরাশির তাণ্ডবলীলা দেখিতেছিল; এমন সময় ক্রমাগত বজ্র-নিনাদে তাহারা উভয়েই শিহরিয়া উঠিল। বালক তখন দাঁড়াইয়া তাহার প্রিয় সেতুটীর নিকট ফিরিয়া যাইতে ব্যস্ত হইল। যাইবার সময় যশোবন্তকে বলিয়া গেল, "মহাশয়, নমস্কার! আজ রাত্রেই হয়ত ভীষণ ঝড়ঝঞ্ঝা বহিবে,

সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বন্যাও হইবে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে মরণকে আলিঙ্গন করিতে পারি।"

বালকটী যে পথ দিয়া চলিয়া গেল, বৃদ্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেইদিকে উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে চাহিয়া রহিল, কিন্তু যখন বালককে আর দেখা গেল না, তখন বৃদ্ধের মন যেন অধীর হইয়া উঠিল, সে একটা অজ্ঞাত প্রেরণায় আপনাকে পুত্রের আসন্ন মৃত্যুপার্শ্বে স্থিরভাবে দাঁড় করাইতে প্রস্তুত হইল। তাহার মনে আর কোন সংশয়ই রহিল না। আজ সে পঞ্চদশবর্ষব্যাপী অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসংকল্প। পুত্রের মৃত্যুকালে সে ত' অন্ততঃ মৌখিক সান্ত্বনাও দিতে পারিবে ?

আবার গভীর নাদে বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল, রৌদ্রদগ্ধ ধরণীর তপ্তবক্ষে প্রবল-নাদে বর্ষণ আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে শত বজ্রনিনাদের ন্যায় প্রবল শব্দে দূর-দিগন্তনিলীন বিশাল পর্ব্বতবক্ষঃ ভেদ করিয়া বন্যার বারিরাশি ছুটিয়া আসিতে লাগিল। যশোবন্ত দ্রুতগতিতে পুত্র যে পথে তাহার কুটীরে গমন করিয়াছে সেই পথ লক্ষ্য করিয়া উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া চলিল। অনতিকালমধ্যেই সে সেতুর সম্মুখে আসিয়া, ঘন ঘন বিদ্যুদালোকে দেখিল, তাহার পুত্র অপলক দৃষ্টিতে সেতুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। পিছন ফিরিয়া চাহিতেই সে বৃদ্ধকে অদূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "পালান, মহাশয়, শীঘ্র পালান। দেখুন জলরাশি কিরূপ গর্জ্জন করিতেছে, কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে!"

কিন্তু যশোবন্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না তাহা হইতে পারে না। আমিও যে এ সময় তোমারই সঙ্গী হইতে আসিয়াছি! এ অধিকার আমার আছে, আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছি। এখন আর আত্মগোপন করিব না। শোন বৎস! আমিই তোমার নিরুদ্দিষ্ট পিতা—যে স্বার্থান্ধ তোমাদিগকে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিতে দিয়া পনর বৎসর পূর্ব্বে একদিন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, আমিই সেই হতভাগ্য। আমি যদি এরূপ না করিতাম হয়ত আজ তোমাকে এমন করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইত না।"

বালক বজ্রাহতের ন্যায় এক দৃষ্টিতে বক্তার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মস্তকের একগাছি চুলও নড়িতেছিল না। এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া, হঠাৎ

তাহার মুখমণ্ডল হইতে বিস্ময়ের ভাব অপসারিত হইয়া আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ভগবান আমাকে রক্ষা কর, আমি কি পাপী! বাবা, বাবা! আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি আপনাকে না চিনিয়া আপনার সম্বন্ধে কত কি অন্যায় কথা বলিয়াছি।" ইহা বলিতে বলিতে সজল নয়নে বালক পিতার পদতলে পড়িয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

(৫)

বালক প্রকৃতিস্থ হইয়া একটী লণ্ঠন সাহায্যে জল বৃদ্ধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। এতদিন পর পিতাপুত্র পুনর্মিলিত হইয়া মুখামুখি হইয়া সাগ্রহে ও সানন্দে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে চলিয়াছে সুতরাং কথা বার্ত্তার কোনই প্রয়োজন ছিল না। বালকের অন্তরে ও বাহিরে এক স্বর্গীয় শান্তি নীরব আনন্দে নিবিড় হইয়া আসিতেছিল। উভয়েই উভয়ের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল। সহসা একটা দম্‌কা বাতাসে লণ্ঠনটী নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তখন বালকটী অন্ধকারে হাতড়াইয়া কুটীরে প্রবেশ করিল, পরক্ষণেই পাঁচটী তৈলপূর্ণ ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপ লইয়া বাহির হইয়া আসিল। নদীতীরে সেই পাঁচটী প্রদীপ জ্বালাইয়া এবং উহা পর পর উচ্চতর স্থানে রাখিয়া বৃদ্ধকে বলিল, "জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ইহার এক একটী নির্ব্বাপিত হইবে।" এই সময় ঝড় বৃষ্টি থামিল, বালক দীপ জ্বালা শেষ করিয়া বৃদ্ধের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়া একটা ঘূর্ণী বাতাস হুহু করিয়া ছুটিয়া আসিল। একটা ভীষণ শব্দ দেখিতে দেখিতে প্রথম অলোকটী নিভাইয়া দিয়া কোথায় ছুটিয়া পলাইল। আবার সব নীরব! কিয়ৎকাল পরে আবার ভীষণ রবে বায়ু ছুটিয়া আসিয়া দ্বিতীয় আলোটি নিভাইয়া দিল জল দ্বিগুণ বেগে বাড়িয়া চলিল। তারপর, লুটিয়া ছুটিয়া ভৈরব গর্জ্জনে জল কেবলি বাড়িতে লাগিল একে একে সবগুলি আলো নিভিয়া গেল। তুমুল ঝড়ের হাওয়ায়, স্রোতের প্রবল আঘাতে দৃঢ় গ্রথিত সেতুর স্তম্ভ নড়িয়া উঠিল। একে একে কাষ্ঠাবরণী খসিয়া ছুটীয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আকাশে মেঘে মেঘে গভীর গর্জ্জনরব, বিদ্যুতের তীব্র অট্টহাসি। বৃদ্ধ যশোবন্ত সব ভুলিয়া আজ এতকাল পরে ঈশ্বরের প্রেম ভুলিল, যে হৃদয়ের স্নেহের বন্ধনকে সে একদিন সবলে ছিঁড়িয়া

ফেলিয়া গিয়াছিল, আজ সে বন্ধনের প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে সেই ভগ্ন সেতুর পার্শ্বে—যেখানে কিশোর সেতুরক্ষক দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে অতি কষ্টে হাত বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে সজোরে বুকে টানিয়া লইল। *

শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

ইদিলপুর কি বিক্রমপুরের সীমান্তভুক্ত ?

বিগত বিক্রমপুর সম্মিলনের ডোমসার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পর উক্ত সভা-মণ্ডপে বিক্রমপুর সম্মিলনীর নবগঠিত চিকন্দী শাখার একটি অধিবেশন হয়। তাহাতে বর্ত্তমান ইদিলপুর পরগণা বিক্রমপুর পরগণান্তর্গত কি না এবং না হইলে কার্ত্তিকপুর কিরূপে বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে তাহা লইয়া একটুকু আন্দোলন চলে, আমরা এখানে সে প্রশ্ন লইয়াই আলোচনা করিব।

প্রাচীন তাম্রশাসন ও কুলগ্রন্থাদি হইতে জানিতে পারা যায় যে হিন্দু শাসন সময়ে ইদিলপুর বিক্রমপুরেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং উহার পৃথক কোনও নামের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায় না। শ্যামলবর্ম্মা কর্ত্তৃক বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত বেজনীসার, সামন্তসার প্রভৃতি গ্রাম এখনও ইদিলপুরান্তর্গত। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, চাঁদ ও কেদার রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করায় উক্ত বৈদিকগণ ঐ সমস্ত ভূমির কর দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া শ্যামলবর্ম্মা দেবের অপর তাম্রশাসন হইতে উদ্ধৃত, বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভুক্তান্তে—পূর্ব্বে নাগরকুণ্ডা দক্ষিণে ধীপুর পশ্চিমে লঙ্কাচুয়া, উত্তরে কুলকণ্ঠী চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূমি, ও যে বর্ত্তমান ইদিলপুরেই অবস্থিত, তাহা এঅঞ্চলবাসীর পক্ষে বুঝিতে মোটেই কষ্টকর নহে। কাজেই হিন্দুশাসন সময়ে যে ইদিলপুর বিক্রমপুরান্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু কথা হইতেছে যে প্রাচীন বিক্রমপুর (হিন্দু শাসন-

---

* E Hobart-Hampdenএর ইংরেজী গল্পাবলম্বনে—লেখক।

কালের, ও বর্ত্তমান বিক্রমপুরে কোনও পার্থক্য আছে কিনা? পরগণা মুসলমানী শব্দ। হিন্দুশাসন সময়ে পরগণা বিভাগ ছিল না। তখন ইদিলপুর বিক্রমপুরভুক্তি বা ভাগেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় বলেন যে, হিন্দুশাসন সময়ে এক একটি "ভুক্তি" বহু "মণ্ডলে" এবং এক একটি "মণ্ডল" বহু "বিষয়ে" বিভক্ত হইত।' অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন যে মুসলমান শাসন সময়ে ঐ মণ্ডলগুলিই পরগণায় পরিণত হয়। ইহা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে বর্ত্তমান জেলাগুলির সদর মহকুমার মত বিক্রমপুর ভুক্তির অন্তর্গত বিক্রমপুর মণ্ডল নামে কতকগুলি স্থান পরিচিত ছিল, অথবা অন্য কোনও নামে পরিচিত মণ্ডলের বিক্রমপুর অংশও অবস্থিত ছিল এবং তাহাই মুসলমান শাসন সময়ে বিক্রমপুর পরগণা নামে পরিচিত হয়। ইদিলপুর বিক্রমপুর ভুক্তি বা ভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও উহা উক্ত মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা ঠিক্ বোঝা যায় না;—থাকিলেও সেই মহালটি আস্ত পরগণায় পরিণত হইয়াছিল কিনা অর্থাৎ বিক্রমপুর মণ্ডল বা ভুক্তি পরগণায় পরিণত হওয়ার পরেও ইদিলপুর পরগণা বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তাহাও বিবেচ্য। কারণ বিক্রমপুর পরগণার প্রসার লইয়াই আমাদের তর্ক; বিক্রমপুর মণ্ডল বা ভুক্তি লইয়া নহে।

মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ নিজেদের শাসন সৌকার্য্যের জন্যই দেশকে পরগণাদিতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কাজেই তাহারা যে মণ্ডল বা ভুক্তি গুলির অঙ্গ—বিন্দুমাত্র ও বিবৃত না করিয়া দেশগুলিকে পরগণায় পরিণত করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। পরন্তু নিজদের সুবিধানুযায়ী পরগণাগুলি বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। মুসলমান শাসন সময়ে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে এক একজন জমিদারের শাসনাধীন সমস্ত ভূমিই একই পরগণান্তর্গত ছিল এবং অনেক সময়েই উক্ত জমিদারের রাজধানীর নামানুসারেই পরগণার নামকরণ হইত। এই কারণেই এখনও চতুর্দ্দিকে অন্য পরগণান্তর্গত ভূমি সমূহে বেষ্টিত থাকা সত্বেও মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডকে অপর পরগণান্তর্গত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—কার্ত্তিকপুর, রাজনগর—বৈকুণ্ঠপুর পরগণা প্রভৃতি। নিম্নে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে ইদিলপুর পরগণাও মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে এই রূপেই সৃষ্ট হইয়াছিল।

প্রচলিত প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায় যে বর্ত্তমান ইদিলপুর মুসলমানদের করায়ত্ব হইলে পর তাহারা অধিকৃত ভূখণ্ডের উত্তরাংশে লেদামের নদীর তীরবর্ত্তী কুতুকপুর নামক স্থানে একটি প্রমোদউদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তথায় তাহাদের কতকগুলি সৈন্যও অবস্থান করিত। মধ্যে মধ্যে তাহারা নদীর পরপারবর্ত্তী ছয়গাঁ দেওভোগের ব্রাহ্মণদিগকে ধরিয়া নিয়া উক্ত উদ্যানে নানারূপ নিষ্ঠুর কৌতুকের অবতারণা করিত। কিন্তু সে সময় নগবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত ছয়গাঁয়ের ভূম্যধিকারীগণের শক্তি নিতান্তই খর্ব্ব হইয়া পড়ায় তাহারা মুসলমানদিগকে মোটেই আটিয়া উঠিতে পারিত না। সে সময় সেনরাজগণের শক্তিও নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি তাহারা যে মধ্যে মধ্যে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইতেন, তাহা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। উপরোক্ত প্রমোদ কাননে মুসলমান হস্ত হইতে অশ্বরোহী সৈনিক কর্ত্তৃক কয়েক জন ব্রাহ্মণের রক্ষা বৃত্তান্ত এখনও প্রবাদ মুখে প্রচলিত আছে। কিন্তু শীঘ্রই ছয়গাঁয়ের হিন্দুগণ অত্যাচার ভয়ে পালাইতে বাধ্য হয় এবং উক্ত ছয়গাঁ ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানা গ্রাম মুসলমান করায়ত্ব হইয়া পড়ে। এই মুসলমান বীরের-নাম ইদিল খাঁ এবং ইহার নাম হইতেই যে ইদিলপুর পরগণার নামকরণ হইয়াছিল, তাহা শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় তাঁহার "ফরিদপুরের ইতিহাসেও" স্বীকার করিয়াছেন। ইদিলখাঁর এই আক্রমণ যে সেনরাজগণের অন্তিম সময়ে ইতিহাসোক্ত তুর্কীদিগের আক্রমণেরই অন্যতম, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইদিল খাঁ কর্ত্তৃক তৎ জমিদারির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ায় ছায়গাঁ, দেওভোগাদি নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী কয়েকখানা গ্রামও তখন ইদিলপুর পরগণান্তর্গত হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীতে এই সমস্ত ভূভাগ চাঁদ ও কেদাররায়ের হস্তগত হইলে পর উক্ত স্থান আবার হিন্দুদের বাসস্থানে পরিণত হয়। এবং সে সময় ছয়গাঁয়ে নবাগত সিদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য্য চূড়ামণি মহাশয় রাজসমীপে দরবার করিয়া ছয়গাঁদি গ্রামকে বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেই যে উহারা বিক্রমপুরের অংশ বলিয়া পরিচিত হইতেছে, তাহা এখনও স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যে সময় বিক্রমপুর ভুক্তি বা মণ্ডলের দক্ষিণাংশ মুসলমান-করায়ত্ব হইয়া পরগণায় পরিণত হয়, তখনও বর্ত্তমান বিক্রমপুরাংশ স্বাধীন হিন্দু নৃপতিগণ

(সেন বংশীয়) কর্ত্তৃকই শাসিত হইতেছিল। এইরূপে ইদিলপুরাংশ বিক্রম-পুরাংশের পূর্ব্বেই পরগণায় পরিণত হয় এবং দুই অংশ ইদিলপুর (মুসলমানাধিকৃত) ও বিক্রমপুর (হিন্দু শাসিত)—এই দুই নামে পরিচিত হইতে থাকে। পরে বিক্রমপুর ভাগ ও মুসলমান করকবলিত হইয়া পীর আদম নামে কাজীদ্বারা শাসিত হয়। বস্তুতঃ উভয়ে এক বিক্রমপুরভুক্তির গর্ভজাত সহোদরা বিশেষ হইলেও পরগণা হিসাবে উহারা মূলতঃ পৃথক এবং একে অপর হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন।

মুসলমান শাসন কালের ইতিহাসেও আমরা ইদিলপুরকে বিক্রমপুরের বাহিরেই দেখিতে পাই। শ্রীপুর রাজগণের সময়ে ইদিলপুর তাহাদের অধিকার ভুক্ত থাকিলেও উহা যে পৃথক পরগণা বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহা চূড়ামণি মহাশয়ের ছয়গাকে ইদিলপুর হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ বিক্রমপুরের সামিল করিয়া লওয়ার চেষ্টা হইতেও বুঝিতে পারা যায়। আইনইআকবরী গ্রন্থেও লিখিত আছে যে সে সময় বিক্রমপুর ও কার্ত্তিকপুর পরগণা সরকার সোনারগায়ের ইদিলপুর সরকার বাকলার (বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ) অন্তর্ভুক্ত ছিল। "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ও উভয়ের পার্থক্য প্রমাণ করে।--যথা

দিলপুরোত্তরেভাগে ব্রহ্মপুত্রস্থ—পশ্চিমে।
বৃদ্ধগঙ্গা দাক্ষণে চ পূর্ব্বে পদ্মানদী বরাৎ॥
বিক্রমভূপবাসত্বাৎ—বিক্রমপুরমতো বিদুঃ।
অর্দ্ধোদয়স্থযোগে চ অভূৎকল্পতরুর্নৃপাঃ॥

পদ্মানদী যে পূর্ব্বে বিক্রমপুরের পশ্চিমদিক দিয়া প্রবাহিত হইত তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামগতির কবিতা হইতেও জানিতে পারা যায় যথা :—

ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্ব্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার॥
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদজ্ঞানী বিস্তর॥

"দিগ্বিজয় প্রকাশ" গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশ স্পষ্টই প্রমাণ করে যে ইদিলপুর বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্তছিল না। কাজেই হিন্দু শাসন সময়ে ইদিলপুর ভুক্তি বা ভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে ও পরগণা হিসাবে উহা বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্ত

নয়। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে ছয়গাঁয়ের দক্ষিণেই লেদামের [নদীই বিক্রমপুরের দক্ষিণ সীমা এবং উহার দক্ষিণ তীর হইতেই ইদিলপুর পরগণার আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ নয়াভাঙ্গনী নদী পর্য্যন্ত ইদিলপুরের সীমা কল্পনা করিয়া উক্ত নদীকেই বিক্রমপুরের দক্ষিণ সীমা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। তাহাদের জানা উচিত যে ইদিলপুরের বিস্তৃতি উক্ত নদী পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ নহে, পরন্তু উহার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী বাখরগঞ্জ জেলায়ও অনেক দুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বর্ত্তমানে বিক্রমপুর পরগণা বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, পরগণা সৃষ্টির সময় বিক্রমপুরভুক্তির সেই অংশটুকুই যে বিক্রমপুর পরগণা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা আমাদের উপরোক্ত বৃত্তান্তগুলি হইতেই অনুমিত হয়। পরে বিভিন্ন সময়ে এই বিক্রমপুর পরগণার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জমিদারের অধিকারভুক্ত হইয়া যে বিভিন্ন পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল, তাহা পরগণা আমিনাবাদ, বৈকুণ্ঠপুর, রাজনগর প্রভৃতি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। রাজনগরের মহারাজাদের অধিকারভুক্ত সমস্ত ভূ-ভাগ পরগণা রাজনগর বলিয়া পরিচিত। পরগণা রাজনগর বলিয়া পরিচিত ভূমি শুধু উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরেই নয়—সুদূরে বাখরগঞ্জ জেলায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। বলিতে কি বিক্রমপুর পরগণা সৃষ্টি হওয়ার পরে উহা এত গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, ঐ গুলিকে বিক্রমপুর পরগণা হইতে কোনরূপেই বাদ দেওয়া চলে না। ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণার নাম জমিদারী-সংক্রান্ত কাগজপত্র ব্যতীত ব্যবহার হইতে বড় দেখা যায় না। কাজেই প্রথম পরগণা সৃষ্টি হওয়ার সময় যে ভূ-ভাগ বিক্রমপুর পরগণা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এত ভাগ বিভাগ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ সেই ভূ-ভাগকেই বিক্রমপুর পরগণা বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন এবং আমরাও স্বীকার করিতেছি।

কাজেই বিক্রমপুর দক্ষিণপারের পূর্ব্বাংশে এখন সেই ভূ-ভাগ কার্ত্তিকপুর পরগণা বলিয়া পরিচিত তাহাও পরগণা বৈকুণ্ঠপুর রাজনগরের মত বিক্রমপুর পরগণারই অন্তর্গত; পরন্তু ইদিলপুর পরগণার মত স্থানই বিক্রমপুর পরগণা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। যেই কার্ত্তিক মুন্সির নামানুসারে কার্ত্তিকপুর গ্রামের নামোৎপত্তি, তিনি মুসলমান শাসনকালের লোক। কেদার

রায়ের অন্যতম সেনানায়ক সেক কালুর জমিদারীই তাহার রাজধানী কার্ত্তিকপুর গ্রামের নামানুসারে কার্ত্তিকপুর পরগণা নামে পরিচিত হয়। কালুর বংশধরগণের সময়ে জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া অনেক নূতন নূতন ভূ-খণ্ডও উক্ত পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কাজেই কার্ত্তিকপুর পরগণার উত্তর ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে সংগঠিত হয়। বস্তুতঃ আইন-ই-আকবরির পূর্ব্বে অন্য কোন গ্রন্থেই কার্ত্তিকপুরের নাম দৃষ্ট হয় না। কাজেই কার্ত্তিকপুর পরগণা যে বিক্রমপুর পরগণারই অন্তর্গত তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মোট কথা ইদিলপুর হিন্দু শাসন সময়ে বিক্রমপুর-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও উহা কখনও বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং এখনও নাই; পক্ষান্তরে কার্ত্তিকপুর চিরদিনই বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এখনও আছে।

শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়।

বিক্রমপুরের কৃষি ও উদ্ভিদ্।

বিক্রমপুর প্রাচীনকাল হইতেই বিখ্যাত। বিক্রমপুরের পূর্ব্বাঞ্চল—বিশেষতঃ রামপাল ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থান কৃষি-কার্য্যের জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে—রামপালের কৃষক কলা, মূলা, আদা ও ইক্ষু প্রভৃতির চাষে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে তাহা সবিশেষ প্রশংসার্হ।

বঙ্গ-সাহিত্যে-লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ, মহাশয় তদ্‌রচিত 'শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকায়' উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শিক্ষা-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ সমূহের দৃষ্টান্ত দেখিয়া উদ্ভিজ্জগতের বিশালতা ও বৈচিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ লইয়া তাহাদের বাহ্য আকৃতি, তাহাদের অন্তরের বিষয়, তাহাদের উৎপত্তি বিকাশ ও বৃদ্ধির অবস্থাসমূহ, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি, স্বভাব, তাহাদের ক্ষেত্র, প্রকৃতি ও মানব-সমাজের সহিত তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ এবং তাহাদের প্রত্যেকের উপকারিতা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

এই উপায়ে বহুবিধ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, পাতা, ফুল, ফল, বীজ প্রভৃতির পরীক্ষা করিতে করিতেই উদ্ভিদ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মে উপনীত হওয়া যাইবে।” (২)

বিক্রমপুরের কৃষি-উদ্ভিদের আলোচনার পূর্ব্বে এ স্থানের মৃত্তিকার অবস্থা ও প্রাকৃতিক বিভাগ ও অবস্থান প্রভৃতির নির্ণয় আবশ্যক।

পদ্মা হইতে উৎপন্ন একটী শাখা খাল বহর, বালিগাঁ, সুবচনী, তালতলা প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ধলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই শাখা খালটী আবার উত্তর বিক্রমপুরকে প্রধানতঃ পূর্ব্ববিক্রমপুর ও পশ্চিম-বিক্রমপুর এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে। এই খালটী তালতলার খাল বলিয়া পরিচিত। এই খালের তীরবর্ত্তী স্থানসমূহের জমি খুব উর্ব্বরা; এই স্থানের ভিটী জমিতে প্রচুর পরিমাণ কদলীর চাষ হইয়া থাকে; বিক্রমপুরের মধ্যে এই পূর্ব্ব-বিক্রমপুরের দিকটাই সকলের চেয়ে উঁচু।

পূর্ব্ব-বিক্রমপুরের অধিকাংশ স্থানই—বিশেষতঃ রামপাল, বজ্রযোগিনী, পঞ্চসার, পাইকপাড়া ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থান সকলের চেয়ে উঁচু। রামপালকেত একটী ছোট খাট টিলা বলিলেও চলে। রামপালের মৃত্তিকা ঈষৎ পীতবর্ণ; এস্থানে যেরূপ ফলমূল জন্মে বিক্রমপুরের অন্যত্র কোথাও সেরূপ হয় না। এস্থানের মৃত্তিকারও যে বিশেষ গুণ আছে তাহা বলাই বাহুল্য। বলিতে গেলে বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র কৃষিকার্য্যের জন্যই রামপাল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পশ্চিম-বিক্রমপুরের মৃত্তিকা হইতে পূর্ব্ব-বিক্রমপুরের ভূমি অধিকতর উর্ব্বরা।

পশ্চিম বিক্রমপুরের ভূমি অপেক্ষাকৃত নিম্ন এবং মৃত্তিকা অত্যন্ত বালুকা মিশ্রিত। হল্‌দিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থানের মৃত্তিকা এরূপ বালুকাময় যে সে সমস্ত স্থানে গভীর ভাবে পুষ্করিণী খনন করা যায় না; এজন্য সে সমস্ত স্থানে গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত জল কষ্ট ও শস্যহানি হইয়া থাকে।

পদ্মা-তীরবর্ত্তী ও তৎসন্নিহিত স্থান সমূহের মৃত্তিকা খুব আঠালিয়া, এই মৃত্তিকা শস্যোৎপাদনের ও মৃৎ-শিল্প গঠনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

লৌহজঙ্গ বন্দরের পূর্ব্বাংশ বিধৌত করিয়া পদ্মার যে শাখা উত্তরবাহিনী হইয়া ধানকুনিয়া, কনকসার, কোরহাটী, হল্‌দিয়া, গয়ালীমান্দ্রা, শ্রীনগর ষোলঘর, হাসাড়া প্রভৃতি স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া ধলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে

(২) ‘শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা’ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রণীত; ৪১ পৃঃ দ্রঃ।

তাহা পশ্চিম-বিক্রমপুরকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে; এইটী হলদিয়ার খাল বলিয়া সুপরিচিত। এই খালের তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে বহুল পরিমাণ ধানের ও পাটের চাষ হয়।

বিক্রমপুর নদনদী-সঙ্কুল দেশ বলিয়া এস্থানের ভূমির উর্ব্বরতা শক্তিও বেশী; বর্ষার জলপ্লাবনে ভূমিতে যে পরিমাণ মৃত্তিকা সঞ্চিত হয়, তাহাতেও মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মৃত্তিকার রকম, নাল জমি (বা নিম্নভূমি) ভিটীজমি (বা উচ্চভূমি)।

নাল জমিতে সাধারণতঃ ধান্য, পাট, তিল, কায়ন প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাটের চাষই খুব বেশী হয়; ধান্যের চাষও মন্দ হয় না; অন্যান্য খন্দের সময় কলই, কালাই, কায়ন, তিল, সর্ষপ, ধন্যা, মেথি, যব, মরিচ, উচ্ছে, ইক্ষু, ধঞ্চে, তামাক, রান্ধনী, কালিজিরা, বাঙ্গি, তরমুজ, ক্ষিরাই, কুম্‌ড়া, বেগুন ও সাগরকন্দ আলু প্রভৃতি শস্য জন্মিয়া থাকে। বিক্রমপুর জলাভূমি, বর্ষার সময় বিক্রমপুরের নাল বা নীচু ভূমিগুলি সমস্তই জলে ডুবিয়া যায়। কার্ত্তিক মাসে বর্ষার জল নির্গত হইয়া গেলে বিক্রমপুরের কৃষকগণ জমিতে উপরোক্ত ফসলসমূহ রোপণ করিয়া থাকে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে এই সমস্ত ফসল উঠিয়া গেলে সেই জমিতে কৃষকগণ ধান্য, পাট ধঞ্চে প্রভৃতি ফসল রোপণ করিয়া থাকে। আষাঢ় মাসে পাট এবং কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটা হইয়া গেলে কৃষকগণ বর্ষাশেষে জমিতে পর্য্যায়ক্রমে এই সমস্ত ফসল রোপণ করিয়া থাকে। কৃষকগণ সাধারণতঃ তিল, কায়ন, ধান্য ও ধঞ্চে; পাট এবং আশুধান্য; ধঞ্চে ও পাট প্রভৃতি নানাবিধ শস্য একই জমিতে একত্র রোপণ করিয়া থাকে। এই প্রথায় একটা সুবিধা এই যে, একই জমিতে সম্বৎসরে দু'তিন প্রকারের ফসল উৎপাদন করিলে তাহা ঘটিয়া উঠে না। ইহাতে আরো একটী সুবিধা এই যে, যদি কোনও কারণে একটী ফসল নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে অপরটী দ্বারা তাহা পূরণ হইতে পারে।

ভিটী জমিঃ—ভিটী জমি (বা উচ্চভূমি) কলা, মূলা, আদা, হলুদ, ইক্ষু, পান, পটল প্রভৃতি ফসল উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী।

নাল জমিতে উহার চাষ হইতে পারে না ; কারণ এই সমস্ত গাছ গাছড়ার গোড়ায় জল লাগিলেই, গাছ মরিয়া যায়। বিক্রমপুরের পূর্ব্বাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ কলা, কচু, আদা, পান, আলু, মূলা মরিচ প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিক্রমপুরের মধ্যে রামপালই কৃষিকার্য্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ; এখানে কলা, মূলা, আদা, হলুদ ও ইক্ষুর চাষই খুব বেশী হয়। তন্মধ্যে কলা ও মূলার চাষই সর্ব্ব-প্রধান। রামপালে প্রায় বিংশতি প্রকারের কলার চাষ হয় ; রামপালের কলা কি সুস্বাদ, কি সুগন্ধে, কি মিষ্টত্বে বস্তুতঃই অতুলনীয়, অমৃতসাগরের ন্যায় সুগন্ধি, সুস্বাদু ও সুমিষ্ট কলা বাঙ্গালার অন্যত্র কোথাও মিলে না। কলাও খুব বড় হয়। রামপালের কৃষকের কলাগাছ রোপনের একটা বিশেষত্ব এই যে একই সময়ে সমস্ত কলার ছড়াই দক্ষিণদিকে ফলে।

রামপালে কলা বাগিচায় দুইসারি কলাগাছের মধ্যভাগে আদা ও হলুদ, কিম্বা পর্য্যায়ক্রমে আদা ও হলুদ রোপিত হইয়া থাকে। স্বতন্ত্র বা প্রধান ভাবে ও উহাদের চাষ হইয়া থাকে, কিন্তু পরিশ্রমের তুলনায় তাহা অনেক স্থলেই লাভজনক হয় না। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে রামপাল অঞ্চলে বিঘাপ্রতি কদলী চাষে ৪৮৵৪ পাই খরচ পড়িত এবং সরিষা, আদা প্রভৃতি বাজে ফসল বিক্রয় করিয়াও ৮৭৲ টাকা প্রাপ্ত পাওয়া যাইত। মুন্সীগঞ্জের বাজার রামপালের কলা ও মূলা বিক্রয়ের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রামপালে প্রায় বিংশতি প্রকারের কলার চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু তন্মধ্যে অমৃতসাগর, দুধসাগর, অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁশী, মোহনবাশী, নেপালী, মর্ত্তমান ও চাপা প্রভৃতি কলাই উৎকৃষ্ট।

অমৃতসাগর, নেপালী, মোহনবাঁশী এবং কানাইবাঁশী এই চারিপ্রকারের কলার স্বাদ ও বর্ণ অনেকাংশেই একরূপ হইলেও অমৃতসাগর কলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। ইহার আকৃতি সাধারণতঃ ৯।১০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত রামপালে সবরী, কবরী, কাঁচাকলা (বা আনাইজা কলা) জাওয়া, তৃপ্তি, বিচা, লেপাই, বাঘনলী প্রভৃতি আরও নানাপ্রকারের কলা জন্মে। সাধারণতঃ বৈশাখ মাসেই কলা রোপণের প্রশস্ত কাল। আষাঢ় বা আশ্বিন মাসেও কলা লাগাইতে পারা যায়, কিন্তু আষাঢ়ের কলা বৃষ্টির জলে এবং আশ্বিনেরকলা শীতের প্রকোপে প্রায়ই যথোপযুক্ত পুষ্ট হয় না বা গাছ মরিয়া যায়

বিক্রমপুরে বারুই, নমঃশূদ্র এবং মুসলমানই কৃষিকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ; এবং খুব শ্রমসহিষ্ণু, শস্যোৎপাদনের ক্ষমতাও উহাদের খুব বেশী। বারুইগণের পানের 'বরো' বিশেষভাবে দর্শনযোগ্য, ইহা এরূপ সুনিপুণ ভাবে নির্ম্মিত এবং পানগাছগুলি এমনই সুশৃঙ্খলার সহিত রোপিত হইয়া থাকে যে, দেখিলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। 'বরো'গুলি অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রায় ২॥ হস্ত পরিমাণ ব্যবধানে লম্বালম্বি ভাবে 'আইল' বাঁধিয়া তাহাতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে পানগাছ রোপিত হয়। পানের 'বরোর' দুইসারি পানগাছের মধ্যভাগে পটল, মরিচ, কাঁকুর, কুমর, ঝিঙ্গে, শশা, ডাটা এবং অন্যান্য সময়ানুযায়ী ফসল রোপিত হইয়া থাকে। মিরকাদিমের পান এই জেলা মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সুপরিচিত।

বারুইগণের কৃষিলব্ধ তরিতরকারী এবং লেবু কাগজি প্রভৃতি সুগন্ধি ও সুস্বাদুর জন্য দেশ প্রসিদ্ধ; ইহাদের উৎপন্ন ফসল 'বারইয়া' ফসল বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; বাজারে অন্যান্য স্থান হইতে আমদানী ফল, মূল, তরীতরকারী প্রভৃতির তুলনায় ইহাদের উৎপন্ন ফসল দেড়গুণ, দ্বিগুণের অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

কুসুমফুলের চাষ।

এ অঞ্চলে এক সময়ে প্রচুর পরিমাণ কুসুমফুলের চাষ হইত; কতিপয় বৎসর পূর্ব্বেই কোরহাটী, হলদিয়া, তন্তর, সেরেজদিঘা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এবং পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থানে প্রচুর পরিমাণ কুসুমফুল উৎপন্ন হইত। বর্ত্তমান সময়েও উহার চাষ একেবারে লোপ পায় নাই, এখনও তন্তর, শেখরনগর ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রামে এবং ধলেশ্বরী নদীর তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে ইহার সামান্য পরিমাণ চাষ হইয়া থাকে।

কুসুমফুল হইতে পীত ও লাল এই দ্বিবিধ প্রকারের রং প্রস্তুত হইত। কুসুম ফুলের বীজ হইতে এক প্রকার তৈলও প্রস্তুত হইত।

কুসুমফুলের চাষের হ্রাস প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন তিল নামক এক প্রকার অভিনব শস্যের চাষ আরম্ভ হইয়াছে; ইহার ফুল ও গাছ অনেকটা কুসুমফুলের সদৃশ; এই তিল হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈল উৎপন্ন হয়।

তূলার-চাষ।

পূর্ব্বে বিক্রমপুরের নানাস্থানে বিশেষতঃ রামপাল অঞ্চলে প্রচুর তূলা উৎপন্ন হইত। রামপালে এখনও সামান্য পরিমাণ তূলার চাষ হইয়া থাকে।

পাট।

বিক্রমপুরে পাটের চাষ খুব বেশী হয়; সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, তূলার চাষ হ্রাস প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কিম্বা গত শতাব্দীর প্রথম বিক্রমপুরে পাটের চাষ প্রবর্ত্তিত হয়। বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রামেই প্রচুর পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। দক্ষিণচারিগাঁ, খিলগাঁ, নওপাড়া প্রভৃতি গ্রামে বারুইগণের উৎপন্ন পাটই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। লৌহজঙ্গ (বা তারপাশা), ধানকুনিয়া, শ্রীনগর, হাসাড়া, রাজানগর, সেরেজদিঘা, তালতলা, কমলাঘাট, রাজাবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ প্রভৃতি বন্দরে পাট ক্রয় বিক্রয়ের বড় বড় গুদাম বা Office ঘর আছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে হল্‌দিয়া বন্দরেও একটী পাটের গুদাম ছিল। প্রতি বৎসর এই সমস্ত বন্দর হইতে প্রচুর পাট কলিকাতা হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এই সমস্ত বন্দর হইতে প্রতিবৎসর আনুমানিক ২॥ আড়াই লক্ষ ৩ লক্ষ হইতে ৫।৬ পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা মূল্যের পাট খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

বিক্রমপুরের কোন কোন স্থলে পাটকে নাইলা এবং কোষ্ঠা বলে।

ক্ষেত্রজাত অধিকাংশ শস্যই বীজ হইতে উৎপন্ন হয় না; অনেক রকম চাষে আদৌ বীজের দরকার হয় না; হলুদ, আদা, আলু, কচু, ইক্ষু, পান প্রভৃতির চাষে বীজ লাগে না; কোন কোন ফসলের বীজ ক্ষেত্রে উপ্ত হয় না, মরিচ, বেগুন, তামাক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বীজগুলি স্বতন্ত্র ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রোপণ করিয়া পরে চারা উৎপন্ন হইলে উহা উত্তোলন পূর্ব্বক মাঠে লাগাইতে হয়। উচ্ছে বীজও ক্ষেত্রে উপ্ত হয় না, ইহার চারা জন্মাইতে এক অভিনব প্রথা অবলম্বিত হয়, কৃষকগণ বীজগুলি ৫।৬ দিন ভিজাইয়া রাখে, পরে কলাপাতা কিম্বা কচুপাতা দ্বারা বাঁধিয়া নারা (বিচালি) দিয়া জড়াইয়া রাখে; এইরূপে ৮।১০ দিন পরে বীজ হইতে অঙ্কুরোদগম হইলে কৃষকগণ উক্ত চারা

ক্ষেত্রে রোপণ করে। চারাগুলি একটু বড় হইলে কৃষক ক্ষেত্রে নারা পাতিয়া দেয়, তখন গাছ হইতে লতা পাতা মেলিতে থাকে।

সকল কৃষক সকল জাতীয় শস্য রোপণ করে না, বিশেষ বিশেষ শস্য রোপণের জন্য 'আইরস্ত' আছে—উচ্ছে, ইক্ষু প্রভৃতি শস্য রোপণ করিতে 'আইরস্ত' লাগে।

লাউ, ঝিঙ্গা, ছিম, মাথই, শসা, তুন্দইল, ঢেরস, ডাটা, ঢুলা প্রভৃতি তরী তরকারী ক্ষেত্রে চাষ হয় না, সাধারণতঃ গৃহস্থগণের বাড়ীতে কিম্বা বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে এই সমস্ত ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নিম্নে কয়েকটী প্রধান প্রধান শস্যের চাষ-বাস প্রণালী লিপিবদ্ধ হইল, যথা—

আদা—রামপাল এবং তন্নিকটবর্ত্তী ভিটী জমিতে প্রচুর পরিমাণ আদা জন্মে, রামপালে সাধারণতঃ বৈশাখ মাসেই আদা রোপিত হয়, কেহ কেহ জ্যৈষ্ঠ মাসেও লাগাইয়া থাকে। রামপালে সাধারণতঃ রংপুরী এবং পাটনাই আদার চাষ হয় কিন্তু কোন স্থলেই রামপালের আদা রামপালে রোপিত হয় না। ইহার কারণ এই যে রামপালী আদার ফলন কম হয় এবং রংপুরী ও পাটনাই আদার তুলনায় অল্প পরিমাণ আদা জন্মে। এক মণ আদা লাগাইলে, সাধারণতঃ পাঁচ মণ আদা জন্মে ইহাই সাধারণ নিয়ম। চৈত্র মাসে আদার চাষ উঠিয়া গেলে, সেই জমিতে রামপালের কৃষক ধান বা পাট লাগাইয়া থাকে।

আলু—বিক্রমপুরে সাধারণতঃ ৫।৬ প্রকারের আলু জন্মে; গোলআলুর চাষ এখানে খুব কম হয়। ধনী ব্যক্তিগণের বাগানে এবং রামপাল অঞ্চলে ইহা সামান্য পরিমাণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাকরকন্দ আলু—রামপাল ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এই আলু প্রচুর পরিমাণ জন্মে। ইহাকে লালআলু বা মিঠা আলুও বলে। ভাদ্রমাসে চারা রোপণ করা হয়, এবং অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ফসল উৎপন্ন হয়।

গাছআলু—এই আলুর স্বতন্ত্র বা প্রধান ভাবে কোন চাষ হয় না; সাধারণতঃ গৃহস্থগণের বাড়ীতে এই আলু উৎপন্ন হয়। ইহার রং কালা; কিন্তু ভিতরের রং ঈষৎ রক্তিমাভ।

সাকআলু—ইহাও গৃহস্থের বাড়ীতে জন্মে। এই আলু মাটির নীচে জন্মে; ইহার প্রত্যেকটী ওজনে /৩, /৪ সের পর্য্যন্ত হয়। গ্রীষ্মকালে ইহা সর্করা সংযোগে খাইতে বেশ মুখরোচক।

ইক্ষু—বিক্রমপুরের অধিকাংশ গ্রামেই খাগরি বা পেতী ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। স্থানে স্থানে গেণ্ডারী বা বোম্বাই ইক্ষুর ও চাষ হয়। বিক্রমপুরের বহু স্থানে ইক্ষু গুড় প্রস্তুতের কারখানা আছে, পুর্ব্বে বিক্রমপুর হইতে উক্ত গুড় বিভিন্ন স্থানেও রপ্তানি হইত কিন্তু পাটের চাষ বৃদ্ধি হেতু ইক্ষুর চাষ হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় এখন আর উক্ত গুড় দ্বারা স্থানীয় অভাবও পূরণ হইতেছে না।

উচ্ছে—নদী ও খালের তীরভূমিতে প্রচুর পরিমাণ উচ্ছে জন্মে। পৌষ মাসে বীজ উপ্ত হয়, ফাল্গুন চৈত্র মাসে ফসল উৎপন্ন হয়।

করলা—করলার চাষ এখানে খুব অল্প হয়।

কচু—৫।৬ প্রকারের কচু এখানে উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে রামপাল ও মুন্সীগঞ্জের নারিকেলী কচুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অগ্রহায়ণ মাসে কচু লাগাইলে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মাণকচু কেবল গৃহস্থগণের বাড়ীতেই উৎপন্ন হয়।

কলই—মটর কলই, খেসারী কলই, মাসকালাই [ঠিকরি এবং কলাই প্রভৃতি নানাজাতীয় কলই এখানে উৎপন্ন হয়; বিক্রমপুরের পূর্ব্বাঞ্চলেই ইহা অধিক পরিমাণ উৎপন্ন হয়।

কায়ন—বিক্রমপুরের সর্ব্বত্রই ইহার চাষ হইয়া থাকে। কায়ন ও তিল, সাধারণতঃ এই দ্বিবিধ শস্য একত্র একই জমিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বালুকাময় মৃত্তিকা এই ফসল উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মাঘ ফাল্গুন মাসে বীজ বপন করা হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে ফসল কর্ত্তিত হইয়া থাকে।

কাকুর—বিক্রমপুরের পূর্ব্বাঞ্চলেই বারুইগণ সাধারণতঃ পানের বোরজ মধ্যে কাকুরের চাষ করে।

কালিজিরা—বিক্রমপুরের খালের ও নদীর তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে যথেষ্ট কালিজিরা উৎপন্ন হয়। পৌষ মাঘ মাসে বীজ উপ্ত হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে ফসল কর্ত্তিত হইয়া থাকে।

কুমর—মাঘ মাসে বীজ উপ্ত হয় এবং মাঘ ফাল্গুন মাসে ফসল উৎপন্ন হয়।

গিমিকুমড়া—মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলে ইহা সাধারণতঃ পানের বোরের মধ্যেই উৎপন্ন হয়।

গাটী—রামপাল ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রচুর পরিমাণ গাটী জন্মিয়া থাকে।

মুলা—রামপাল ও মুন্সীগঞ্জের মূলা দেশ প্রসিদ্ধ। রামপালের মূলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বেগুন—রামপালে ৫।৭ প্রকারের বেগুণের চাষ হইয়া থাকে; সাধারণতঃ আদার সঙ্গে বেগুণের চাষ; রামপালে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার বেগুণের চাষ হয়, যথা:—

১। লাফা বেগুন—স্থূলাকার, গোল।

২। বিদ্যাসুন্দর—লম্বা, মসৃণ ও চিকন।

৩। ভোলানাথ—লম্বা, মোটা।

৪। দুধরাজ—শ্বেত বর্ণ।

৫। কালা—চিকন জাতি।

স্বতন্ত্র বা প্রধান ভাবেও বেগুনের চাষ হইয়া থাকে।

হলুদ—রামপালে এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে প্রচুর পরিমাণে হলুদের চাষ হইয়া থাকে। রামপালে সাধারণতঃ কলা বাগিচার দুই সারি কলাগাছের মধ্য-ভাগে কেবল আদা বা হলুদ কিম্বা পর্য্যায়ক্রমে আদা ও হলুদ রোপিত হইয়া থাকে। কেবল হলুদের চাষ ও হইয়া থাকে কিন্তু পরিশ্রমের তুলনায় তাহা অনেক স্থলেই লাভজনক হয় না।

শন—বিক্রমপুরে বহুপূর্ব্বে শন উৎপন্ন হইত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে ইহার চাষ একপ্রকার হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। পদ্মার তীরবর্ত্তী কোন কোন স্থানে এখনও উৎকৃষ্ট শন জন্মে।

ছন—কোন কোন স্থানে ইহার চাষ অল্প স্বল্প পরিমাণে হইয়া থাকে; ঘরের ছাউনী দিবার জন্যই সাধারণতঃ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাইসা—নদী এবং খালের তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রচুর পরিমাণে কাইসা জন্মে; শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট কুশাসন প্রস্তুত হয়।

লটাঘাস—নদী তীরবর্ত্তী স্থানে এবং চড়ে বহুল পরিমাণ লটাঘাস

উৎপন্ন হয়। চউড়া মুসলমানগণ হাটসমূহে ইহা বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহা গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য।

এতদ্ব্যতীত বিক্রমপুরের নানাস্থানে চিনা, তরমুজ, ৰাঙ্গী, ক্ষিরাই, পায়রা, মাথই, মেথী, সর্ষপ, তিল, সউলপা, মরিচ, পিয়াজ, রসুন, পটল, ধান্য, মুগ, মুসরী, রাঁদ্ধনীসজ, তামাক, ইক্ষু, ধনিয়া, ধঞ্চে প্রভৃতি সময়ানুযায়ী ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পৌষ মাঘ মাসে রঞ্জন তিল ও সর্ষপ ফুলগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া শস্য ক্ষেত্রসমূহ হরিদ্বর্ণ ধারণ করে এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান গাছ ও অন্যান্য ফসলগুলির উৎপত্তি হয় ও ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্রগুলি শস্য-শ্যামল হয় তখনকার দৃশ্য অতীব রমণীয় ও নয়নানন্দদায়ক।

বিক্রমপুরের পূর্ব্বাঞ্চলে শুপারী, বাঁশ, লটকা, ডউয়া, কাউ, পায়লা, চাইলতা প্রভৃতি গাছ গাছড়ার যেরূপ সংখ্যাধিক্য বিক্রমপুরের মৃত্তিকা এই সমস্ত বৃক্ষ উৎপাদনের পক্ষে যে বিশেষ উপযোগী তাহা বলাই বাহুল্য।

বিক্রমপুরে মান্দার, বউনা, হিজল ও পিটখিলা, এই কয় জাতীয় বৃক্ষের যেরূপ সংখ্যা প্রাচুর্য্য পরিদৃষ্ট হয় বঙ্গের অন্যত্র কুত্রাপি তাহা পরিলক্ষিত হয় না। এই কয় জাতীয় বৃক্ষ সাধারণতঃ পুষ্করিণীর তীরে মাঠে এবং রাস্তার পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে জন্মিয়া থাকে। বউনা, হিজল ও পিটখিলা এই কয় জাতীয় বৃক্ষ 'আরজালা' জন্মে। গৃহস্থগণ তাহাদের বাড়ীর সীমানা সুরক্ষিত করিবার জন্য বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে এবং রাস্তার দুইদিকে মান্দার বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে। ইহার ডাল কাটিয়া পুতিয়া রাখিলেই গাছ জন্মে। এই কয় জাতীয় বৃক্ষ পুষ্করিণীর তীরে রাস্তার ধারে এবং মাঠে রোপিত হয়

বিক্রমপুরে বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষের খুব সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

রামপালের ইতিহাস প্রসিদ্ধ গজারী বৃক্ষটী ব্যতীত বিক্রমপুরের আর কোথায়ও গজারী বা শাল বৃক্ষ দৃষ্ট হয় না। ঢাকা জেলার এক ভাওয়াল অঞ্চল ব্যতীত আর কোথাও এতজ্জাতীয় বৃক্ষ নাই।

কলমাগ্রামের একটী বটবৃক্ষ 'কালাপাহাড়' বৃক্ষ নামে সুপরিচিত। জনপ্রবাদ এইরূপ যে ওড়িষ্যা প্রদেশের পাঠান রাজগণের দুর্দ্দান্ত হিন্দু বিদ্বেষী সেনাপতি কালাপাহাড় হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ধ্বংস করিতে করিতে এই পর্য্যন্ত আসিয়া এই

বট বৃক্ষমূলে উপবেশন করেন; তদবধি উহা 'কালাপাহাড়' বৃক্ষ নামে আখ্যাত হইয়াছে।

বিক্রমপুরে কাঁঠালবৃক্ষ খুব কম জন্মে; ইহার একমাত্র কারণ কাঠাল গাছের গোড়ে জল লাগিলেই গাছ মরিয়া যায়। বিক্রমপুর অত্যন্ত নিম্নভূমি বলিয়া যে বার অতিরিক্ত বর্ষা হয় সে বার অধিকাংশ বাড়ীতেই জল উঠে এবং ঘর বাড়ী সব সলিলে ভাসে। যে বার প্রবল বর্ষা হয় সেবার গৃহস্থের সযত্ন রোপিত কাঁঠাল বৃক্ষগুলি অকালেই মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া থাকে। বিগত ১৩০১, ১৩১৩ ও বর্ত্তমান ১৩২২ সনের বর্ষার অত্যধিক পরিমাণ জলবৃদ্ধি হেতু বিক্রমপুরের অধিকাংশ স্থানের কাঁঠাল বৃক্ষই মরিয়া গিয়াছে।

আম্র, হিজল ও বউনা এই কয় জাতীয় বৃক্ষে সাধারণতঃ পরগাছা (orchid) জন্মিয়া থাকে।

বিক্রমপুরে সাপলা, কলমী, হেলেঞ্চা, কেছলা, গিমা, ঢেকী, টলা, ও হালিম প্রভৃতি নানা জাতীয় শাক শবজী উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাপলার আঁশ কদলীর আঁশের ন্যায় কার্য্যকরী হয় কিনা তাহা বিশেষজ্ঞগণের গবেষণার যোগ্য।

এই প্রবন্ধ সঙ্কলন করিবার জন্য বিক্রমপুরের কৃষিউদ্ভিদ বিষয়ক নানাগ্রন্থ ও পত্রিকা ব্যবহার করিতে হইয়াছে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "বিক্রমপুরের ইতিহাস" ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত 'ঢাকার ইতিহাস' প্রভৃতি পুস্তকাদি প্রকাশিত হওয়ায় বিক্রমপুরের কৃষি-উদ্ভিদাদি সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ পাওয়া যায়।

১৩১৯ সনের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের 'কৃষি-সম্পদ' পত্রে 'রামপালে আদার চাষ' ও 'রামপালে কলার চাষ' শীর্ষক দুইটী সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩২২ সনের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের 'বিক্রমপুর পত্রে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন সরকার মহোদয় 'বিক্রমপুরের বনফুল' শীর্ষক একটী সারগর্ভ নিবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বিক্রমপুরের একমাত্র মুখপত্র 'বিক্রমপুর' পত্রে বৎসরাধিককাল যাবৎ ধারাবাহিক ক্রমে বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে; বিক্রমপুরের কৃষি-উদ্ভিদাদির বিবরণ বিষয়ে উক্ত প্রবন্ধসমূহ ও উপকরণ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রলাল চন্দ।

মনের বাঘ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

রৌদ্রের পর বৃষ্টি, বৃষ্টির পরে আবার রৌদ্র, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার পরে অমাবস্থার অন্ধকার, এবং আবার আঁধারের পরে পূর্ণিমার শুভ্র হাসি প্রকৃতিরই বিধান। সংসার এই নিয়মের অধীন।

এই যে দেবগঞ্জে মহামারীর একটা শোকের প্রলয়লীলা অভিনয় করিতেছিল, শোককাতর নরনারীর আকুল আর্ত্তনাদ, যমদূতরূপী কাকগুলার বিকট চীৎকারধ্বনি পল্লীর সর্ব্বত্র ভাবনাতীত এক উদ্বেগ, অশান্তি ছড়াইতেছিল, দুই দিন পরে প্রকৃতির শাসনে সেই সব অসুখ অশান্তি দেবগঞ্জ ছাড়িল, প্রবল প্রজ্জ্বলিত শ্মশান-বহ্নি সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হইল, আবার গৃহে গৃহে সুখশান্তি ফিরিয়া আসিল, পল্লীবাসীর প্রাণে আবার আশা আনন্দের ঢেউ উথলিয়া উঠিল। দিনের পর দিনই শোকের তীব্রতা কমিতে লাগিল। সেদিন পতিপত্নী পুত্রকন্যাদি ইষ্টজন বিয়োগে যাহাদের হৃদয়ে শোকের ঝড় বহিয়াছিল, চোখে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছিল। আজ তাদের অধরকোণে হাসির রেখা দেখা যাইতেছে। পত্নীবিয়োগে নবপ্রেমের উপাসক যে সকল যুবক সংসার অসার ভাবিয়া সন্ন্যাসগ্রহণে উদ্যোগী ছিল তাহারা আজ আবার বিরাট নৈরাশ্যকে বিদায় দিয়া নিরাশ উদাসহৃদয়ে অনুরাগ দেবতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতেছে। কেহ কেহ ইতিমধ্যেই পরিণয় মাল্য বিনিময় ছলে সন্ন্যাসের ত্রৈমাসিক শ্রাদ্ধ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইল কিন্তু অল্পবয়স্ক বিপত্নীকদের কেহ কেহ সহজে ধরা দিল না, প্রেম জীবনে "পুনশ্চ" দিতে একেবারে নারাজ।

হীরেন্দ্রকান্ত একদিনের জন্যও শোভনার সহিত ভাল ব্যবহার করে নাই, সুতরাং শোভনার বিয়োগে তাহাকে ক্ষণিক বৈরাগ্যের পদতলে আত্ম-বিক্রয় করিতে হয় নাই। বরং সে যেন কোনও কঠিন বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে ভাবিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

পুত্রকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া বৈষয়িক পিতা রূপকান্ত নন্দী ও সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার নিশ্চিন্ত রহিলেন, পুত্রবধূর বিয়োগে তাহার চোখেমুখে কোনও বিষাদমলিনতার ছায়া পড়িল না। দুইদিন সকাল সন্ধ্যায় শুধু নন্দীগৃহিনী অশ্রুহীন চোখে আঁচল দিয়া বৌমার উদ্দেশে গৎবাঁধা দুটা চীৎকার করিয়া পারিবারিক শোকের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, ইহাতে গণ্ডগ্রামের চিরন্তন শোকপ্রকাশ রীতির মর্য্যাদাও ষোলআনা রক্ষিত হইয়াছে। এই কান্না বৃষ্টির পরমুহূর্ত্তেই নন্দী পরিবারের আবার রৌদ্র উঠিল, নব আশার নবমধুরতার শারদজ্যোৎস্নায় নন্দী গৃহ সহসা উজ্জ্বলশ্রীধারণ করিল। সংসারের কি বিচিত্র লীলা, 'কাহারও সর্ব্বনাশ কাহারও পৌষ মাস।'

যাহাদের মেয়ে মারা যায় তাহাদের হৃদয়ে চিরজীবনের জন্য শোকতাপের দাবানল জ্বলিয়া উঠে, আর যাহাদের বউ শ্মশানে শয্যা রচনা করে, তাহারা অন্তর্জ্জালায় কি চক্ষুলজ্জায় দু'দিন দু'ফোটা চোখের জল ফেলে বলিতে পারি না, তিন দিনের দিনই তাহারা হাসিমুখে অন্যকে বরণ করিয়া শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া থাকে। দেবগঞ্জে এবারকার কলেরায় ১৭ জন কিশোরও যুবক পত্নী হারাইয়া মুহূর্ত্তের জন্য জগৎ আঁধার দেখিয়াছিল। ঘটনার পর তিন মাসের মধ্যে তেরজন আবার মুকুট মাথায় দিয়া বর সাজিয়া নূতন শ্বশুরের ঘর আলো করিয়াছে। দেবগঞ্জে চারিজন বিপত্নীক বিবাহে বাকী রহিলেন তন্মধ্যে শ্রীমান্ হীরেন্দ্রকান্ত একজন। হীরেন্দ্র মৃত পত্নীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ কিংবা প্রেমের গভীরতা ফলাইবার জন্য পুনরায় প্রেম পরীক্ষায় জয়ী হওয়ার জন্য বিবাহে অসম্মতি দেয় নাই, তাহার বিবাহের পথে প্রবল লোকনিন্দা কিছুদিন বাঁধা উপস্থিত করিল। শোভনার প্রতি নন্দী বাড়ীর ব্যবস্থার চারিদিকে জানাজানি ও ঘরে ঘরে ইহা লইয়া খুব জোরে বলাবলি করিতেছে কাজেই এইকশাই-বাড়ীতে কন্যা দিতে সকলেই একটু চিন্তাভাবনা করিতেছেন। যে সমাজে কন্যার কণামাত্র সম্মান নাই, কানাকড়ি মূল্য নাই, যে বিবাহের সমাজে প্রয়োজন শুধু কন্যাগত, সেই সমাজের মেয়েরা—যে সমাজে কন্যা পথের ধূলিকণা অপেক্ষাও তুচ্ছ, ঘৃণা অনাদরের সামগ্রী, সেই সমাজে যে ধনী রূপকান্ত রায়ের একমাত্র বি এ পাশ পুত্র হীরেন্দ্রকান্তকে দারপরিগ্রহে বেশী দিন শাসন-নিগ্রহ সহ্য করিতে হইবেইবা কেন? ধীরে

ধীরে শোভনার প্রতি রায় পরিবারের অমানুষিক অত্যাচারের স্মৃতি সমাজবক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। বিবাহযোগ্যা কন্যাগণের অভিভাবক দল রূপকান্ত রায়ের পারিবারিক অবস্থা স্মরণ করিয়া সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য মনে করিলেন না। ক্রমে চারিদিক হইতে পঙ্গপালের মত কন্যাওয়ালার দলে দলে রায়বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। এই ভাবেই শাসনের অভাবে বাঙ্গালার ভদ্র সমাজে অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। বিবাহ প্রস্তাবের এই অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য্য দেখিয়া বৈষয়িকশিরোমণি রায় মহাশয়ের হৃদয়ে এক নূতন আশা নূতন প্রলোভনের অঙ্কুর জন্মলাভ করিল। শোভনার মৃত্যুর পরে যখন কিছুদিন কোন কন্যাপক্ষই রূপকান্ত রায়ের পুত্রের করে কন্যা সম্প্রদান করা উচিত মনে করেন নাই তখন সস্ত্রীক রায় মহাশয় পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন ভদ্রঘরের একটী সুশ্রী সুলক্ষণা পাত্রী পাইলেই বিপত্নীক পুত্রের বিবাহ পরিত্রাণ পাইতে কাল বিলম্ব করিবেন না। পরে যখন বরপণ নিষ্পেষিত কন্যাপক্ষ রায় পরিবারের পৈশাচিকতা বিস্মৃত হইয়া রূপকান্তের কৃপাবিন্দু লাভের আশায় দিন রাত ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন তখন বৈষয়িক রূপকান্ত ও বুদ্ধিমতী সারদাসুন্দরী পাত্রীর সৌন্দর্য্যে ও তাহার পিতার কুল-মানে তৃপ্তিলাভ করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। সংসারে সকল বস্তুরই আদর অনুসারে দর বাড়িয়া থাকে। রায়ভবনেইবা ইহার ব্যাতিক্রম ঘটিবে কেন? কূটবুদ্ধি রূপকান্ত প্রথমে ভাবিয়াছিলেন বিক্রীত বিকৃত পুত্রের মূল্য বা পণ এবার পাত্রীর চলনসই রূপ লাবণ্য পাইলেই যথেষ্ট। পরে খরিদদারগণের আগ্রহ দেখিয়া যৌতুক ও নগদ কিঞ্চিৎ দাবী করিতেও সাহসী হইলেন। ক্রমে যখন নিলামের দর উপরে উঠিতে লাগিল তখন কৌশলি রূপকান্তের মনে একটা নূতন বুদ্ধি অঙ্কুরিত হইল। তিনি ভাবিলেন "বাঃ ব্যাপারত মন্দ নয়। প্রথম বারের চেয়ে এবার দেখছি হীরেনের আদরটা সমাজে খুব বেড়ে উঠেছে; আমরা প্রথমে কত ছাইভস্ম মাথা মুণ্ডুই না ভেবেছি। এখন দেখছি ওসব ভুল। বি, এ, পাশ করা ছেলে তার এতটা আদর হবেই বা না কেন? আমারত দেখে শুনে মনে হচ্ছে, অবস্থাপন্ন ঘরের বি, এ পাশ করা ছেলেরা দু একটা বৌকে গলাটিপে মেরে ফেল্লেইবা কি! তাদের পায়ে মেয়ে দিতে সবাই আকুল মনে ছুটে আসবে। হীরেনের পণ এবার

নগদ দু'হাজার পর্য্যন্ত উঠেছে। এম, এ টা পাশ করাতে পার্লে নিশ্চয় চার হাজার আদায় করতে পারবো। কিছু দেরী হ'বে তাতে এমন ক্ষতিটাই বা কি? হীরেনের বয়সত মোটে বাইশ বৎসর। গৃহিনী সারদাসুন্দরীও পতির এই পরামর্শে সংগ্রহে সম্মতা হইলেন।

(৭)

যথা সময়ে সৌভাগ্যশালী রূপকান্তের আশা পূর্ণ হইল। পুত্র শ্রীমান হীরেন্দ্র কান্তের নাম এম, এ পরীক্ষার ফলের তালিকায় সকলের নীচে স্থান লাভ করিল। রায় পরিবারে একটা নূতন আনন্দের উৎসব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এম, এ পাশের পরে বরের বাজারে হীরেন্দ্রকান্তের দাম নূতন জিনিষের মত বৃদ্ধি পাইল। চরিত্রসম্পদেও কর্ম্মক্ষেত্রে তেমন কিছু সফলতা না থাকিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষা পাশের মূল্য বরের বাজারে কম নয়। নানা স্থানের বহু পুরাতন ও নূতন সম্পন্ন পরিবার হইতে বিস্তর সম্বন্ধ প্রস্তাব আসিতে লাগিল কিন্তু কষ্টিপাথরের কষাতে কোনটিই বড় টিকিতেছিল না। কোন পাত্রীর রং আছেত লাবণ্য নাই; অঙ্গের সৌষ্ঠভ আছেত বর্ণের উজ্জলতা নাই; কোন পাত্রীর সৌন্দর্য্য মনোনীত হইলেও দেনা পাওয়ানা লইয়া গোল ঘটিল, কোন পাত্রীর সৌন্দর্য্যও বিভব আছেত পিতৃকুলের গৌরব নাই কাজেই কোনটিই পছন্দসই হইয়া উঠিতেছিল না।

শোভনার জীবন নাটকে ইতি পরার পরে হীরেন্দ্রের দাম্পত্য জীবনে যখন পুনশ্চ দেওয়ার কথা প্রথম প্রচারিত হইল তখনই শ্যামলাল বাবু ইহার সহিত কন্যা স্বপনরাণীর বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কিন্তু এম, এ পরীক্ষার জন্য হীরেন্দ্রের বিবাহ কিছুদিন স্থগিত ছিল বলিয়া শ্যাম বাবু এসম্বন্ধে আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

এম, এ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে শ্যামলাল বাবু যখন শুনিলেন হীরেন্দ্র-কান্ত পাশ হইয়াছে এবং চারিদিক হইতেই ইতিমধ্যে বরষার জল ধারার মত বিবাহের প্রস্তাব বর্ষিত হইতেছে তখন তিনি এই রত্নটিকে হস্তগত করিবার জন্য রায়গৃহে লোক পাঠাইলেন। প্রেরিত লোক প্রস্তাব উত্থাপন করিলে বৈষয়িক রূপকান্ত নানা বচনবিন্যাসে দাবীর ফর্দ্দটা উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন "হীরেনকে এপর্য্যন্ত পড়াতে আমার কত টাকা যে বাক্সচ্যুত হয়েছে তা আর কি

বলব। শ্যাম বাবুত আর সব টাকা দেবেন না।" প্রেরিত লোক রায় মহাশয়ের কথায় প্রতিবাদ করিয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে মৃদুস্বরে বলিলেন "আমরা ত শুনেছি হরিহরপুরের শ্রীকণ্ঠ বাবুর অর্থেই না কি হীরেন বি, এ পর্য্যন্ত পাশ করেছে, আপনি এম, এ টা পড়িয়েছেন তা বেশ এম, এ পড়াতে আপনার যা খরচা হয়েছে আমরা তা কড়াগণ্ডায় হিসাবে করে দিতে প্রস্তুত আছি।" রূপকান্ত বিরক্তির সহিত বাধা দিয়া বলিলেন "ছেলে বিয়ে দিতে অত হিসাব নিকেশের দরকার কি মশাই আমি অত শত কথার ধার ধারিনে। আমরা পাড়া গাঁয়ের সাদাসিদে লোক, আমাদের সোজাসুজি কথা। নগদ দুটী হাজার টাকা ও কম পক্ষে আড়াই হাজার টাকার যৌতুক গহনা দিতে যদি শ্যাম বাবু সম্মত হন তবে তাঁর সাথে আমি কুটুম্বিতে করতে স্বীকৃত আছি।" রূপকান্ত রায়ের দৃঢ়তা ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া শ্যাম বাবুর প্রেরিত লোক আর বেশী কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। পরে রূপকান্ত রায়ের প্রস্তাবিত দাবীতে স্বপনরাণীর সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল। এই শ্যাম বাবুই পূর্ব্ব পরিচিত সহরের ডাক্তার শ্যাম লাল দত্ত।

(৮)

হীরেন্দ্রকান্ত পত্নী বিয়োগের প্রায় আড়াই—বৎসর পরে আবার 'সংসারী' হইল। এই বিবাহে অনেকেই একটা জটীল প্রশ্নের মীমাংসায় মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতে লাগিলেন। শ্যামলাল ডাক্তার প্রচুর ধন সম্পত্তির মালিক। এই বিবাহে খরচ পত্রও কম করেন নাই এত অর্থ ব্যয় করিয়া কসাইএর বাড়ীতে মেয়েটিকে কেন পাঠাইলেন। শোভনার জীবন দীপ নির্ব্বাণের সময় তিনিই চিকিৎসা করিয়াছেন, কিরূপ সেবা শুশ্রূষার মধ্য দিয়া শোভনা পর পারে চলিয়া গিয়াছেন ডাক্তার বাবু নিজ চ'খে দেখিয়াছেন সুতরাং তিনি সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমাণ যন্ত্রে ওজন করা উচ্চ শিক্ষার মোহে পড়িয়া কন্যা স্বপনরাণীকে কেন দানবের করে সমর্পণ করিলেন ইহাই সকলের আলোচ্য বিষয় হইল এবং এই সমস্যার সিদ্ধান্তে কেহ উপনীত হইতেও পারিলেন না।

এদিকে নববধূ দেখিয়া রমণী মহলেও একটা আন্দোলন ও আলোচনার প্রবল তরঙ্গোচ্ছাস উত্থিত হইল। মহিলারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন

'হীরেনের এই বউটিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন শোভনাই ফিরে এসেছে। ঠিক সেই চেহারা ও চাহনি। তবে তার চেয়ে এ বউর রং কিছু ফর্‌শা শরীরটাও একটু মোটা। মোটের উপরে লাবণ্যও যেন একটু বেশী।" ক্রমে স্থির হইল স্বপনরাণী বুদ্ধিমতী, মধুরহাসিনী, স্বভাব চরিত্রেও অতুলনীয়। ডাক্তার বাবুর কন্যা শুভমুহূর্ত্তে, শুভ যাত্রা করিয়া রায় গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার প্রশংসা ও আদর রায় পরিবারে আর ধরে না। হীরেন্দ্রকান্ত যেন সেই হীরেন্দ্র নাই। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! স্বপনরাণীর রায় পরিবারের এই অভাবনীয় আদর যত্ন লাভ তাহার নিজ গুণে কি ঐশ্বর্য্যশালী শ্যামলাল বাবুর অকাতর ব্যয় মাহাত্ম্যে জন্মলাভ করিল তাহার নির্দ্দেশ করা প্রকৃত পক্ষেই কঠিন। স্বপনরাণীর প্রেমস্পর্শে হীরেন্দ্রকান্তের নীরস নিরাশা হৃদয়ে অজ্ঞাত অপরিচিত নব অনুরাগ-পারিজাত বিকশিত হইল। স্বপনরাণীর শুভ দৃষ্টিতে হীরেনের নির্ব্বেদময় জীবনে এক নবভাবের নব অধ্যায় আবিষ্কৃত হইল। হীরেন্দ্রকান্তের ভাব পরিবর্ত্তন, রায় পরিবারে আদর যত্ন স্নেহ মমতায় স্বপনরাণীকে প্রতিষ্ঠিত করিল। বাংলার সমাজে পিতা মাতা প্রভৃতির উপরে পাশ করা পুত্রের এমনই প্রভাব বটে!

হীরেন্দ্রকান্ত দাম্পত্য জীবনের শূন্য সিংহাসনে স্বপনরাণীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে পর দীর্ঘ পনরটি বৎসর অতীত হইয়াছে। মা ষষ্ঠী এই কয় বৎসরে ইহাদিগকে দুইটি কন্যা ও তিনটি পুত্র সন্তান উপহার দিয়াছেন। জেষ্ঠ্যা কন্যা শান্তিকণা, বয়স, তের বৎসর দেখিতে বেশ সুশ্রী।

এক মাস পরে শান্তির বিবাহ। এক দিন শান্তির বিবাহের খরচ পত্র ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে হীরেন্দ্র ও স্বপনরাণীর মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

হীরেন্দ্র। "বিয়ের দিনত ঘনিয়ে এল। এখন আর সবুর সয় না। যা' হয় একটা পরামর্শ স্থির ক'রে কাজে লাগতে হচ্ছে। বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন তিনি কিছুর ভিতরেই আর থাক্‌তে চান না। তিনি আমার উপরেই সব চাপিয়ে দিয়েছেন। এখন বল দেখি, কি রকমে কাজটা শেষ করি?"

স্বপন।—"কত টাকা খরচ কর্ব্বে বুঝ্‌তে না পার্‌লে পরামর্শ কি করে দেওয়া যায়?"

হীরেন।—"তাত বটেই। সবই বলছি। বাবা বলছেন আমার জীবনে বোধ হয় এই শেষ কাজ। এই বিয়েতে আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছেন সবাইকে ডাক্‌তে হবে, টাকা পয়সার জন্য ভেবোনা। সব দিক যাতে বজায় থাকে তাই কর। তাই তোমায় জিজ্ঞাস কচ্ছি কাকে কাকে আনবো; আর আমোদ প্রমোদেরই বা কি ব্যবস্থা করা যায়। মেয়েকে গহনা পত্তর যা দেওয়া হয়েছে তার উপরে আর কিছু দিতে হবে কি? দানসামগ্রীর জিনিষ গুলোও এক রকম কেনা হয়েছে। আস্‌ছে বুধবার আংটী ও ঘড়ির চেইন স্যাকরা দেবে বলেছে। বাবা এই বিয়ের খর্চ্চা ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। এর উপরে দু-একশ লাগেত এক রকমে চলে যাবে। এখন বলত আত্মীয় কুটুম্ব কাকে কাকে আনতে হবে।"

স্বপনরাণী নীরবে সব শুনিল ও কিছুকাল ধীরভাবে কি চিন্তা করিল। তারপর আত্মীয়দের দুই চারিটা নাম করার পরেই শ্রীকণ্ঠ বাবুর ও স্বর্ণপ্রভার নাম উচ্চারণ করিল। শ্রীকণ্ঠ বাবুর নাম শ্রবণ মাত্রেই হীরেন্দ্র নিতান্ত বিরক্তির সহিত ভ্রূকুটী করিয়া কহিল; "স্বপন! তোমায় অনেক দিন বলেছি ঐ নামটি আমার কাছে ব'লো না। আমি ওসব শুন্‌তে চাইনে।'

স্বপন বিষণ্ণভাবে কহিল,—"কেন? শ্রীকণ্ঠ বাবু জলের মত টাকা খরচ করে তোমায় মানুষ করেছেন ব'লে তার নাম শুনে শিউরে উঠ বুঝি। হায়রে কলির ধর্ম্ম!"

হীরেন্দ্র উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিল—"যে শোভনা আমার সুখের মুকুলিত জীবনকে নীরস মরুময় করে তুলেছিল, যার মূর্ত্তি দেখলে আমার সব স্ফুর্ত্তি মাঠে মারা যে'ত, আমার জীবনের মধুময় পাঁচটী বৎসর যে নষ্ট করেছে তার নাম ভুলেও কখনো আমার কাছে ক'রো না। আর যার সাথে শোভনার সংস্রব ছিল বা আছে আমি তাদের ছায়া মাড়াতেও প্রস্তুত নই—ভাগ্যে ভগবান দয়া করেছেন তাই"—

"তাই কি? বিধাতা দিদিকে কোলে স্থান দিয়ে তোমার সকল জ্বালা দূর করেছেন!"

স্বপনের এই কথার উত্তরে হীরেন্দ্র দৃঢ়তার সহিত বলিল, "হাঁ তাই।"

স্বপনরাণী আর কিছু বলিতে পারিল না আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। হৃদয়কোনে সযত্নে লুক্কায়িত মর্ম্মবেদনা রাশিতে হীরেন্দ্রকান্ত দারুন আঘাত

পাইল; তাই সে আজি শুভকর্ম্মের সূচনায় প্রাণান্ত চেষ্টাতেও উদ্বেলতাশ্রুর বেগ রোধ করিতে পারিল না। স্বপনের ভাব দেখিয়া হীরেন লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া বলিল "রাণী কাঁদছ কেন? আমি তোমায়ত কিছু বলিনি। যে আমার জীবনের কণ্টক ও তোমার সতীন ছিল আমি তারই প্রসঙ্গ তুলতে নিষেধ করেছি বইতো নয়। তাতে কেন এই ব্যাপারটা ঘটচে কিছুইতো বুঝতে পাচ্ছি নে।"

স্বপনরাণী বহু কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিল এবং চোখের জল মুছিতে মুছিতে কহিল "দিদি কি এমনই মন্দ ছিলেন যে তার নামটী পর্য্যন্ত শুনতে বা বলতে নাই। দেখছিত তার নামে তোমাদের আনন্দের হাটে আগুন লাগে, বাড়ী শুদ্ধ লোক মূর্চ্ছা যায়! এ গাঁয়ে আর কেউত তার নিন্দা করে না বরং সকলের মুখেই তার প্রশংসা শুনতে পাই। না হয় স্বীকারই কর্লাম দিদি তোমার সরস জীবনে অসুখ অশান্তির আগুন জ্বেলেছিলেন কিন্তু তার বাপমার কি দোষ? কোন্ পাপে তাঁরা এমন নরকে পড়েছেন যে তাঁদের নাম কর্ত্তেও তোমরা ঘৃণাবোধ কর। অমরাত শুনছি—শ্রীকণ্ঠ বাবু তাঁর বাড়ী ঘড় জমী জমা যা'কিছু আছে তা তোমায় লিখে দেন নি। এই দোষেই শ্বশুর মহাশয় তাঁর উপরে চটে ছিলেন এবং তুমি যাতে শ্বশুর বাড়ীর দিকে না যাও তাঁর চেষ্টাও যথেষ্ট করেছেন। আর দিদির দোষের মধ্যেত শুনেছি—তুমি ছিলে বাইশ বছরের রসিক যুবক, আর তিনি ছিলেন সাড়ে নয় বছরের বালিকা। তাঁর কাছে চেয়েছিলে উপন্যাস বা থিয়েটারের প্রেম। তা পাবে কেন? এই অপরাধেই দিদি নরকে পড়েছিলেন!"

হীরেন্দ্র আবার বাধা দিয়া বলিল "তোমাকে মূলতত্ত্ব বের কর্ব্বার জন্যে অত কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে হবে না। শোভনা বিনা দোষে নরকেই পড়ে থাক বা বিশেষ গুণে স্বর্গেই গিয়ে থাক্ দয়া করে তার নামটি আর আমার কাছে তুলোনা।"

পতির বাক্যে পত্নী স্বপনরাণী বড়ই মর্ম্ম যাতনা অনুভব করিল, সে কিছুতেই আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। সে তখন মুখ বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত করিয়া আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। হীরেন্দ্রকান্ত অবাক, অপ্রস্তুত। পরে অপরাধীর মত ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "রাণী আমার অপরাধ

হয়েছে ক্ষমা কর। তুমি যে এ কথায় এতটা কষ্ট পাবে সত্যিই তা বুঝতে পারি নি। শোভনার নাম বলতে বা শ্রীকণ্ঠ বাবুকে নেমন্তন্ন কর্ত্তে আর নিষেধ কর্ব্ব না। তুমি কেঁদো না। শুভ কর্ম্মে চোখের জল ফেল্‌তে নেই।" স্বপনরাণী কিছুকাল পরে চোখের জল মুছিয়া আবার শোভনার কথা পাড়িল। হীরেন্দ্র একটু বিরক্তি দেখাইয়া বাঁধা দিয়া বলিল "ওতো হোয়েই গেল। শ্রীকণ্ঠ বাবুকে নেমন্তন্ন করা যাবে। বিয়েতে আর কি কি কর্ত্তে হবে তাই শুন্‌তে চাই।"

স্বপন :—"তা বলবো এখন কিন্তু যে কথাটার জন্য এত চোখের জল ফেল্লুম তার শেষ না দেখে ছাড়ছি না।"

হীরেন্দ্র।—"রাণী তোমাকে আজ কিসে পেয়েছে। নাছোড়বান্দা হয়ে লেগেছ দেখ্‌ছি। আনন্দের উলু দিয়ে শুভ কাজের ফর্দ্দ ধর্ব্বে না চোখের জলে বাড়ী ঘর ভাসাতে চলেছ। তা তোমার যা ইচ্ছে' তাই কর। শোভনা তোমার কে? তার জন্য এত দরদ-ই-বা কেন? সে ত তোমার সতীন ছাড়া কেউ ছিল না। কোথায় তার নিন্দায় সুখ পাবে—না তার নিন্দায় তোমার দুঃখের-বান ডাকে—কলির সবই উল্টো।"

স্বপনরাণী ঘৃণার সহিত অপাঙ্গ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে একটু চাহিল। আজ তাহার মূর্ত্তি বড় গম্ভীর; বড়ই বেদনা-মলিন। তাহার নয়নে বদনে একটা সঞ্চিত গুপ্ত ঘটনা বিদ্যুতের মত যেন ছুটাছুটি করিতেছিল। সে কিছুকাল আবার নীরবে কত কি ভাবিল তারপর এক অপরিচিত দৃঢ়তায় মানসিক বল সঞ্চয় করিয়া সুস্পষ্ট ভাষায় স্বামীকে বলিল, "তুমি জান্‌তে চাচ্ছ শোভনা আমার কে, শোভনার নিন্দায় সুখ না পেয়ে এত দুঃখ পাই কেন। প্রকৃত কথাটা শুন্‌বে? শুন্‌লে ঠিক থাকতে পার্ব্বে? ভূত আবার কাঁধে চাপ্‌বে না তো? যে ভাগ্য হীনা শোভনা অশান্তির গরল ঢেলে দিয়ে তোমায় উৎসন্নের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সেই শোভনাই যদি আমি হ'য়ে থাকি? মৃত্যুর প্রায় আড়াই বৎসর পরে এই স্বপনরাণী মূর্ত্তিতে গরলের বদলে সুখ শান্তির সুধাভাণ্ড হাতে নিয়ে যদি তোমার জীবন কুঞ্জের দুয়ারে এসে হাজির হয়ে থাকি তবে কেমন হয়? কথাটা বিশ্বাস হলো কি?" এক নিশ্বাসে ইহা বলিয়া আত্মবিস্মৃতা-স্বপনরাণী হীরেন্দ্রকান্তের মুখের উপরে বিস্ফারিত নয়নদ্বয় স্থাপিত করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

হীরেন্দ্র হো হো হাস্যে গৃহদ্বার কম্পিত করিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ-কিঞ্চিৎ-প্রেম-সুরে বলিল, "এবার বাজীমাৎ। এমন ঔপন্যাসিক গল্পটা কোথায় পেলে? বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ধার করনি তো? শোভনা মরে ভূত হয়ে স্বপনরাণীর রূপ ধরে আমার কাঁধ চেপে বসেছে বুঝি? এবার ওঝা ডাক্‌তে হচ্ছে দেখ্‌ছি।"

স্বপনরাণী পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবেই বলিল—"অত ঠাট্টা কর্ত্তে হবে না। আমি শোভনা বলে বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? এখনি সব জান্‌তে পার্ব্বে।"

হীরেন্দ্র অবাক হইয়া বলিল—"আঁ্যা! আঁ্যা! বল কি তা কি করে সম্ভব! সত্যি কথাটা বলনা শোভনা তোমার কে?"

স্বপন—"গল্প নয়, উপন্যাস নয় সত্যি ঘটনা প্রকৃত কথা—আমিই সেই শোভনা।"

হীরেন্দ্র :—"আঁ্যা, আঁ্যা, তুমিই সেই শো—শো শোভনা। যে সকলের সাম্‌নে মরলো, যার শরীর খালের সমুখে শ্মশানের আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল; সে আবার বাঁচ্‌লো কি করে?"

স্বপন :—"কে বল্লে সে মরেছিলো। আর শ্মশানের আগুনে তাকে পোড়ালেই বা কে?"

হীরেন্দ্র :—"উঃ তার জন্যে ভেবোনা, গ্রামশুদ্ধ লোক এর সাক্ষী। হারুদাদা, পুলীন খুড়ো, যোগেশ পণ্ডিত প্রভৃতি তাকে শ্মশানে নিয়েছিল।

স্বপন :—"হাঁ একথা বল্‌তে পার। তারা শ্মশানে নিয়েছিল বটে কিন্তু পুড়িয়েছিল কে বল্লে? আমি শুনেছি আমার যখন শ্বাস বন্ধ হ'লো তখন আমায় মড়া ভেবে তোমরা তাড়াতাড়ি শ্মশানে পাঠিয়ে দিলে। সে দিন আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না বলেই তাড়াতাড়ি পাঠাবার দরকার ছিল। আমারত আর বাস্তবিকই প্রাণ বের হয় নি' কিছুকালের জন্য দম্‌টা বন্ধ হয়েছিল মাত্র। শুনেছি কলেরা রোগে তা হয়ে থাকে। যখন আমায় শ্মশানে নিয়ে যায় তখনই আমি নাকি একটু নড়ে চড়ে উঠেছিলাম। শ্মশান বন্ধুরা সেই নড়ন চড়ন দেখে ভাবিল এ কি! তবুও তাঁরা খালের ঘাটে নিয়ে আমাকে শ্মশানে চড়াতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তখনই নাকি আমার হাত পা একটু বেশী নড়ে চড়ে উঠেছিল। তারা তাই না দেখে 'রাম রাম' বলে ছুট। ডাক্তার বাবুর চাকর কালীচরণ এদের সাথে ছিল। সে এক

দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাক্তার বাবুর নৌকায় উঠে নানা ভঙ্গিতে ডাক্তার বাবুর কাছে আমার ভূতে পাওয়ার গল্পটা বলে ফেল্লে। ডাক্তার বাবু ত আর ভূত বিশ্বাস করেন না; কালীচরণ কথাটা বলতে না বলতেই তিনি সব বুঝতে পেরে মাঝিদের ডেকে বল্লেন—শিগ্‌গির নৌকা খুলে ঐ শ্মশান ঘাটে যাও ত। শব যেখানে পড়েছিলো তার কিছু দূরেই ডাক্তার বাবুর নৌকা বাধা ছিল। এই সময় এক পসলা বৃষ্টিও নাকি হয়। শ্মশানবন্ধুরা তখন কোথায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, এদিকে আর এলেন না। এই সময়ে ডাক্তার বাবুর নৌকা শ্মশান ঘাটে এসে হাজির হয় এবং আমি বেঁচে আছি বুঝতে পেরে কালীচরণ ও মাঝি নিধিরামকে ডেকে অতি সন্তর্পণে আমায় নৌকায় তুল্লেন। তারপর সেখান হতে নৌকা নিয়ে আবার পূর্ব্বের ঘাটে এসে উপস্থিত হলেন। এদিকে বৃষ্টির বেগটা একটু থেমে গেলে তোমাদের লোকজনেরা—ওপাড়ার সাহসী সুরেন চৌধুরী ও তোমাদের জ্ঞাতি গোপাল নন্দী ঘাটে ফিরে এলেন। এসে মড়া নাই দেখে সবাই আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—ঐ যাঃ ভূতে ধরে মড়াটা গেল কোথায়ে! শেয়ালগুলো টেনে নিয়ে গেল না কি? না ভূত হয়ে শেওড়া গাছে বসেছে? তা যাক্ যেখানে ইচ্ছা। এস আমরা একটা কাজ করি। কাপড় ও কাঠগুলো পুড়ে ফেলে ওদের গিয়ে বলি শবদাহ হয়ে গেছে। তারা তাই কল্লেন। কালীচরণ শ্মশানে আলো দেখে তামাসা দেখবার জন্য নৌকা হতে নেমে শ্মশানের কাছে গিয়েছিল সেখানে গিয়ে এদের সব কাণ্ড কারখানাই দেখেছিলো এবং শুনেছিলো। আমি তার কাছেই শেষে এসব কথা শুনেছি তোমরা এমন মানুষ ও শোভনাকে এত ভালবাসতে যে, নিজেদের কেউ সে সময় শ্মশানে আসা উচিত বোধ কর নি। নিজের বল্‌তে বাবা ছিলেন, তা'ও নাকি আমায় বের কর্ব্বার পরেই ফিট্ হ'য়ে পড়ে থাকেন। এইত হল কথা। নাটক উপন্যাসে শ্মশান ফের্ত্তার গল্প পড়েছ ও শুনেছ এমন অসম্ভব যে সম্ভব হয় কখন বিশ্বাস করেছ কি? শোভনা মরেছে ভালই হয়েছে, যত কিছু আপদ বালাই তার সঙ্গেই চলে গেছে। এখন স্বপনরাণীর পালা, তার কপাল ভাল।

হীরেন্দ্রকান্ত:—তারপর কি, বল শীগগ্‌রি বল।" স্বপন।—"তারপর আবার কি। দু'ঘণ্টা পরে নাকি আমার জ্ঞান হয়। ডাক্তার বাবু ঔষধ

দিতে লাগলেন আর কালীচরন শুশ্রূষায় নিযুক্ত হ'ল। রাত শেষে ডাক্তার বাবু নৌকা ছাড়তে হুকুম দিলেন। ডাক্তার বাবুর চিকিৎসার গুণে সে যাত্রা আমি রক্ষা পেলাম। আমার শরীর ভাল রকম শোধরাতে প্রায় ছ'মাস লাগলো। তারপর আমায় তোমাদের বাড়ীতে কি হরিহরপুরে বাবা ও মার কাছে পাঠাবেন এই নিয়ে কিছু দিন কর্ত্তা গিন্নিতে বেশ পরামর্শ চল্লো। শেষটা ডাক্তার বাবুর কথাই বজায় থাকলো। তিনি গিন্নিকে বল্লেন, আমি দেবগঞ্জের কসাই বাড়ীতে মেয়েটাকে এইভাবে কখনই দেব না। হরিহরপুরে শ্রীকণ্ঠ বাবুর কাছেও পাঠাব না। তাহলে কথাটা প্রকাশ হ'য়ে পর্ব্বে, আমার অভিসন্ধি টিক্‌বে না।"

হীরেন্দ্রকান্ত একটু বিকৃতভাবে হাসিয়া বলিল ডাক্তার বাবুর অভিসন্ধিটা বুঝি স্বপনরাণী পরিচয় দিয়ে আমার সাথে আবার বিয়ে দেওয়া।

স্বপন ঃ—আঃ অত উতালা হচ্ছ কেন, শুনে যাও না। তারপর তিনি নিজের মেয়ের মত আমায় পাল্‌তে লাগলেন। কেবল তাই নয়, নিজের কন্যা বলিয়াই পরিচয় দিলেন। আমিও তাঁকে বাবা ও গিন্নিকে মা ডাকৃতে আরম্ভ কল্লুম। এদিকে ডাক্তার বাবু খোঁজ নিতে থাকলেন তুমি শূন্য গৃহ আবার কবে পূর্ণ কর। তিনি একদিন হাসতে হাসতে গিন্নি মাকে বল্লেন যদি শোভনা বলেই একে রায় বাড়ী পাঠাই তবে এর দুঃখ দুর্গতি ইহজন্মেও ঘুচ্‌বে না। আমার মেয়ে নাই। স্বপ্নে পাওয়ার মত একে পেয়েছি। একে স্বপনরাণী বলে ডাক্‌বো এবং আমার কন্যা স্বপনরাণী বলে পরিচয় দিয়ে যত টাকা লাগে দিয়ে আবার হীরেনের সাথেই বিয়ে দিব। তা হলে এর কপালে সুখ সৌভাগ্য ঘটলেও ঘটতে পারে। গিন্নি মা বিস্মিত হ'য়ে বলে ছিলেন—এআবার তুমি কোন্ দেশী রূপকথা জুড়ে দিলে। ওকে না হয় কন্যা বলে পরিচয় দিলে। টাকা পয়সা দিয়ে বিয়ে দেওয়াটাও না হয় সম্ভব হ'ল কিন্তু ওর চেহারা লুকোবে কি করে? ওকে দেখেইতো তারা চিনে ফেলবে। উত্তরে ডাক্তার বাবু বল্লেন হাঁ তারা চিন্তে বসেছে। এমন ভাবে টাকা ছড়াব যে চিন্‌লেও আর চিন্তে চাইবে না। টাকায় এসংসারে কি না হয়? চেনাও অচেনা হয়, অচেনাও চেনা হয়। তা ছাড়া অনেক স্থলে দুজনার ভিতরে চেহারার মিল কি আর থাকে না? তারপর যা যা ঘটেছে তা বোধ হয় আর বল্‌তে হবে না। গিন্নি মা আর কিছু বল্লেন না। তিনি যে আশঙ্কা

করেছিলেন তোমাদের বাড়ীতে তা ঘটে নি। আমায় কেউ শোভনা বলে চিন্তে পারে নি। আমিও খুব সাবধানে চলেছি। আমার ইচ্ছে ছিল শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত এর বাষ্প তোমাদের কাহাকেও জান্তে দেব না, কিন্তু আজ আর তা হ'ল না। তোমার ব্যবহারে কেমন হাড় পাঁজর ভেঙ্গে কান্নাটা এসে পড়্লো চেষ্টা করেও তা থামিয়ে রাখা গেল না কাজেই ধরা দিতে হ'ল। এখন বোধ হয় তোমার কাঁধে আর ভূত চাপ্‌বে না। আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি সেই শোভনাইত আমি স্বপনরাণী। সেই বা এত কুৎসিৎ কদাকার বোকা অসভ্য হয়েছিল কোন্ দোষে, আর এই যে আমি স্বপনরাণী আমারইবা এত সৌন্দর্য্য এমন বুদ্ধির বহর ফুটে উঠল কোন্ গুণে। তুমি কি বলবে জানি না আমার বিশ্বাস মনের বাঘে তোমাকে খেয়েছিল। আর শুধু তোমাকেই বা বলি কেন তোমাদের বাড়ী শুদ্ধ সবাইকেই মনের বাঘে ধরেছিল। আর কখনও এমন মারাত্মক মনের বাঘটাকে কাছে আসতে দিও না এই আমার অনুরোধ। সংসারে অনর্থ ঘটাবার মূলই এই মনের বাঘ।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র গুপ্ত শাস্ত্রী।

——:০:——

পরশমণি।

(১৩)

লীলাও ভাল করিয়া বিজয়কে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই; কুয়াসায় ঢাকা প্রকৃতির স্বচ্ছ আবরণের মত কি যেন এক বিচিত্র রহস্য-কাহিনী যে তাহার জীবন ঘিরিয়া রহিয়াছে, সেটা সে বিশেষ করিয়াই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। যেখানে পরাজয়—যেখানে কিছু বাধা—যেখানে কিছু গোপনের ভাব প্রকাশ পায়, মানুষের চিত্ত ঠিক্ সেখান হইতেই গুপ্ত রহস্য আবিষ্কারের জন্য ব্যাকুল হইতে চাহে। যে মানুষ অতি সহজ সরল ভাবে সব কথা বলিয়া যাইতে কোন দ্বিধা সঙ্কোচ করে না, সে যে কেন তাহার আত্ম-কথা নিবেদনের বেলাই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে—এ কেমন? বিজয়ও বুঝিতেছিল যে সে আর নিজকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে না, অথচ তাহার আগের মত তেমন সরল

সাহসও নাই যে সব কথা বলিয়া যাইতে পারে। সে যে কোন রূপেই তাহার গোপন-ইচ্ছাটাকে ব্যক্ত করিতে চাহে না, তার এ দুর্ব্বলতা কেন? আর লীলা! সেও যে কেমন একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, এ দুর্ব্বলতাত তাহার কোন দিন ছিল না! সে যে বিদ্যালয় হইতে সুরু করিয়া কলেজের শিক্ষা শেষ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহুপুরুষের সহিত মুক্ত কণ্ঠে আলাপ করিয়াছে, হৃদয় একটুও ত কাঁপে নাই, কোন দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে নাই! আজ যে বিজয়ের সঙ্গে আলাপ করিতে গেলে ক্রমাগতই তাহার চারিদিকে লক্ষ্য পড়ে,—কাপড়ের পারটা এলাইয়া পড়িল কি? মাথার কুন্তলগুচ্ছ একটু এলমেলো হইয়া পড়িল বুঝি; ব্রুচটা বুঝি ঠিক যায়গায় নাই; জুতার গোড়ালিটা কি বিশ্রীই না দেখায়—কেন এসব?

উভয়ের হৃদয়েই দুর্ব্বলতা। লীলার পাণ্ডুর মুখ বিজয়ের সহিত চোখাচোখি হইলেই লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিত। বরদা বাবু বারেন্দা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে— বিজয় ও লীলা, দু'জনে খানিক চুপ করিয়া রহিল; তারপর ধীরে ধীরে বিজয় কহিল—"দেখুন, কাল আপনাদের ছেড়ে যেতে যে কত বড় আঘাত পাব, আজ, কাল যাব একথা মনে করেই তা অনুভব কর্ত্তে পাচ্ছি; কে জানে জীবনে আর কখনো দেখা হবে কিনা! বিদায় কথাটা মর্ম্মান্তিক! বিধাতার বিধান এমনি নির্ম্মম যে কত জনের এইরূপ বিদায়ই চিরবিদায়ে পরিণত হয়ে গেছে! তাই আজ—"কালকার" বিদায় আমাদের জীবনের চির বিদায় কিনা সে কথা মনে ভেবে ভেবে আমার চিত্ত যেন বড়ই ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ছে! সব কথা ভালকরে বলে উঠ্‌তে পাচ্ছি না! আপনি কি ভাবছেন মিস্ রায়!"

লীলা মৃদুস্বরে কহিল—"তা কেন হবে? নিশ্চয়ই আবার আপনার সাক্ষাতে প্রীতি লাভ কর্ত্তে পারবো। হাজারের মধ্যে দু'দশজন বাঙ্গালীর চিত্ত কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ হতে পারে কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই দুর্ব্বল—স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের। ইংরেজের মতো কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, চিত্তের দৃঢ়তা এখনো বাঙ্গালীর নাই। বিশেষ যাহারা ভাবপ্রবণ তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।" জলভরা মেঘের মত দুইটী তরুণ কোমল হৃদয় বুকের মধ্যে যে প্রাণের আবেগ পোষণ করিতেছিল তাহা লজ্জার বাধায় আর অগ্রসর হইল না। বিজয়ের চোখে সেই তরঙ্গে ভাসমানা সুন্দরীর

রূপলহরী, তারপর শয্যায়শায়িতা লীলার সেই অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যরাশি কেবলি চোখে ভাসিতেছিল। লীলার কাছে বিজয়ের দীপ্ত গৌরকান্তি পৌরুষ-সৌন্দর্য্য জগতের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া মনে হইতেছিল।

*　　*　　*　　*

পরদিন বিকেল বেলা নরেন্দ্র বাবু, বরদা বাবু, লীলা ও অন্যান্য কয়েকজন প্রবাসী বাঙ্গালী বিজয়ের সহিত ষ্টেশন পর্য্যন্ত চলিলেন। ষ্টেসনে লোকারণ্য; কত দেশদেশান্তরের যাত্রী গাড়ীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে নিরূপিত সময়ে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজগামী গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইল। বিজয় একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষে যাইয়া উঠিয়া বসিল। সকলে একে একে বিদায় লইলেন। লীলার সহিত শেষ বিদায় লইবার সময় সে আপনাকে সামলাইতে পারিল না; হঠাৎ সে লীলার দুইখানা কুসুম কোমল হস্ত দুইহাত দিয়া চাপিয়া কহিল—"মিস রায়, দয়া করে মনে রাখ্‌বেন।"

লীলার বাক্য স্ফুরণ হইল না কিন্তু তাহার বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ দু'টী হইতে দুই ফোটা তপ্ত অশ্রু বিজয়ের হাতের উপর গড়াইয়া পড়িল, সে আর চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না! ধীরে ধীরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল! বরদা বাবু ও নরেন্দ্র বাবু ষ্টেশনের বারেন্দায় দাঁড়াইয়া রুমাল নাড়িতে লাগিলেন! বিজয়ের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না—সে দেবী প্রতিমার মতো দণ্ডায়মান লীলার সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য চিত্র, যতক্ষণ দৃষ্টি চলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ণিমেষ নয়নে দেখিতেছিল,—লীলা ও একই ভাবে গতিশীল গাড়ীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল!

যখন গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেল তখন সে আপনার দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিল, নিজকে সাম্‌লাইয়া লইয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "মিস রায়, ভালত?" লীলা ফিরিয়া দেখিল ওভারকোটে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া ও চোখে নীল রঙের চস্‌মা পরিয়া অমল দাঁড়াইয়া, তাহার সাম্‌নে প্রচুর লটবহর ও লোকজন! লীলা তাড়াতাড়ি অমলকে প্রতি নমস্কার করিয়া নরেন্দ্র বাবু ও বরদা বাবুর নিকট চলিয়া আসিল এবং ত্রস্ত বাড়ীর পথ ধরিল। অমল তাহাদিগকে দেখিতে পাইল—সেদিকে অগ্রসর হইল কিন্তু কাছে আসিয়া কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই দেখিতে পাইল যে তাহারা ষ্টেশনের দরজা ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন।

(১৪)

তারাসুন্দরীর কোন কথাই রহিল না, তাহার মিনতি, তাহার অনুরোধ বাক্য কিছুতেই রাধাকান্ত বাবুর মন টলিল না। দরিদ্রের এত তেজ কেন? অর্থহীন নিরন্নের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই হইবে! দেখা যাউক কতদিন সে দারিদ্র্যের নির্য্যাতন সহিয়া আপনাকে সাম্‌লাইয়া রাখিতে পারে! পূর্ব্বে জামাতাকে যে মাসিক ত্রিশ টাকা সাহায্য পাঠাইতেন তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। বাড়ীর সকলের উপর করা হুকুম হইল, কেহ যেন সেই পাজি হতভাগা নচ্ছার ছোরাটার সম্বন্ধে কোন কথা আর তাহার নিকট না বলে! কমলা স্বামীর এতটা অপমানে কোনরূপেই আপনাকে অপ্রমানিতা মনে করিল না! স্রোতের ফুল যেমন ভাসিতে থাকে, সেও তেমনি লক্ষ্যহীন ভাবে ভাসিয়া যাইতে লাগিল! তাইত, দরিদ্র যে তাহার এত গর্ব্ব থাকাই যে অন্যায়! তবু কন্যার একটা মত ভাল করিয়া জানা ভাল, কি জানি পাছে যদি আবার কন্যার চিত্ত সেই অপদার্থ দরিদ্র স্বামীর জন্য কাঁদিয়া উঠে, পাছে সে আবার একটা গোল বাঁধাইয়া ফেলে; কারণ মেয়েদের বিশ্বাস কি? যাহাকে পরের করে সমর্পণ করা হইয়াছে, দেবতা ও বিগ্রহ সাক্ষী করিয়া যাহাকে অপরের হস্তে দান করা হইয়াছে, সেই কন্যার স্বামীর প্রতি চিত্তের আকর্ষণ থাকা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এজন্য বুদ্ধিমান রাধাকান্ত বাবু কমলাকে ডাকিয়া সব কথা বুঝাইয়া কহিলেন "কোন চিন্তা নাই মা! আমি তোমাকে পথের কাঙাল করে যাচ্ছি না, আমার অভাবেও যাহাতে তোমার কোনও কষ্ট না হয়, তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পার, আমি সে সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, যে দিন না বিজয় এসে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবে—অনাহারে রুক্ষ-ছিন্ন বেশে এসে আমার দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে না দাঁড়াবে—ততদিন পর্য্যন্ত তুমি তাকে ভুলে যাও মা, মনে কর তুমি কুমারী! আমার শিরায় শিরায় তার সেই অপমানের বাণী গলিত অগ্নি স্রাবের মত উষ্ণদাহে পুড়িয়ে মারছে, সে অপমানের প্রতিশোধ চাই—শাস্তি চাই; তুই যদি আমার সংকল্প রক্ষার সহায় না হ'স্, তাহলে যে পেরে উঠ্‌বো না মা, তোর মায়ের কথা তুই শুনিস্ না। দরিদ্রের মেয়ে এসে বড় ঘরে পড়েছে কিনা, তাই বড় বংশের মান মর্য্যাদা, খ্যাতি প্রতিপত্তি কি সে তা জানেনা, সবই সে সাধারণ বিচারের তৌলে ওজন কচ্ছে, সে কি করে

হবে বলত? বিধাতা তাহলে ধনী দরিদ্র গড়তেন না; দরিদ্র—সে যে ধনবানের অধীনতাকে মেনে চলবেই! তার তেজ কেন থাক্‌বে? কেমন মা, একথা ঠিক্ কিনা বল্!"

বিধাতার সৃষ্টি রহস্যময়। রুক্ষ বন্ধুর পাষাণ গঠিত কঠিন পর্ব্বতও তাহার সৃষ্টি আর স্বচ্ছ শীতল সলিল বাহিনী জাহ্নবীর ধারাও তাঁহার সৃষ্টি। নারী করুণাময়ী, নারী পাষাণীও বটে। কমলা—স্থির নিশ্চল পাষাণে গড়া মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া পিতার কথাগুলি শুনিল—দরিদ্র স্বামীর প্রতি তীব্র কটাক্ষ ও বিদ্রূপের অট্টহাস্যও তাহার কর্ণে পশিল, তবু সে দ্বিধা সঙ্কোচ বিহীন চিত্তে দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "বাবা, আমি কবে তোমার অবাধ্য হয়েছি বল? সংসারের সকলেইত আমাকে ঘৃণা করে, নিন্দা করে, শুধু তুমি আমায় ভালবাস, তোমার স্নেহই আমার অক্ষয় কবচ; তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য্য, আমি তোমার কথা শুন্‌বো, তোমার অপমানের ব্যথায় আমার পঞ্জরও যে জীর্ণ হয়ে গেছে, সে ব্যথা, সে অপমান যে আমার প্রাণে কত বড় লেগেছে, সেত আমি বলে বুঝাতে পারবো না বাবা! যে আমার পিতার অপমান করেছে, অমন স্বামীর মুখ আমি দেখবোনা, তার জন্য আমি ব্যাকুল হব না! আমার জীবন ব্যর্থ হয়েছে হউক, সেও ভাল!" রাধাকান্ত বাবু উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন "আশীর্ব্বাদ করি মা, তুমি চির সুখিনী হও, তোমান পিতার আশীর্ব্বাদ কখনো ব্যর্থ হবে না, একদিন না একদিন তা সার্থকতার ফুল্ল-সৌরভে তোমার চিত্তকে মধুময় করে তুলবেই!

মানুষ সব করিতে পারে, হিংসার জ্বালায় সে আপনার হৃদপিণ্ড ছেদন করিতে পারে। ক্রোধের অগ্নিতে সে স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিয়া সোণার সংসারে অশান্তির প্রবল বহ্নি জ্বালাইয়া দিতে পারে! মানুষ মোহের তাড়নায় বিবেক হারাইয়া দম্ভের পিশাচ মূর্ত্তির অঙ্গুলি সঙ্কেতে আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইয়া, কর্ত্তব্যকে ছাপাইয়া দ্বেষের লোভের ও দম্ভের মোহিনী মায়ায় আপনাকে ডুবাইয়া ফেলে, বুঝিতে পারে না যে সে কোথায় নামিয়া যাইতেছে, কত বড় তাহার পদস্খলন হইতেছে সে কোথায় ডুবিয়া যাইতেছে! বুঝিবার সুযোগ তাহার কোথায়! প্রকৃতিস্থ হইবার অবসর তাহার কই? বিবেক যে তাহার নাই, সে যে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত আপনার শক্তি হারাইয়া কেবলি ভাসিয়া

চলিয়াছে! সয়তান যে তাহার হৃদয়ে বসিয়া কেবলি বলিতেছে, প্রতিশোধ চাই! প্রতিহিংসা চাই! মানব চরিত্রের কি এ জটিল সমস্যা! মানবের কি এ দুর্ব্বলতা!

শাস্ত্রে কহে "নারীর অপমানে লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হ'ন। নারীর সন্তোষে ও তৃপ্তিতে "কমলা" চিরদিন বাঁধা থাকেন। যে দেশে নারীর মর্য্যাদা বিলুপ্ত— সে দেশ কখনো জাগিতে পারে না, পুরুষ ও নারী জগতের দুই শক্তি; একের অভাবে অন্যের প্রভাব কোথায়? প্রকৃতি ও পুরুষের মধুর সংযোগ ফলেই বিশ্বজগত জাগ্রত, শোভা সম্পদ পরিপূর্ণ ও বিশ্বমানবের চির প্রিয়তম ভূমি! প্রকৃতির মোহিনী মায়ায়ই জগত চলিতেছে; সে মায়াকে তাড়াইবার আস্ফালন বৃথা!

তারাসুন্দরী বারবার আঘাত পাইয়া রোগশয্যায় একেবারে গা ঢালিয়া দিলেন। স্বামীর দুর্ব্যবহার, কন্যার অমানুষিক ভাব তাহাকে উন্মত্তা করিয়া তুলিল। মেয়ে মানুষের একি আচরণ! স্বামী যে স্ত্রীলোকের একমাত্র আরাধ্য দেবতা, আর স্ত্রী যে স্বামীর চির আদরিণী। একে অন্যের অভাবে সংসার যেখানে অচল হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে একি বিষম ব্যবধান! বিজয়ের বিষাদমাখা মুখখানা মনে করিয়া তাহার হৃদয়ের শান্তি সুখ একেবারে চলিয়া গেল! তাহার মাথার যন্ত্রণা, বুকের ব্যথা ডাক্তারের ঔষধে পথ্যে বা শুশ্রূষায়—কোনরূপেই কমিবার দিকে নামিল না, কেবলি বাড়িয়া চলিল। কি করা যায়? মেয়ে কি এমনি করিয়া স্বামী থাকিতেও স্বামী সোহাগিণী হইবে না! সে দিন রাধাকান্ত বাবু বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন! তারাসুন্দরী জানালার ধারের সোফায় শুইয়া সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিতেছেন; কি সুন্দর গোলাপী আভা! কি সুন্দর স্তরে স্তরে সজ্জিত লোহিত মেঘমালা! কি সুন্দর উদার অনন্ত নীলাকাশ! পাশে কমলা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তারাসুন্দরী ধীরে ধীরে কমলার হাতখানি ধরিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে কহিলেন, "কমলা"। তাহার স্বরের মধ্যে এমন একটা বেদনা মাখান ছিল যে কমলা হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "কি মা?"

"কমল, একটা কথা।"

"কি কথা মা?"

"সত্য বল্‌বি ?"

"আমিত কোনোদিন মিছে কথা বলিনা মা !"

"বেশ, তবে আমি তোকে এখন জিজ্ঞেস কর্‌তে পারি ?"

"তুমি অমন কচ্ছ কেন মা ?"

"কই, কিছুত না ! আমার বড্ড বাধ বাধ ঠেক্‌ছে, তবু তোকে জিজ্ঞেস করি, তুই কি বিজয়কে ভালবাসিস ?"

কমলা এমন একটা অস্বাভাবিক প্রশ্ন আশা করে নাই ! তার সারা শরীর বাহিয়া একটা বৈদ্যুতিক-প্রবাহ ছুটিয়া গেল, সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া—বেশ একটু দৃঢ় কণ্ঠে কহিল "একথা কেন জিজ্ঞেস কচ্ছ মা ?"

"অম্‌নি, তবে কি জানিস্ মা—স্ত্রীলোক যত বড় কঠোরই হয় না কেন, সে কখনো তাহার স্বামীকে ভুল্‌তে পারে না, স্বামীর প্রাণে আঘাত দিতে পারে না কেন না স্বামী—স্বামী, যে নারী পতির প্রাণে ব্যথা দিতে পারে, সে পাষাণী, সে রাক্ষসী, সে পিশাচী ! তুই আমার মেয়ে হয়ে কি রাক্ষসী হতে চাস ?" একথাগুলি বলিবার সময় তাহার চোখ দিয়া বজ্রাগ্নির ন্যায় তেজরাশি ছুটিয়া বাহির হইতেছিল, কণ্ঠে তাহার অমানুষিক তেজ ও দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছিল।

কমলা মাতার এই তেজোদীপ্ত বাণীতে স্তম্ভিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার বাক্য নিঃসরণ হইল না ! তারাসুন্দরী বলিয়া যাইতে লাগিলেন "আমার বই পড়া বিদ্যা নেই মা, স্ত্রী পুরুষের সমান বিধান কোন দিন জগতে চল্‌বে কিনা জানি না ; তবে একথা জান্‌বি, নারী—নারী, পুরুষ—পুরুষ ! পুরুষের চরিত্রে যা শোভন হয়, নারীর চরিত্রে তা কখনো খাট্‌বে না, নারীর ভালবাসা স্নেহ মমতাই হচ্চে জীবনের সার ধর্ম্ম, আর পুরুষের পৌরুষত্ব, শক্তি দৃঢ়তা হচ্চে পুরুষের ধর্ম্ম। যেখানে সে বিধান প্রত্যাখ্যাত, সেখানে বিষবৃক্ষ উঠ্‌বেই ! যে নারী স্বামীর অপমানে আপনাকে অপমানিতা মনে করে না, লজ্জা বোধ করে না—সে নারীর অযোগ্যা ! একদিন এদেশেই সতী শিবের নিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, উনি বিজয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন—একটা মনগড়া দোষ তৈরী করে, তুই কেন তার প্রশ্রয় দিচ্ছিস্, তুই কেন তাকে বুঝিয়ে বলিস্ না, "না এ হ'তে পারে না, তাহলে কি এতটা দাঁড়াতে পারত ? অন্যায় কি এতটা বিষের জ্বালা ছড়িয়ে দিয়ে সংসারটায় অশান্তির আগুণ জ্বালাতে

পারত? আমার কথা শোন্ কমল, আমি তোর মা, মা যেমন মেয়ের কষ্ট বোঝে. বাপ কখনো তেমন বুঝতে পারে না, তুই বিজয়কে চিঠি লেখ্, ক্ষমা চা, সব মেঘ দূর হয়ে যাবে! সে বড় ভাল ছেলে, সে তোকে ক্ষমা করবে।”

কমলা ক্রুদ্ধা রাজহংসীর মত গ্রীবা উচ্চ করিয়া কহিল, “আমিত কোন অন্যায় করিনি মা! কেন আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে যাব, সে আমি পারবো না—না কখনো পারবো না! বাবার উপদেশই আমার শিরোধার্য্য! তোমার কথা মা আমি কোন রকমেই রাখ্‌তে পারবো না, যদি দোষ কর্‌তুম তা হলে এক কথা ছিল, বিনা দোষে কেন আমি ক্ষমা চাইতে যাব? তা হবে না—হবে না!”

তারাসুন্দরী স্তম্ভিত হইয়া কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন—তারপর অতি কোমল কণ্ঠে নিজের মনে বলিতে লাগিলেন, “এতেজ থাক্‌বে না! একদিন তোর এ গর্ব্ব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে!” প্রকাশ্যে কহিলেন, “আমি মা তোকে অভিশাপ দিতে পারি না, কিন্তু আজ আমার ঠোঁটের কাছে কেবলি যে অকল্যাণের বাণী এসে ধাক্কা দিয়ে বেরুতে চায়! আর তাকে যে রোধ করতেই হবে! কিন্তু কমল, একদিন তুই এ ভুল বুঝবি, কিন্তু সেদিন হয়ত তোর এ মা বেঁচে থাকবে না।”

কমলা আর কোন কথা কহিল না! এমন সময়ে রাধাকান্ত বাবু ঝড়ের মত বেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, “গিন্নি, শুন্‌ছো! শোন! বড় সু-খবর! তারাসুন্দরী কোচের উপর দুইটী বালিশের উপর ভর দিয়া মাথা তুলিয়া কহিলেন “বল।”

“শচী ব্যারিষ্টারী পাশ দিয়েছে, আস্‌ছে মেইলে দেশে আস্‌বে!” গৃহিণীর দুই চোখ বাহিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িল! চোখের জল মুছিয়া, অতি করুণ স্বরে কহিলেন, “আহা! বেঁচে থাক্, বাছাকে আমার দেখে যেন মরি!” “একি বল্‌ছো মা!’—কমলা সব ভুলিয়া গিয়া সহজ সরল ভাবে এই কথাটি বলিয়া ফেলিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “তা বই কি! আমার যে দিন বড় ঘনিয়ে আস্‌ছে! আমি তা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি!”

রাধাকান্ত বাবু একটু ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন—“তোমার ঐ এক কথা!”

(ক্রমশঃ)

প্রসঙ্গ-কথা।

ঢাকা ইউনিভার্সিটী।

বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার বিগত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নবাব নবাবআলি চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে অনেকের বিশ্বাস পশ্চিম বঙ্গবাসী লোক বিশেষের চক্রান্তে (Manœuvre) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখনও স্থাপিত হইতেছে না। তাহার কথা শ্রবণে বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু রাগান্বিত হইয়া উঠেন কিন্তু তর্জ্জন গর্জ্জন ব্যতীত বিশেষ কিছু বলিতে পারেন নাই। তাঁহার ঈদৃশ উত্তেজনার আমরা কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বিলম্ব দর্শনে পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণ নিতান্তই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং নবাব সাহেবের সন্দেহ যে ভিত্তীহীন নহে তাহাই মনে করিতেছে। পাটনাতে যদি এ সময় নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে তবে ঢাকা কি দোষ করিল? ভূতপূর্ব্ব ভাইসচেন্সেলার সার আশুতোষও প্রকারান্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মত গ্রহণ করিলে Doomsday পর্য্যন্ত একমাত্র কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর দ্বারাই বাঙ্গলার সমস্ত শিক্ষা সমস্যা পূরণ হইবে। 'বেঙ্গলী' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকাতে'ও ঢাকা ইউনিভার্সিটীর সাপক্ষে কোনও প্রবন্ধাদি দেখিতেছি না। বরং শেষোক্ত পত্রিকাটিতো প্রকাশ্যভাবে বিপক্ষবাদী। এমন কি 'সঞ্জীবনী'—যাহার সম্পাদকের জন্মস্থান পূর্ব্ববঙ্গে (এক্ষণে কলিকাতায়)—সেও বিপক্ষপাতী। মোট কথা—পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হয় ইহা যেন অনেকের ইচ্ছা নয়।

কয়েক বৎসর যাবৎ বর্ষাসমাগমে ঢাকায় লাট সাহেব আগমন করেন এবং তখন ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশন হয়। ইহা ও যেন পশ্চিমবঙ্গবাসী কাহারও কাহারও অসহ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। বিগত লাট সাহেবের সভায় অধিবেশনে বর্দ্ধমানের মহারাজা যাহাতে ভবিষ্যতে ঢাকায় সভা না হয়—তাহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট অবশ্য এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। যদি বোম্বাই ও ইউ পির দ্বিতীয় রাজধানী পুণা ও লক্ষ্ণৌতে ব্যবস্থাপক সভার

অধিবেশন হইতে পারে তাহা হইলে ঢাকায় হইতে কেন এমন আপত্তি? এই সম্বন্ধে তথাকথিত দেশনায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় ঢাকার সাপক্ষে কোনও প্রবন্ধ লিখিত হইতে দেখিতেছি না কেন? মনোগত ভাব অনুমেয়। যখন স্বদেশী আন্দোলনে দেশ মাতাইয়া বাহাবা নিতে হইবে,—National universityর জন্য অর্থের প্রয়োজন হইবে—Double Company ইত্যাদির জন্য সৈন্য সংগ্রহের দরকার হইবে তখন এই পশ্চিম বঙ্গবাসী নেতাগণ কলিকাতা হইতে আগমন করিয়া খুব স্বদেশহিতৈষিণার বক্তৃতা করিয়া যান, ভাই ভাই বলিয়া কত গলাগলির ভাব দেখান কিন্তু তার পর, পূর্ব্ববঙ্গের উন্নতি বিষয়ক কোনও প্রস্তাব সম্বন্ধে তাহাদের সহানুভূতি দেখিনা। পূর্ব্ববঙ্গবাসী ঈদৃশ 'নেতাদের' ব্যবহারে দিন দিনই ত্যক্ত হইতেছে। কবে তাহাদের মোহ সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে?

(৩) 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় পূর্ব্ববঙ্গের শুভানুধ্যায়ী স্বরূপে দুইজন অজ্ঞাত নামা লেখক ঢাকা ইউনিভার্সিটীর বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ধূয়া উঠান হইয়াছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে মুসলমানদের ডিগ্রী লাভের ও চাকরী পাইবার সুযোগ হইবে এবং সেই অনুপাতে হিন্দুগণ চাকরী হইতে বঞ্চিত হইবে। এই হিন্দু মুসলমান সম্মিলনের দিনে ঈদৃশ সঙ্কীর্ণতার পরিচয় কেন? আর 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বা ঈদৃশ প্রবন্ধাদি স্থান পায় কেন? বেঙ্গলীর কথায় আমরা হিন্দু ও মুসলমান নাকি এক রমণীর দুই চক্ষু বিশেষ। 'চাকরীর' সাধ কি বাঙ্গালীর এখনও মিটিল না? কেবল 'চাকরী' করিয়া কোন্ জাতি ধনী বা বড় হইয়াছে? মাড়োয়ারীগণের ভিতর কয়জন চাকর আছে কিন্তু War Loanএ তাহারা সামান্য কয়েকজন ব্যক্তি যে টাকা দিয়াছেন, বাঙ্গালী সকল 'চাকরগণ' একত্র হইয়াও তাহার সহস্রাংশের একাংশ দিতে সক্ষম হইয়াছে কি? গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে মুসলমানগণ এখন তাহাদের সংখ্যানুপাতে কেরাণী ইত্যাদি চাকরী পাইতেছে এবং দিন দিনই তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইতেছে। রহিল বাকী কয়েকটী ডেপুটী ও মুন্সেফী খুব—সম্ভব তাহার সম্বন্ধেও শীঘ্রই ঈদৃশ ব্যবস্থা হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলেই যে মুসলমানগণ দলে দলে বি, এ, এম এ পাশ করিয়া দেশ ছাইয়া ফেলিবে, এমত মনে হয় না। শুধু ঢাকায় কেন, প্রত্যেক বিভাগে

একটী করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। বিলাতে কয়টী বিশ্ববিদ্যালয় আর সেই অনুপাতে আমাদের কয়টীর প্রয়োজন? শিক্ষা কেন্দ্র যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে—ততই শিক্ষার বিস্তার হইবে, দেশ উন্নত হইবে। মিথ্যা হিংসা করিয়া দেশের উন্নতির পথরোধ চেষ্টা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। তবে দেখিতে হইবে, যাহাতে Commercial & Technical Educationর বিস্তার হয় তাহার দিকে যেন আমাদের সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি থাকে।

বাঙ্গালী পল্টন ও সৈন্য সংগ্রহ।

গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীগণকে সৈন্যস্বরূপে যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। যে জাতির ভিতর সৈনিক নাই তেমন বল বীর্য্যহীন জাতির জগতে স্থানও নাই। আমরা আশা করি, দলে দলে বাঙ্গালী যুবকগণ এ শুভ ব্যাপারে যোগদান করিবে। 'বিক্রমপুর বীর কেদার রায়ের জন্মস্থান' তাঁহার দেশবাসী কি এক্ষণ এমনই কাপুরুষে পরিণত হইয়াছে যে অন্ততঃপক্ষে দুইশত লোকও যুদ্ধে যোগদান করিবে না? বিক্রমপুরবাসী সকল কার্য্যেই অগ্রণী কেবল কি এ ব্যাপারেই তাহারা পশ্চাৎপদ হইবে? আশা করি এক বিক্রমপুর হইতেই এক Double Companyর উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহ হইবে।

যুদ্ধঋণ সভা।

মুন্সীগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নগরকসুবা গ্রামে যুদ্ধঋণ সংগ্রহের জন্য সভা করিয়াছিলেন তাহাতে তত্রত্য ব্যবসায়ীগণ গভর্মেণ্টকে ষোল হাজার টাকা ঋণ দানে প্রতিশ্রুতি দিয়ায়াছেন।

বিক্রমপুর-সাহিত্য-সমিতি।

গত ২রা বৈশাখ রবিবার বিক্রমপুরের গৌরব স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই মহোদয়ের জন্মস্থান ভরাকর গ্রামে উক্ত ঘোষ মহাশয়ের বসতবাটিতে তদঞ্চলবাসী সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের একটি সভা হয়। বিক্রমপুরের সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ অবকাশমত সম্মিলিত হইয়া যাহাতে সাহিত্যালোচনা করিতে পারেন এবং বিক্রমপুরবাসী ছাত্রগণ যাহাতে প্রথম হইতেই বাঙ্গলাভাষার অনুশীলনে অনুরাগী হন, তৎসম্বন্ধে কোনওরূপ ব্যবস্থা

করা সম্ভবপর কি না তাহা আলোচনা করাই সভার উদ্দেশ্য ছিল। আলোচনান্তে উক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থ "বিক্রমপুর সাহিত্য সমিতি নামে" একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থিরীকৃত হয় যে কি প্রণালীতে এই সমিতির কাজ চলা উচিত তৎসম্বন্ধে বিক্রমপুরবাসী সমস্ত সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য সম্মুখবর্ত্তী গ্রীষ্মের কিম্বা পূজার ছুটিতে বিক্রমপুরের কোনও স্থানে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। যে পর্য্যন্ত তাহা না হয় সে পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত সুরথনাথ দাশ গুপ্ত, এম্. এ, এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের সহকারিতায় শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত, বি, এ মহোদয় এই সমিতির সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। সভার কয়েকটী অধিবেশনে শ্রীযুক্ত উমাপ্রসন্ন দে, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু ও শ্রীযুক্ত সুধেন্দ্রভূষণ দাশ গুপ্ত যথাক্রমে 'সাহিত্যের লক্ষ', বঙ্গসাহিত্যে কালীপ্রসন্নের স্থান "সাহিত্যালোচনার উপকারিতা" ও "বঙ্গসাহিত্যে সৌভ্রাত্র" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২৪—'চির আমি' কবিবর রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র কবিতা—ভাব অস্পষ্ট, আর সেই 'ঘ্যানঘ্যানানি' সুর। পুরুষোচিত ভাব, মানবের সুখ দুঃখের চর্চ্চা—সহজ সরল ভাষা,—বলবানের যে সকল লক্ষণ ক্রমে ক্রমেই বাঙ্গলা ভাষা হইতে অদৃশ্য হইতেছে। সর্ব্বত্রই mysticism sentimentalism (ভাবুকতা)—কি কাব্যে কি চিত্রে, মন খুলিয়া কেহই কথা বলিতে জানে না। ভাবিয়াছিলাম, কবিবর নব্য জাপান ও চিরনবীন এমেরিকা ঘুরিয়া আসিলেন—নূতন আশা উদ্যমের বাণী কিছু শুনিতে পাইব। কিন্তু কোনও শক্তি বীর্য্যের কথা তাঁহার কবিতায় আশা করা অসম্ভব। কবিতাটী ভাল লাগিল না। 'চৈতন্যদেবের ভাব ও প্রভাব—লেখক সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মতে নিম্নলিখিত প্রকারে এ প্রভাব দ্রষ্টব্য :—(১) কলিযুগ শাস্ত্রে সর্ব্বত্র ভয়াবহ, নিন্দিত। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে সর্ব্বযুগসার বলিয়া বর্ণনা করিয়া, সমসাময়িক ব্যক্তি ও ঘটনার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করাইয়াছেন।

(২) বাঙ্গলা-সাহিত্যের উন্নতি। (৩) তিনি ভক্তি মাহাত্ম্য ও উন্নতভাব সকল প্রচার করিয়া জাতির হৃদয় কোমল ও উন্নত করিয়াছেন। (৪) উচ্চ নীচ মানুষকে, মানুষ বলিয়া বুকে ধরিয়া লইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।" আমরা চৈতন্যের বিশেষ ভক্ত নই। তাঁহার শিক্ষার ফলে নির্জীব বাঙ্গালী—আরও কাপুরুষ হইয়াছে—বৈরাগীর দল কাপুরুষতার অবতার বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। গোপিকাগণের ও কৃষ্ণরাধিকার প্রেমবহুল কাহিনীসমূহের চর্চ্চা ও তাহাদের আদর্শে জীবন গঠিত করিতে যাইয়া—সমাজ নীতি morality বিষয়ে নীচে নামিয়া গিয়াছে। ভাবের প্রাবল্য হেতু চৈতন্যদেব নিজকেই শেষ পর্য্যন্ত ঠিক রাখিতে পারেন নাই—তাঁর শিষ্যগণ মধ্যে এই ভাবের প্রাবল্যই অত্যধিক জ্ঞানচর্চ্চা নিতান্ত কম বলিয়া। তিনি জাতিভেদের বিরুদ্ধে কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও হস্তে আহার না করিয়া নিজ দৌর্ব্বল্য ও প্রকারান্তরে কপটতার প্রকাশ করিয়াছেন। ফলে—তাঁহার শিক্ষা বাঙ্গলার ভদ্রলোক শ্রেণীদের ভিতর কখনও প্রসার লাভ করে নাই। তাঁহার প্রভাব দ্রষ্টব্য, বিশেষতঃ বাঙ্গলা সাহিত্যের উপর। লেখক জোর করিয়া—অনেক বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু অনেক বিষয়েই তাঁহার সহিত এক মত হওয়া অসম্ভব।—"উদয়পুর" সুন্দর সুপাঠ্য চিত্র শোভিত ভ্রমণ-কাহিনী। 'দাঁতের বোঝা'—ছোট গল্প—অপাঠ্য। 'জাতি সম্বন্ধীয় সমালোচনা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত, ভাষা নীরস, জমিয়া উঠে নাই। 'ফুলের ভাষা'—সীতাদেবী লিখিত ছোট গল্প, ফরাসী গল্পের অনুবাদ—নাম যে কেন ফুলের ভাষা হইল বুঝিলাম না। ভাষা সুন্দর কিন্তু গল্পটী জমে নাই। 'প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানোদয়'—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত—ইংরাজী কোটেশনে ভরা, যেমন বাঙ্গলার তথাকথিত দার্শনিক প্রবন্ধ সচরাচর হইয়া থাকে। লেখকের নিজ মত কোটেশনের চাপায় ঢাকিয়া পড়িয়াছে। ইনিই নাকি আমাদিগের একজন দার্শনিক পণ্ডিত। কিন্তু 'দার্শনিকত্ব' কোথায়, এ পর্য্যন্ত দেখিলাম না। 'গুড় ব্যবসায়'—যোগেশচন্দ্র রায় লিখিত সুপাঠ্য, প্রবন্ধ প্রত্যেকের পড়া উচিত। 'বঙ্গের কৃষি সামগ্রী'—মনোরম প্রবন্ধ। পঞ্চশস্য' 'প্রবাসীর এই সংগ্রহ প্রবন্ধটী বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়। এই সংখ্যায় ও তদ্রূপ। 'ছোট গল্প' রচনা উপলক্ষে—ষোলজন ইংরাজী লেখকের

মত উদ্ধৃত করিতেছি—(১) তোমরা যথাসাধ্য ভাল লিখিবার চেষ্টা কর। (কনান ডয়েল)—বাঙ্গালী লেখকগণের বিশেষ বিবেচনার বিষয়। যা তা ছাপাইবার লোভ সম্বরণপূর্ব্বক নিজ সমস্ত শক্তির সহিত লেখার চেষ্টার প্রয়োজন খুব অভ্যাসের দরকার লোক্যু)। সংযত বিশেষণ বাজে কথা মোটেই না (গ্লিন)। অন্যান্য লেখকের রচণাপ্রণালী আয়ত্ব করিবার চেষ্টার প্রয়োজন নাই (ওপেনহাম) ইহাদের সঙ্গে আমার মতে, পরের দিকে চাহিয়া নিজ বিশেষত্ব (Individuality) ভুলিয়া যাইওনা। লেখায় সাহস ও আন্তরিকতার আশ্রয় গ্রহণ কর—এই দুইটাই কালে প্রতিভার genius লক্ষণস্বরূপ বিবেচিত হইবে। এবার 'প্রবাসী' বেশ সুখপাঠ্য।

বীরেন্দ্র

কাল ও ঘড়ি

কহে কাল—"এ জগত আমি সৃষ্টি করি।"
"আমি তবে স্রষ্টা তব"—শুনে' কয় ঘড়ি॥

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এবার স্থানাভাব 'বশতঃ আইভান হো', 'হৃদয়-বাণী' ও সাহিত্য-সম্রাট কালীপ্রসন্নর 'স্মৃতি-প্রসঙ্গ'অন্যান্য বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ কম্পোজ হইয়াও ছাপা হইল না। আগামী সংখ্যা হইতে শ্রীযুক্তা আমোদিনী ঘোষ লিখিত 'শেষপত্র' নামক একখানা মনোহর ক্ষুদ্র উপন্যাস প্রকাশিত হইবে। এবং 'দেশেরসংবাদ' নাম দিয়া বিক্রমপুরের গ্রাম্য সংবাদসমূহ প্রকাশ করিব। আমাদের বিজ্ঞাপিত ১০ ফর্ম্মার অতিরিক্ত ১২ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৯৬ পৃষ্ঠা করিয়া প্রতি সংখ্যা ছাপাইতেছি। ঠিক্ এই ১২ ফর্ম্মা হিসাবেই এখন হইতে প্রতি মাসের কাগজ ছাপা হইবে।

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত

২। **প্রহ্লাদ উপখ্যান**—সিল্কের বাঁধা Approved by T.B.C. ।/০

শ্রীসয়েদ এমদাদ আলী প্রণীত

১। **ডালি** (কাব্যগ্রন্থ) সচিত্র—Approved by T.B.C. ৸০

১। **একলব্য** (সচিত্র) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় প্রণীত ॥৵০

শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত প্রণীত

১। **খেলনা**—টেক্‌ষ্টবুক কমিটী অনুমোদিত ।০

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১। **আশীর্ব্বাদ**—বিবাহ বাসরে নবদম্পতীর পুণ্য উপহার, পবিত্রতায় দেবতার নির্ম্মাল্য, সতীলক্ষ্মীর বুকের ধন Approved by T. B. C. ১৲

২। **প্রহ্লাদ**—ভক্তবীর প্রহ্লাদের নীতি ও ধর্ম্মমূলক জীবনী Approved by T. B. C. ॥৵০

৩। **লেখা**—(উপন্যাস) ৸০

৪। **শিশুপাঠ্য কৃত্তিবাস**—সিল্কের বাঁধান—১৲ অবাঁধান—৸০ Approved by T. B. C.

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১। **সর্ব্বানন্দ**—মেহারের সিদ্ধপুরুষ সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের সিদ্ধকাহিনী। বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের লিখিত ভূমিকা সহিত।

২। **শাক্যসিংহ**—মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সম্বলিত, Approved by T.B.C. ১৲

৩। **দেবীমাহাত্ম্য**—(English) ।০

১। **মল্লিকা**—শ্রীমতী চারুবালা দেবী ॥০

১। **গন্ধপুষ্প**—শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস বিএ প্রণীত Approved by T. B. C. ৸০

১। **হজরতের জীবনী**—মৌলভী অব্দুল জব্বার প্রণীত Approved by T. B. C.

২। **নুরজাহান**—

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারীকৃত।

সমগ্র ভারতে বিখ্যাত

একদিনে জ্বর সারে, তিন দিনে সুস্থ ও সবল হয়।

ছোট বোতল ৸৹ আনা।



লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

সপ্তাহে প্লীহা, যকৃৎ আরোগ্য হয়; নূতন মানুষ গড়িয়া তোলে।

বড় বোতল ১।৹ আনা।

ডাক্তার শ্রীঅমরচাঁদ মিত্রের

সর্ব্বজ্বরহর পাচন।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বরের মহৌষধ।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। এজেণ্টগণের বিশেষ সুবিধা; পত্রে বিস্তারিত জ্ঞাতব্য।

ক্ষত নিস্দূন ঘৃত।

কোন অবস্থায়ই অস্ত্র করার প্রয়োজন হয় না। বিনা অস্ত্রে ও বিনা ক্লেশে, মাত্র বহির্মালিসে সর্ব্বপ্রকার ক্ষত নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ॥৹ আট আনা, ডজন ৫৲ পাঁচ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

দন্তসংস্কার চূর্ণ।

দন্ত পীড়ার মহৌষধ, হিন্দু টুথ পাউডার। মূল্য ১ কৌটা ৵৹ আনা ডজন ১॥৹ দেড়টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

সুধা চূর্ণ।

সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক, মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যে ও স্মৃতিহীনতা, অনিদ্রা, মাথাধরা, মাথাঘোরা এবং কোষ্ঠবদ্ধাদির মহৌষধ।

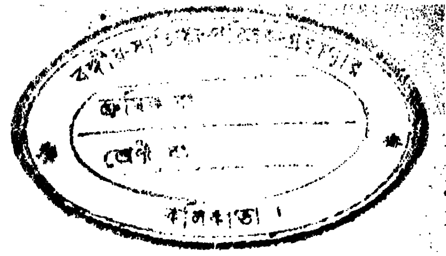
মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ভিঃ পিঃ তে ১।৹ আনা। ৩ তিন শিশি ২৸৹, ভিপিঃতে ৩৲ টাকা।

তারকনাথ ঔষধালয়।

প্রপ্রাইটার, ডাক্তার—শ্রীঅমরচাঁদ মিত্র।

হলদিয়া—ঢাকা।

জ্যৈষ্ঠের সূচী।



সূচীপত্র

শোক-সংবাদ

বিক্রমপুরের সুসন্তান, পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, কুলচন্দ্র দে আর ইহজগতে নাই।

বিগত ১৭ই আষাঢ়, জ্বর রোগে, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব-গণকে কাঁদাইয়া অকালে দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।

তাঁহার অভাবে "বিক্রমপুরের" যে ক্ষতি হইল, সুদূর ভবিষ্যতেও তাহা পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ।

ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন ইহাই প্রার্থনা।

বিক্রমপুর

৫ম বর্ষ } আষাঢ়, ১৩২৪ { ৩য় সংখ্যা।

প্রসঙ্গ-কথা।

বর্ত্তমান সময়ে জলাভাব দেশের একটী প্রধান সমস্যা। জলাভাবেই দেশের সর্ব্বত্র বিবিধ পীড়ার প্রসার হয়। বঙ্গের সর্ব্বত্রই জলের অভাবজনিত ক্লেশ সমভাবে বিদ্যমান। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—এই তিনমাসে জল সমস্যা। পল্লীবাসী নরনারী জলাভাবে যে কিরূপ ক্লেশে দিন কাটায়, কত কষ্ট সহ্য করে তাহা বর্ণনাতীত। একবার গ্রীষ্মকালে বিক্রমপুরের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী কোন পল্লী হইতে ফিরিবার সময় পথে দেখিতে পাইলাম, একটী ডোবার অপরিস্কৃত জল কয়েকটী রমণী কলসী ভরিয়া লইয়া যাইতেছেন, অনুসন্ধানে জানিলাম যে নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসীর এই ডোবার জলই একমাত্র সম্বল! এইত অবস্থা! শিক্ষিত জনসাধারণ, দেশের নেতৃবৃন্দ সকলেই সভায়, কাগজে, সর্ব্বত্র এই জলাভাবের বিষয় আন্দোলন করিতেছেন, কিন্তু প্রায় বিশবৎসরকাল যাবত এইরূপ আন্দোলনে যেরূপ ফললাভ আশা করা গিয়াছিল তাহার কিছুই হয় নাই।

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব জনপ্রিয় গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর পল্লীগ্রামের জলকষ্ট নিবারণের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, এমন কি গ্রাম্য জনসাধারণের অভাব অভিযোগের ক্লেশ স্বচক্ষে দেখিবার জন্য স্বয়ং গ্রামে

গ্রামে গমনও করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি বলিতে কি, আমাদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ অভাব-ক্লেশ আশানুরূপ দুরীভূত হয় নাই।

বিগত ২৭শে মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর বঙ্গদেশের ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ১৯১৫—১৬ খ্রীঃ মোট কতগুলি পুষ্করিণী খনন বা সংস্কার করেন তাহা জানিতে চাহিয়া প্রশ্ন করেন; তদুত্তরে গভর্ণমেণ্ট যে জাবাব দিয়াছেন আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। উহা হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে পানীয় ক্লেশ দুর করিবার জন্য ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড সমূহ একরূপ কিছুই করেন নাই; গভর্ণমেণ্টও দুঃখের সহিত এই অকৃতকার্য্যতার বিবরণের উল্লেখ করিয়াছেন।

"In view of the fact that in September 1895, Government impressed on all District Boards the desirability of spending large sums of money from the Public Works Cess on the excavation of tanks in rural areas, the result must be regarded as disappointing."

"There was an increase of expenditure amounting to 1¾ lakh in 1913-14 and 2¼ lakhs in 1914-15, but in these years in spite of the instructions above referred to, a decrease is recorded in every Division except the Presidency Division, and no district, except Bankura, did much more for water supply than during the previous year, while several did less. The decrease was Rs. 14,246 in Bakharganj, Rs. 19,221 in Dacca, over Rs. 10,000 in Midnapore, and over Rs. 5,000 in Bogra, Jessore and Howra. The District Board of Bakharganj was able to begin only two new tanks during the year and the explanation given of the reduced expenditure, viz. that it was difficult to procure free grants and sites, does not account for a falling off in charges for repairs from Rs. 6,455 to Rs. 333. The difficulties reported elsewhere

were in Midnapore and Pabna, the failure of local contributions, in Murshidabad the reluctance of proprietors, who are neither willing, nor able to re-excavate tanks themselves; to make them over as reserved tanks after re-excavation by the Boards, although proprietory and fishing rights are secured to them. In Noakhali, on the other hand, where the public are ready to make over their tanks to be reserved by the Board, funds are said to permit of any but selected tanks being taken up each year. The Governor in Council has, under consideration, the terms of the agreements which should be taken by Boards for the excavation of private tanks. A water survey was completed in Faridpur and slow progress was made by the District Board of Jessore in completing water-spply registers and maps. The District Board of Mymensingh has in contemplation, a scheme for showing the sources and nature of the water supply in each village by colours and symbols on the 16 "Settlement maps."

এই বিবরণীতে অন্যান্য জেলাবোর্ডের কর্ম্ম-প্রণালী সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যায়, কিন্তু ঢাকা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড কি প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে কোন কথাই উল্লিখিত হয় নাই।

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড পল্লীগ্রামে পুষ্করিণী খনন বা সংস্কার সম্বন্ধে কেন ব্যর্থকাম হন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ জানা আবশ্যক। যদি গ্রাম্য জনসাধারণ ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের সর্ত্তানুসারে পুষ্করিণী খননে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সে সর্ত্তগুলি কি? এবং তাহার সংশোধনের কোন উপায় অবলম্বিত হইতে পারে কিনা তাহাও বিবেচ্য। আমাদের মনে হয়, যে যে স্থানে ভীষণরূপ জলকষ্ট সে সব স্থলে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের প্রচলিত সর্ত্ত সমূহ প্রত্যাহার করিয়া একটা সামঞ্জস্যের বিধান করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড নিম্নলিখিত সর্ত্তানুযায়ী পল্লীগ্রামের

পুষ্করিণী খনন করেন, যথা :—(১) গ্রামবাসী জনগণ পুষ্করিণী খননের ⅓ অংশ ব্যয় প্রদান করিলে বাকী ব্যয় ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড দিবেন।

(২) মৎস্যের সত্ত্ব ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

আমাদের বিবেচনায় এই সর্ত্ত দুইটী ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের প্রত্যাহার করা উচিত। সর্ব্বত্র উহা সমীচীন না হইলেও স্থান বিশেষে যে অবলম্বনীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দেশের সর্ব্বত্রই জলাভাবে হাহাকারধ্বনি উত্থিত, কাজেই এদিকে ডিঃ বোর্ড, লোকেলবোর্ড ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

লোকহিত সাধন বা সমাজসেবা।

বিগত ১২ই ফাল্গুন (শনিবার, ২৪শে ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যাকালে কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, এম, বি, "Social Service" বা সমাজসেবা সম্বন্ধে একটী ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় প্রভূত জনসমাগম হওয়ায় সুপ্রশস্ত লাইব্রেরী হল লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলাও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতার লর্ড বিশপ, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, অনারেবল, রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন বার-এট-ল, 'বসুমতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক রায়সাহেব বিহারীলাল সরকার প্রভৃতি কলিকাতা নগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই প্রবন্ধপাঠ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন বার-এট-ল মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে, বাঙ্গালার লাট কাউন্সিলের প্রধান সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত পি, সি, লায়ন আই, সি, এস, সি, এস, আই মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর ডাক্তার মৈত্র মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিক প্রভৃতি নানা বিভিন্ন দিক হইতে যে সমাজসেবা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তিনি এই কথার উল্লেখ করিয়া বলেন যে এইরূপ এক একটি দিক হইতে এক একটি বক্তৃতা যদি রামমোহন লাইব্রেরী হইতে দিবার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে লোক-শিক্ষার পক্ষে বিশেষ

সহায়তা হয়। তিনি নিজে ঐ সমুদয় দিক হইতে সমাজসেবা সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া তাঁহার প্রবন্ধে বিষয়টিকে মোটামুটি এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন :—

(১) সমাজসেবা কাহাকে বলে এবং বাঙ্গালা দেশে ইহার ক্রমপরিণতি। (২) বর্ত্তমান কালে ইহার বিশেষ ও একান্ত প্রয়োজনীয়তা। (৩) সমাজ-সেবা সম্বন্ধে দেশবাসীর কর্ত্তব্য। ডাক্তার মৈত্র মহাশয় বলেন, "Social Service" বা সমাজসেবা কথাটির বাঙ্গালা দেশে নূতন প্রচলন হওয়াতে অনেকেই ইহাকে ব্যক্তিগত বদান্যতা কিম্বা সমাজ-সংস্কারের সহিত এক জিনিস বলিয়া ভুল করিয়া বসেন। ব্যক্তিগত বদান্যতা ও সমাজসংস্কার হইতে ইহা পৃথক হইলেও তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন নহে। লোকহিতসাধনকল্পে চেষ্টা, সমাজে রোগ ব্যাধি, দুঃখ দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা মূর্খতা প্রভৃতির কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহার নিরাকরণ দ্বারা সমাজিক জীবনকে উন্নত ও সমাজকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহাকেই "Social Service" বা সমাজসেবা বলা যাইতে পারে। তাহার পর তিনি সমাজসেবার আদর্শ প্রাচীন ও আধুনিক সমাজে কিরূপ ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখান যে যুগভেদে এই আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। আধুনিক যুগে আমাদের দেশেও সমাজসেবার নব আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নব আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন ও বিবেকানন্দ। তাঁহারা জাতিধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের হিতসাধন ও সেবার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন।

তাহার পর তিনি আমাদের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আমাদের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক দুই প্রকারের অভাব বিদ্যমান। স্বার্থত্যাগ, আত্মশক্তি প্রয়োগ ও আত্মসম্মানবোধ এই তিনটীর অভাব আমাদের ভিতরের। সমাজ-সেবাকার্য্যে এই গুলির বিশেষ প্রয়োজনীয়তার বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, কোনও প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী লইয়া সমাজসেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে চলিবে না ; প্রকৃত প্রেম ও ভ্রাতৃভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া লোকহিতসাধনে ব্রতী হইতে হইবে।

তাহার পর তিনি বঙ্গদেশের অস্বাস্থ্য, অজ্ঞতা, দুঃখদারিদ্র্য প্রভৃতি নানাবিধ অভাব অভিযোগের বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়া এই সকল বিষয়ের প্রতিকারকল্পে প্রকৃতপক্ষে কি করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা

হইতে কয়েকটি উপায় নির্দ্দেশ করেন এবং বলেন যে, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠানগুলি মফঃস্বলের হিতসাধন মণ্ডলীগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া একত্রে কার্য্য করিলে দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হয়।

ডাক্তার মৈত্র মহাশয় দেশবাসীর সম্মুখে সেবার ও লোকহিতসাধনের যে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে সেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক দেশের ও সমাজের প্রতি আপনাদের কর্ত্তব্য সাধনের জন্য সকলকে আহ্বান করিয়া তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ শেষ করেন।

অতঃপর সভাপতি লায়ন সাহেব সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—"এই সভার অধিকাংশ ব্যক্তির ন্যায় আমিও আজ ডাক্তার মৈত্রের বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলাম; বিশেষ কিছু বলিব বলিয়া আসি নাই। আমি ইতঃপূর্ব্বে এরূপ হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা অল্পই শুনিয়াছি। ডাক্তার মৈত্র বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সম্পর্কে যাহা করিয়াছেন তাহা সকলেই জানেন; সেই জন্যই লোকহিতসাধন সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতায় সমাজসেবার যে কার্য্যক্ষেত্র বিবৃত হইয়াছে তাহা অতি বিস্তৃত বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্তু সকল সমাজসেবক সমিতিরই সম্মুখে যে এইরূপ বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে তাঁহার প্রবন্ধে তাহা যথাযথ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর দ্বারা যে কার্য্য অতি সুন্দর ভাবে আরব্ধ হইয়াছে, ডাক্তার মৈত্রের সহিত সেই কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য আমিও বাঙ্গালার পৌরুষকে আবাহন করিতেছি। বাঙ্গালী যুবক ও ছাত্রেরা যে কতদূর নিঃস্বার্থ ও মহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ তাহার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা আমার আছে। মেদিনীপুরের জলপ্লাবনের চারি মাস পরে যখন বন্যার প্রকোপ প্রশমিত হইয়া গিয়াছে ও জলপ্লাবনে সাহায্য করিবার উত্তেজনা ও উৎসাহ নিভিয়া গিয়াছে, যখন কোনও প্রকারের প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা ছিল না, সেই সময়েও কতিপয় যুবক ছাত্র বন্যাপীড়িত দুঃস্থগণের সাহায্যার্থে যেরূপ প্রাণের সহিত কাজ করিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিয়া আমি তাহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়াছি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে সম্প্রতি অনেক যুবক বিপজ্জনক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছেন কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ কেহ কেহ যথোচিত ভাবে চালিত হইলে তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি প্রকৃষ্টতর পথে ধাবিত করিয়া

সমাজের বিশেষ উপকারী বন্ধু হইতে পারিতেন। আমি বিশেষ ভাবে ইচ্ছা করি যে ডাক্তার মৈত্রের এই হিতসাধন মণ্ডলীর কার্য্য যতদূর সম্ভব প্রচারিত হউক ও এই কার্য্যে সকলের উৎসাহ জাগাইয়া তুলুক। ইহা দ্বারা বাঙ্গালার যুবকগণের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি আকৃষ্ট হইতে পারিবে ও সর্ব্বাপেক্ষা কোন প্রকৃষ্ট উপায়ে তাঁহারা স্বদেশের সেবা করিতে পারেন ডাক্তার মৈত্রের নিকট তাহারও নির্দ্দেশ তাঁহারা পাইবেন। আমি বিশ্বাস করি এরূপ খুব অল্প লোকই আছেন যাঁহারা ডাক্তার মৈত্রের অপেক্ষা সুন্দরভাবে তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে পরামর্শ দান বা পরিচালনা করিতে পারেন।"

পরে ডাক্তার মৈত্রের প্রবন্ধ হইতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া লায়ন সাহেব বলেন,—"প্রবন্ধে লিখিত একটি প্রস্তাবে আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি। তাহা এই যে, নানাস্থানে হিতসাধন মণ্ডলীর শাখা সকল মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রীকবোর্ডকে নানাবিধ স্বাস্থ্যোন্নতি সম্পর্কিত উপায় উদ্ভাবন ও গভর্ণমেণ্টের 'গ্র্যাণ্টের' দ্বারা তাহা কার্য্যে পরিণত করা বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন।"

সর্ব্বশেষে লায়ন সাহেব এই বলিয়া তাঁহার ব্যক্তব্য শেষ করেন যে,—"আমি পুনরায় বাঙ্গালার জনসাধারণকে আহ্বান করিতেছি যে তাঁহারা ডাক্তার মৈত্রের এই অনুষ্ঠানকে অর্থ ও সেবা দ্বারা পুষ্ট করুন।"

আমরা উপরে লোকহিতসাধন সভার বক্তৃতার সারমর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। কিন্তু প্রধান কথা এই এ সকল সভায় কর্ত্তৃপক্ষগণ কি কি প্রণালী অবলম্বনে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। কয়েক দিন হইল উক্ত সভার জনৈক প্রচারকর্ত্তা ঢাকানগরীতে আগমন করিয়াছিলেন, ঢাকা সহরেই সভা করিয়া পল্লীগ্রাম উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। কোনও পত্রিকার সম্পাদকের সহিত বা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত পল্লীগ্রামের উন্নতি অবনতি সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিয়াছেন কি না তাহাও জ্ঞাত নহি। কেবল যদি সহরে সহরে পরিভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা প্রদানই এই সভার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে সভার কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে বলিতে পারি; আর যদি তাহা না হইয়া পল্লীগ্রামের অভাব অভিযোগের প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানই সভায় উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে সভার দ্বারা আশানুরূপ ফল হইতেছে না বলিতে পারি।

সৌখিন দেশ সেবায় এখন আর লোক বিশ্বাস করিতে চাহে না। যদি মণ্ডলীর অভিপ্রায় এই হয় যে তাহারা প্রকৃতই পল্লীর কল্যাণেচ্ছু; তাহা হইলে তাঁহারা প্রত্যেক জেলার "সম্মিলনীসভার" সহায়তা গ্রহণ করুন। আর ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে পল্লীতে পল্লীতে লোক পাঠাইয়া গ্রামে গ্রামে বা বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সভা আহ্বানের সুব্যবস্থা করুন। জন সাধারণকে বুঝাইয়া দিন কিরূপ ভাবে চলা ফিরা করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কিরূপভাবে রোগ ক্ষুদ্র বীজাণুর আকারে মানব শরীরে প্রবেশ করে। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে সংক্রামক ব্যাধির হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। আর আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই জল কষ্ট। জলাভাবেই নানাস্থানে পীড়ার উদ্ভব হইতেছে। গ্রীষ্মের দিনেত এক বিন্দু জলের জন্য ভয়ানক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। মণ্ডলির পক্ষ হইতে যিনি মফঃস্বলে আসিবেন, তাহার সহরে না আসিয়া পল্লীগ্রাম গুলির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য। মণ্ডলীর পরিচালকগণ সকলেই দেশের নেতা বা নেতৃ স্থানীয়, তাহারা কেবল মাত্র প্রবন্ধ পাঠ ও গভর্ণমেণ্টের কৃপাপ্রার্থী না হইয়া যদি গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় জেলায় জেলায় মণ্ডলীর শাখা সংস্থাপন করিয়া একজন কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রচারক নিযুক্ত করেন তাহা হইলে কাজের অনেক সুবিধা হয়। ঐরূপ প্রচারক যদি প্রকৃত কর্ম্মপ্রাণ হন তাহা হইলে তাহার দ্বারা বহুকার্য্যের আশা করা যায়। এমন কি প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক গ্রামের আভ্যন্তরীন অবস্থা মণ্ডলীর পরিচালকগণ এই সমুদয় প্রচারকগণের সাহায্যে যথাসময়েই পাইতে পারেন। পরিচালকগণও উহার সাহায্যে সেই জেলার অবস্থাপন্ন লোকদের বিষয়, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও লোকেলবোর্ডের কার্য্যপ্রণালী ইত্যাদি জানিয়া গভর্ণমেণ্টের সহযোগীতায় অনেক কাজ করিতে পারেন।

পল্লীবাসী আমরা, দিন দিনই সহরের নেতৃবৃন্দের মধুর বাক্য ও সম্মোহিনী আশার ভাষায় মোহিত হইয়া এখন দশদিক অন্ধকার দেখিতেছি। তাহারা গাছে তুলিয়া দিয়া প্রায়ই মই সরাইয়া লইতেছেন। এই যে দেশের হোম্‌রা চোম্‌রারদল, তাহারা কয়জনে পল্লীগ্রামের সংবাদ রাখেন? দার্জ্জিলিং, মুশৌরী, নাইনিতাল যাইতে সকলেরই অবসর হয়, আর দেশে আসিতে সময় ও অবসর হয় না, ইহা কি বিচিত্র কথা নহে? মণ্ডলীর নেত্রবৃন্দ যাহারা, তাহারা

কি দেশের খবর রাখেন? কবিতায় কাঁদা, বক্তৃতায় বাহাদুরী লওয়ার দিন এখন আর নাই। এখন এই সভার সম্পাদক যিনি যত বড়ই হউন না কেন কার্য্য না করিলে তাহাকে কেহই গ্রাহ্য করিবেনা।

প্রতিবৎসর দেশে "সাহিত্য সম্মিলন," "প্রাদেশিক সমিতি" হইতেছে, সোডা লিমনেডের বোতল ভাঙ্গিতেছে, রোহিত মৎস্যের মুণ্ড ও অজনন্দনগণের নধরকান্তির দ্বারা মহাপুরুষগণের উদর পূর্ত্তি হইতেছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সাহিত্য সম্মিলন কি করিলেন? কয়জন নিরন্ন দীনদরিদ্র সাহিত্যসেবীর সাহায্য করিলেন? দূরে যাউক সে কথা, তাহারা যদি সভার অর্থের এক অষ্টমাংশ দ্বারাও সেই সেই জেলায় কোনও মৃত কৃতিমান সাহিত্যিকের নামে স্থান বিশেষে এক একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া সেই মৃত কবি বা লেখকের নামে উৎসর্গ করিতেন তাহা হইলে কত লোকে জলপান করিয়া বাঁচিত; সাহিত্য সম্মিলনের উদ্দেশ্য মধ্যে ইহা না হইলেও একেবারে যে প্রস্তাবটী অসাধ্য তাহা আমরা মনে করিনা;—প্রাদেশিক সামিতিত অনায়াসেই তাহা করিতে পারেন; কিন্তু কেকাহার কথা শোনে? হে মণ্ডলীর নেতাগণ তোমরা যদি দেশের বিলাসী রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার প্রভৃতিকে নিজ নিজ গ্রামে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর তাহা হইলেই অনেক কাজ করিতে পারিবে। বেশী নয়—প্রতি পূজার ছুটিতে, বৎসরে একবার, বেশী নয়, শুধু দশপনের দিনের জন্য, তাহা হইলেই দেখিবে ধীরে ধীরে দেশের অভাব অভিযোগ দূর হইবে, নতুবা তোমাদের :—

"তোমরা সবে নামরে জলে
আমরা শুধু থাক্‌বো কূলে'

এ নীতির অনুসরণে আর কাজ চলিবেনা। হিতসাধন মণ্ডলী কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন, তাই তাহাদিগকে এতগুলি কথা বলিলাম। তোমরা জাননা বিশীর্ণা শোককাতরা পল্লীজননীর, কণ্ঠে কি ভীষণ আর্ত্তনাদ! তোমরা যে শুনিতেছ না ইহাই আশ্চর্য্য, রাজপুতনার কালিকা দেবীর ন্যায় আমাদের শ্রীহীনা—রিক্তভূষণা দীনা পল্লীমাতা বলিতেছেন 'ময়্যা পানি মাঙ্গেহু!' তোমরা জল দাও, দেশ ধন্য হইবে।

গত ৪ঠা এপ্রিল অপরাহ্ণে রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে বঙ্গের সুসন্তান ডাক্তার জগদীশচন্দ্রকে অভ্যর্থনার্থ এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় সার জগদীশচন্দ্র বলেন :—

'অধুনা আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে সেই সম্মান হইতে ব্যক্তিত্ব বাদ দিয়া উহাকে অন্য ভাবেও দেখা যাইতে পারে। গুণগ্রাহিতা দ্বিবিধ হিতসাধন করে। কোন একটি উদ্দেশ্যকে সম্মুখে

ভারতবর্ষের বিশেষত্ব

রাখিয়া যিনি নানা বিপদের মধ্যে কঠোর সংগ্রাম করিতেছেন তিনি নূতন পথে কার্য্য করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়। যখন তাঁহার সহানুভূতি ও সহায়তা পাইবার একান্ত আবশ্যক তখন তিনি তাহা পাইতে পারেনই না। তখন অন্য কিছুর দিকে না চাহিয়া নিষ্ঠা সহকারে তাঁহাকে স্বীয় কর্ত্তব্যই সাধন করিতে হয়। তারপরে লোকে যখন সেই নূতনকে স্বীকার করে তখন উহা ব্যক্তিকে স্বীকার করা নহে, মতের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

আমাকে সম্রাট যে সম্মানসূচক উপাধি দান করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি পৃথিবীর বিজ্ঞানভাণ্ডারে ভারতবর্ষের দানকেই স্বীকার করিয়াছেন। আমি ভারতবর্ষের বিশেষ দানের কথা বলিলাম ইহাতে কেহ কেহ ভাবিতে পারেন যে, বিজ্ঞান সর্ব্বজাতির সুতরাং ভারতীয় বা ইয়ুরোপীয় বিশেষ বিজ্ঞান থাকিতে পারে না।

আমি মনে করি জ্ঞানের বিশ্বভাণ্ডারে যে দেশ যাহা দান করেন, সে দেশের একটি বিশিষ্টতা উহাতে থাকেই।

সমন্বয় ও সার্ব্বভৌমিকতাই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। আমরা বহু বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি না। আমরা জানি সমস্ত বিজ্ঞান এক বিজ্ঞানেরই অঙ্গীভূত। আমরা যে সত্যে বিশ্বাস করি তাহা এক ঐ একের সন্ধানে বাহির হইয়া রাজা রামমোহন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই একেরই আদর্শ ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে দর্শনের সমন্বয় সাধনে প্রোৎসাহিত করিয়াছে। ঠিক এইজন্যই রবীন্দ্র নাথের কাব্য, বিশ্বকাব্য হইয়াছে।

এই একত্ব সাধনের প্রভাব আমরা বংশপরম্পরা ক্রমে লাভ করিয়াছি। বিক্রমাদিত্য যুগ ভারত ইতিহাসের এক প্রসিদ্ধ কাল। সেই বিক্রমাদিত্যের কে

কে মন্ত্রী ছিলেন, কে কে সেনাপতি ছিলেন, আমরা তাহা অবগত নহি, কিন্তু সেই যুগকে যাঁহারা শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোকে ভূষিত করেন সেই নবরত্নের স্মৃতি এখনও আমাদের মনে সজীব হইয়া রহিয়াছে।

আমার যাহা সাধনীয় লক্ষ্য সেই বৈজ্ঞানিক আদর্শ এখন অতি অস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। বিবিধ বিজ্ঞানের ঐক্যসূত্র নির্ণয় ও সমন্বয় বিধানই আমার লক্ষ্য। বিবিধ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের মধ্যে যে সীমারেখা আছে তাহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। জীব নির্জ্জীবকে একই পর্য্যায়ভুক্ত প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

এই কার্য্যের ক্ষেত্র এমন প্রসারিত যে ইহা বহুজাতির সম্মিলিত চেষ্টার ফলে প্রতিপন্ন হইতে পারিবে। কিন্তু এখনও সেই দিন দূরে রহিয়াছে যে দিন যুদ্ধলিপ্ত জাতিসমূহ অস্ত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সমগ্র মানবজাতির সাধারণ সম্পদের উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। এই ক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস ও আশা রহিয়াছে। সেই আশায় প্রণোদিত হইয়া আমি অনুশীলন মন্দির স্থাপন করিয়াছি। আমার জীবনে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে আমার ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল হয়ত আমার সকল প্রত্যাশাকে অতিক্রম করিবে। (সঞ্জীবনী)

জাপানের কথা।

(৩)

দিনগুলি একতারার মত টুন্‌টুন্ করে, দিব্যি একটানা বয়ে যাচ্ছে। Monotonous বলে আদৌ মনে হচ্ছে না। এ যেন নূতন ধরণের একখানি "নবনাটক"—কেবলি পটপরিবর্ত্তন ;—আর দরিগিরিদরিয়ার অভিনব দৃশ্য !

গুরুদেবের সঙ্গে মোটরে করে আশপাশের পুরাণো মন্দির, ও ভাঙ্গা মঠে বেড়াতে যাই। সেখানে গেলেই বুদ্ধদেবের একটা অশরীরী ধ্যানমূর্ত্তি, একটা আব্‌ছায়া গোছের Spirit যেন মনের আনাচে উঁকিঝুঁকি মারাতে থাকে। বৌদ্ধপুরোহিত ও ভিক্ষুদের কি সৌম্যশান্ত-নম্রনত ভাব! গায়ে গেরুয়ারঙ্গের

---

that I exist is a pe petual surprise, which is life.

Stray Birds, page 12. by R. N. Tagore.

ঢোলা আলখেল্লা--পায়ে খড়ের ছাউনি করা কাঠের খড়ম। মুখখানি সরলতা ও পবিত্রতার চিরন্তন আসন। ওঁদের দেখলে শ্রদ্ধা-ভক্তিতে আপনি মাথা নুয়ে আসে। মঠগুলি পাহাড়ের তলায়—ছায়ানিবিড় প্রাচীন পাইন গাছে ঘেরা। ইচ্ছে করে মন্দিরের দুয়ারে লুটায়ে কাঁদি;—আঙ্গিনার ধূলায় একেবারে ধূসর হয়ে উঠি!

জাপানে যখনি যা-কিছু দেখি, সবটাই যেন আজগুবি বলে মনে হয়। সমগ্র দেশটা যেন চোখ মেলে চেয়ে আছে। সোনার কাটির স্পর্শে খুঁটিনাটিটি পর্য্যন্ত সজীব হয়ে উঠেছে। এখানে ভূত নাই—সবই অদ্ভুত!

একদিন গুরুদেব বল্লেন, 'পৃথিবীর সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, আমরা বেঁচে আছি'—অমনি আমার চমক ভেঙ্গে গেল। গুরুদেবের মুখের পানে ফেল্ ফেল্ করে চেয়ে রইলুম।

এনড্রুজ সাহেব হঠাৎ পীড়িত হয়ে পড়েছেন! এখন টোকিও হাঁসপাতালে আছেন। আমি একদিন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলুম, গুরুদেব ও সেদিন গিয়েছিলেন। আজ বোধ হয় পিয়ার্সন সাহেব যাবেন। দিন কয়েক বাদে আর একবার তাঁকে গিয়ে দেখে আসব। কি সুন্দর লোক! দেবতার মত পবিত্র। শিশুর মত সরল, নারীর মত কোমল, যোগীর মত জটিল! কি সংযম—কি সঙ্কল্প! একেবারেই খাঁটি মানুষ। নিজকে টুকরো টুকরো করে অনাথ আতুরের জন্য বিলিয়ে দিচ্ছেন। কলজেটা কেবলি কুলি মজুরদের তরে কেঁদে কেঁদে উঠছে। তাঁর অভাবটা বড় বেশী রকম বুকে বাজছে। ভগবান তাঁকে অচিরে নিরাময় করুন।

আমি একটা ছবির Scroll এঁকে একরকম শেষ করেছি। সেটা মিঃ হারা ও গুরুদেব ভারি পছন্দ করেছেন। হারা সাহেব দয়া করে, আমার এই ছবিটা নিয়ে নিয়েছেন। আর বলচেন, আমাকে তাঁর বাড়ীতেই বছর দুই রেখে দেবেন। আমি এখানে থেকে জাপানী ধরণের ছবি আঁকা শিখব। ছবি খানি পেয়ে তাঁর কি আনন্দ! উল্লাস একেবারে উছলে উঠছে। এই ছবিটা নিয়ে যে কি করবেন, ভেবে ঠিক কর্ত্তে পারছেন না। যাকে তাকে ডেকে এনে দেখাচ্ছেন, আর গঙ্গা জলের মত বুঝিয়ে দিচ্ছেন—কোথায় ছবির প্রাণ—কোথায় তার রক্তমাংস—বর্ণব্যঞ্জনা, ভাববিভূতি—আরো কত কি! আর—সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও আকাশে তুলচেন।

গুরুদেব বলেন, "তোর আর জাপানে থেকে কাজ নেই। চল্ আমার সঙ্গে আমেরিকায়, সেখানে Etching শিখবি।" আরো বলেন, "Indian Art' এর ভিতর জাপানী ঢং কস্মিনকালেও খাপ্ খাবেনা। অনুকরণ, নিজস্বটাকে মেরে ফেলতেই খুব জানে, বেঁচে থাকবার মত খোরাক সংগ্রহ কর্ত্তে সে নিতান্তই অক্ষম।

মিঃ হারার Careএ থেকে মানুষ হওয়াত পরমসৌভাগ্য। আর গুরুদেবের সঙ্গ—সে যে ভাগ্যের চেয়েও বরণীয়—কাব্যের চেয়েও কমনীয়। তার কি আর তুলনা আছে?

এই সূর্য্যমামার দেশ ছেড়ে, শীঘ্রই আমাদিগকে যুক্তরাজ্যে যেতে হবে, তারি অনুষ্ঠান-আয়োজন চলছে।

কয়েক দিন হলো, আমরা Hakomeতে এসেছি। দিন দুই বাদে, আবার Yekohamaতে ফিরে যাব। অনেক পাহাড়পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে, তবে এখানে আসা গেছে। শৈলশৃঙ্গে, মেঘের রাজ্যে এই অলকালয়। মাঠে কয়েক খানি ক্ষুদ্র কুটীর, প্রায় সব কয়টিই হোটেল। এখানেও হারা সাহেবের একখানি আশ্রম আছে। গুরুদেব ও মিঃ হারা ছেলেপুলে নিয়ে সেখানে আছেন। আমিও কাছাকাছি রাস্তার ওধারে একটা জাপানী হোটেল দখল করে বসেছি। এনড্রুজ সাহেব এখন বেশ সেরে উঠেছেন। তিনিও এখানে এসে জুটেছেন—অপর একটা হোটেলে। সেটা ইংরিজি ও জাপানীর খিচুঁরি। হোটেলটা নাকি তাঁর বেশ মনে ধরেছে। পিয়ার্সন সাহেব নিকোতে গেছেন—বেড়াতে। এ স্থানটা Sulphur-bathএর জন্য খুব প্রসিদ্ধ। রোজ ৩।৪ বার করে চান করি। মিসেস্ টাইকনও টৌকিও থেকে সম্প্রতি আমাদের এই হোটেলে এসে নেমেছেন। দল ক্রমশঃ পুরু হয়ে উঠছে।

আমার ঘরের এক কোণে, চৌকো চুলোতে কেট্‌লিতে করে সব সময় জল গরম হচ্ছে—চায়ের জন্য। আর একটা ছোট তাকে চায়ের সুন্দর সুন্দর সরঞ্জামগুলি সাজান রয়েছে। এখানকার জল একেবারে পানের অযোগ্য। মিস্থই বলে এক রকম পানীয় রয়েছে, দরকার হলে তাই খাই। ঘরের আসবাবের মধ্যে বসবার বালিস, আর লেখবার জন্য পালিস করা একটা ছোট্ট টেবিল। চেয়ার চৌকি ডেক্‌স দেরাজ আদপে নেই। মেজে, চারুচিক্কণ

মাদুরের গদি দিয়ে মোড়া! দেয়ালের গায়ে Admiral Togoর হাতের লেখা একটা জাপানী ফ্রেমে করে, টাঙ্গোনো রয়েছে। যদিও তার মানে বোঝা আমার পক্ষে একেবারে অসাধ্য, তবু হরফ দেখলেই মনে হয় লেখার কি জোর! কলমের টান দেখলেই ধারণা হয় একজনা সামুরাইএর লেখা—কি bold!—যেন কাগজের উপর কেউ তলোয়ার ভাঁজিয়ে যাচ্ছে।

এখানে ছোট ছোট ছেলে মেয়ের পল্টন নিয়ে, দিব্যি আরামে আছি। ওদের সাথে দুদিনেই খুব ভাব হয়ে গেছে। আমার কামরাটা ওরা একেবারে মজ্‌গুল করে রেখেছে। সবাই আমার কাছে এসে ছবি আঁকা শিখছে। আর কখনো কখনো আমি ওস্তাদ্ গায়ক গোপালনায়ক সেজে, গুরুদেবের তৈরী করা গান ওদের শুনাই।

'তুমি কেমন করে, গান কর গো গুণী!

শিশু সমিতি "অবাক হয়ে শুনে" আর কিচিরমিচির করে, আমার সঙ্গে সা-রি-গা-মা বোলে। আমি গম্ভীর ভাবে গোয়ালিয়র ফেরং ছক্কণলালের মত বদন ব্যাদান করে, উদারা মুদারা গুলির আদৎ চেহারা উহাদের চোখের সামনে এনে খাড়া করি। আর সময় বুঝে "সমে" মাথা নাড়ি! এ সকল অবশ্য গুরুদেবের আড়ালে আবডালেই হয়ে থাকে। সঙ্গীতে যে আমি সরিমিঞার কাছাকাছি তা উনি বিলক্ষণই জানেন। আদৎ জাপানী বুলিটা কিন্তু, শিশুদের কচিমুখে বেশ মিষ্টিমধুর শুনতে। ঠিক যেন বৈশাখের বকুল ডালে—বুল্‌বুলি বোলে।

বিকেলের চা ও রাত্রের dinnerটা খুব Sumptuous ধরণেরই হয় হারা সাহেবের বাড়ীতে। Break-fastটা হোটেলেই সেরে নিই। খুব Simple break fast—রুটি ৪ টুক্‌রো; ডিম দুটো; খানিকটা Jam, আর কোন কোন দিন Cake—বস্!

মিসেস টাইকন ও মিসেস হারা আমাকে নিয়ে হামেসা হাস্য কৌতুক ঠাট্টা তামাসা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে থাকেন। কখনো দেশের কথা ঘরের কথা জিজ্ঞেস করেন। আজ বল্লেন 'যখন Tagore, ও Pearson আমেরিকায় চলে যাবেন এবং Andrews সাহেব India ফিরে যাবেন, আর তুমি এখানে একলাটি পড়ে থাকবে, তখন নিশ্চয় তোমার মায়ের জন্য মন কাঁদবে।' আমি অমনি গ্রীবা

উঁচু করে বীরপুরুষের মত বলে উঠলুম, "না—কখনো না। আমি ত আর মেয়ে মানুষ নই যে কান্নাকাটি করে শুকনো ডাঙায় বান ডেকে আনব—আমি যে মরদ বাচ্চা।" আমার বীর রসাত্মক বক্তৃতা শুনে হেসে কুটপাট্‌—সে কি হাসি—এই হালকা হাসির ফুৎকারে আমার দম্ভ-দাপট পুরুষকার এক নিমেষে কোথায় যে উড়ে গেল। আমি একেবারে ভেবাচেকা হয়ে গেলুম; চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। আসল কথা বলতে কি মায়ের নাম কর্ত্তেই, বুকটা যেন ধরাস করে উঠল। কত কি যে ভিজে কাহিনী মনে পড়তে লাগল—মায়ের সেই সামনে বসে খাওয়ান—ইলসে ভাতে;—ইঁচা পাতরি, শোলমুলা—পোয়া মাছের পোট্‌কা—তাতেও আমার মন উঠেনি—বিনা কারণে মায়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি। আবার উল্‌টো বাছাধন বলে আমায় খোসামোদ—কত সাধাসাধি! ৫ ডিগ্রী জ্বরে যখন ছটফট কচ্ছি সোডা সরবৎ, ডাব বরফ সব হার মেনে যাচ্ছে—মা তখন শিয়রে বসে, পাখা ভিজিয়ে বাতাস দিচ্ছেন—গায়ে হাত বুলুচ্ছেন—আর মা দুর্গার কাছে পাঁটা মহিষ কত কি মানত কচ্ছেন। চোখ একটু বুজে আসলে অস্থির হয়ে বারংবার আমার নাম ধরে ডাকছেন। আজ বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে সব চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। মা যেন দূরদেশে এসে, মাথায় হাতখানি বুলিয়ে দিয়ে গেলেন। কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম জানিনে। সে কি শান্তি!

গুরুদেবের সঙ্গে আমি ও মিঃ পিয়ার্সন আগামী কল্য (২।৪।১৬) বিকেল ৪টায় Canada Maru জাহাজে আমেরিকায় রওনা হব। এনড্রুজ সাহেব কোবে থেকে ভারতবর্ষে রওনা হয়েছেন। কাল যেতে হবে, সময় আর মোটেই নেই। একেবারে ছুটাছুটি লেগে গেছে। এই এখনি এক জায়গায় চায়ে যেতে হবে। তারপর শিমামুড়রে বাড়ীতে Studio দেখতে যাব। পেট্‌রা পুঁটুলি গোছাতে হবে। পঙ্গপালের মত জাপানের যত সব জংবাহাদুরের দল গুরুদেবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কর্ত্তে আস্‌চেন। লোকের ভয়ানক ভিড়। এই সবে ভোর হয়েছে—এই ফাঁকে চিঠি-পত্র লিখে নিচ্ছি।

আমেরিকা যাচ্ছি বটে, কিন্তু মনটা এই জাপানেই পড়ে রইল। এই তাদের দেয়ালের বেষ্টন থেকে পালিয়ে বাঁচা আর তুলির দেশটাকে একেবারে মুছিয়ে

ঘুচিয়ে দেওয়া আমার মত বীরকেশরীর কর্ম্ম নয়। এ যে আমার শিরায় শিরায় জড়িয়ে গেছে। জাপান যেন একটা জলজ্যান্ত জাগ্রত জীব—জড়জগত থেকে সম্পূর্ণ আলাহিদা।

কাল রাত্রে হারার বাড়ীতে আমাদের খুব জাঁকাল রকমের Dinner হয়ে গেল। আজ রাত্রেও আমার সেখানে নেমন্তন্ন আছে। কাল আরো নূতন নূতন ছবি তাঁর বাড়ীতে দেখা গেল। সে যে কি—একেবারে অকহতব্য!—কলরব করে তা বুঝান যায় না—ওটা যে অনুভবের সামগ্রী?

আমার সব চেয়ে ভাল ছবিটাই হারাকে present করেছিলুম। কিন্তু এসব আলেখ্যের কাছে ওটা আস্ত আলপনা—নেহাৎ!

আমেরিকা পৌঁছাতে আমাদের দিন পনর লাগবে। Yokohama থেকে সটান সিয়েটেল বন্দরে গিয়ে পৌঁছব। সমুদ্রের অবাধ হাওয়ার গুণে, আর নিত্য নূতন জায়গায় আসা যাওয়ার দরুণ, আমার ভিতর বাহির দিন দিন সবুজ তরুণ হয়ে উঠছে। আমার জন্য আদৌ ভাববেন না। যত দিন দানাপানি আছে ততদিন কালাপানি কিছুই কর্ত্তে পারবে না। আমার জাপানের কথা এখানেই শেষ হল।

শ্রীমুকুলচন্দ্র দে।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় যোগে ধর্ম্ম শব্দ সাহিত হইয়াছে। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারণ করা। যাহা ধারণ করে বা রক্ষা করে তাহাই ধর্ম্ম; "ধরতি লোকান ধ্রিয়তে পুণ্যাত্মাভিরিতি।" অর্থাৎ যাহা লোক সমূহকে ধারণ করিয়া আছে বা যদ্দ্বারা পুণ্যাত্মাগণ ধৃত বা সংরক্ষিত হন তাহাই ধর্ম্ম। আমরা তাহাকেই সাধারণতঃ ধর্ম্ম বলি,—যদ্দ্বারা লোকরক্ষা, সংসাররক্ষা ও আত্মরক্ষা হয়। ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ এইরূপ কথিত হইলেও অধুনা ধর্ম্ম শব্দের নানাপ্রকার অর্থ সূচিত হইয়া থাকে। তাই ধর্ম্ম শব্দে কেহ 'যাগযজ্ঞ' কেহ 'অহিংসা' কেহ 'নীতি' ও কেহ 'উপাসনা' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। আবার

কাহারও মতে ধর্ম্মই 'ঈশ্বর' বা 'ব্রহ্ম' বলিয়া কথিত হয়। আমাদের দেশে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ নির্ণয়ে যেরূপ মত ভেদ চলিতেছে ইউরোপে 'রিলিজিয়ন' (Religion) শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করিতেও সেইরূপ বিতণ্ডা চলিতেছে। সেই কারণে বড় বড় পণ্ডিতগণও 'ধর্ম্ম' বা 'রিলিজিয়ন' শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ধর্ম্ম শব্দের অর্থ পৃথক পৃথক ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক ধর্ম্মই মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব প্রদান করে।

ধর্ম্ম শব্দের অর্থ যেমন এক বাক্যে মিমাংসিত হয় নাই, ধর্ম্ম মতও সেইরূপ অবিসম্বাদিতরূপে গৃহীত হয় নাই। যুগভেদে ও জাতিভেদে নানাপ্রকার ধর্ম্ম মত চলিয়া আসিতেছে। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানগণ মধ্যে ধর্ম্মমত পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী। আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রেই কত প্রকার ধর্ম্ম মত চলিয়া আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে সমস্ত ধর্ম্মেরই মূল উদ্দেশ্য বিষয়ে চিন্তা করিলে উহার একত্ব অনুভূত হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী উৎপন্ন হইয়া যেমন সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, সেইরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতও সেই বিরাট ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্মুখীন হইবার পথ প্রদর্শন করিতেছে সে বিষয় সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যুক্তিপূর্ণ বহু উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বাস্তবিক এই ভূমণ্ডলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কিম্বা চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রের গতিবিধির পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয় যে এরূপ একজন আছেন যাঁহার অলৌকিক শক্তিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত থাকিয়া পরিচালিত হইতেছে; তিনিই ঈশ্বর বা ব্রহ্মপদ বাচ্য। সম্পদে তাঁহাকে চিনিতে না পারিলেও বিপদে তিনি স্বতঃই স্মৃতি পথে পতিত হন। মানব যখন কোন বিপদাপন্ন হইয়া লৌকিক অসামর্থ্যের বিষয় চিন্তা করিতে কোন মহাপুরুষের নিকট যুক্তকরে বিপদ-পরিত্রাণ প্রার্থী হয় তখনই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্যক উপলব্ধি হইয়া থাকে।

দেশভেদে, কালভেদে ও জাতিভেদে তাঁহার উপাসনা প্রণালী বিভিন্নরূপে প্রচলিত আছে। তৎসমুদয়ই ধর্ম্মজগতের এক একটি স্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যাঁহার যেরূপ জনম, যেরূপ শিক্ষা, যেরূপ প্রকৃতি ও যেরূপ মতি গতি তাঁহার সেইরূপ ভাবের স্তরে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে

হয়। তাহাই শাস্ত্রে অধিকারিভেদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যিনি সর্ব্বোচ্চ স্তরে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছেন তিনিই সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন অথবা এ বিশ্ব ঈশ্বরময় দেখিতে পান। তখন তাঁহার আমিত্ব একবারে লোপ পাইয়া সোহংতত্ত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। যিনি ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই তিনিই ভেদবুদ্ধি প্রযুক্ত ঈশ্বরের বিভিন্নরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহার উপাসনায় রত হন। এ জগতে যত প্রকার উপাসনা বা পূজাপদ্ধতি প্রচলিত আছে সকলকেই সেই ধর্ম্ম জগতের স্তর পর্য্যায়ের খণ্ডভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এ নশ্বর জগতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে হইলে যেমন বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে গভীর গবেষণাপূর্ণ পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে হয়, ধর্ম্মজগতের সর্ব্বোচ্চ স্তরে উপস্থিত হইতে হইলেও সেইরূপ নিম্নস্তর অর্থাৎ দেবদেবীর পূজা ইত্যাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সাধন করিয়া ক্রমে উচ্চ স্তরে অর্থাৎ ব্রহ্মসকাশে উপনীত হইতে হয়।

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার বলিয়া সম্প্রদায় বিশেষে তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে; বাস্তবিক চিন্তা করিয়া দেখিলে এক ঈশ্বরই সাকার ও স্বগুণ এবং নিরাকার ও নির্গুণ বলিয়া সপ্রমাণ হইতে পারে। মানব সাধারণতঃ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করিতে সমর্থ হয় না সুতরাং সাধক তাঁহার এক একটি রূপ কল্পনা করিয়া ধ্যান ও ধারণায় রত হয়। এজন্য নিরাকারবাদী ও সাকারবাদীর বিতণ্ডা নিরর্থক। হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থে উক্ত আছে,—

চিণ্ময়স্যদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥

অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ, অদ্বিতীয়, উপাধিশূন্য, শরীর রহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্ত করা হইয়া থাকে।

সংসারে দেখিতে পাই এক ধর্ম্মাবলম্বী অপর ধর্ম্মাবলম্বীর উপাসনা বা পূজা পদ্ধতিকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন ইহা কখনই সমীচীন নহে। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ও বৌদ্ধ যে কোন সম্প্রদায়ের ব্যবহারতত্ত্ব আলোচনা করিলে ইহা সম্যক প্রত্যক্ষীভূত হইবে যে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ বিদ্বেষের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। বাস্তবিক যিনি প্রকৃত তত্ত্বদর্শী তিনি এরূপ বিদ্বেষভাব কিছুতেই হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন না। হিন্দুধর্ম্মের

অধিকারী ভেদ সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে হৃদয়ঙ্গম হইলে ঐরূপ বিদ্বেষভাব কিছুতেই থাকিতে পারে না। 'যত ভক্ত তত দেব' হিন্দুর এই উক্তিতে সার্ব্বজনীন অবিরোধের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। বোধ হয় এই ভাব হইতেই হিন্দুর তেত্রিশকোটী দেবতার অস্তিত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের সার শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

যে যথা মাংপ্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! যে আমাকে যেরূপে ভজনা করে আমি সেই রূপেই তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি; মনুষ্যগণ আমার পথেরই অনুসরণ করিয়া থাকে।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে সাধক যেরূপেই ঈশ্বরের উপাসনা করুক তিনি সেরূপেই তাহার বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। তাঁহার সম্মুখীন হইবার তিনটী পথ বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। যিনি যে পথ সুগম বলিয়া মনে করেন তিনি সেই পথে অগ্রসর হইলেই সফল মনোরথ হইতে পারেন।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চ উপাসক প্রচলিত আছে। এই সকল সম্প্রদায় মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। কেবল হিন্দুর মধ্যে এরূপ বিরোধ নহে; পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সকল জাতির মধ্যে এইরূপ ধর্ম্ম বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। ইউরোপে প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় মধ্যে একসময়ে ভীষণ শত্রুতানল প্রজ্বলিত হইয়া কত নরনারী দগ্ধীভূত হইয়াছিল ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মুসলমান ধর্ম্মে সিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায় মধ্যেও এইরূপ বিদ্বেষভাব চলিয়া আসিতেছে। কত দিন ধর্ম্মের এই সকল বিরোধ দূরীভূত হইয়া ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রত্যেক মানবের হৃদয় কন্দরে বিরাজ করিবে তাহা বলা যায় না। দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য।

আমাদের হিন্দু শাস্ত্র সম্যক পর্য্যালোচনা করিলে অনেক সারবান উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রধানতম সংহিতাকার মনু ধর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই এ প্রবন্ধে উল্লেখ করিতেছি,—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহাস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীবিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্ম্ম লক্ষণং॥

অর্থাৎ ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (শক্তি সত্ত্বে অপকারীর প্রত্যুপকার না করা), দম (বিষয় সংসর্গে মনের অবিকার), অস্তেয় (অন্যায় পূর্ব্বক পরধন হরণ না করা), শৌচ (দেহশুদ্ধি), ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবর্ত্তন করা), ধী (সম্যকজ্ঞান লাভ) বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য (যথার্থ জ্ঞান) এবং অক্রোধ (ক্রোধশূন্যতা)—এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। বাস্তবিক এই দশটী লক্ষণ সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই পরিগ্রহ করিতে পারেন। ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না। হিন্দু ঋষিগণ যে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন তাঁহাদের অনেক উক্তিতেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, যথা :—

সত্যাৎ উৎপাদ্যতে ধর্ম্মঃ ধর্ম্মাদয়াৎ প্রবর্ত্ততে।
ক্ষমায়াং স্থাপিতোধর্ম্মঃ লোভাদ্ধর্ম্মো বিনশ্যতি॥

অর্থাৎ সত্য হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি, দয়া হইতে বিস্তৃতি, ক্ষমা হইতে স্থিতি ও লোভ হইতে ধর্ম্মের বিনাশ পায়। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে উক্ত আছে :—

"ত্রিবিধ নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধ স্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ংত্যজেৎ॥

অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ নরকের ত্রিবিধ দ্বার স্বরূপ অতএব আত্মার নাশক, এজন্য এ তিনটী পরিত্যাগ করিবে। অসীম তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,—

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিত॥"

অর্থাৎ পরস্ত্রী মাতৃবৎ, পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ এবং সর্ব্বজীব আত্মবৎ যে ব্যক্তি দর্শন করিয়া থাকেন সে ব্যক্তিই পণ্ডিত।

এই সকল নীতিবাক্য যাহার হৃদয়ে মালার ন্যায় বিরাজমান তিনিই আলৌকিক শ্রীসম্পন্ন এবং ইহাই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম মন্দিরের সোপান স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

শ্রীরাসমোহন মৌলিক।

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ।

পশ্চিমপাড়া।

পশ্চিমপাড়া গ্রামখানি আয়তনে ক্ষুদ্র; ইহার জনসংখ্যাও কম—দেড় হাজারের অনূর্দ্ধ; তথাপি শিক্ষাদীক্ষায় এবং জ্ঞানগরিমায় পশ্চিমপাড়া বিক্রমপুরের প্রধান প্রধান গ্রামগুলির সমকক্ষ। কোন কোন বিষয়ে গ্রামখানি বেশ উন্নত।

বিক্রমপুরের কি ছোট, কি বড়, সকল স্থানেরই অতীত এবং বর্ত্তমান ইতিহাস 'ঠিকঠাকরূপে' উদ্ধার করা যেমন তেমন কথা নয়। গবেষণা এবং পরিশ্রমের ফলস্বরূপ যা'কিছু সংগ্রহ করিতে পারা যায় তাহাও সামান্য মাত্র। পশ্চিমপাড়া গ্রামের পক্ষেও ঐ রকম কথা বলা যাইতে পারে; বিশেষতঃ এখানে এমন কোন বৃদ্ধ লোক নাই যাঁহার নিকট হইতে এস্থানের অতীত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তবে, আমি যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

দুইশত বৎসর পূর্ব্বের গ্রামের ইতিহাস স্পষ্টরূপে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। ইহার পরের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যাহা আমরা শুনিতে পাই তাহা হইতে বুঝা যায় যে একসময়ে—যখন মুখোটী, ভট্টাচার্য্য এবং চাটুয্যেদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল, যখন মুখোটীদের কার্য্যকলাপের জন্য পশ্চিমপাড়া, মুখোটীর পশ্চিমপাড়া। আখ্যায় অভিহিত হইত' তখন এই ক্ষুদ্র পশ্চিমপাড়া বিক্রমপুরের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ গ্রাম ছিল। কিন্তু এখন আর পশ্চিমপাড়ার অবস্থা সেরূপ নাই।

প্রাচীনত্বের নিদর্শনস্বরূপ এগ্রামে বিশেষ কিছুই নাই। বর্ত্তমানে মুখোটী বাড়ীতে একটী ধ্বংসোন্মুখ শিবমন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দিরটী পুরাতন বটে। দেবালয়টী অনুমান দুইশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। ইহা ৺ জগন্নাথ মুখোটীর শ্মশানোপরি অবস্থিত। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে জগন্নাথ তৎপুত্র গৌরসুন্দর এবং রামনিধির নিকটে তদীয় শ্মশানের উপর একখানি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পিতার অন্তিম অনুরোধ স্মরণ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার

শ্মশানের উপর এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উহাই পূর্ব্বোক্ত শিবমন্দির। দুঃখের বিষয় মন্দিরটী এখন ধ্বংসের দিকে—আর যে বেশী দিন টিকিবে এমন বোধ হয় না। একসময়ে মন্দিরটী বেশ সুন্দর ছিল। মন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী রাস্তা (বর্ত্তমানে যেখানে সড়ক) দিয়া যাহারা যাতায়াত করিতেন তাহারা ইহার কারুকার্য্যের প্রশংসা না করিয়া যাইতেন না। মন্দিরের ভিতর একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মুখোটী বাড়ীর ভিতরকার দোতালা দালান খানিও খুব পুরাতন. ইহা প্রাগুক্ত শিবমন্দিরের সমসাময়িক—নির্ম্মাতা পূর্ব্বোক্ত রামনিধি মুখোটী। ইহাও ধ্বংস হইতে চলিয়াছিল; সৌভাগ্যক্রমে ইহার সংস্কার হইয়াছে। সংস্কার হইবার পর হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ উপরের তালায় নীত হইয়াছেন। এই লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহটী বেশ প্রত্যক্ষের।

গ্রামে অপর একটী শিবমন্দির দৃষ্ট হয়; কিন্তু উহা তত প্রাচীন নহে। এই গ্রামস্থ মুখোটী বাড়ী যে একসময়ে কিরূপ ঝমঝমে এবং জনপূর্ণ ছিল তাহা প্রকাণ্ড একটা পাকের কোঠার ধ্বংসাবশেষ দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন গাছের মধ্যে গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোনস্থ একটা বটগাছ এবং মুখোটী বাড়ীর একটা নিমগাছ উল্লেখযোগ্য। গ্রামের বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন যে তাহারা ছেলাবেলা হইতে এই গাছ দুইটাকে এক রকমই দেখিতেছেন—বিগত ৮০।৯০ বৎসরের ভিতর ইহাদের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

সকলেই জানেন যে বিক্রমপুরে পশ্চিমপাড়া দুইটী। একটী পয়সাগাঁর নিকটবর্ত্তী—লোকে তাকে বলে ‘পয়সা পশ্চিমপাড়া’ আর অপরটী জৈনসার এবং ভবানীপুরের সন্নিকটে অবস্থিত বিধায় লোকে বলে’ জৈনসার-পশ্চিমপাড়া’ বা ‘ভবানীপুর-পশ্চিমপাড়া’। আমি যে গ্রামের বিবরণ লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছি তাহা ‘জৈনসার পশ্চিমপাড়া’।

গ্রামের অদূরে—দক্ষিণে প্রসিদ্ধ পোড়াগঙ্গার খাল। এই খালের একটী শাখা এই গ্রামের ভিতর দিয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। বর্ষার সময় নৌকাদি এই খাল দিয়াই যাতায়াত করে। খালের অনেক স্থান হিজল আর বউন্না (বরুণ) বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। ‘গতিকে গাতিকে’ দুই একটা ‘বড়’ নৌকা এই খালে আসিয়া পড়িলে চালাইয়া নিতে মাঝিদিগকে বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হয়।

গ্রামের পূর্ব্বদিকে কাঁঠালতলী এবং প্রসিদ্ধ জৈনসার গ্রাম। উত্তরসীমায় খিলগাঁ এবং সুজানগর নামক দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত; পশ্চিমে নওপাড়া। ভবানীপুর পশ্চিমপাড়ার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। এই গ্রামের সীমা বলিবার সময় ইহাও বলা আবশ্যক যে গ্রামের সকল দিকেই উন্মুক্ত ময়দান। এই সমস্ত গ্রামগুলি ময়দানের পারে।

গ্রামের নাম পশ্চিমপাড়া কেন হইল, এতৎসম্বন্ধে কয়েকটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটী মাত্র সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। প্রবাদটী এই :— পূর্ব্বে কখন—তা' বলা যায় না—পশ্চিমপাড়া মালপদিয়া নামক গ্রামের অংশ বা পাড়া ছিল। গ্রাম্যের বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন যে প্রাচীন মালপদিয়া অতি বিস্তৃত গ্রাম ছিল। কালক্রমে কোনও কারণে উহার পাড়াগুলি এক একটা গ্রাম বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠে। এই জন্যই পশ্চিম সীমায় পাড়া বলিয়া গ্রামের নাম হইয়াছে "পশ্চিমপাড়া"। প্রবাদের যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য আজও ধারে পাশে মধ্যপাড়া (গ্রামের মধ্য স্থানের পাড়া), ধারপাড়া (একধারে অবস্থিত যে পাড়া) প্রভৃতি 'পাড়া' অন্ত গ্রামগুলি বর্ত্তমান আছে।

মুন্সীগঞ্জ হইতে শ্রীনগর যে রাস্তা (সড়ক) চলিয়া গিয়াছে, তাহার একটী প্রশাখা গ্রাম খানিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার উত্তর ভাগটা দক্ষিণ ভাগ হইতে সমধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়; কারণ দক্ষিণপাড়ায় কোন পুরাতন ইষ্টকালয় অথবা কোন পুরাণো গাছ দেখা যায় না; আর পুষ্করিণী খননকালে এমনভাবে বালি উঠিতে থাকে যে তাহাতে পুকুর কাটান পণ্ড হওয়ার উপক্রম হয়। শেষোক্ত কারণদৃষ্টে বুঝা যায় যে দক্ষিণ পাড়ার নিকট দিয়া কোনও নদী প্রবাহিত হইত। এই নদী অন্য কোন নদী নহে—পোড়াগঙ্গা বলিয়া যে নদীর কথা আমরা শুনিতে পাই উহাই বোধ হয় সেই নদী। একটা কারণ হইতে এ ধারণা নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। কারণ এই যে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে এবং গ্রামের (পশ্চিম পাড়ার) দক্ষিণস্থ বিস্তৃত মাঠের মধ্যে একটা বটগাছ ব্যতীত অন্য কোনও প্রাচীন গাছ দৃষ্ট হয় না। বটবৃক্ষটা বোধ হয় পোড়াগঙ্গা নদীর পারে ছিল—দৈবানুগ্রহে নদীর কুক্ষিগত হয় নাই। কালক্রমে পোড়াগঙ্গা নদী একটা বিলে পরিণত হইয়াছিল। ইদানীং যেখানে পোড়াগঙ্গা নদী প্রবাহিত হইত

সেখানে একটী খালমাত্র পরিলক্ষিত হয়। লোকে ইহাকে পোড়াগঙ্গার খাল বলিয়া থাকে। কালের কি প্রভাব! নদীও একটা খালে পরিণত হয়!

দত্ত অর্থাৎ বারুইরা এগ্রামের সর্ব্বপ্রাচীন অধিবাসী। ইহাদেরপরেই ভট্টাচার্য্য এবং মুখোটীরা রাজনগর হইতে আসেন। প্রায় আড়াইশত বৎসর যাবৎ ইঁহারা এ গ্রামে বাস করিতেছেন। কাশী হইতে আসিয়া ভট্টাচার্য্যেরা প্রথমতঃ চামারদিতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু এখানে অন্য কোনও ব্রাহ্মণের বাস না থাকায় মুখোটীরা ভট্টাচার্য্যদিগকে পশ্চিমপাড়ায় আসিতে বলেন—তাহাদিগের কথামতই ভট্টাচার্য্যেরা এখানে আসিয়াছিলেন। ‡

গ্রামে তিনঘর তালুকদার বাস করেন—মুখোটী, ভট্টাচার্য্য এবং চাটুয্যে। পূর্ব্বে, বিগত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও মুখোটীদের খুব প্রতাপ ছিল। প্রত্যহ ইহাদের বাড়ীতে তিন চার মণ চাউল রন্ধন হইত। কিন্তু কালচক্রের আবর্ত্তনে ইহাদের সেই অবস্থা এবং প্রতাপ সকলই চলিয়া গিয়াছে; তাহাদের কার্য্যকলাপের স্মৃতিমাত্র লোকের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। ভট্টাচার্য্যেরা খুব ধার্ম্মিক—আজ পর্য্যন্তও ইহারা আমিষ ভক্ষণ করেন না। এই বংশে অনেক কৃতী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চাটুয্যেরা মুখোটীদিগের ন্যায় অত নামজাদা না হইলেও ইহারাও কম নন। ডাক্তার নিশিকান্ত, শীতলাকান্ত প্রভৃতি এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া বিক্রমপুরের ইতিহাসে পশ্চিমপাড়াকে ধন্য করিয়াছিলেন। এই গ্রামস্থ চাটুয্যেবংশ বিক্রমপুরে অনেক স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বোক্ত চাটুয্যে এবং মুখোটীরা পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন—একের উন্নতি অপরে যেন দেখিতে পারিতেন না। এই উভয় বংশের যে সব কারণে অবনতি হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ আত্মকলহ। সামান্য সামান্য কারণে ইহারা মোকদ্দমা করিতেন—আর লাঠিয়ালের লড়াই যেন

‡ কাহারও কাহারও মত এই যে, পূর্ব্বে এখানে দত্ত এবং হরি স্যাজির বাড়ীবলিয়া এক ঘর কাপালীর মাত্র বাস ছিল। কোন ব্রাহ্মণের বাস না থাকায় দত্তরা বড়ই অসুবিধায় পড়েন। কাশী হইতে এক ঘর ব্রাহ্মণ চামারদিতে আসিবেন জানিয়া দত্তরা তাঁহাদিগকে এখানে আসিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তাহারা পশ্চিম পাড়ায় আসেন। মুখোটীরা ইঁহাদের পরে আসিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে লাগিয়াই ছিল। "কাইজা-কচায়নে" ব্যাপৃত না থাকিয়া মিলিয়া মিশিয়া গ্রামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে থাকিলে আজ হয় ত পশ্চিমপাড়া বিক্রমপুরে সর্ব্ববিষয়ে প্রধান গ্রাম বলিয়া বিবেচিত হইত। আজ পর্য্যন্তও তাঁহারা সে বিদ্বেষ ভুলিতে পারেন নাই—সময়ে সময়ে আজও ইঁহারা দলাদলি করিয়া থাকেন। চাটুয্যেদের পূর্ব্বপুরুষ ভট্টাচার্য্যদের দৌহিত্র সন্তান। এই সম্মিলিত দুইবংশ 'ভারটী' নামে প্রসিদ্ধ। কায়লী বা কালীপাড়ার জমিদার একঘর এ গ্রামে বাস করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের অবস্থা পড়িয়া গিয়াছে। কায়স্থেরা এ গ্রামে মুখোটী এবং ভট্টাচার্য্যদিগের সমসাময়িক কাল হইতে বাস করিতেছে। দত্তদের অবস্থা এক সময়ে খুব ভাল ছিল; এখন তাহারা মধ্যবিত্ত। গ্রামের নীচ জাতীয়গণের অবস্থা বেশী ভাল নয়। সকলকেই 'মাথার ঘাম পায়ে' ফেলিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে হয়। মুসলমানেরা গ্রামের পূর্ব্বধারে বাস করে, তাহাদের পাড়ার নাম 'পূর্ব্বকান্দা'। তাহাদের দুই চারিজনের অবস্থা মন্দ নয়; আর সকলেই 'দিনে আনে দিনে খায়' ধরণের।

গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা মন্দ নয়। গ্রাম খানি ছোট হইলেও শিক্ষিতের সংখ্যা লোক সংখ্যার অনুপাতে ভালই বলিতে হইবে। এই গ্রামে ক্ষণজন্মা 'নামেডাকা' পুরুষ বেশী জন্মগ্রহণ না করিয়া থাকিলেও এ বিষয়ে এগ্রাম অন্যান্য গ্রাম হইতে সৌভাগ্যবতী, কারণ যা, দুই চারি জন এ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা শুধু এই গ্রামের কেন—সমগ্র বঙ্গের গৌরবস্থল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ডাক্তার নিশিকান্ত ও শীতলাকান্ত এবং নবকান্ত—এই চট্টোপাধ্যায় ভ্রাতৃত্রয়ের নাম বিক্রমপুরবাসী শিক্ষিত মাত্রের নিকটই সুপরিচিত। বাস্তবিক ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় ব্যক্তি বিশাল ভারতেও দুই চারিটী বই মিলেনা। ইঁনি উনবিংশতিটী ভাষায় সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। নিম্নে এই গ্রামস্থ স্বর্গগত কতিপয় মহাত্মার নাম উল্লেখ করিলাম।

১। ৺ হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ফয়জাবাদের Assistant Surgeon ছিলেন। স্বগ্রামের প্রতি ইঁহার বেশ টান ছিল।

২। ৺ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—গৌরীপুর Estateএর দেওয়ান ছিলেন।

যাহারা গ্রামে থাকেন তাহাদের মধ্যেও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অপর দুই একজন ভদ্রলোক ব্যতীত গ্রামের উন্নতি কল্পে কাহারও তাদৃশ মনোযোগ নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে পশ্চিমপাড়া গ্রামের দুর্দ্দশায় নিশ্চিতই দূরীভূত হইত। গ্রামবাসিগণ এ বিষয়ে যত্নপর হইবেন কি?

শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ে গ্রামখানি উন্নত হইলেও এখনও গ্রামের অভাব অসুবিধা অনেক রহিয়া গিয়াছে। গ্রামবাসিগণ একটু চেষ্টা করিলেই এ সমস্ত অসুবিধা দূর করিতে পারেন।

গ্রামবাসিগণের প্রায় প্রত্যেকেই গ্রামের উন্নতি হউক ইহাই ইচ্ছা করেন। কিন্তু উন্নতি করিতে তাহারা কেহই চেষ্টা করেন না।

এই গ্রামে কোনও উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় নাই। এ অসুবিধাটা গ্রামস্থ ছাত্রদিগকে খুবই ভোগ করিতে হয়। রক্ষা যে নিকটেই ইছাপুরা হাই ইংলিশ স্কুল—তাহাই বা বিশেষ নিকটে কি?—প্রায় দুই মাইল দূর হইবে। যাইতে কোন ভাল বান্ধানো রাস্তা নাই। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এবং কার্ত্তিক মাসে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। নিরুপায় হইয়া তাহারা সেই স্কুলেই পড়ে। গ্রামবাসিগণ এই অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিবেন না, কি?

এখানে একটী উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালা আছে। তাহাও বর্ত্তমানে বেশী ভাল চলিতেছে না। পূর্ব্বে ইহার অবস্থা আশাতীত ভাল ছিল—প্রতি বৎসরই ৭।৮টী উচ্চ প্রাইমারী পাশ করিত। গ্রামের বর্ত্তমান যুবকগণের অনেকেই এই পাঠশালার ছাত্র। কিন্তু বর্ত্তমানে গ্রামস্থ ভদ্রলোকদের (দুই একজন ব্যতীত) কোনও সাহায্য না পাওয়ায় ইহার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে। শিক্ষকেরা কিন্তু যত্ন চেষ্টার ত্রুটী করেন না। ভদ্রলোকদের এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

না থাকার মত একটী বালিকা বিদ্যালয় এই গ্রামে আছে। দুই চারি দিন মেয়েরা স্কুলে যায়, আবার দুই চার দিন বন্ধ থাকে। মেয়েদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না। তাহারা ত আর ছেলেদের মত দূরবর্ত্তী স্কুলে যাইতে পারে না। যেখানে ছেলেদের শিক্ষার জন্যই বিশেষ চেষ্টা হয় না সেখানে মেয়েদের শিক্ষাদান হইবে কেমন করিয়া?

সুখের বিষয় এই যে ছেলেদের জন্য স্কুল, পাঠাগার প্রভৃতি স্থাপন করিতে গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণের বিশেষ চেষ্টা না থাকিলেও তাহারা যাহাতে দুশ্চরিত্র না হইতে পারে তৎপ্রতি তাঁহাদিগের প্রখর দৃষ্টি আছে। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে বক্তব্য।

ভদ্রলোকের ছেলেপিলেদের সকলেই স্কুলে পড়ে। নিম্নশ্রেণীস্থ কয়েকটী ছেলে এখন পাঠশালায় পড়িতেছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শ্রেণীর লোকের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা খুব কম। বর্ত্তমানে এই গ্রামে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের কথা চলিতেছে। পশ্চিমপাড়ার মত গ্রামে হাই স্কুল স্থাপন একটী বেশী কিছু নহে। গ্রামবাসীদিগের সকলের সাহায্য এবং সহানুভূতি পাইলে এই কাজ অনায়াসেই হইতে পারে।

প্রায় ১০ বৎসর হইল এ গ্রামে ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়াছে। ডাকঘরটী ভালই চলিতেছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় যুবকের চেষ্টায় এই গ্রামে একটী পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুদিন চলিয়াই উহা উঠিয়া গিয়াছে।* পূর্ব্বে মুখোটী বাড়ীতে Literary Association হইত। গ্রামের সমস্ত ছাত্র সেখানে যাইত। সকলেই কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া নিত—আর সেখানে তাহা পাঠ করিত। এই কার্য্যে তাহাদের অশেষবিধ উপকার হইয়াছিল। দুই চার জন ভদ্রলোকও এই কার্য্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। কিন্তু সকলের সহানুভূতি না পাইলে কোনও কাজ হয় না—বর্ত্তমানে উহা নাই।

---

* এই অভিযোগটি সাধারণ, বিক্রমপুরের প্রায় গ্রামেই পাঠগার নাই। যেই দুই একটা আছে—তাহাও সকলের উদ্যম, উৎসাহ ও সহানুভূতির অভাবে বিলুপ্ত হইতেছে। প্রত্যেক গ্রামে পাঠাগার স্থাপন বিষয়ে যুবকদিগের অগ্রণী হওয়া উচিত। তাহাদের নূতন উদ্যম, নবীন উৎসাহ, প্রাণের সহানুভূতি এই কেন্দ্রে প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। বৃদ্ধগণ খেয়া ঘাটে বসিয়া এ সকল ভাবিবার সময় পাইবেন কেন?—তথাপি, এবার পূজার সময় "বিক্রমপুর" সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত বিক্রমপুরের কতিপয় স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে বৃদ্ধদিগের এ বিষয়ে যৌবন—সুলভ উৎসাহ, উদ্যম দেখিয়া বাস্তবিকই আনন্দিত হইয়াছি।—লেখক।

গ্রামে কোনও হাট বাজার নাই। এ অসুবিধাটা কিন্তু আমাদিগকে তত বেশী ভোগ করিতে হয় না। কারণ, নিকটেই ভবানীপুর এবং নওপাড়ার হাট, আর ইছাপুরার বাজার। অধিকন্তু হাট বাজার বসিতে পারে এমন 'রোকের' জায়গাও এখানে নাই। গ্রামে ৭।৮টী মুদি দোকান আছে!—সেখানেও প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে গ্রামের ছেলেরা হাডুডু, গোল্লাছুট, দারিয়াবান্ধা প্রভৃতি দেশীয় খেলা খেলিত। এ সমস্ত খেলায় এক পয়সাও ব্যয় নাই—আমোদও যথেষ্ট; অথচ শরীরেরও বেশ উপকার হয়। এখন ক্রীকেট, ফুটবল, বেডমিণ্টন্, টেনিস তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে!

গ্রামের ভদ্রলোকদের জীবন ধারণের প্রধান উপায় চাকুরি। কাহারও কাহারও 'খামার' আছে, তদ্দ্বারাই তাহাদের অন্নসংস্থান হইয়া থাকে। নীচ জাতীয়গণের কৃষিই জীবনধারণের প্রধান সম্বল।

উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ধান এবং পাট প্রধান। অন্যান্য শস্যও যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উৎপন্ন না হয় এমন নহে।

গ্রামের যুগীরা বস্ত্রবয়নে ওস্তাদ। কাপালীরা পাটের ছালা বুনাইতে পারে। উহারা এই সমস্ত ছালা সিরাজদিখার হাটে বিক্রয় করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করে। পান, বিস্কুট, সুপারী এবং অন্যান্য জিনিষের 'গাওয়াল' * করিয়াও ইহারা কিছু কিছু পাইয়া থাকে। এই গ্রামের কৈলাস মণ্ডল লাঠির খেলা দেখাইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামে বেশ নাম করিয়াছে। উহার বয়স এখন ৬০ বৎসর; কিন্তু সে এখনও দাঁত দিয়া ঢেঁকি ঘুরাইতে পারে। নীলপূজার † সময় গ্রামের নিম্নশ্রেণীরলোক নানাপ্রকার সাজ দিয়া জাকজমকের সহিত গ্রামে গ্রামে বাহির হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসে দুই তিনটা মেলাও এখানে বসিয়া থাকে। মনা যুগীর (মনমোহন নাথ) 'কবির দলটী' কিছুদিন হইল উঠিয়া গিয়াছে।

গ্রামের জল বায়ু এবং স্বাস্থ্য মোটের উপর ভাল। বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে ৩।৪ বার মাত্র, কলেরা দেখা দিয়াছিল। এই ৩।৪ বারের মধ্যে ২বার

---

* গ্রামে গ্রামে এবং বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া জিনিষ বিক্রয় করাকে বিক্রমপুরে 'গাওয়াল' বলা হয়।—লেখক। † নীলপূজা—নীলকণ্ঠ পূজা, চড়কপূজা। 'বিক্রমপুরের শব্দ সম্পদ' দ্রষ্টব্য লেখক।

খুব ভীষণভাবে লাগিয়াছিল। একবারের আক্রমণে মুখোটীবাড়ী জনশূন্য হওয়ার পথে গিয়াছিল। আমাশয় এবং জ্বরের উপদ্রবও সময়ে সময়ে দেখা যায়। ডাক্তারের সংখ্যা বেশী নাই। তাহাদের কেহই এল, এম, এস অথবা এম, ডি, নহেন। একেত ডাক্তার কবিরাজের সংখ্যা কম তাহাতে তাহাদের অনেকেই অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে থাকেন, যা' দুই একজন গ্রামে থাকেন তাহারাও বিশেষ অভিজ্ঞ নন। কাজেই আপাততঃ দেখিতে গেলে রোগ হইলে তাহার প্রতিকারের উপায় যেন থাকেনা। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে নিকটবর্ত্তী জৈনসার গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং সেখানে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন; আর ধারে পাশের গ্রামসমূহেও কয়েকজন চিকিৎসক বাস করেন। নতুবা অকালে অচিকিৎসায় অনেককে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত। কিন্তু সকলের পক্ষে সরকারী ডাক্তার আনা ত আয়াসসাধ্য নহে।

পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে গ্রামে ভাল পুকুর ছিলনা। জল ছিল পেনাপচা—ঘোলা। অনেক স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু এখন তাহার অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে গ্রামে পুকুরের সংখ্যা প্রায় ৩৫টী তন্মধ্যে ১০।১৫টীর জল সর্ব্বদা ব্যবহারের উপযুক্ত; আর গুলির সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। জলের উপর লোকের স্বাস্থ্য নির্ভর করে গ্রামবাসীদিগের পানীয় জলের ভাল বন্দোবস্তকরা উচিত। গতবৎসর কলেরার ভীষণ প্রকোপের ফলে আমাদের গ্রামে কয়েকটী পুকুর খনিত হইয়াছে। ইদানীং কয়েকটী পুকুর—reserve* রাখিবার কল্পনা জল্পনা চলিতেছে।

পশ্চিমপাড়া গ্রামের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য-নয়নমনোমুগ্ধকর। চারিদিকেই উন্মুক্ত ময়দান এই গ্রামের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। রাস্তাঘাট মন্দনয়। গ্রামের রাস্তা।—তা আর একটা বেশী কি হইবে। বাধাঁন রাস্তা একটী মাত্র; আর সকলই হালট। সড়কটার উপর ৩টা পুল আছে। বর্ষাকালে এই রাস্তাটা জলে ডুবিয়া যায়। কার্ত্তিকমাসে নাক না ধরিযা দুর্গন্ধের জন্য এই রাস্তা দিয়া চলা যায় না। রাখালবালকেরা এই রাস্তায় গরু চরায়।

গ্রামখানিতে ঝোপ-জঙ্গল-পরিপূর্ণ স্থান বেশী নাই। কাজেই 'মনের বাঘে খাইবার' বা ডর পাইবার স্থানও খুব কম। তবে, সড়কের উত্তরস্থ মুখোটী

* বিক্রমপুর সম্মিলনীর হাতে দেওয়ার কথা চলিতেছে।

বাড়ীর 'চিতাখোলায়' অনেককেই ভয় পাইতে হইয়াছে। ওখানে নাকি অনেক অপদেবতার বাস। গ্রামে আর একটা ভয়ের স্থান আছে; উহা গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোনস্থ বটগাছের নিকট। কথিত আছে এক ব্যক্তি এখানে জগন্মাতা শীতলাদেবীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। গাছটা বহুকালের—কেহ বলেন এখানে দক্ষিণাকালিকা আছেন; কেহ বলেন গাছটা শীতলাদেবীর আবাসস্থল; কেহ বলেন এখানে অনেক দেবতা বাস করেন। কিন্তু যেই যা বলুন না কেন, গাছটা যে 'দেবাংশি' এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বৃক্ষটীকে দেখিয়া ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—যখন তিনি আমাদের গ্রামে আসিয়াছিলেন—তখন বলিয়াছিলেন যে, পশ্চিমপাড়া গ্রামের উন্নতি অবনতি মঙ্গল অমঙ্গল এই গাছটার অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। অর্থাৎ যখন গাছটা সতেজ এবং পত্রে সুশোভিত হইতে আরম্ভ করিবে তখন জানিবে যে গ্রামের উন্নতি এবং মঙ্গল হইবে আর যখন গাছটা 'টাঙ্গামুণ্ডা' হইতে আরম্ভ করিবে অর্থাৎ পাতা পড়িয়া ইহার ডালগুলি ভাঙ্গিয়া অথবা, শুকাইয়া যাইবে তখন জানিবে যে গ্রামের অমঙ্গল হইবে।' মহাপুরুষের বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে; কয়েক বৎসর হইল ঝড়ে ইহার একটা ক্ষুদ্র শাখা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কয়েকটী উজ্জ্বল রত্নও লোকান্তরিত হইয়াছেন।

হিন্দু এবং মুসলমানই এই গ্রামের অধিবাসী। মুসলমানেরা তাহাদের ধর্ম্মে আস্থাবান্; হিন্দুরা দেবদ্বিজে ভক্তিমান্। নীচজাতীয়গণের ব্রাহ্মণের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি আছে। ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অমৃতায়মান উপদেশের ফলস্বরূপ সনাতন ধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতিঃ আমাদের গ্রামের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিতেছে। গ্রামে প্রত্যেক দিনই খোল করতাল সংযোগে 'হরি সংকীর্ত্তন' হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম-বিষয়ে এই গ্রামের স্থান বিক্রমপুরে অতি উচ্চে। আমাদের গ্রামে একজন সংসার ত্যাগী আজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী সন্ন্যাসী আছেন। ইহার নাম কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। এই মহাত্মার শ্রীশ্রীসদগুরু সঙ্গী নামক গ্রন্থখানি নানাবিধ সদুপদেশ পূর্ণ। ইনি এবং ইহার অপর তিন ভ্রাতা হরকান্ত, বরদাকান্ত এবং সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—পুরীতে অবস্থান করেন। এই গ্রামের ব্রহ্মানন্দ

ভারতীর নামও বঙ্গদেশের অনেকের সুপরিচিত। হিন্দুদর্শনে ইঁহার জ্ঞান অসাধারণ। ইঁনি কয়েকখানা গ্রন্থ প্রনয়ন করিয়াছেন। ভারতী মহাশয় বৎসরে দুই একবার স্বীয় জন্মভূমিতে আসিয়া বালক এবং যুবকদিগকে একত্র করিয়া নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান করিয়া যান। শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী বিগত দ্বাদশ বৎসরের ভিতর একবার মাত্র পশ্চিমপাড়ায় আসিয়াছিলেন। গ্রামের যুবকেরা রোগীকে রোগমুক্ত করিতে, বিপন্নের বিপদ দূর করিতে এবং পরোপকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে পশ্চিমপাড়া সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত না হইলেও বিক্রমপুরে ইহার খ্যাতি প্রতিপত্তি যথেষ্ট। কোন কোন অংশে পশ্চিমপাড়া এতদূর উন্নত যে বিক্রমপুরে ইহার সমকক্ষ গ্রাম নাই বলিলেই চলে। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে, কি ধনে, কি মানে, কি বিজ্ঞতায় সকল বিষয়েই পশ্চিমপাড়া বিক্রমপুরের একটী প্রধান গ্রাম বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু মুখোটী এবং চাটুয্যেদের বিবাদ বিসংবাদ পশ্চিমপাড়ার ক্রমোন্নতির পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সে বিদ্বেষবহ্নি আজও একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। মোকদ্দমা করিবার ইচ্ছা বর্ত্তমান পশ্চিমপাড়াবাসীর হৃদয়েও বেশ বলবতী। সামান্য সামান্য কারণে ইঁহারা উকীল মোক্তারকে অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন (অবশ্য সকলে নয়)।

শ্রীকুমুদিনীকান্ত ঘোষাল।

পরশমণি।

(১৫)

বিলাতের মাটি যে মানুষ গড়িয়া তোলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী যাহাদের মাথায় আশীর্ব্বাদের পুষ্প-স্তবক তুলিয়া দিতে চাহেন না—সেই সকল ব্যর্থকাম ভক্তের দলও সাগরপারের বিদ্যা-রাণীর করুণালাভে বঞ্চিত হন না। সেখানে বিদ্যালাভ শুধু পুঁথিগত নয়, শুধু পরীক্ষা পাশ করিবার জন্য নয়—ঠিক খাঁটি মানুষ করিবার জন্যই সেখানে

বিদ্যাদানের ব্যবস্থা, কেবল উহা চাকুরীগত নয়, উহা শোণিতধারার ন্যায় শিরায় শিরায় নব-সঞ্জীবনী-সুধা ঢালিয়া দিয়া অকর্ম্মণ্যকেও কর্ম্মী এবং কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

শচীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড হইতে বি, এ, উপাধি লাভ ও তারপরে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দীর্ঘ পাঁচবৎসর সুদূর প্রবাসের পর দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। দীর্ঘ প্রবাসের পর দেশে ফিরিয়া আসিবার আনন্দ যে কি পরিমাণ হৃদয়কে তোলপাড় করিয়া তোলে, প্রাণের সে আনন্দ ঝঙ্কার ঠিক ভাষায় ফুটিয়া উঠে না। আবার সেই পিতামাতার চরণ দর্শন, পরিবারের বিমল প্রীতিলাভ আর দেশ-জননীর অপরূপ সৌন্দর্য্যধারার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দেওয়া শৈশবের শত মধুরস্মৃতি নবভাবে অনুভব করা—সে যে কি পরমলাভ,—তাহাতে কি অপরূপ আনন্দ, সে মধুর কথা ভাবিতে ভাবিতে নীল সাগর জলে ভাসমান সোণার কমল ইংলণ্ডের প্রান্তভূমি ছাড়িয়া, সে দেশের দিকে যাত্রা করিল।

নানা সাদর অভিনন্দন ও অভ্যর্থনার মধ্য দিয়া গৌরব-মণ্ডিত মস্তকে শচীন্দ্র আবার হাসিমুখে আসিয়া পিতামাতার চরণ-বন্দনা করিল। স্নেহময়ী জননী পুত্রের মস্তক চুম্বন করিয়া বুকে টানিয়া লইলেন। ঠিক খাঁটি বাঙ্গালীর মত সাধারণ বেশভূষায় সাজিয়া যখন শচীন্দ্র সকলের মাঝখানে অতি সরল ও সহজ ভাবে আসিয়া আপনাকে প্রকাশ করিল, তখন অতি বড় নিন্দুকের দলেরও রসনাকণ্ডুয়ন থামিয়া গেল, সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিল—"সাবাস ছেলে বটে, যেমন বিদ্যা, তেমনই বুদ্ধি! সমাজ কিন্তু উহা নীরবে সহিল না, রাজাই হও, জমিদারই হও, ধনীই হও, দরিদ্রই হও—একবার তাহার চরণধূলির কাছে মাথাটা নীচু করিতেই হইবে। বাহিরের লোকে যে পরিমাণ আনন্দের সহিত এই ধনী পরিবারের সুশিক্ষিত যুবকটীকে দেশের আশা-প্রদীপ জ্ঞানে প্রশংসার কলনিনাদে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল,—কিন্তু দেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই চলিতেছিল। সেখানে গ্রামের কৃতবিদ্য যুবকগণ ও কন্যাদায়গ্রস্ত জন কয়েক দীন ভদ্র সন্তান ব্যতীত গ্রামের বা সমাজের আর কেহই তেমন ভাবে তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন না। তর্কালঙ্কার, বিদ্যালঙ্কার ও গ্রামের নিকর্ম্মারদল—যাহারা চিরদিন জমিদার-পরিবারের অর্থ সাহায্যে উদর পূর্ত্তি করিয়া আসিতেছে,

তাহারা পর্য্যন্ত এখন সমাজের ত্রুটী ধরিয়া মুরুব্বির মত রাধাকান্ত বাবুকে বিবিধ অযাচিত উপদেশ দানে পুত্রের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কহিলেন—"শেষটায় কি কর্ত্তা ম'শাই, সাতপুরুষের পিণ্ড লোপ করবেন, সমুদ্র-যাত্রায় যে সব ধর্ম্ম-পণ্ড হয়।" রাধাকান্ত বাবু কহিলেন, "সংসারে কোনদিন কারু মুখের দিকে চেয়ে কাজ করিনি, সমাজকে চিরদিনই মেনে আস্‌ছি, মান্‌বোও, তবে বাড়াবাড়ি কখনও সইবনা। ছেলে শিক্ষার জন্য বিলেত গিয়েছে, ভগবানের কৃপায় সে মানুষ হয়েও এসেছে, সেত কোন অন্যায় করেনি,—প্রয়শ্চিত্ত যদি দরকার হয়, সে পরে বোঝা যাবে। তবে শচীনের কি মত জানিনা। ছেলের অমতে আমি কোন কাজ কর্‌বোনা। প্রায়শ্চিত্তের কোন আবশ্যক আছে তাত আমার মনে হয় না"

শচীন ঠিক্ সেই সময়ে সেখানে আসিয়া পঁহুছিল এবং গুরুজনকে প্রণাম করিয়া কহিল—"আপনারা সব ভাল ত?" শচীনের সুন্দর গৌরদেহ, জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিভাসিত বদন কমলের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য দেখিয়া, সর্ব্বোপরি তার বিনয়-নম্র ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন, কাহারও বড় একটা বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। তর্কালঙ্কার মহাশয় আনন্দে দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—"বেঁচে থাক বাবা!" তখন তিনি সত্য সত্যই প্রায়শ্চিত্তের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

এইবার রাধাকান্ত বাবু সুযোগ বুঝিয়া প্রায়শ্চিত্তের কথাটা পাড়িয়া বসিলেন। শচীন্দ্রনাথ ধীর গম্ভীর স্বরে কহিল—'আমার ত মনে হয় না বাবা, প্রায়শ্চিত্তের কোন প্রয়োজন আছে; অন্যায়কে মেনে নিয়ে আমি কোন কাজ করতে রাজী নই। যদি এজন্য সমাজ আমাদের পরিত্যাগ করে—করুক; আমরা ধনী, আমরা শিক্ষিত, আমরাই যদি সমাজের এই চোখ রাঙাণীতে হাল ছেড়ে দিই, তা'হলে দরিদ্রের উপর এর অত্যাচারের মাত্রাটা যে কত বড় হ'য়ে দাঁড়াবে! এই অত্যাচারকে আবহমান কাল থেকে আমরা নতশিরে, বিনা প্রতিবাদে মেনে এসিছি বলেইত আজ সমাজের এই হীনাবস্থা। আর বাবা! সমাজে থেকে—দেশে থেকেও ত আমরা সমাজের কোন বন্ধনকে মেনে চলিনি, সমাজের কোন অনুশাসনই কোন দিন মানিনি, খাওয়া দাওয়ার কোন্ বিচার আমরা মেনেছি? অথচ কই সমাজত কোনদিন চক্ষু গরম করে উঠেনি, বিলেত

থেকে ফিরে বাড়ী এসেছি, অম্‌নি সকলেই 'প্রায়শ্চিত্ত প্রায়শ্চিত্ত' করে অস্থির করে তুল্‌ছেন। যেখানে ধর্ম্মের ভাণ—শাস্ত্রের ভাণ ক'রে দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সমাজের ভীরু কাপুরুষেরদল গোপনে সব অন্যায় করেন অথচ সমাজকে ভয় করে লম্বা টিকি রেখে ধর্ম্মের ভণ্ডামি, হিন্দুয়ানীর চৌদ্দপুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন, সেই সমাজ ত্যাগ কর্‌লেইবা, আমরা সে সমাজকে চাই না।"

বিদ্যাভূষণ মহাশয় নস্য দিতে দিতে কহিলেন—"পিতৃপিতামহের চির প্রচলিত প্রথাটা কি হেলার জিনিষ বাবা?" "তাত নয়ই, তবে কি জানেন বিদ্যাভূষণ মশায়, যদি আপনারা উদারতা দেখাতে পার্‌তেন, বিলেত ফেরত শিক্ষিত ভদ্র-সম্প্রদায়কে আনন্দে কোল দিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আন্‌তেন—তা'হলে হিন্দুর হিন্দুত্ব ও মহত্বই প্রকাশ পেত, সমাজের এমন দুরবস্থা আর হ'ত না; কিন্তু সে দিন চলে গেছে এখন দু'টো সংস্কৃত বচনের জোরে কেউ শিরনত কর্‌তে রাজি হবে না, মনুষ্যত্বের কাছেই মানুষ আত্ম-বিক্রয় করে, দুর্ব্বলের চোখ রাঙানির কাছে নয়। আমি সমাজকে চাই না, আমাদের সমাজ, আমরাই গড়ে নিতে পারবো।"

বিদ্যাভূষণ মহাশয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, গ্রামের মাতব্বরের দল এ উহার মুখের দিকে চাহিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাদের যুক্তি, তর্ক, বীরদর্প কোথায় ভাসিয়া গেল!

রাধাকান্ত বাবু কহিলেন—"শচীনের যে মত, আমরাও সেই মত, আমি আমার ছেলের প্রায়শ্চিত্ত করাব না। সমাজকে যে ছাড়্‌বো, তাও মনে কর্‌বেন না। যে ভাবে বরাবর চলে এসেছি ঠিক্ সেই ভাবেই চল্‌বো। এখন আপনারা যা ভাল বোঝেন কর্‌বেন। আর আপনাদের ব্রাহ্মণ-সমাজ ত বিলেতফেরতেরা প্রায়শ্চিত্ত করলেও সমাজে গ্রহণ কর্‌বে না, তবে আর প্রায়শ্চিত্ত করে কি লাভ?"

বিদ্যাভূষণ প্রমুখ ব্রাহ্মণ-সমাজের চাঁইয়েরদল একথার উপর আর কোন কথা বলিলেন না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

কিছু দিন পরে ব্যারিষ্টার চৌধুরী সাহেবের রূপসী ও বিদুষী কন্যা—প্রীতিবালার সহিত শচীনের মহাধুমধামের সহিত কলিকাতা সহরে বিবাহ হইয়া গেল, তারাসুন্দরী পুত্রবধূকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়া মনের ব্যথা মিটাইলেন। রাধাকান্ত বাবু এ বিবাহ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য গ্রামে একটী দাতব্য

চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ সমাজের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই সে বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়া 'চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়' ভূরি ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে ফটোগ্রাফের ক্যামারায় আট্কা পড়িয়া গেলেন! ব্রাহ্মণ-সমাজের এইরূপে জয় হইল! বাঙ্গালার মাটী ছাড়িয়া শচীন্দ্র সপরিবারে পুরী সহরে যাইয়া ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়া দিল।

(১৬)

কমলার সহিত তাহার শ্বশুর বাড়ীর গোলযোগের কথাটা শচীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়াই শুনিয়াছিল, স্নেহময়ী মাতা কন্যার জীবনের সুখ শান্তির দিকে চাহিয়া আনুপূর্ব্বিক সকল বিবরণ পুত্রের নিকট কহিয়া উহার একটা প্রতীকারের উপায় চাহিয়াছিলেন। শচীন্দ্রও প্রথমতঃ কথাটা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল এবং বিজয়কে পত্র লিখিতে উদ্যোগী হইয়াছিল—কিন্তু সে যখন পিতার নিকট হইতে বিষয়টা আরও ভালরূপে জানিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করিল, তখন রাধাকান্ত বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"এহ'তে পারে না, শচীন।"

"কেন বাবা!"

"সে আমাকে যে ভাবে অপমান করেছে, সে শুধু আমার একার নয়, সমস্ত পরিবারের, সমস্ত বংশের—তোমাদেরও যে। এই দেখ বিজয়ের পত্র।"

শচীন্দ্রনাথ বিজয়ের পত্র পড়িয়া কহিল—"এতটা যে হয়েছে তত জান্তুম না; তা বেশ, কমলার জন্য ভাবনা কি? দেখা যাক্‌না এ ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। সে মাকে যাইয়া কহিল—'মা, বাবা যা'বুঝেছেন তাই ঠিক, এখন বিজয়ের তত্ব তালাস কর্‌তে গেলে নিজেদের খাটো কর্‌তে হয়, সে ত হতে পারে না, মা।"

তারাসুন্দরী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"বেশ!" কিন্তু এই একটী কথায় তাহার অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

শচীন্দ্রনাথের বাহিরের ব্যবহারে তাহাকে খাঁটি বাঙ্গালীর মত মনে হইলেও অন্তরে সে সাহেব হইয়াই দেশে ফিরিয়াছিল। শুধু যে কয়টা দিন দেশে ছিল, সে কয়েক দিন সাধারণ ভাবেই চলা ফেরা করিয়াছে, কিন্তু পুরাদস্তুর পাঁচ বৎসরের অস্থি মজ্জাগত সাহেবী চালচলনটা সে ভোলে নাই, পুরী আসিয়া সে

ঠিক সাহেবী ফ্যাসানে তাহার বাড়ীখানা সাজাইয়া গুছাইয়া লইল ; সমুদ্রের ধারেই তাহার বাড়ী—আদব কায়দায় ও সাজসজ্জায় উহা সাহেবের বাড়ী হইয়াই দাঁড়াইল। কলিকাতার জনবহুল "বার" ছাড়িয়া পুরী আসিয়া সে বেশ সোয়াস্তি বোধ করিল, তাহারত জীবিকার্জ্জনের জন্য উপার্জ্জন নয়, তাহার এই সখের ব্যবসা মাল বোঝাই নৌকার মত ধীর মন্থর গমনে চলিলেও কোন ক্ষতি নাই ; সে যে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া আসিয়াছে ইহাই যে পরিবারের পরম সৌভাগ্য।

সমুদ্র তীরে সুসজ্জিত বাড়ী। তরুণ যৌবন, অতুল ঐশ্বর্য্য, শিক্ষিতা প্রিয়তমা স্ত্রী—ইহা অপেক্ষা আর সংসারে শান্তি সুখের কি আছে ? জগতে অর্থের অভাব—বড় অভাব। প্রতিভা বল, বিদ্যা বল, খ্যাতি বল, সাধুতা বল, সৌহার্দ্দ্য বল, ঐ একটীর অভাবে তাহার কোনটীই ফুটিয়া উঠিতে পারে না। তুমি কাব্যালোচনায় নিযুক্ত, এমন সময় স্ত্রী আসিয়া বলিলেন,—'ওগো ! শুনছো, ঘরে চাল নাই !' তোমার কাব্যপ্রতিভা ফুটিবে কোথা হইতে ? কাজেই অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিও অর্থাভাবে স্বীয় প্রতিভা বিকাশের অবসর পায় না। একজন অর্থাভাবে হাহাকার করেন, আর একজন অর্থের অপব্যবহারের অবসর খুঁজিয়া পান না। এই বিচিত্র বিধান বলেই জগত পরিচালিত, মানুষ উহার নিগূঢ় তত্ত্ব কিরূপে বুঝিবে ? শচীন্ বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ তথাপি একটু নির্জ্জনতা প্রিয়, শান্তিপ্রিয় লোক—তাহার কাছে নব পরিণীতা প্রীতিবালাকে সুধাভাণ্ড করে সমুদ্রোত্থিতা লক্ষ্মীর মত মনে হইতেছিল। সে নবপ্রেমে মস্‌গুল থাকিয়া আইনের কূটতর্ক ও মক্কেলের বাক্যজালকে সবলে ছাড়াইয়া ফেলিতে চাহিলেও নবাগত ব্যারিষ্টার সাহেবের হাতে মোকদ্দমা দিতে পারিলে জয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনাজ্ঞানে শচীনের শত-অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার ব্যবসাটা বেশ জমিয়া আসিতেছিল। মালবোঝাই নৌকার পরিবর্ত্তে উহা প্রথম হইতেই যখন পালের জোরে দ্রুতগামী তরণীর মত ছুটিতে সুরু করিল, তখন আর কি করা যায় ? অর্থটাকেও উপেক্ষা করা ঠিক নহে, হাজার জমিদারি রহিলইবা। বিশেষ শিক্ষিতা প্রীতিবালা পিতার অজস্র অর্থ উপার্জ্জনের মোহে স্বামীকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে উভয়বিধ প্রেমের মোহেই তাহাকে দিব্য আকর্ষণ করিয়া চালাইতে সুরু করিল।

মাতার অনুরোধে শচীন্ বিজয় ও কমলার মনোমালিন্য দূর করিয়া মাতার প্রাণে যে শান্তি আনিবার চেষ্টার উদ্যোগী হইয়াছিল—পিতার কঠোর বাণীতে তাহা দূরে ভাসিয়া গেল! আর অত ভাবনা ভাবিবার অবসরও বা তাহার কই? বিলাত হইতে দেশে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই অল্পকয়েক দিনের মধ্যে একযোগে অনেকগুলি ঘটনা ঘটিয়া গেল—প্রায়শ্চিত্তের গোলযোগ, বিবাহ ও পুরীতে ব্যারিষ্টারীর হাঙ্গামা, কাজেই এত গোলযোগের মধ্যে সবদিক্ ভাবিবার অবসর কোথায়? তবু কর্ত্তব্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া সে যেটুকু অগ্রসর হইবার সংকল্প করিয়াছিল তাহাও আর হইল না। বিজয় ও কমলার প্রসঙ্গ উঠিবার আর কোনও সুযোগই ঘটিল না।

তারাসুন্দরীর দেহে যে কালব্যাধি দৃঢ়রূপে আসন গাড়িয়াছিল, উহা ক্রমশঃই তাহাকে মৃত্যুর দিকে টানিয়া আনিতেছিল, শেষটায় এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে ডাক্তাররা বলিয়া দিলেন যে সমুদ্রের হাওয়ায় যদি উপকার হয় ভালই, নচেৎ এমন কোন ঔষধ চিকিৎসা-শাস্ত্রে নাই যাহার ব্যবহারে এই দুরারোগ্য ব্যাধি দূর হইতে পারে।

রাধাকান্ত বাবু বাহিরে কঠোর প্রকৃতি ও একগুঁয়ে লোক হইলেও পত্নীকে যে ভাল না বাসিতেন তাহা নহে, তবে পাছে, তাহার গোঁ ছাড়িলে লোকে কাপুরুষ ও দুর্ব্বল চিত্ত বলে, এই অভিমান বা দম্ভের জন্যই অনেক সময় অন্তর স্নেহরসে সিক্ত হইলেও বাহিরে তাহার বিকাশ হইত না। কমলার কথা তিনি ভাবিতেন,—ভাবিতেন তাহার অভাবে কমলার কি হইবে কে জানে? সেজন্য বালিগঞ্জে তাহার জন্য বিরাট বাড়ী, প্রায় পঁচিশহাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি এবং নগদ পাঁচলক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া দিয়াছিলেন। অর্থ থাকিতে আর ভয় কি? এই অর্থের প্রলোভনে একদিন না একদিন সেই হতভাগা ছোঁড়া কমলের চরণপ্রান্তে লোটাইয়া পড়িবেই! সংসারে অর্থের চেয়ে যে আর কিছু বড় থাকিতে পারে এটা তিনি কোনরূপেই মানিতে চাহিতেন না। কর্ম্মজীবনে তোষামুদের দল, নায়েব মুচ্ছুদ্দী ও বিবেক-বিহীন মুহুরীর দল ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের আশ্চর্য্য দৃঢ়তা দেখিয়া তাহার এই বিশ্বাস হইয়াছিল, সংসারটা ঠিক্ এই শ্রেণীর লোকেই গড়া, কাজেই বিজয়ের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে তার খুব বড় একটা উচ্চ ধারণা ছিল না।

সংসারে আনন্দ বলিতে যাহা কিছু, তাহা যে কত ক্ষণস্থায়ী উহা নিজ নিজ জীবনের উপলব্ধি ব্যতীত বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। রাধাকান্ত বাবু যখন সর্ব্বভাবে জীবনকে মধুময় মনে করিয়া অতুল্য আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়েই তাহার জীবন-সঙ্গিনী পত্নীর জীবনের দিনগুলি অতি বড় সংক্ষিপ্ত, ডাক্তারেরা একথাটা বিনা সঙ্কোচে প্রচার করিয়া দিলে কঠিন চিত্ত রাধাকান্ত বাবুর প্রাণেও একটা বিষাদের হাহাকার ধ্বনি জাগিয়া উঠিল। তবে কি সত্য সত্যই তাহাকে হারাইতে হইবে নাকি? চিরজীবনের সঙ্গিনী, শান্ত স্থির ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি পত্নী, যে কোন দিন তাহার কোন বাক্যের প্রতিবাদ করে নাই, নীরবে সব সহ্য করিয়াছে, আজ সে কি সত্য সত্যই তাহার পরপারে যাইবার তরণীখানি ঘাটে আসিয়া লাগিল নাকি?

মৃত্যু কথাটা বড়ই ভীষণ। তুমি বিদ্বান হইতে পার, পণ্ডিত হইতে পার, বিচক্ষণ হইতে পার; কিন্তু মৃত্যুকে ভয় না করিয়া তোমার রক্ষা নাই; আর শোকগ্রস্ত কাহাকেও উপদেশ দিয়াও নিরস্ত করিবার সাধ্য নাই। সেখানে শাস্ত্রমূক—ভাষা স্তব্ধ।

দার্জ্জিলিংএর শৈত্য প্রদেশ ছাড়িয়া পুরীর সমুদ্রতীরে শচীনের বাড়ীতে তারাসুন্দরীর চিকিৎসা চলিল। কিন্তু ক্রমশঃই অন্তিম দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। তারপর এমন হইল, এই বুঝি শেষ মুহূর্ত্ত! পূর্ণিমার রাত্রি, চারিদিক জ্যোৎস্নায় হাসিতেছে, সাগরের নীলজলে জ্যোৎস্নার অপূর্ব্ব লাস্য-লীলা। আজ রোগিণীর জীবনের আশা আর নাই। স্বামীকে পার্শ্বে ইঙ্গিত করিয়া বসাইয়া কহিলেন—"দেখ, আমি তোমাদের সকলকে কাছে রেখে যাচ্ছি, এর চেয়ে আর স্ত্রীলোকের সুখ কি বল, তবে এক কথা—বিজয় ও কমলাকে সুখী দেখে যেতে পারলেই আমি সুখে মরতে পারতেম, কিন্তু বিধাতা মানুষকে সব সুখ দেন না! তুমি আমার স্বামী, দেবতা, আমার মাথায় পায়ের ধুলো দাও। কিন্তু একটা কথা—স্ত্রীলোকের স্বামীর চেয়ে আর বড় গুরু নেই সে শিক্ষাটা কমলকে দিও। মা কমল! মরণকালে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি তোর যেন মতি ফেরে। উঃ! বৌমা! কমলকে বুঝিও, তুমি মা বুদ্ধিমতী, লক্ষ্মী, সবত বোঝ না!" আর কোন কথা বলার অবসর হইল না। কমলের শুভ কামনা করিতে করিতেই তারাসুন্দরী চক্ষু বুজিলেন। সকলে উচ্চৈঃস্বরে

কাঁদিয়া উঠিল! রাধাকান্ত বাবু স্তম্ভিতের মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া পত্নীর শব দেহের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন—"গিন্নি! সত্য সত্যই তুমি চলে গেলে? উঃ!" (ক্রমশঃ)

অদৃষ্টের বিড়ম্বনা।

(গল্প)

সে দিন ১০ টার কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই আফিসে আসিয়াছিলাম। আমার টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাগজপত্র গুছাইতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম—বছরটা শেষ হইয়া আসিল, অথচ একটি দিনও "ক্যাজুয়েল লিভ" নেওয়া হয় নাই।

ঘণ্টা বাজিবার হয়ত আর ২।১ মিনিট বাকী আছে, এমন সময় পিয়ন একখানা টেলিগ্রাম লইয়া উপস্থিত হইল, দেখিয়াই প্রাণটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল—না জানি কি সর্ব্বনাশের জন্যই আজ হঠাৎ বিদায়ের আপ্‌শোষটা মনে স্থান পাইয়াছে।

পড়িয়া দেখি ঠিক তাই। মন্দ অভিলাষেরও শক্তি আছে। লেখা ছিল—"মার কলেরা হইয়াছে, শীঘ্র এস, সরলা।" বলা বাহুল্য—সরলা আমার স্ত্রীর নাম।

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। অন্যান্য বাবুরা আসিয়া আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, 'হাঁ' 'না' করিয়া আমি তাহাদের দুই একটি প্রশ্নের উত্তরও দিলাম। পরে বলিলাম, "বাড়ীর গাড়ী ৫টার ছাড়ে—কাজেই এখনি আমার যাবার দরকার নাই। ৪টায় গেলেই চলবে।" তাহারা সকলেই অধঃস্তন কর্ম্মচারী—বিশেষ দ্বিরুক্তি না করিয়া একে একে যার যার কাজে চলিয়া গেল।

ধীর ও গম্ভীর ভাবে আমি আফিসের কাজগুলি করিয়া যাইতে লাগিলাম। মনে রহিল, "অন্তর্য্যামী ভগবান ঐ মন্দ আপ্‌শোষটার জন্যই এই শাস্তি দিলেন। সহ্য কর্‌তেই হবে। কিন্তু মা বেঁচে উঠেন, তা হলেই ধন্য মান্‌ব।"

৪—৩০ টার সময় বাসায় আসিয়া গরম জামা কাপড় লইলাম, পথে এক সের বেদানা কিনিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের দিকে গেলাম। গাড়ী ছাড়িবার তখন বেশী বিলম্ব ছিলনা।

হু হু শব্দে গাড়ী ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হইয়া যাইতে লাগিল। কত লোক উঠিল, কত নামিল—আমার যেন মোটেই হুস্ ছিল না। এক কোনে বসিয়া আমি শুধু মা'র রোগক্লিষ্ট অবস্থার কথা মনে করিয়া কষ্ট বোধ করিতেছিলাম। আরও কত কি অপ্রত্যাশিত অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া আকুল হইয়া উঠিতেছিলাম। গ্রামে ভাল ডাক্তার নাই; বাড়ীতেও বেশী লোক নাই, শুধু স্ত্রী, একটা চাকর ও দেওয়ান মহাশয়। পাশের বাড়ীর সঙ্গে ছিল আমাদের বিষম শত্রুতা, কাজেই তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য আশা করা বৃথা। এখন ভগবান যা' করেন।

রাত্রি তখন প্রায় ৮টা। পৌষের প্রথম, খুব শীত বোধ হইতেছিল। আমাদের ষ্টেশনে পৌছিতে আর হয়ত মিনিট পনর গৌণ আছে। এমন সময় হঠাৎ ট্রেন্‌টা থামিয়া পড়িল। জানালার খুলিয়া বাহিরে তাকাইলাম—কেবল-ই অন্ধকার। ৭।৮ মিনিট চলিয়া গেল, ২।৩ বার বাঁশী বাজিল—তবু গাড়ী চলিল না। উদ্বিগ্ন হইয়া কয়েক জন বাহির হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম—দূরে Signal Postএ নীল আলোর পরিবর্ত্তে একটা লাল আলো জ্বলিতেছে।

গার্ডের নিকট গেলাম। গার্ড কহিলেন, 'সামনে লাইন খারাপ আছে, কুলি কাজ করিতেছে। আশা করা যায় ২।১ ঘণ্টায় লাইন মেরামত হইবে। সে পর্য্যন্ত গাড়ী এখানেই থাকিবে। ষ্টেশন হইতে আমরা আর মাইল তিনেক দূরে আছি মাত্র।'

অন্তরে যে কি যন্ত্রণা বোধ করিলাম, তাহা বলিবার নয়। মনকে প্রবোধ দিলাম,—এই দুর্ঘটনাটিও ভগবান প্রেরিত শাস্তি বিশেষ। তবুও মনটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। শেষে খেয়াল চাপিল—এখান হইতে হাটিয়া গেলেই ত বেশ হয়। বিশেষতঃ এখান হইতে আমাদের গ্রাম ষ্টেশনের চেয়ে অনেক নিকটে, কেননা লাইনটা গ্রামের পশ্চিম দিক্‌টা সমুদায় ঘুড়িয়া দক্ষিণদিকে ষ্টেশনে মিশিয়াছে। গার্ডকে টিকেটখানি দিয়া আমি তখনই রওনা হইলাম।

নানাপ্রকার অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে করিতে শীতে ও অন্ধকারে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া যখন বাড়ী পৌছিলাম তখন রাত্রি প্রায় ১০ টা। কিন্তু সব যে নিস্তব্ধ, কোথাও সাড়া শব্দটি নাই, সব যেন অচেতন! শুধু কৃষ্ণা একাদশীর অর্দ্ধেক চাঁদ পূর্ব্ব কুয়াসার হিম আবরণ ভেদ করিয়া আপন পাণ্ডুর বদন প্রকাশ করিতেছিল।

ভাবিলাম মা বোধ হয় সুস্থ আছেন। তবুও প্রাণটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সাহসে ভর করিয়া বারান্দায় উঠিয়া মাকে ডাক দিলাম ও দরজায় একটু ঘা দিলাম। মা সাড়া দিলেন। তারপর আলো জ্বালাইয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। আমি অবনতমস্তকে, আমার সুস্থদেহা মাতার পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তাঁর বৌটিও তখন ঘোম্‌টা টানিয়া খাটের পাশে দণ্ডায়মান ছিল। মনে বিষম একটা খট্‌কা বাঁধিয়া গেল। ভাবিলাম 'সরলা কোন বিশেষ প্রয়োজনের জন্য গোপনে টেলিগ্রাম করে নাই ত?" কিন্তু গোপনে এমন একটা সাংঘাতিক সংবাদ দ্বারা আমাকে বাড়ী আনার সাহস তার মত সরলা অবলার পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আস্‌তে এত গৌণ হল যে?"

—'গাড়ীটা লেট হয়ে গিয়েছে।'

—'এই তোদের বড়দিনের বন্ধ আরম্ভ হ'ল—না?'

—'না মা সে বন্ধের আরো কয়েক দিন বাকী আছে। আফিসের কাজে এদিকে এসেছিলাম। কালও ছুটি আছে, তাই ভাবলাম তোমাদের দেখে যাই, তোমার জন্য কয়েকটি বেদানা এনেছি," এইরূপে কয়েকটা নিরেট মিথ্যা কথাই বলিয়া ফেলিলাম।

আহারাদির পর শয়নকক্ষে সরলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'চিঠিপত্র লেখনা যে, ভুলে গেছ নাকি?"

সরলা একটু হাসিয়া কহিল, "আহা তাই বুঝি ব্যস্ত হয়ে দেখতে এলে?" আমি— 'দোষ কি? এদিকে আফিসের একটু কাজও ছিল, আর ছুটিও আছে, তাই ভাবলাম তোমাদের দেখে যাই।'

সরলা। 'হাঁ, তাই বল—কাজ ছিল। নচেৎ কল্‌কাতার বাবুদের কি আর দেশের কথা মনে থাকে?"

মনের খট্‌কাটা রহিয়াই গেল। সরলা ঘুমাইলে পর অনেক চিন্তা ভাবনা করিয়াও তাহার বিশেষ একটা কূল কিনারা করিতে পারিলাম না।

পরদিন প্রাতে বাহিরের পুকুর হইতে হাত মুখ ধুইয়া আসিতেছিলাম, পথে পাশের বাড়ীর আমার খুল্লতাত, অথচ চিরশত্রু, শ্রীযুক্ত হরিহর মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "সুরেন্ তোমার সঙ্গে কয়েকটি কথা আছে, এখানে একটু বস্‌বে?"

যাঁহার সঙ্গে প্রায় ১০।১২ বৎসরের মধ্যে কোন কথাই বলি নাই, তাঁহারই এ সস্নেহ সম্ভাষণে, তদুপরি তাঁহার কাতর কণ্ঠস্বরে আমি যার পর নাই বিস্মিত হইয়া গেলাম। বিনীত ভাবে তাঁহাকে বলিলাম, "আচ্ছা, ঘর থেকে জামাটা নিয়ে আস্‌ছি।"

তিনি ওখানেই রহিলেন। আমি ঘরে আসিয়া শুনিলাম গত রাত্রে হরিহর কাকার বড় ছেলে গোপালের কলেরা হইয়াছে। অবস্থা নিতান্ত খারাপ। খুড়া মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎকারের কথা কাহাকেও না বলিয়া তাড়াতাড়ি জামাটা পরিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

তিনি তখনও সেই ভাবেই সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। আমার হাত ধরিয়া বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গেলেন। উভয়েই একটা চৌকির উপর বসিলাম। দেখিলাম তাঁহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর, কাতর ও বিষণ্ন। কিন্তু তিনি বেশ স্পষ্টভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন:—

"দেখ, আজ আমার অদৃষ্টে কি আছে জানি না। বোধ হয় শুনেছ যে গোপালের কলেরা হয়েছে; আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে বাঁচবে না। কিন্তু তার চলে যাবার পূর্ব্বেই আমি তোমার নিকট কয়েকটী কথা বলতে চাই। আশা করি, তুমি তা শুন্‌বে, শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন বাধা দিবে না।"

আমি তাঁহার এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে এতটা বিস্মিত হইয়াছিলাম যে কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না। তিনি বলিতে লাগিলেন:—"তোমার মা তোমাকে বলে থাক্‌বেন যে আমি কোন সময় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—তোমার পিতার অত্যন্ত অনুগত ছিলাম। তোমাকে এখন বল্‌ছি যে সেটা ছিল আমার কপটতা। বাহিরে বাহিরে ছিলেন তিনি আমার প্রিয়, কিন্তু অন্তরে ভাবতাম তিনি কতদিনে মরবেন। ওঁর মরবার অব্যবহিত পরেই আমি আমার নিজমূর্ত্তি ধারণ করলাম। জাল উইল, জাল মোকদ্দমা প্রভৃতির কথা সব শুনে থাক্‌বে—সে সব আমার কৃত। আদালতে তার অনেকটা ফুস্ হয়ে যায়। তারপর যে

ভাবে আমি দাঙ্গাহাঙ্গামা ফৌজদারী আরম্ভ করি তাহা এতদ্দেশে কখনও হয় নাই; কিন্তু তোমার দেওয়ান ঠাকুরটির বিচক্ষণ বুদ্ধিবলে তাহাতেও কিছু ফল হয় না। তারপর—দেওয়ান আর তোমার মার নামে একটা কলঙ্ক রটিয়ে দিই; কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে ও তাহাদের চরিত্রগুণে কেউ তাহা বিশ্বাস করে নাই। তখন তুমি এদের কলকাতা নিয়ে যাও।

"কিন্তু যার তুলনায় এ সব তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ, এখন সেই পাপ অভিসন্ধির কথা বলি। আমি এখন ভাবলাম তোমাকে, আমার ভ্রাতার এই একমাত্র উপযুক্ত সন্তান, তোমাকে সরাতে পারলে অনেকটা সুবিধা হবে। তাই তোমার স্ত্রীর নামে তোমার কাছে একটা টেলিগ্রাম করে দিই। তাহা কাল পেয়ে থাক্‌বে। এদিকে ষ্টেশনের পথে জঙ্গলার আড়ালে দুইজন সরদার রেখে দিয়েছিলাম। যদি তুমি ঠিক সময় আস্‌তে তবে তারা তোমায় এমনি ভাবে খুন করত যে মাছিটিও তা টের পেত না।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তিনি আমার গায়ে হাত বুলাইয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন :—

"চমকিওনা, ভগবান তোমার সহায়, তাই অমন ভাবে ট্রেন লেট হয়ে গেছে। আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও। আর এদিকে পাপের শাস্তি দেখ। সরদারদের বিদায় করে এসেই দেখি গোপালের কলেরা হয়েছে। আমার অমনি ধারণা হল—এ ছেলে বাঁচবে না। ভগবান পাপের শাস্তি দেবেন। তখন আমি কি করলাম্—শুনবে? ঘরে যেয়ে দরজা বন্ধ করে ভাবতে লাগলাম। কি ভাবলাম বল্‌তে পারি না। তবে শেষে স্থির করলাম, তোমার কাছে সব স্বীকার করব। তখনি বাহির হয়ে এসে দেখি তুমি খেয়ে হাত মুখ ধুচ্ছ। তখন ফিরে গেলাম—ভোরে বলব বলে। এতে একটু আশ্বস্ত বোধ করলাম, এই উঠে এসেছি—উঃ!

তাঁহার চক্ষু বাহিয়া জল পড়িতেছিল। তাহা মুছিয়া বলিলেন, "ছেলেটা তোমার প্রতি খুব অনুরক্ত ছিল। অন্তিমকালে তাকে একবার কি দেখবে না?"

দ্বিধা না করিয়া আমি বলিলাম, 'হাঁ চলুন।' পৌষের সেই পরিষ্কার প্রভাতটি বোধ হয় আমার চিরকাল মনে থাকিবে। এই খুড়া মহাশয়ের যে এমন একটা পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। সবই ভগবানের

ইচ্ছা বলিতে হইবে, নচেৎ আমার চক্ষে পৃথিবী যে লুপ্ত হইয়া যাইত। এক্ষণে এই হতভাগ্য অবোধ বালকের অদৃষ্টে কি আছে কে বলিবে?

গোপালকে দেখিলাম—অবস্থা নিতান্ত খারাপ। ডাক্তার সেখানেই ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বাহিরে আসিলাম; তিনি বলিলেন—'আর আধ ঘণ্টা টেঁকে কিনা সন্দেহ।'

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তবে কি পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই ইহার জন্ম হইয়াছিল?

পনর মিনিট যাইতে না যাইতেই গৃহমধ্যে কান্নার রোল উঠিল। দৌড়িয়া যাইয়া দেখি, সত্যই পুত্রের আত্মা পাপপিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছে। মূর্চ্ছিত পিতা ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছেন; শোকাতুরা মাতা মৃত পুত্রের দেহের উপর পড়িয়া হাহাকার করিতেছেন।

* * * *

দৈব এখানেই শেষ হয় নাই। দুই দিন পর কলিকাতায় আফিসে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। সাহেব বলিলেন, "হেড কেরাণী কাজ ত্যাগ করিয়াছে; আপনি ঐ পদ গ্রহণ করিলে আমি খুব খুসি হইব। মাইনেও ২৫৲ টাকা বেশী হবে।" কিন্তু যে যন্ত্রণার ভয়ে স্বীয় জমিদারীর ভার বেতনভোগী কর্ম্মচারীর উপর অর্পণ করিয়া, নিজকে পরের বেতনভোগী করিতে পছন্দ করিয়াছিলাম, দৈবের ইচ্ছায় তাহা দূর হইয়াছে। চাকুরী ছাড়িয়া দেশে যাইয়া বাস করিবার জন্য সকলেই বিশেষ ভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই মাহিয়ানা বৃদ্ধিতেও প্রলুব্ধ না হইয়া আমি বলিলাম:—

"দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আমি কাজ ত্যাগ করিবার জন্যই আসিয়াছি।"

সাহেব একটু রাগিয়া গেলেন। সব কথা বুঝাইয়া বলায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন—এবং ভদ্রতার সহিত আমার প্রাপ্য চুকাইয়া দিলেন।

মিত্রদের দীর্ঘকালব্যাপী শত্রুতা সেই অবোধ বালকের চিতায় বিসর্জন দিয়া আমরা এক্ষণে নির্ব্বিবাদেই বাস করিতেছি।

* * * *

শ্রীহেরম্বনাথ বিশ্বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্র।

ড্যানটীস মারকেডিসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহির্গত হইলে ড্যাংগ্লার্স ও ক্যাডারাউস তাঁহার পশ্চাৎ চলিতে লাগিল এবং মারকেডিসের বাটীর নিকটস্থ এক উদ্যানে বসিয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিল। ড্যানটীস্ কাপ্তান হইবে এই চিন্তা ড্যাংগ্লার্সকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল। কিরূপে ড্যানটীসের অনিষ্টসাধন করিয়া তাঁহার উন্নতির পথ রোধ করিবে উভয়ে এই পরামর্শ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাহারা দেখিল ফারণাণ্ড তাহাদিগের সম্মুখ দিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটিয়া যাইতেছে। ক্যাডারাউস তাহাকে নিবৃত্ত করিল এবং হাত ধরিয়া কহিল, "ওহে ব্যাপার কি? পাগল হলে নাকি? অমন করে দৌড়াচ্ছ কেন? তোমার বাড়ীর পাশে আমরা বসে আছি আমাদের সঙ্গে কি দুটো কথা কইতেও নেই?" ফারণাণ্ডের মস্তিষ্ক তখন বাস্তবিকই প্রকৃতিস্থ ছিল না—সে ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল। ড্যাংগ্লার্স কহিল, "এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, এর কিছু অষুধ দরকার" এই বলিয়া ফারণাণ্ডকে ধরিয়া খুব খানিকটা ঝাঁকড়াইয়া দিল। ইহাতে তাহার চৈতন্য হইল। মুখের ঘাম কাপড়ে মুছিয়া সে কহিল, "তোমরা কি আমায় ডাক্‌ছিলে?" ক্যাডারাউস কহিল, "এতক্ষণে তোমার বুঝি হুঁস হ'ল। তুমি যেমন করে দৌড়াচ্ছিলে আমি ভাবলাম তুমি বুঝি প্রেমে নিরাশ হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছ। ভাগ্‌গিস্ আমরা তোমায় ধরেছিলাম।" ড্যাংগ্লার্স কহিল, "ফারণাণ্ডের প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে, এমন সাহস কে রাখে? তার ঘাড়ে কটা মাথা? ক্যাডারাউস তুমি ঠাট্টা রাখ।" ফারণাণ্ডের মুখে এতক্ষণে কথা ফুটিল। সে কহিল, "মারকেডিস্ যাকে খুসী ভাল বাস্‌তে পারে এতে আমার বাধা দিবার অধিকার কি?" ক্যাডারাউস্ কহিল, "তুমি যদি ভাই তা ভাব তবে অবিশ্যি ভিন্ন কথা। আমি মনে করেছিলাম তোমার পিতা পিতামহদের রক্ত বুঝি এখনও তোমার শিরায় বহিতেছে। এখন দেখছি

অনেক দিন আমাদের দেশে থেকে তোমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।” ফারণাণ্ড নৈরাশ্যের স্বরে কহিল “তোমরা আমায় কি কর্‌তে বল?” ড্যাংগ্লার্স এতক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া কহিল, “কচি খোকা আর কি! আরে আহাম্মক—একখানি ছোরা—বাস্‌ ডানটীসের দফা নিকেশ!” ফারণাণ্ড কহিল, “তাতে আমার লাভ কি? মারকেডিস বল্লে ড্যানটীস যদি মরে তা’হলে সঙ্গে সঙ্গে সেও প্রাণ দেবে।” বস্তুতঃ পক্ষে এ হত্যাচিন্তা ফারণাণ্ডের মনে বহুবার উদিত হইলেও হত্যা করিয়াও যদি মারকেডিসকে না পায় এই আশঙ্কায় এতদিন এই নৃশংস ব্যাপারে সে বিরত রহিয়াছে। ইতিমধ্যে ক্যাডারাউস্‌ মদ্যপানে প্রায় জ্ঞানশক্তি বিবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় দেখা গেল ড্যানটীস্‌ ও মারকেডিস্‌ পরস্পরের হাত ধরিয়া ঐদিকে আসিতেছেন। ফারণাণ্ড মনে করিল সেই মুহূর্ত্তেই ড্যানটীসের বক্ষে আমূল ছুরিকা প্রোথিত করিয়া দেয়। কিন্তু মারকেডিসের ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা ভাবিয়া তাহার হস্তস্থিত ছুরিকা ভূতলে পড়িয়া গেল। ড্যাংগ্লার্স মনে ভাবিল “এদের কাউকে দিয়ে কাজ হবে না। একটা নিতান্ত ভীরু আর একটা মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।” মারকেডিস নিজের প্রাণই দিক্‌ কি যাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক তাতে ড্যাংগ্লার্সের ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আপাততঃ ড্যানটীস্‌ ফেরাওন জাহাজের কাপ্তান না হইলেই তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। কিন্তু ফারণাণ্ডকে নির্ব্বিকার দেখিয়া সে হতাশ্বাস হইয়া ভাবিতে লাগিল, “ড্যানটীসের এখন জোর কপাল! সে এই সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করিবে এবং জাহাজের কাপ্তান হইয়া আমার প্রতি বিদ্রূপকটাক্ষ করিবে—ইহা নিতান্তই অসহ্য।” ড্যানটীস ইতিমধ্যে মারকেডিসের সমভিব্যাহারে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন। ড্যাংগ্লার্স আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, “শুনছিলাম শীগ্‌গীরই তোমাদের বিয়ে, সে শুভদিন কবে?” ড্যানটীস্‌ উত্তর করিলেন, “হাঁ ভাই বেরিয়ে পড়লে আবার কতদিনে ফিরি তার তো কিছু ঠিক নেই। বাবারও একলাটী বড় কষ্ট পেতে হয়। মনে করেছি কালই কাজটা সেরে ফেল্‌ব। তোমাদের ভাই নেমন্তন্ন রইল।” ক্যাডারাউস কহিল, “আমাদের তো নেমন্তন্ন কল্লে, ফারণাণ্ডের কি অপরাধ?” ড্যানটীস কহিল “মারকেডিসের ভাই আমারও ভাই। এ কাজে তিনিই কর্ত্তাপক্ষ, তাঁকে আবার নেমন্তন্ন কি?” ফারণাণ্ড

উত্তর দিতে চাহিল কিন্তু তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। ড্যাংগ্লার্স কহিল, "কাপ্তেন অত তাড়াতাড়িতে পেরে উঠ্‌বে কেন? কাপড়টা আস্‌টা তৈরী কর্ত্তে হবে, গয়নাগাঁটীও তো দু' একখানা দেবে?" ড্যানটীস লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "ভাই আমাকে লজ্জা দিও না। আমি এ সম্বোধনের অধিকারী এখনও হইনি।" ড্যাংগ্লার্স কহিল, "না ভাই, তোমাকে ঠাট্টার উদ্দেশ্যে বলি নি'। তুমি কাপ্তেন হয়ে'ছ এটাতো সুখের কথা। আমি বলছিলাম কি এত তাড়াতাড়ি পেরে উঠ্‌বে না। এখনও ঢের সময় পড়ে আছে। জাহাজতো তিন মাসের এ দিকে কিছুতেই ছাড়া যাবে না?" ড্যানটীস কহিলেন "আমি গরীব মানুষ আমার আর যোগাড় যন্ত্র কি ভাই? তা ছাড়া বিশেষ কাজে দু'এক দিনের মধ্যেই আমাকে প্যারিসে যেতে হবে, সেখান থেকে কবে ফিরি তার ঠিক কি? সেই জন্যই।" ড্যাংগ্লার্স আশ্চর্য্যের ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "প্যারিসে আবার তোমার কি দরকারটা পড়লো? এই ফাঁকে সহরটা দেখে নেবে বুঝি। তুমি বুঝি প্যারিসে কখনো যাও নি—না? ওঃ! চমৎকার জায়গা।" ড্যানটীস্ বলিলেন "আমি প্যারিসে কখনো যাইনি সত্য কিন্তু সহর দেখার জন্য আমার সেখানে যাবার আগ্রহ নেই। কাপ্তেন সাহেব মরবার সময় আমাকে একটী আদেশ দিয়ে যান। তাই দু'এক দিনের মধ্যে আমার না গেলেই নয়।" এই কথা শুনিয়া ড্যাংগ্লার্সের মনে চকিতের ন্যায় কি যেন একটা খেলিয়া গেল। সে ভাবিল ড্যানটীস্ নিশ্চয়ই নেপোলিয়ানের চিঠি লইয়া প্যারিসে যাইবে। "আমি কি বেকুব এই সহজ কথাটা এতক্ষণ আমার খেয়াল হয় নি! ড্যানটীস্! তোমার সুখস্বপ্ন আমি চিরকালের মত ভেঙ্গে দিচ্ছি, তুমিই আমার উন্নতির পথে একমাত্র বিঘ্ন।" পরে প্রকাশ্যে কহিল "ড্যানটীস্ তোমাকে আর খামখা এখানে আট্‌কিয়ে রাখ্‌ব না। তুমি যেয়ে শুভকাজের বন্দোবস্ত কর।" ড্যানটীস্ ও মারকেডিস্, সকলকে অভিবাদন করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে ড্যাংগ্লার্স ফারণাণ্ডকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ফারণাণ্ড! বিয়ে তো হতে চল্লো এখন তুমি কি করবে ভেবেছ?" ফারণাণ্ড কহিল, "আমাকে তোমরা কি কর্‌তে বল?" ড্যাংগ্লার্স কহিল, "কথায় বলে—যার মাথা তার ব্যথা নেই পাড়াপড়সীর মাথা ব্যথা—আমারও হয়েছে

তাই। তুমি পড়লে পীরিতে আর আমরা তোমায় ফন্দী ঠাউরে দেব? ভারি আবদার তো? আর, যা বল্লাম তা তুমি শোন কই?" ফারণাণ্ড কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "আমি উপায় স্থির করে ফেলেছি। মনে করোনা ড্যানটীসের বুকে ছুরী বসিয়ে দিতে আমার বিন্দুমাত্র ভয়, কিন্তু তাতে আমার লাভ কি? তাতেও তো আমি মারকেডিসকে পাব না? এ দিকে মারকেডিস ড্যানটীস্‌কে বিয়ে কর্‌বে তাও আমি প্রাণ থাক্‌তে দেখ্‌তে প্যরব না। তার চেয়ে আমি আত্মঘাতী হয়ে মরব তা হলেই সব ঘুচে যাবে।" ড্যাংগ্লার্স কহিল "এ আর কোন বুঝের কথাটা হলো? চোরের উপর রাগ করে মাটীতে ভাত খাওয়া—তোমারও যে দেখ্‌ছি তাই। আমি তোমায় এক বুদ্ধি দিতে পারি। ড্যানটীস্‌কেও খুন কর্‌তে হবে না—আর তোমারও আত্মঘাতী হতে হবে না—কিন্তু বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে।" ক্যাডারাউস মদ্যপানে বিহ্বল হইয়াছিল। কথা বলিবার বড় একটা ক্ষমতা ছিল না। সে জড়িতস্বরে হঠাৎ কহিয়া উঠিল, "কে ড্যানটীসের খুনের কথা বলে? ড্যানটীস্ আমার দোস্ত।" ড্যাংগ্লার্স আর এক গেলাস মদ ঢালিয়া ক্যাডারাউসকে খাওয়াইয়া দিল। ফারণাণ্ড উত্তেজিত হইয়া কহিল, "কেমন করে বিয়ে বন্ধ হয় শীগ্‌গির বল। তুমি যেমন বল্‌বে আমি তাই কর্‌ব।" ড্যাংগ্লার্স কহিল "যদি রকম সকম করে শ্রীমানকে শ্রীঘরে পাঠান যায় তা'হলে আপাততঃ তাদের বিয়ে বন্ধ হতে পারে।" ক্যাডারাউস কহিয়া উঠিল "কে ড্যানটীস্‌কে ফাটকে দিতে চায়? সে ঘরে সিঁদও দেয়নি' কি কাকে খুনও করে নি'।" ড্যাংগ্লার্স কহিল, "মাতাল চুপ্ কর।" ক্যাডারাউস গর্জ্জন করিয়া কহিল "কেন? চুপ করব কেন? ড্যানটীস্ কেন ফাটকে যাবে? তাকে আমি বড্ড ভালবাসি!" এই বলিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া আর এক গেলাস মদ খাইয়া ফেলিল। ফারণাণ্ড জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা ভাই তাকে কি করে ফাটকে পাঠান যায়?" ড্যাংগ্লার্স কহিল, "তা চেষ্টা কল্লে পারা যায় বৈকি? কিন্তু এতে আমার গরজ কি? ডানটীস্ তো আমার কিছু করে নি?" ফারণাণ্ড কহিল "তোমার যে একেবারে গরজ নেই তাওতো বোধ হয় না। তুমি আর শুধু আমার উপকারের জন্যই এতটা ব্যগ্র হয়ে পড়নি।" ড্যাংগ্লার্স এই কথায় উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কহিল "যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর!

সংসারের নিয়মই এই! যদি তুমি ভাব এতে আমার একবিন্দু স্বার্থ আছে তা হলে আমি চল্লাম---আমার কি মাথা ব্যথা? দূর হক্‌গে!” ফারণাণ্ড বেগতিক দেখিয়া ড্যাংগ্লার্সের হাত ধরিয়া কহিল, “আচ্ছা তোমার স্বার্থ থাকুক আর নাই থাক আমার স্বার্থ ষোল আনা স্বীকার কল্লাম। ড্যানটীস্ আমার চক্ষুর শূল। ছোঁড়াকে জব্দ করা চাই-ই। আমায় একটা মতলব ঠিক করে দাও। যা'যা', দরকার আমিই সব কর্‌ব। কিন্তু এইটী দেখো ড্যানটীস্ প্রাণে না মরে। তা'হলে মারকেডিসও প্রাণ রাখিবে না।” এই কথা শুনিয়া ক্যাডারাউসের একটু হুঁস হইল। সে মাথা উঠাইয়া কহিল, “কি! ড্যানটীস্‌কে খুন করা—বল্লেই হলো আর কি! খোদার ঘর সিধে নয় বাবা! খবরদার! ড্যানটীস্ আমার দোস্ত। আজ সকালেই না সে আমায় এক মুঠো টাকা দিতে যাচ্ছিল। কেউ তাকে খুন কর্‌তে পার্‌বে না।” ড্যাংগ্লার্স ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, “আচ্ছা ফ্যাসাদেই পড়া গেছে মাতালটাকে নিয়ে। আরে বোকা! ড্যানটীস্‌কে আবার খুন কর্‌বে কে? তুমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছ নাকি। আর এক গেলাস মদ খেয়ে ফেল দেখি।” এই বলিয়া তাহাকে বড় এক গেলাস মদ খাওয়াইয়া দিল। মদ খাইয়া ক্যাডারাউস আড়ষ্ট হইয়া রহিল। ফারণাণ্ড তখন ড্যাংগ্লার্সকে কহিল, “কি করতে হবে বলেই ফেল না ছাই! এ মাতালটার খুব নেশা হয়েছে।” ড্যাংগ্লার্স কহিল, “ড্যানটীসের সম্বন্ধে এক গোপনীয় কথা আমি জানি। ফেরাওন জাহাজ যখন ফিরে আসে ড্যানটীস্ এল্‌বা দ্বীপে নেমে নেপোলিয়ানের সঙ্গে দেখা করে তাকে একখানি চিঠি দিয়ে এসেছে। নেপোলিয়ান তাকে আর একখানি চিঠি দিয়েছে, সেখানা নিয়ে সে প্যারিসে যাবে। প্যারিসে নেপোলিয়ানের দলের এক গুপ্ত সভা আছে না—বোধ হয় ও চিঠিখানা ঐ দলের কোন লোকের। চিঠিখানা ড্যানটীসের কাছেই আছে। এখন যদি ড্যানটীস্‌কে নেপোলিয়ানের দলের বলে নালিস করা যায়—তাহলে বাছাধন যে জেলে যাবেন তার আর ভুল নেই।”

ফারণাণ্ড অধৈর্য্য হইয়া কহিয়া উঠিল, “আমি এখনই ওর নামে নালিশ করব।” ড্যাংগ্লার্স কহিল, “দেখ, এত ব্যস্ত হলে চল্‌বে না—ডানটীস্ ফাটকে গেলেই যে চিরকাল আটক থাক্‌বে তার ঠিক কি? সে যখন খালাস হয়ে

ফিরে আস্‌বে—তখন তার শত্রুদের কারও নিস্তার থাক্‌বে না। তা ছাড়া মারকেডিস্ যখন জান্‌বে তুমিই উদ্যোগ করে তাকে জেলে পাঠিয়েছ—সে তোমায় বিয়ে করা দূরে থাক্; চিরদিনের মত তোমার শত্রু হয়ে থাক্‌বে, কাজেই এখন ভেবে চিন্তে কার্য্যোদ্ধার করা চাই—যাতে দুদিক বজায় থাকে—ড্যান্‌টীসের সর্ব্বনাশ হয়ে যায় অথচ আমাদের গায়ে আঁচড়টী না লাগে। যাও, তুমি ঝাঁ করে দোয়াত কলমটা নিয়ে এস দেখি—বাছাধন ঘুঘু দেখেছেন ফাঁদ দেখেন নি। যে ফন্দি আঁটা গেছে এ আর ফস্‌কায় না। যাও যাও, দোয়াত কলমটা নিয়ে এস।" আজ্ঞামাত্র ফারণাণ্ড দোয়াত কলম ও কাগজ হাজির করিল। ড্যাংগ্লার্স কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বাঁ হাতে কি লিখিয়া ফারণাণ্ডকে পড়িতে দিল। ফারণাণ্ড পড়িল:—

"রাজসিংহাসনের হিতার্থী কোন প্রজার নিবেদন। মরেল সাহেবের ফেরাওন জাহাজের সহকারী এড্‌মাণ্ড ড্যানটীস বাণিজ্য হইতে ফিরিবার পথে এল্‌বাদ্বীপে নামিয়া নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তাহাকে একখানি পত্র দিয়াছে। প্যারিস নগরের বিদ্রোহসভার কোন লোককে দিবার জন্য আর একখানি পত্র নেপোলিয়ান তাহাকে প্রদান করিয়াছে। উক্ত পত্র তাহার কাছে, তাহার নিজ বাটীতে অথবা ফেরাওন জাহাজে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে।"

ফারণাণ্ড উহা পাঠ করিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। সে বুঝিতে পারিল না ইহাতে ড্যানটীসের কারাবাসের কি সম্ভাবনা। ড্যাংগ্লার্স ফারণাণ্ডের ভাব দেখিয়া কহিল, "কিছুই মাথায় ঢোকে নি বুঝি? নেপোলিয়ানের দলের লোকদের খোঁজ পেলেই পুলিসে ধরে নিয়ে যায় তা বুঝি জান না? আর বাঁ হাতের লেখা—এ কি আর কেউ সনাক্ত কর্‌তে পারবে? ড্যানটীস্ যদি ফিরেও আসে তবু কে তার বিরুদ্ধে লাগিয়েছে তা আর টেরটী পাবে না। তা হলে আমরা নিশ্চিন্ত। তুমি শীগ্‌গীর চিঠিখানি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এসো তো।" এই বলিয়া পত্রখানি আঁটিয়া উপরে মারসেলিসের প্রধান বিচারকের নাম লিখিয়া ফারণাণ্ডের হাতে দিয়া কহিল, "এখন আপনিই কাজ হবে। আমাদের আর কিছু করবার নেই।" ক্যাডারাউস মদ্যপানে বিভোর হইলেও একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হয় নাই;

সে অসাধারণ শক্তিপ্রয়োগে তাহাদের কথা বার্ত্তা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। এবং এ অভিযোগের ভয়াবহ ফল কতকটা অনুমান করিতেও সমর্থ হইল। ক্যাডারাউস কহিয়া উঠিল, "আপনা আপনি কাজ হবে—বটে ?" এই বলিয়া পত্রখানি কাড়িয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইল। কিন্তু ডাংগ্লার্স তাহাকে নিবারণ করিয়া কহিল, "আমি কেবল ঠাট্টা কচ্ছিলাম। আমি কেন ড্যানটীসের অনিষ্ট কর্ত্তে যাব ?" এই বলিয়া পত্রখানি ফারণাণ্ডের হাত হইতে লইয়া কিছু দূরে ফেলিয়া দিল। ক্যাডারাউস কহিল, "হাঁ এই হলো মানুষের কাজ। আমার বন্ধুর কোন অনিষ্ট আমি সাম্‌নে থাক্‌তে হতে পার্‌বে না।" ড্যাংগ্লার্স কহিল, "তোমার দোস্তের কেউ কিচ্ছু করবে না—চল আর কেন ? আমরা এখন ভেসে পড়ি—এখানে বসে আর কি কর্‌ব।" এই বলিয়া ডাংগ্লার্স ক্যাডারাউসের হাত ধরিয়া বাটীর দিকে চলিল। ফারণাণ্ড কিছু পরেই পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া ডাকে দিয়া আসিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহ-সভা

পরদিন প্রাতঃকাল বড়ই মনোরম। নির্ম্মল আকাশ আয়নার মত স্বচ্ছ। সেই নির্ম্মল আকাশে বালসূর্য্য উদিত হইয়া সমুদ্রবক্ষে সহস্র কিরণমালা বিস্তার করিয়াছে এবং কিরণোদ্ভাসিত বীচিমালা হীরক খণ্ডের ন্যায় ঝলমল করিতেছে।

আজ ডানটীস ও মারকেডিসের বিবাহ। প্রথা অনুসারে বিবাহের পূর্ব্বে ভোজ হইয়া থাকে। একটী পান্থনিবাসে ভোজের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বেলা বারটার সময় ভোজ আরম্ভ হইবে। এগারটা বাজিতে না বাজিতেই হোটেলের ক্ষুদ্র কক্ষ ফেরাওনের নাবিকগণ ও মরেল সাহেবের কারখানার কর্ম্মচারী দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল। অনেকে কহিল স্বয়ং মরেল সাহেব এ বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু কথাটায় কাহারও বিশেষ আস্থা হইতেছিল না। এমন সময় ড্যাংগ্লার্স ও ক্যাডারাউস আসিয়া উপস্থিত হইল। ড্যাংগ্লার্স কহিল, মরেল সাহেব প্রকৃতই এ সভায় উপস্থিত হইবেন। তিনি পশ্চাতে

আসিতেছেন। কিছুক্ষণ পরেই মরেল সাহেব স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল—এবং ভাবিল ড্যানটাসের কাপ্তান হওয়ার কথাটা একেবারে অমূলক নহে।

তাহার পর ড্যানটীস, তাঁহার পিতা, মারকেডিস ও ফারণাণ্ড একত্র উপস্থিত হইলেন। মরেল সাহেব স্বয়ং উঠিয়া ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ফারণাণ্ড চিত্রপুত্তলিকাবৎ একস্থানে বসিয়া রহিল এবং ড্যাংগ্লার্সের দিকে বার বার চাহিতে লাগিল।

আহারাদি শেষ হইতে প্রায় দেড়টা বাজিয়া গেল। আর এক ঘণ্টা পরেই বিবাহ। ড্যাংগ্লার্সের চিন্তাস্রোত ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব্বে যদি ড্যানটীস ধরা না পড়ে তাহা হইলে ফারণাণ্ডও তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। এবং তাহার চক্রান্তের বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ফারণাণ্ডও ভারি অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। সে পাগলের মত গৃহের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আনন্দ কোলাহল তাহার হৃদয় হলাহলের ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ক্যাডারাউস ফারণাণ্ডের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে ফারণাণ্ডের সহিত একত্র দেখিয়া ড্যাংগ্লার্সও সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইল। তখন ক্যাডারাউস কহিল, "দেখ, দেখি ড্যানটীস্ কি চমৎকার লোক? কাল তোমরা যে পরামর্শ করেছিলে সে রকম কাজ সত্যি সত্যি কল্লে হয়েছিল আর কি! কি সর্ব্বনাশটা হয়ে যেত।" ড্যাংগ্লার্স কহিল "আমি তো তখান তোমায় বলেছি আমরা তামাসা কচ্ছিলাম। এ কি কেউ করে?" ইতিমধ্যে মরেল সাহেব সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, "এখন দুটো বাজ্‌ল। এখানে অপেক্ষা না করে এখন গির্জ্জায় যাওয়া উচিত।" এই কথায় সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ফারণাণ্ড জানালার নিকট দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল— সে হঠাৎ বিস্ফারিতনেত্রে গৃহের ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং নিকটস্থ একখানা আসনে বসিয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই গৃহের বাহিরে বহু মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল। দ্বারদেশে আঘাত করিয়া কে বজ্রনিনাদে কহিয়া উঠিল "দরজা খোল।" নিমন্ত্রিত সকলেই সেই শব্দে স্তম্ভিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। কাহারও মুখে একটী বাক্য নিঃসৃত হইল না। দ্বার উন্মুক্ত হইলে একজন পুলিস কর্ম্মচারী জন কয়েক সশস্ত্র সৈনিক সমভিব্যাহারে গৃহমধ্যে

প্রবিষ্ট হইল। উপস্থিত ব্যক্তি মণ্ডলী সকলেই নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া ভীত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিল। মরেল সাহেব হঠাৎ পুলিসের আবির্ভাবে বিস্মিত হইলেন। তিনি এই পুলিস কর্ম্মচারীকে চিনিতেন। তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মচারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এখানে আপনার কি আবশ্যক? বোধ হয় আপনার কোন ভুল হইয়া থাকিবে।" কর্ম্মচারী স্বাভাবিক উদ্ধত্যের সহিত কহিল "যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তা না হয় শুধরে নেওয়া যাবে। আপাততঃ আমি রাজাজ্ঞায় এক আসামীকে ধর্‌তে এসেছি।" এই বলিয়া মরেল সাহেবকে আর উত্তরের অবসর না দিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনাদের মধ্যে এড্‌মাণ্ড ড্যানটীস্‌ কার নাম?" সকলেই ভীতিবিহ্বলচিত্তে ড্যানটীসের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। ড্যানটীসের হৃদয়ও ইহাতে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু বাহ্যিক কোন বিকার তাঁহাতে লক্ষিত হইল না। তিনি প্রশান্ত বদনে অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "আমার নামই এড্‌মাণ্ড ড্যানটীস্‌। আমার সহিত আপনার কি আবশ্যক?" পুলিস কর্ম্মচারী কহিল, "তোমাকে আমি রাজাজ্ঞায় ধৃত করিলাম।" ড্যানটীস্‌ ঈষৎকম্পিত-স্বরে কহিলেন, "আমাকে ধরবেন? কেন মহাশয়?" পুলিস কর্ম্মচারী কহিল "তা আমি জানিনা। আদালতে গেলেই সব জান্তে পার্ব্বে।" এই বলিয়া পুলিস কর্ম্মচারী ড্যানটীসকে সিপাহীদের হাওলা করিয়া দিলেন। মরেল দেখিলেন এখন বাধা দেওয়া বাতুলতা মাত্র। সরকারী পোষাক পরা পুলিস—সামান্য কর্ম্মচারী হইলেও ক্ষমতায় স্বয়ং সম্রাটের সমকক্ষ। বৃদ্ধ পুত্রবাৎসল্যে অধীর হইয়া যোড়করে কর্ম্মচারীকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্রু-কাতর প্রার্থনা কিছুতেই কর্ম্মচারীর পাষাণহৃদয় বিগলিত হইল না। সিপাহীরা ড্যানটীস্‌কে ধরিয়া লইয়া চলিল। তিনি পশ্চাতে চাহিয়া একবার মাত্র উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "মারকেডিস্‌ বিদায়।" দ্বারদেশে একখানি গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। সৈনিকগণ তাঁহাকে সেই গাড়ীতে উঠাইয়া দিল এবং গাড়ীখানি মারসেলিস্‌ সহরের দিকে রওনা হইল। ড্যানটীস্‌কে এইপ্রকারে পুলিস কর্ম্মচারী ধৃত করিয়া লইয়া গেলে মরেল সাহেব সকলকে লক্ষ্য কহিলেন "তোমরা খানিকক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর। আমি সহরে যেয়ে এর কারণ জেনে আসি। সম্ভবতঃ ড্যানটীস জাহাজের কোন নিয়ম ব্যতিক্রম করে

থাক্‌বে। আমি নিজে গেলেই সব গোল চুকে যাবে আর তাকে খালাস করে নিয়ে আস্‌তে পারব।" সকলে সমস্বরে কহিয়া উঠিল, "তাহলে আপনি আর দেরী কর্‌বেন না। শীগ্‌গীর যান। আমরা এখানেই রইলুম।" বৃদ্ধ এবং মারকেডিস শোকে মূহ্যমান হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এবং উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলী নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ক্যাডারাউস ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ড্যাংগ্লার্সকে কহিল, "হাঁরে ড্যাংগ্লার্স! এর মানে কি?" ড্যাংগ্লার্স কহিল, "বাঃ! আমি কি জানি। তুমিও যেখানে আমিও সেইখানে। আমিতো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। কাণ্ড দেখে আমারও বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে।" ক্যাডারাউস গৃহের ইতঃস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ফারণাণ্ডকে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইল না। গত কল্যের সমস্ত ঘটনা ক্যাডারাউসের চক্ষের সমক্ষে বিদ্যুদালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "ড্যাংগ্লার্স তোদের ঠাট্টা তামাসার ফল কি অবশেষে এতদূর গড়াল? তোরা তো দেখ্‌ছি জানোয়ার বিশেষ।" ড্যাংগ্লার্স কহিল, "বাঃ! তা কেমন করে হবে? সে চিঠি তো তখুনি তোমার সামনেই ছিঁড়ে ফেল্লাম।" ক্যাডারাউস কহিল, "মিথ্যা কথা, ফারণাণ্ডটা গেল কোথায়?" ড্যাংগ্লার্স কহিল, "সে বোধ হয় তার নিজের কাজে কোথাও গিয়ে থাক্‌বে। ঐ সময় কথা কাটকাটি না করে এস এদের শান্ত করা যাক।" ইতিমধ্যে ফারণাণ্ড আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্যাডারাউস তাহাকে দেখিয়াই কহিল, "ড্যাংগ্লার্স নিশ্চয়ই ইহা ফারণাণ্ডের কাজ।" ড্যাংগ্লার্স কহিল "আমার তো তা' মনে হয় না। ফারণাণ্ড নেহাৎ বোকা। তবে যেই এ কাজ করুক না কেন সে তার প্রতিফল পাবে।" এই বলিতে বলিতে তাহারা বৃদ্ধের নিকট যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বৃদ্ধের শোকাবেগ কিছুতেই প্রশমিত হইল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শিয়ালদির চন্দ্রমাধব।

বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত শিয়ালদি গ্রামে গোস্বামীদের বাসভবনে চন্দ্রমাধব দেবের সুপ্রসিদ্ধ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। এতদঞ্চলের ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু নরনারী মাত্রের নিকট চন্দ্রমাধবের মাহাত্ম্য বিশেষ পরিচিত। চন্দ্রমাধব দেবের প্রাচীন ইতিহাস অতীতের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সুধু কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া আমি যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, "বিক্রমপুরের" পাঠকবর্গের নিকট তাহা অনাদৃত হইবে না এই বিশ্বাসে তাহা এখানে প্রকাশ করিলাম।

শিয়ালদির গোস্বামীদের পৈতৃক বাসভবন কোথায় ছিল তাহা জানা যায় না। প্রায় দেড়শতবর্ষ পূর্ব্বে শুক্লাম্বর গোস্বামী নামে ইঁহাদের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ শিয়ালদির পশ্চিমদিকে অবস্থিত ইছাপুরা গ্রামে বাস করিতেন। ইছাপুরা গ্রামের মধ্যভাগে "লোহারপুকুর" নামে একটী অতি বৃহৎ পুষ্করিণী অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। লোহার পুকুরের উত্তর পারেই শুক্লাম্বর গোস্বামীর ভদ্রাসন অবস্থিত ছিল। কথিত আছে যে, উক্ত শুক্লাম্বর গোস্বামীর প্রতি চন্দ্রমাধবের স্বপ্নাদেশ হয় যে, তিনি উক্ত পুষ্করিণী হইতে উত্থিত হইবেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রকৃতই চন্দ্রমাধব দেবের গুরুভার প্রস্তরমূর্ত্তি উক্ত পুষ্করিণীতে ভাসিয়া উঠে। বোধ হয় অতঃপর হইতেই পুকুরটী লোহার পুকুর নামে খ্যাত।

শুক্লাম্বর গোস্বামী মহাশয় সমারোহের সহিত চন্দ্রমাধব দেবের বিগ্রহ স্বীয় বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত করেন ও যথারীতি পূজার ব্যবস্থা করেন। গোস্বামী মহাশয়ের কোনও কৃতী শিষ্য তাঁহাকে শিয়ালদি গ্রামে বিস্তর ভূমিদান করেন। তখন তিনিও চন্দ্রমাধব দেবের সহিত শিয়ালদিতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার বংশধরগণ এখন শিয়ালদি গ্রামেই অবস্থান করিতেছেন।

ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে অনেক দেবদেবীর ভগ্নমূর্ত্তি দেখা যায়। ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যে বাসুদেবের বিগ্রহই সংখ্যায় অধিক। কিন্তু অধিকাংশ মূর্ত্তিই অঙ্গহীন দৃষ্ট হয়। সৌভাগ্যের বিষয় চন্দ্রমাধব দেবের মূর্ত্তি বিকলাঙ্গ নহে। ইছাপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে যে এক সময়ে মুসলমান প্রভাব অপ্রতিহত ছিল তাহার ঐতিহাসিক নিদর্শনের অভাব নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে দেওয়ান ঈশাখাঁর নাম হইতেই এই গ্রামের নাম ঈশাপুর হয়—পরে ঈশাপুরের

অপভ্রংশ "ইছাপুরে" পরিণত হইয়াছে। ইছাপুরায় এখন বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোকের বাসস্থান কিন্তু পূর্ব্বে এই গ্রাম মুসলমান অধিবাসিতে পরিপূর্ণ ছিল। ইছাপুরা বাজারের উত্তরদিকে যে খাল আছে উহা চলবলখাঁর বেড় নামে এখনও পরিচিত। কেহ কেহ বলেন উহা চলবলখাঁ নামক জনৈক পাঠান ভূস্বামীর বাসভবনের চতুঃপার্শ্বব্যাপী পরিখার অংশ মাত্র। উক্ত পরিখার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকের চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। সম্ভবতঃ বিক্রমপুরে যখন হিন্দু দেবদেবীর প্রতি উৎপীড়ণের মাত্রা চরমে উঠিয়াছিল তখন চন্দ্রমাধবের সেবায়েতগণ বিগ্রহকে ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ মুক্ত রাখিবার জন্য উহা পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হ'ন। পরে যখন এই স্থানে মুসলমান প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়, তখন চন্দ্রমাধবদেব প্রকট হইয়া শুক্লাম্বর গোস্বামীকে স্বপ্নাদেশ করেন। কেহ কেহ বলেন চলবলখাঁ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, নবাব সরকারে চাকরী করিয়া খাঁ উপাধি লাভ করেন। বলাবাহুল্য যে আমাদের এই সিদ্ধান্ত অনুমানপ্রসূত, অমূলক কিনা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের বিচার্য্য।

চন্দ্রমাধবের মূর্ত্তিখানি ভাস্কর্য্য শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। এমন সুঠাম সুন্দর মূর্ত্তি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। যে নিপুণ শিল্পী পাথর কাটিয়া এই অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তি গঠন করিয়াছে তাহার পরিচয় পাইবার কোনও পন্থা নাই। চন্দ্রমাধব দেবের মুখমণ্ডল প্রশান্ত, ভাবব্যঞ্জক ; নয়নযুগল আয়তোজ্জ্বল, ভ্রূযুগল সুবঙ্কিম নাসিকা উন্নত ও ললাট প্রশান্ত। বিকশিত শতদলের উপর মাধব দণ্ডায়মান। শতদল নিম্নে বাহন গরুড় বিরাজিত। দুই পার্শ্বে দুইজন নায়িকা বিরাজমান। "চালচিত্রে" ব্রহ্মা, নারদ প্রভৃতি দেব ও ঋষিগণের মূর্ত্তি খোদিত। মূর্ত্তিখানি দৈর্ঘ্যে ৩½ হস্ত ও প্রস্থে ২ হস্ত। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ইহা বাসুদেবের মূর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ করিলেও চন্দ্রমাধবের পূজা-প্রণালী বাসুদেবের পূজা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বর্ত্তমান সেবায়েত গোস্বামীগণ বলেন যে, পূজার ধ্যানও মাধব শুক্লাম্বর গোস্বামীকে স্বপ্নে জানান। ঊর্দ্ধে কীর্ত্তিমুখ, দক্ষিণদিকে অপ্সরযুগল। দক্ষিণোর্দ্ধ গদা, দক্ষিণাধঃ পদ্ম, বামোর্দ্ধ চক্র, বামাধঃ শঙ্খ। দক্ষিণদিকের নায়িকা চামরধারিণী, বামদিকের নায়িকাটি বীণা হস্তে দণ্ডায়মানা। পদতলে উপাসকমণ্ডলী উপবিষ্ট। হস্তে অঙ্গুরীয়ক, কণ্ঠে আভরণ, কর্ণের দুইদিকে ছিদ্র রহিয়াছে, গলদেশে বলিরেখা, দৃষ্টি নিম্নাভিমুখী, মস্তকে কারুকার্য্য

খচিত মুকুট। এই মূর্ত্তিটিকে বাসুদেব, ত্রিবিক্রম বা উপেন্দ্র নামে অভিহিত করা যায়, ইহাই পুরাণোক্ত বিধি। 'কালিকাপুরাণ', 'অগ্নি পুরাণ', পদ্মপুরাণ, ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে এই মূর্ত্তির ধ্যানের উল্লেখ আছে।

ধ্যানটি এইরূপ,—"পূর্ণচন্দ্রোপমঃ শুক্লঃ পক্ষিরাজোপরি স্থিতঃ।
চতুর্ভুজঃ পীতবস্ত্রস্ত্রিভিঃ সংবীতদেহভৃৎ।
দক্ষিণোর্দ্ধে গদাং ধত্তে তদধো বিকচাম্বুজম্।
বামোর্দ্ধে চক্রমত্যুগ্রং ধত্তেঽধঃ শঙ্খমেবচ।
শ্রীবৎসাঙ্কাঃ সততং কৌস্তুভংহৃদিচাদ্ভুতম্।
ধত্তেকক্ষেঽহ্যধো বামে তূনীরং বাণপূরিতম্।
দক্ষিণে কোষগং খড়গং নন্দকং সশরাসনম্।
শীর্ষে কিরীটং সদ্যোতঃ কর্ণয়োঃ কুণ্ডলদ্বয়ম্।
আজানুলম্বিনীং চিত্রাং স্বর্ণমালাং গলস্থিতাম্।
দধানং দক্ষিণে দেবীং শ্রিয়ং পার্শ্বেতুবিভ্রতম্।
সরস্বতীং বামপার্শ্বে চিন্তয়েদ বরদং হরিম্।"

এই মূর্ত্তিটির নাম চন্দ্রমাধব কেন হইল বুঝিলাম না। বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি মূর্ত্তির মধ্যে মাধব নাম আছে বটে, বোধ হয় মাধব নামের সহিত চন্দ্র যোগ করিয়া মূর্ত্তিটির বিশেষত্ব প্রকাশের জন্যই চন্দ্রমাধব নাম হইয়াছে।

চন্দ্রমাধবদেবের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। যখনই কোনও ভাবী বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তখনই মাধব মূর্ত্তির দেহ হইতে অবিরাম স্বেদঃ নির্গত হইতে থাকে। ইহার মধ্যে একটী ঘটনা আমাদের চাক্ষুষ। একবার এই গ্রামে কোনও ঘটনা ঘটে, তখন চন্দ্রমাধবের দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইতে থাকে। গ্রামবাসী বহু ভদ্রলোক আসিয়া চন্দ্রমাধবদেবকে সুস্নিগ্ধ জলে স্নান ও সুশীতল বায়ু বীজন করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে চন্দ্রমাধবদেবের ঘর্ম্মাক্তভাব নিবারণ হয়। গ্রামে কোনও ব্যধি পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইলে মাধবের নিকট মানত করিলে নিরাময় হয়। অভীষ্টসিদ্ধির জন্যও অনেকে মাধবের নিকট "হত্যা" দিয়া সুফল পান। হিন্দু পর্ব্ব উপলক্ষে বহু নরনারী চন্দ্রমাধবের বাড়ীতে সমাগত হন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

বসুন্ধরা।

হে পৃথিবী, হে প্রকৃতি, অয়ি বসুন্ধরে!
অনন্ত নীলাম্বু মাঝে প্রথম যে দিন
লভিলে জনম তুমি পুণ্য জ্যোতিময়,
সেই মহাদিন হ'তে তিল তিল করি
অমূল্য রতনরাজি ভাণ্ডারে তোমার
আমার তরে মা তুমি করেছ সঞ্চিত!
হে জননি, আমারি তরে ও বক্ষ তব
করিয়াছ সুধাপারাবার! কত শত
অসংখ্য পরশমণি রেখেছ ছড়ায়ে।
যখন নয়ন মোর নবীন আলোকে
নেহারিল রূপ তব, হে বিচিত্ররূপা!
মনে নাই কি ভাবিয়া উঠিনু কাঁদিয়া
বুঝি বড় ভয় ত্রাস জেগেছিল মনে
দয়া স্নেহ বিরহিত এই দেশে হায়!
অক্ষম দুর্ব্বল আমি কেমনে বাঁচিব?
অমনি তোমার প্রথম স্নেহের দান
মাতৃবুকে সুধাধারা পাইনু পুলকে।
তার পরে একে একে জ্ঞানের প্রসূন
হৃদয়কাননে যবে লাগিল ফুটিতে
কি দেখিনু কি শুনিনু হে বিশ্ব জননি!
পূর্ণ করি, ধন্য করি ইন্দ্রিয় আমার
রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে করিয়া সার্থক
এ বিশ্ব ভাণ্ডার মোরে দিয়েছ সঁপিয়া!
দাঁড়াও দাঁড়াও দেবি, লইয়া তোমার
সে মোহন বিশ্বরূপ অক্ষয় অসীম।

আমারে হেরিতে দাও, এ তুটি নয়ন
যতদিন পারে হেরিবারে। অয়ি, দেবি!
সংসারের ক্ষুদ্র যত স্বার্থ কোলাহল
ভুলাইয়া, দেও মোরে দেও ডুবাইয়া
স্নেহের সাগরে তব। যেন এ হৃদয়
প্রতিদিন রচি তব নবীন বন্দনা
করে আত্ম নিবেদন; মাতিয়া উল্লাসে
'জয় জয় জগদ্ধাত্রী' গায় অনিবার।

রেঙ্গুন, ব্রহ্মদেশ।　　শ্রীযোগেশচন্দ্র দেওয়ানজী।

শেষ পত্র।

(১)

ঘরের কোণে দীপাধারে মৃৎ প্রদীপ জ্বলিতেছিল, আর তাহার কাছে মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া গৃহিণী কন্যা প্রিয়তমাকে শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেছিলেন। কনিষ্ঠা অনুপমা জ্যেষ্ঠার বসনাঞ্চল লইয়া 'এক্স ষ্টুডেণ্টের' মত সে ব্যাখ্যা শুনিতেছিল। গৃহিণী বলিতেছিলেন "জলমিতি ভস্ম, স্থলমিতি ভস্ম, ব্যোমিতি ভস্ম—অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক পরিদৃশ্যমান এই যে জগৎ এ কিছুই নয়। এ আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না, বুদ্বুদবৎ মহাচৈতন্যসাগরে আবির্ভূত হয়েছে, আবার বুদ্বুদবৎ লীন হবে। এ হচ্ছে অপরা প্রকৃতির মায়িক লীলা, প্রপঞ্চের বিভ্রম মাত্র। এতে সৎ বস্তু কিছু নেই। ওঁতৎসৎ—তিনিই একমাত্র সৎ বস্তু, আর সব অসৎ—"

প্রিয়তমা অবিবাহিতা, কুমারী, সপ্তদশ উত্তীর্ণ হইয়া অষ্টাদশে পদার্পণ করিয়াছে; তন্বাদী, লাবণ্য-ললিতা গৌরীবালা; নম্র স্থির শান্ত বশম্বদ প্রকৃতি। অনুপমা তাহার দুই বৎসরের ছোট। মাতার কথায় প্রিয়তমা বলিয়া উঠিল, "সবই যদি বিভ্রম, তবে মানুষ মাত্রেই তাতে মুগ্ধ কেন?" "মানুষ হচ্ছে অজ্ঞানোপহত চৈতন্য—অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন চৈতন্যাংশ,' সে যে সব জায়গায়ই সমান।

যেমন লোহার দা'। কোনওটা ভোঁতা, কোনওটা ধারালো, আবার কোনওটা মর্‌চেপড়া—কিন্তু সবই সেই লোহায় গড়া; কোনওটায় কাজ হয়, কোনওটায় হয় না। ভগবানের ভুবনমোহিনী মায়া! স্থষ্টির উপরে এ যেন একটা আবরণ, পিছনে স্বরূপ আকাশ আছে, কিন্তু যতক্ষণ এ আবরণ আছে, ততক্ষণ দেখ্‌বার যো নেই। মায়া তিন প্রকার—তুচ্ছ মায়া, অনির্ব্বচনীয় মায়া, লৌকিক মায়া। তুচ্ছ মায়া জ্ঞান-দৃষ্টিতে নষ্ট হয়, অনির্ব্বচনীয় মায়া যুক্তিতে নাশ হয়, লৌকিক মায়া বিচারে নাশ হয়। চৈতন্য মায়াকে বশে রাখেন, মায়ার ভেদ হলে তবে সেই স্বরূপ আকাশ দৃষ্টি গোচর হয়।

"অবিদ্যা মায়া না?"

"পণ্ডিতেরা সম্বিদকেই মায়া বা অবিদ্যা বলেন। অবিদ্যার দুই শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ শক্তি—যাহার দ্বারা কূটস্থ চৈতন্য আবৃত হয়; বিক্ষেপ শক্তি—যে শক্তির প্রভাবে অবিদ্যা আবরণ শক্তি দ্বারা সমাবৃত কূটস্থ চৈতন্যকে স্থূল ও লিঙ্গশরীর বিশিষ্ট জীব চৈতন্য বলিয়া বোধ হয়—

অনুপমা কহিয়া উঠিল, 'মা গো! তুমি যা কটমট বলতে আরম্ভ কর্‌লে! কিছু যদি বোঝা যায় ওর! মায়ার কথা অত করে বোল্‌ছো,—ভগবানের নেহাৎ অন্যায় ও জিনিসটা স্থষ্টি করা। জগৎটা যদি কিছুই না হয়, খালি ফক্কিকারই হয়, তবে আর মাথা ঘামিয়ে অত তত্ব বের করার দরকারটা কি!

গৃহিণী অনুপমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আঃ! অনি, কি বক্ বক্ কর্চ্ছিস!"

অনুপমা প্রিয়তমার আঁচলের কোণটা আরো পাকাইতে পাকাইতে বলিল, "সত্যি ভগবান কেন মায়া স্থষ্টি কল্লেন? তিনি ত সর্ব্বশক্তিমান, আর কোনও উপায়ে জগৎ ব্যাপারটা চালাতে পারলেন না!"

"মায়া কেন স্থষ্টি কল্লেন! পাগল আর কি, এর উত্তর কি আমি দিতে পারি! বড় বড় জ্ঞানী বিজ্ঞানী পারে না।

"পার না? তবে যাও! তবে ওসব শ্লোক আমি কিছু শুন্‌তে চাই নে! তোমার শাস্ত্রওত তা'হলে ফাঁকি! তুমি আমি যা কিছু সবই যখন ফাঁকি! ঈশ্বর যখন বাজীকর, আর আমরা বাজীর খেলা—তখন—বাঃ! আর শুনে কি হবে!

"তুই ছেলে মানুষ তুই এখন এসব বুঝবি না তবু গোল করবি!"

"দিদি আমার চেয়ে দু'বছরের বড় হয়ে ভারী সব বোঝে!" খোলা জানালা দিয়া চাঁদের আলো ঘরে আসিতেছিল। বাহিরে হরগৌরী ফুলের গন্ধ বহিয়া বাতাস হিল্লোল তুলিয়া ঘরের ভিতর দিয়া বহিয়া গেল।

অনুপমা বলিল, "কি সুন্দর বাতাস আসছে, বাঃ! দিদি চলনা বাইরে যাই!" "নাঃ! অনু, তোকে মানানো যায় না!"

"আচ্ছা, যাও, আমি আর ডাক্‌বো না"—বলিয়া অনুপমা উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, আর্দ্র ঘাস ও ফুল পল্লবের উপরে জ্যোৎস্না ঝিকিমিকি করিতেছিল। একদিকে কতগুলি রজনীগন্ধার ঝাড়, তাহার শুভ্র ফুল জ্যোৎস্নায় শুভ্রতর দেখাইতেছিল। অনুপমা অপ্রসন্ন মনে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সদ্য অবগাহনোত্থিকা তরুণী পূজার্থিণীর মত বারিধারা-ধৌত জ্যোৎস্না-পুলকিত বসুন্ধরার দিকে সে ভ্রুকুটি করিয়া চাহিল। দুঃখের মত আনন্দ যে নিঃসঙ্গতার ভিতর ছাড়া পাইতে চায় না,—একার উপভোগে যে তাহার পূর্ণ স্বাদ পাওয়া যায় না, আপনাকে বিকাশের জন্যও প্রকাশের জন্য যে সে দ্বিতীয় ব্যক্তির আকিঞ্চণ করে—এমনি একটা বোধ বেদনার আকারে অনুপমার অবিকশিত চিত্তে সঞ্চারিত হইতেছিল।

শৈশব হইতে কেহ তাহার সঙ্গী নাই! সে একাকিনী! খেলার ঘরে পুতুল লইয়া একাই তাহার খেলা চলিয়াছে এবং সুড়কির ভাত ও গাছের পাতা কুচির ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া ঝাউ ফলের সন্দেশ সাজাইয়া সে যখন তাহার পুতুল মেয়ের বিবাহ দিয়াছে, তখন সমবয়স্কা সঙ্গিনীর কলহাস্যে এবং কলভাষে তাহার খেলা ঘর ধ্বনিত হয় নাই! একাই সে সকল পক্ষ সাজিয়া উৎসব ও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছে; এবং আরেক দিকের আরেক ঘরে বরের বাড়ী তৈয়ার করিয়া বরের মাতা সাজিয়া বধূ বরণ করিয়াছে!

শৈশবের নিঃসঙ্গতা! শৈশবের দুঃখের মতই তাহা কাতর অসহায়তায় করুণ!

ইন্দ্রিয় সমূহ—চক্ষু কর্ণাদি যেমন কেবল মাত্র আপন অস্তিত্বেই সার্থক নয়, বিষয় সংযোগে সার্থক হয়, মানুষের চেতন তেমনি শুধু আপনার অস্তিত্বে সার্থক হয় না, চেতনান্তরে প্রতিভাসিত হইলে সার্থক হয়!

অনুপমা সিক্ত ঘাসের উপর দিয়া বাগানের এক দিক্ হইতে আরেক দিক্ পর্য্যন্ত পাদচারণা করিতে লাগিল, তাহার পর বিরক্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল, বদ্ধাঞ্জলি প্রিয়তমা মুদ্রিত নেত্রে তখন বলিতেছিল—

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তাদি নাহং, ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণ-নেত্রম্।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন, বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥

পণ্ডিতেরা সংসারী লোকদের কণ্টক চর্ব্বণপ্রিয় উষ্ট্রের সহিত তুলনা দিয়াছেন। কিন্তু নন্দলালবাবুর গৃহিণী আদৌ সে শ্রেণীস্থ ছিলেন না। প্রভাত বেলায় যদিও তাঁহার জীবন তরণী মধুর বায়ু প্রবাহে রঙ্গে ভাসিয়াছিল, প্রদোষের উষায় যখন তটের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, তাঁহার কণ্টকতরুবেষ্টিত কূল ভুজঙ্গে ভরিয়া গিয়াছে। তরী যে দিকে তিনি বাহিতেছিলেন সে দিকে আর বাহিলেন না, ভিন্ন মুখে পাড়ি ধরিলেন।

শুনা যায় গৃহিণী এক কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাধি আহরণ করিয়াছিলেন, এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। কিন্তু অধুনা সে অতীত গৌরবের কোনও বিশেষ চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল না। গৃহিণী চতুর্দ্দশটী সন্তানের জননী হইয়াছিলেন, কিন্তু এই কন্যাদ্বয় একমাত্র পুত্র প্রতীপকুমার ভিন্ন অপর একাদশটী কাল কবলে পতিত হইয়া জননীর স্নেহ-ক্ষীরাব্ধির সুধা সলিলে বাড়বানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল!

একাদশটী সন্তানের গর্ভধারণ, প্রসব বেদনা, লালন পালনের ক্লেশ! একাদশটী সন্তানের হৃদয়-নন্দন মূর্ত্তি! একদশটী সন্তানের মৃত্যুযন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখের স্মৃতি! জল স্থল আবৃত করিয়া, আকাশ বাতাস রুদ্ধ করিয়া, দিবস নিশীথ লুপ্ত করিয়া একাদশটী চিতা সারি সারি জ্বলিতেছিল, এবং তাহার লেলিহান রসনা স্পৃষ্ট হইয়া সংসার তরুর শুষ্ক কাণ্ড অঙ্গারবৎ জ্বলিতেছিল।

নন্দলাল বাবু আপনাকে হিন্দুসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলেও তৎপুত্র প্রতীপকুমার আপনাকে ঠিক্ উক্ত অভিধা প্রদান করিতে পারে কি না তদ্বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ ছিল। অতিরিক্ত বেন্থাম মিল পড়িয়া নন্দলাল বাবুর মস্তিষ্ক লণ্ডভণ্ড হইয়া নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এবং ডিরোজিওর শিষ্যত্বে নব্য ভারতের স্পিরিটে দেশের অন্ধ সংস্কার ও ধারণার জলীয় বাষ্প একেবারে দূরীকৃত হইয়া গিয়াছিল।

নন্দলাল বাবু স্ত্রীকে প্রকৃতিস্থ করিতে বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যে নিঃস্তব্ধ গৃহে শোক শুধু মৃতের পুণ্যস্থানে কায়া ধারণ করিয়া বিচরণ করে, দিবস যেখানে সম্মুখে আলোক-উৎস মুক্ত করিবার আগে রুদ্ধ অর্গলের পশ্চাতে ছায়ালীন হইয়া থাকে, শব্দ যেখানে আপনি কুণ্ঠায় নিঃশব্দ হইয়া আসে, সেখানে পার্থিব জগতের সকল আড়ম্বর, সকল চাকচিক্য বীভৎসতার মত বিকৃত রূপ প্রতিভাত হইতে লাগিল। বিমুখ চিত্তে গৃহিণী কহিলেন, "আমার জন্য তুমি এ সব কোরো না, আমার এ সব আরো বিরক্তিকর লাগে।" নন্দলাল বাবু হাল ছাড়িয়া দিলেন।

বন্ধুবর্গ বলিলেন, ভ্রষ্ট শ্রী নষ্টস্বাস্থ্য সদা-রুগ্নমানা এই নারী—বক্ষের উপর যাহার একাদশটি পুত্র কন্যার চিতা জ্বলিতেছে, সংসার মরীচিকার মোহে তাহাকে আর ভুলান সম্ভবপর নহে, বৈরাগ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে ত্রিতাপ জুড়াইবার পন্থা দেখাইয়া দাও।

কথাটা নন্দলাল বাবুর সবিশেষ মনঃপূত হইল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবসভ্যতা তরুর ফলাস্বাদ করিয়া তিনি বর্ব্বরোচিত আস্তিক্য বুদ্ধিটাকে আত্ম-প্রসাদের প্রবাহমুখে ফেলিয়া দিয়া বিজ্ঞানের পঞ্চভূতাত্মক জগতে বিচরণ করিতে ছিলেন। নন্দলালবাবু ভ্রুভঙ্গি করিলেন।

অস্বীকার করিয়া প্রয়োজনকে কখনও দূর করা যায় না। গৃহিনী ক্রমশঃ শয্যায় মিশিয়া যাইতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গ কহিতে লাগিলেন যে ঐ কদলী ও আতপ-তণ্ডুল তৎপর শিখাধারী ব্রাহ্মণজাতি ভিন্ন অতঃপর আর উপায় নাই। মিক্‌চারে অথবা হোমিওপ্যাথিক ডোজে এ রোগের কিছু হইবে না।

নন্দলালবাবু সমস্যায় পড়িলেন। বন্ধুবর্গ অভয় দিয়া বলিলেন "আতুরে নিয়মো নাস্তি" তোমার স্ত্রী এইক্ষণে রোগিণী—ভৈষজ্য বিধানের ছাপ মারিয়া পৌত্তলিকতার একডোজ গলাধকরণ করাইয়া দাও। কোনও দোষ হইবে না।"

নন্দলালবাবু এ যুক্তির সারবত্তা অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও গোল মিটিল না, কারণ, যে সে পুরোহিত দ্বারা এ কার্য্য হইবার নহে। গৃহিনী নিজে সংস্কৃতে পারদর্শিনী ছিলেন, সুতরাং যে সব ষণ্ডামর্ক পুরোহিত দক্ষিণার থলিটি পূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকরণ ও অর্থশাস্ত্রকে ফাঁকি দিয়া স্বরগ্রামের ও বর্ণসমূহের খেচরান্ন প্রদত্ত করেন, গৃহিণীর বিরাগ উদ্রিক্ত করিবার জন্য তাহাদের ডাকিয়া আনিয়া লাভ কি?

নন্দলালবাবু যখন ইত্যাকার চিন্তায় আকুল, তখন সাধনানন্দ স্বামী পর্য্যটকরূপে দেখা দিলেন।

বন্ধুবর্গ এক বাক্যে কহিলেন "অতঃপর গৃহিণীকে ইঁহার শিষ্যা করিয়া দাও।"

নন্দলালবাবু অকূলে কূল পাইলেন। গৃহিণী সাধনানন্দ স্বামীর শিষ্যা হইলেন।

(২)

নন্দলালবাবু বেড়াইতে বাহির হইয়া যাইতে ছিলেন, এমন সময় অনুপমা পশ্চাৎ হইতে ধরিয়া ফেলিয়া কহিল "বাবা, তুমি পালাচ্ছ ?"

হাহা করিয়া হাসিয়া নন্দলালবাবু কহিলেন, "পালাচ্ছি কিরে হাবি !" "না, পালাচ্ছ না বুঝি। ছড়িটি বগলে নিয়ে, পা টিপিটিপি করে, আ—স্তে দরজা ফটকটি খুল্‌ছ—আমি বুঝি দেখিনি !'

ধরা পড়িয়া গিয়া নন্দলালবাবু অনুপমার বেণীসমেত মাথাটা ধরিয়া বাঁকাইয়া বলিলেন "তোর মত শাসনকর্ত্রীর হাতে পড়ে আমার প্রাণটা গেল রে ! একটু না বেরুলে কি বাঁচা যায় !"

ঠোঁট ফুলাইয়া অনুপমা কহিল "একটু বুঝি এই ! এই যে তুমি যাবে, আর আস্‌বে সেই রাত দশটায় ! একা একা আমার ভয় করে। দিদি মায়ের কাছে এই যে শ্লোক পড়তে থাকে—আর ওঠে না !" ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া নন্দলাল বাবু কহিলেন, "তোর মায়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়টাও একেবারে খেপে গেছে।"

অনুপমা নন্দলালবাবুর পাঞ্জাবীর আস্তিন ধরিয়া টানিয়া বলিল "আজ আমি তোমায় যেতে দেব না। এস্ তাস খেলিগে। চুপি চুপি—বুঝলে ? তোমার ঘরে।"

"তাস খেল্‌বি ? তাস কই ?"

"ঐ যে সেদিন এনেছিলে ?" "ওঃ, তা নরেন নিয়ে গেছে। আজ নিয়ে আসব—কাল খেলা হবে এখন।"

"কাল !"

অনুপমা অপ্রসন্ন মুখে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। নন্দলালবাবু তাহার তীক্ষ্ণ নাসাটি ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া কহিল "আঃ, রাগ করিস্ নে ! পাগল আর কি।

যা' ঘরের ভিতর যা। একলা এখানে ঘুরিস্ নে। কাল ঠিক খেলা হবে দেখিস্। আজ আমার একটু কাজ আছে, আজ আমায় যেতে দে।"

"নাঃ, যাই, আমিও শ্লোক শিখি গিয়ে" বলিয়া অনুপমা ফটক ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

নন্দলাল বাবু ফটকের দরজা ধরিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর বাহির হইয়া গেলেন।

নিভৃত জনহীন পথ, আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে, গ্যাসের আলোকে গাছের ছায়া পথের উপর বৃহত্তর হইয়া পড়িয়াছে। চারিদিক নিঃস্তব্ধ, অন্ধকার। নন্দলাল বাবু কল্পনা প্রবণ ছিলেন না, কিন্তু তত্রাচ এই আলোকহীন শব্দহীন জনহীন পথ একটা সুপ্ত বেদনা তাঁহার বক্ষে জাগ্রত করিয়া তুলিতে লাগিল। পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্বকার জীবন কাহিনী—তরুণী পত্নীর প্রীতিময় মোহময় নবানুরাগ—শিশুকণ্ঠের কল কাকলীতে পূর্ণ মুখরিত হর্ষময় গেহ, স্বপ্নের মত তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, আজিকার এই চন্দ্র-বিরহিত রাত্রি ও জন-বিরহিত প্রান্তর যেন তাঁহার জীবনের প্রতিকৃতিকে তাঁহার সম্মুখে ধরিয়াছে! উভয়ের মধ্যে কেবল প্রভেদ এই—নির্জ্জনতায় আবার জন-সমাগম হইবে, এই নিঃশব্দতা আবার কোলাহলে ভরিয়া উঠিবে, এই অন্ধকার আবার আলোক-স্রোতে মগ্ন হইবে কিন্তু তাঁহার জীবনে আর প্রভাতের আলোকপাত হইবে না! মানুষের সঙ্গে জড় প্রকৃতির এই প্রভেদ!

সে দিন রাত্রিতে নন্দলাল বাবু যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন অনুপমা পাশের ঘরে জোরে জোরে পড়িতেছিল—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্ত্বং বা কুতঃ আয়াত স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥
মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

"অনু"

অনু আর একটু জোরে শেষের দু'লাইন শেষ করিল। নন্দলাল বাবু আবার ডাকিলেন, "অনু আয়, শুনে যা।" অনুপমা আসিয়া দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল।

নন্দলাল বাবু তাহার গায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, "আয়, তাস খেলি, এনেছি তাস।

অনিচ্ছা প্রদর্শন করিয়া অনুপমা কহিল "না, মা আমাকে একটা শ্লোক মুখস্থ কর্ত্তে দিয়েছেন, আমার সেটা সব করা হয় নি।"

"আচ্ছা, সে বোঝা যাবে, আমরা এখন একবার খেলে নি।" অনুপমার অর্দ্ধেক রাগ জল হইয়া গেল সে বলিল, "খেলবে, আগে খাবে না?" "না আমি খেয়ে এসেছি।"

"কে খাওয়াল?"

"চন্দ্রনাথ।"

"তোমাকে সবাই খাওয়ায়, আমাদের কেউ খাওয়ায় না।"

"তোদের মা কি তা দেবে রে!"

"সর্ব্বনাশ! মা আবার তা দেবে! সাধনানন্দ স্বামী মা'র মাথা আরো খারাপ করে দিয়েছে! কি অদ্ভুত কথাই বলে মা! যার হাতে খাওয়া যায়, তার প্রবৃত্তির দোষ-স্পর্শ ঘটে—বলে!"

নন্দলাল বাবু হাসিলেন, কিন্তু মুক্তকণ্ঠে নয়, চাপা হাসি। ঘরের ভিতর তিনি জোরে হাসিতেন না, উচ্চ স্বরে কথা কহিতেন না। এই যে রোদনান্ধ মৌন নারী মূর্ত্তিমতী শোকের মত তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে—তাহাকে তিনি ইদানীং খানিকটা ভীতিজড়িত সম্ভ্রমের সহিত দেখিতেন। এই সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী—একদিন যে অরুণরথবর্ত্তিনী উষার মত তাঁহার জীবন আনন্দে কোলাহলে, সঙ্গীতে সৌরভে, আলোকে নব প্রভাত ঘোষণা করিয়াছিল, তাহাকে তিনি আর কোনও দিক হইতে নাগাল পাইতেন না। অশ্রুধারা ধূসর এক সূর্য্যাস্তের আঁধার রাত্রিতে তাঁহাদের সম্মিলিত জীবন-নদী মৃত্যুশিলায় ঠেকিয়া ভিন্নমুখে কোন্ দিকে যে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার সন্ধান আর তিনি পাইতেন না।

অনুপমা নন্দলাল বাবুকে হাত ধরিয়া টানিয়া খাটের উপর বসাইয়া বলিল, "এস তবে খেলতে বসি। তুমি চেঁচাতে পারবে না কিন্তু। হুন্দর হলেও না।"

নন্দলাল বাবু হাসিয়া বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা।"

পাশের ঘরে বৈরাগ্যের হোমশিখায় যখন সংসার কামনা ইন্ধনবৎ দগ্ধ হইতেছিল, তখন বার্দ্ধক্য ও কৈশোর নূতন করিয়া খেলা ঘরে জীবনের আনন্দ-পাত্র পূর্ণ করিয়া লইতেছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

দাম্পত্য-বন্ধন।

রমণীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি রমণীর যে বিমোহিনী মনোবৃত্তি, তাহাই দাম্পত্য-প্রেম, এবং এই প্রেমের পরিণামই দাম্পত্য-বন্ধন। জীবের বংশ রক্ষা এবং বৃদ্ধির জন্যই প্রকৃতি জীবহৃদয়ে এই বৃত্তির বিধান করিয়াছে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি বহু জন্তুতে দাম্পত্য-প্রেম ও দাম্পত্য-বন্ধন দৃষ্ট হয়, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুও আমরণ দাম্পত্য-বন্ধনে বদ্ধ থাকে, পতিসহ অপর ব্যাঘ্রী কিংবা পত্নীসহ অপর ব্যাঘ্র দর্শনে ঈর্ষা বশতঃ মরণান্ত যুদ্ধ উপস্থিত হয়। গৃহপালিত এবং আরণ্য জন্তু বিশেষে এই বৃত্তি ও বন্ধনের ব্যতিক্রম হয় সত্য, কিন্তু অধিকাংশ আরণ্যজন্তুর জীবনে এই নৈসর্গিক বৃত্তির ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়; সুতরাং প্রেম-বৃত্তি ও দাম্পত্য-বন্ধন জান্তব বাচ্য, মানব এবং পশ্বাদিতে এই জান্তব বৃত্তি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই।

স্ত্রী পুরুষের পরস্পর প্রীতি-জনিত দাম্পত্য-বন্ধন নৈসর্গিক, কিন্তু পুরুষবিশেষ সহ স্ত্রীবিশেষের দাম্পত্য-বন্ধনের নৈসর্গিকত্ব ও অবিচ্ছিন্নত্ব প্রমাণিত হয় না। উক্ত হইয়াছে যে বৃত্তি বিশেষই দাম্পত্য-বন্ধনের জনয়িত্রী, বৃত্তি বৈষম্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে বন্ধন ছিন্ন হয়, উদ্বাহ মন্ত্রশক্তি তাহা রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। পক্ষান্তরে বিহিত বিবাহে বন্ধনহীন স্ত্রীপুরুষ বৃত্তি-জনিত বন্ধনে দৃঢ় আবদ্ধ হয়। মনোবৃত্তি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীলা এবং অনিত্যা, সুতরাং তজ্জনিত সম্বন্ধের তদাকার প্রাপ্তিই স্বাভাবিক।

খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচলনের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-দেশে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, হিন্দু মুসলমানাদি সমাজে বহুবিবাহ আবহমানকাল প্রচলিত। তির্ব্বত ও হিমালয়স্থ

যোয়ানাসার প্রদেশে রমণী মাত্রেই বহু বিবাহ করে। হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্যতীত জগতের সভ্যাসভ্য সকল সমাজের বিধবারই বিবাহ হয়, সধবার পত্যন্তর গ্রহণও বিরল নহে। প্রদেশ বিশেষে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণে বিধবা এবং সধবা উভয়েরই পুনর্বিবাহ প্রচলিত আছে। মৃতদার পুরুষের পুনর্বিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত; সুতরাং পুরুষ বিশেষসহ রমণী বিশেষের দাম্পত্য-বন্ধনের অবিচ্ছিন্নত্ব সাম্প্রদায়িক, এবং নৈসর্গিকত্ব কল্পিত। সমাজ বিশেষে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর আসক্তি হেতু বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হয়, সমাজান্তরে অপরিচিতের সহ অপরিচিতার অথবা বালকসহ বালিকার বিবাহ হয়। শেষোক্ত অবস্থায় প্রথমে দাম্পত্য-বন্ধন তৎপরে বৃত্তি বা ভাবজনিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, কিংবা শারীরিক এবং মানসিক বৈষম্য হেতু দাম্পত্য বন্ধন সত্বেও পরস্পর ভাবজনিত আসক্তি উৎপন্ন হয় না।

সর্ব্বত্রই বৃত্তি ও ভাবের চঞ্চলতার এবং অনিত্যতার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। যে আসক্তির আবেগে দম্পতি বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হয়, সেই আসক্তির মাদকতারূপ গুণাদির নবীনত্বসহ স্বল্পকাল মধ্যে অদৃশ্য হয়, তখন মোহমুগ্ধাবস্থায় অলক্ষিত দোষরাশি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া মোহাপনয়ন করে, কিন্তু ঈদৃশ দম্পতী ও কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং পরস্পর প্রয়োজন সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করে। এতদাবস্থায় সন্তান, সম্পদ, স্বদেশ, সমাজ, জ্ঞান, বিজ্ঞানাদি অপর বিষয়ে মন আকৃষ্ট না হইলে, অর্থাৎ হৃদয়ের সেই শূন্যাংশ অপর প্রীতিপ্রদ পদার্থ দ্বারা পূর্ণ না হইলে, পতি অপরস্ত্রী এবং পত্নী পরপুরুষ কামনা করে। বাসনা দুর্দ্দম্যা হইলে পারিবারিক উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। তাহার পরিণাম খ্রীষ্টানের "ডাইভোর্স্" ও মুসলমানের "তালাক" এবং পুনর্বিবাহ।

হিন্দু সমাজে যুবক যুবতীর পরস্পর রূপগুণাসক্তি-জনিত বিবাহ অতি বিরল। অভিভাবকগণ কুলমর্য্যাদা ও যৌতুকাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অপ্রাপ্ত যৌবন বরের জন্য বালবধূ নির্ব্বাচন করেন, ইত্যাকার বিবাহ-বন্ধনে ভাগ্যবান দম্পতী বিশেষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভাব সমন্বয় জনিত দাম্পত্য সুখে সুখী হইতে পারে, কিন্তু যে দম্পতীর অদৃষ্ট ঈদৃশ সুপ্রসন্ন নহে, শারীরিক এবং মানসিক বৈষম্য হেতু যাহাদের আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, তাহারা উপায়ান্তর হীন, কারণ হিন্দু-সমাজে বিবাহ-বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। তখন "ন খলু সপদি মোক্তুং নাপি শক্নোতি ভোক্তুং" কর্ত্তব্য বোধ এবং লোকলজ্জায় দাম্পত্য

বন্ধন ছিন্ন করা অসাধ্য হয়। পক্ষান্তরে অরোচক ভোগ্যে আন্তরিক ভোগ বাসনাও পরিতৃপ্তা হয় না। ইত্যাকারে অনেক দম্পতী কেবল নিয়তিকে ধিক্কার প্রদান করিয়াই নিরস্ত হয়, এবং আসঙ্গে অভ্যস্ত হইয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করে, কিন্তু কোন দম্পতীর দাম্পত্য-বন্ধন লৌহ নিগড়ে ও গৃহ কারাগারে পরিণত হয়, সতত দুঃখ সংঘাতে তাহাদের হৃদয়স্থা দুর্দ্দম্যা বাসনা-ভুজঙ্গিনী উদ্বাহ-মন্ত্র-শক্তি উপেক্ষা করিয়া উত্থিত হয় এবং বিশাল ফণা বিস্তার পূর্ব্বক সমাজ নীতির মর্ম্মস্থলে দংশন করে। অহো! এই বিষম বিষে সমাজ জর্জ্জরিত! উদ্বাহ প্রথার অভাবে সমাজ ধ্বংস হয়, অথচ কোন প্রকার বিবাহ প্রথাই মানব-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিতে সক্ষম নহে।

রূপজ মোহ নৈসর্গিক, হিমাচলের তুষারমণ্ডিত অভ্রভেদি তুঙ্গশৃঙ্গ দর্শনে দর্শকের বিস্ময়াপ্লুত হৃদয় অনির্ব্বচনীয় ভাবে অভিভূত হয়। বিসারিত সলিলময় অসীম সাগর গাম্ভীর্য্যে অবগাহন করিলে অন্তরে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়; রূপযৌবন গর্ব্বে গর্ব্বিতা বিকসিতা কমলকামিনী যখন সহাস্যাস্যে সৌরভরাশি বিতরণ করে, বিকাশোন্মুখা লাবণ্যময়ী কুসুম কলিকা যখন সান্ধ্য মলয়ানিলসহ ক্রীড়া করিতে করিতে মস্তকান্দোলন পূর্ব্বক স্মিতাননে আহ্বান করে, তখন মুনীন্দ্রের মনও নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা জনিত আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু হিমালয়বাসীর মন হিমালয়ের বিরাটরূপে তাদৃশ মুগ্ধ হয় না, সমুদ্রতীরবাসী কিংবা সামুদ্রিক নাবিকের মন সেই অসীম গাম্ভীর্য্যে অভিভূত হয় না, এবং উদ্যানপাল আপন যত্নে প্রতিপালিতা সুকুমারী কুসুমকুমারীর কমনীয় কান্তি, কিংবা ঘ্রাণেন্দ্রিয় মোদকর সৌরভে তাদৃক্ আকৃষ্ট হয় না, ইহার কারণ ঘনিষ্টতা। সতত দর্শনে রূপগুণের চমৎকারিতা এবং বিমোহিনী-শক্তি বিদূরিতা হয়। যতক্ষণ নূতনত্ব ততক্ষণ রূপজমোহ, যতক্ষণ নবীনত্ব ততক্ষণই গুণজ আসক্তি, এইজন্যই রূপাশক্তি ও গুণাশক্তি জনিত দাম্পত্য প্রেম কালক্রমে ঔদাস্যে পরিণত হয়।

শস্যশ্যামলা পল্লীর অধিবাসী বিচিত্র কারুখচিত সৌধ শ্রেণী শোভিত নগরের সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হয়, পক্ষান্তরে নগরবাসী, ফলফুলমণ্ডিত বৃক্ষরাজি বেষ্টিত তৃণাচ্ছাদিত কুটীর সমম্বিত শান্তিনিকেতন দর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়; যদিও সৌন্দর্য্যে বৈচিত্র্য এবং বৈষম্য আছে, তথাপি পল্লীও

সুন্দর, নগরও সুন্দর, এই সৌন্দর্য্যের তারতম্য নিরূপিত হয় না ; কিন্তু একের অযত্ন লব্ধ, উপেক্ষিত বিষয়ে অপর ব্যক্তি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে আকৃষ্ট হয়, ইত্যাকার মনোবৃত্তি স্বাভাবিক, এবং দম্পতী স্বভাবেরই অন্তর্ভূত। মানব দেহ, দৈহিক রূপ যৌবন স্বাস্থ্য বল মনোবৃত্তি সকলই পরিণামী অর্থাৎ পরিবর্ত্তন-শীল এবং নশ্বর। বাহ্যজগতসহ সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ সতত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কতশত পুরাতন সম্বন্ধ ছিন্ন এবং নূতন সম্বন্ধ সংঘটিত হইতেছে, এতদাবস্থায় পুরুষ বিশেষসহ রমণী বিশেষের দাম্পত্য বন্ধনের নিত্যত্ব মুগ্ধ জীবের কল্পনা মাত্র এবং এই মোহজ কল্পনা হইতেই অবিচ্ছেদ্য দাম্পত্য বন্ধন, আনুসাঙ্গিক ধর্ম্মকর্ম্ম, এবং তাহার পারলৌকিক ফলের আশা হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

সুষুপ্তি সময়ে ভক্তি প্রেম স্নেহ আশা নিরাশা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মনোবৃত্তি লুপ্ত হয়, এবং ঐ সকল বৃত্তিজনিত জাগতিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ সুখদ ও দুঃখদ সর্ব্ববিধ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়। প্রকৃতি এই দৈনন্দিন সুষুপ্তি অবস্থাদ্বারা ভাব, বৃত্তি সম্বন্ধের অসারত্ব অনিত্যত্ব এবং পুরুষের স্বাতন্ত্র্য ও ভূমত্ব * প্রতিপাদন করিতেছে। কিন্তু মোহমুগ্ধ জীবের চৈতন্যোদিত হইতেছে না, ইহাই মহামায়ার মায়া।

স্ত্রী পুরুষের ভাববৃত্তির সমন্বয় হইলে তাহারা শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দাম্পত্য বন্ধনে বদ্ধ হইতে প্রয়াসী হয়, পক্ষান্তরে ভাববৃত্তি বৈষম্যে শতবিধ প্রতিষেধ শাস্ত্র এবং সমাজ শাসন, অবরোধ, অবগুণ্ঠনাদির নিষ্ফলত্বই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমান।

যে দাম্পত্য প্রেমের বিমোহিনী শক্তিতে জগৎ মুগ্ধ, যাহার অমৃত ধারায় ধরাধাম স্নিগ্ধ, যাহার অভাবে গৃহ অরণ্যে এবং সংসার শ্মশানে পরিণত হয়, যাহার মহিমা কবির কবিত্বে, সঙ্গীতের লালিত্যে, চিত্রের নৈপুণ্যে স্ফুরিত, দর্শনে ভাবুকের মন মন্মথসহ নৃত্য করে, বিমুগ্ধ জীবের কল্পনা রাজ্যে জগদীশও যেই জগবিমোহিনী বৃত্তিবশে "দেহিপদপল্লব মুদারম্" বলিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছেন, তাহার ভিত্তি কি ? এই জীবেশ্বর বিমোহিনী সর্ব্বজন কাম্যা কমনীয়া বৃত্তির ভিত্তি আত্মসুখ বা সুখবাসনা। যে বস্তু দর্শনে, স্পর্শনে, শ্রবণে স্বদনে, জিঘ্রণে

* যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি সভূমা। ছান্দোগ্য

তৃপ্তি প্রদান করে তাহাই জীবের প্রিয়; যে বিষয় কল্পনায়, চিন্তায়, কথায় সুখ বোধ হয় তাহাই জীবের প্রিয়; যাহা অতীতে সুখদান করিয়াছিল, যাহা বর্ত্তমানে সুখদ, এবং যাহাতে ভবিষ্যতের সুখ প্রত্যাশা ন্যস্ত, তাহাই প্রিয়; এবং প্রেমবৃত্তি এই প্রিয় পদার্থই আশ্রয় করে ও তদবলম্বনে ক্রিয়া করে। পক্ষান্তরে দুঃখপ্রদ সর্ব্ববস্তুই জীবের অপ্রিয় ও বিদ্বেষজনক; সুতরাং প্রেম স্বার্থে, পরার্থে নহে। যিনি যত পরিমাণে স্বার্থপর বা আত্মসুখ পরায়ণ তিনি সেই পরিমাণে সুখদ পদার্থে আসক্ত-প্রেমিক। নিঃস্বার্থ প্রেম বা অহেতুক প্রেম বন্ধ্যাপুত্রবৎ অলীক, ব্রজগোপিকার আদর্শ প্রেম কি স্বার্থশূন্য, অহেতুক? তাহাদের মিলন জনিত আমোদ, বিচ্ছেদ জনিত বিষাদ, অবহেলাজনিত অভিমান কি হেতুর পরিচায়ক নহে? তাহাদের হর্ষ বিষাদই স্বার্থের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ক্লেশকর কর্ম্ম দ্বারা প্রেমাস্পদের সুখ বিধান করিয়া সুখানুভব, আয়াসলব্ধ মনোরম ভোগ্য প্রেমাস্পদকে দান করিয়া স্বীয় ভোগাপেক্ষা সমধিক পরিতৃপ্তি কি নিঃস্বার্থ প্রেমের নিদর্শন? না, ঐ সকল ভাববৃত্তি এবং কর্ম্মের অন্তরালে আত্মসুখ এবং আত্মতৃপ্তি সতত বিদ্যমানা? এই নিগূঢ় তত্ত্বদর্শন করিয়াই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক ব্রহ্মবাদিনী ভার্য্যা মৈত্রেয়ীর প্রতি গুরু গম্ভীরস্বরে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ করিয়াছিলেন, "হে মৈত্রেয়ী, পতির তৃপ্তির জন্য পতি প্রিয় হয় না, দেবতা ও দেবপ্রীতার্থে প্রিয় নহে, আত্মতৃপ্তি প্রয়োজনেই দেবতা প্রিয় হয় (১)। এই আর্য বাক্যের ব্যাখ্যার্থে বিদ্যারণ্য মুনি বলিতেছেন, "পতির প্রতি পত্নীর এবং পত্নীর প্রতি পতির প্রীতি স্বার্থজনিত, অর্থাৎ স্ব স্ব সুখ হেতু উৎপন্ন হয়; এবং ঈশ বিষ্ণ্বাদি দেবার্চ্চনাও জীব পাপক্ষয়াদি স্বার্থ হেতুই করে, ইহাতে দেবতার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। (২) সুতরাং শ্রুতিস্মৃতি যুক্তি প্রমাণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভক্তি প্রেমাদি বৃত্তি আত্মসুখরূপ স্বার্থ জনিত।

---

(১) নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়োভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়োভবতি।
নবা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তুকামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।
নবা অরে দেবানাংকামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি।
বৃহদারণ্যক

(২) ন পত্যুরর্থে সা প্রীতিঃ স্বার্থ এব করোতিতাম্। পতিশ্চাত্মন এবার্থে ন জায়ার্থে কদাচন॥
ঈষ বিষ্ণ্বাদয়ো দেবাঃ পূজ্যন্তে পাপ নষ্টয়ে। ন তন্নিষ্পাপ দেবার্থং স্বার্থং তত্তু পযুজ্যতে॥
পঞ্চদশী—

অসংখ্য সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র স্বাভাবিক আকর্ষণ শক্তিতে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় কেন্দ্রে বিঘূর্ণিত হইতেছে ও অপরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, এই প্রাকৃতিক আকর্ষণ রুদ্ধ হইলে ব্রহ্মাণ্ডচক্র নিবর্ত্তিত হয়। তদ্রূপ স্ত্রী পুরুষের নৈসর্গিক আকর্ষণ জনিত বন্ধন ছিন্ন হইলে সংসার চক্রেরও নিবৃত্ত হয়। সমষ্টিরূপে ব্রহ্মাণ্ডের স্থায়িত্ব কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক সৌরজগৎ ও তৎসংসৃষ্ট আকর্ষণাদি অস্থায়ী; তদ্রূপ সমষ্টিরূপ মানবজাতির স্থায়িত্ব প্রত্যক্ষ হইলেও প্রত্যেক মানব ও তাহার আনুসঙ্গিক সাংসারিক সর্ব্বসম্বন্ধ অস্থায়ী।

মানবের আহার পানের উদ্দেশ্য ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি ও দেহরক্ষা। মানব কত আয়াসে আহার্য্য আহরণ করিয়া জঠরানলে আহুতি প্রদান করিতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষুধা বহ্নি 'দেহি দেহি' শব্দে প্রদীপ্ত জিহ্বা বিস্তার করিতেছে, অন্তিম-কাল ভিন্ন ক্ষুৎপিপাসার অন্ত নাই। তদ্রূপ দুর্দ্দম্য সুখবাসনায় মানব পার্থিব সর্ব্ব পদার্থে সুখান্বেষণ করিতেছে, আহরণ করিতেছে, বিষয় সহ শত বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে, ত্রিবিধতাপে সন্তপ্ত হইতেছে, কিন্তু বাসনার পরিতৃপ্তি নাই; যদ্রূপ শ্মশানানলে দেহসহ ক্ষুৎপিপাসার অবসান হন, তদ্রূপ বিবেকানলে অহমিকাসহ সুখবাসনা, তজ্জনিত বন্ধন, এবং দুঃখাদিও ভস্মসাৎ হয়। তখনই মানবের ত্রিপাত দগ্ধ হৃদয় পরমাশক্তি লাভ করে। মোহমুগ্ধ জীবের কল্যাণ কামনায় হিতৈষিনী শ্রুতি বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে এই মহান্ তত্ত্ব জগতে ঘোষণা করিতেছে, "যখন হৃদয়স্থ সর্ব্বকাম সঙ্কল্পাদি বিশীর্ণ হয়, যখন সকল হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্ত্য অমৃতত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ করে, ইহাই সর্ব্ব বেদান্তোপদেশ।" * পূর্ব্বকালে বাল্যাবধি দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা আর্য্যসন্তান ইন্দ্রিয় সংযমে অভ্যস্ত হইত, বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন জনিত বিদ্যাবলে তাহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য নির্ণীত হইত, তাহারা গার্হস্থ্য আশ্রম ও তদ্ধর্ম্ম পরবর্ত্তি আশ্রমের সোপান মনে করিত এবং দাম্পত্য সম্বন্ধাদি নৈসর্গিকবৃত্তি নিবৃত্তির উপায় রূপে অবলম্বন করিত, গার্হস্থ্যজীবন এবং গার্হস্থধর্ম্মই তাহাদের জীবনের অন্তিম লক্ষ্য ছিলনা। মানসিক বলের অভাব এবং বাসনার তীব্রতা হেতু তন্মধ্যে কিয়ৎ সংখ্যক

* যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥
কাঠক।

মায়ামোহবশে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সংসার কূপে নিমজ্জিত হইলেও অনেকে সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া আশ্রমান্তর অবলম্বন করিত, কিংবা 'নলিনী দলগত জলবৎ' নির্লিপ্তভাবে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিত। কলিযুগের শুভাগমনে অথবা পুরাণ ও স্মৃতিকারের অনুকম্পায় আশ্রমত্রয় লুপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং গার্হস্থ্য ভিন্ন আশ্রমান্তর ছিলনা, তখন ব্রাহ্মণের অষ্টমবর্ষে, ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষে এবং বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে উপনয়নান্তে অভিভাবকগণ বালকের গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিতেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ইত্যাকার বিধানে বিবাহিত অধিকাংশ দম্পতীই বয়ঃপ্রাপ্তাবস্থায় নিয়তিকে ধিক্কার প্রদান করিয়াই নিরস্ত হয়, আমাদের কলিগ্রস্ত পূর্ব্ব পুরুষগণও তাহাই করিতেন। তাহারা "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ" হেতু পত্নীর অযোগ্যতায় বিশেষ ক্ষুন্ন হইতেন না, এবং 'পাতিব্রতাই রমণীর একমাত্র পারলৌকিক ধর্ম্ম' এই উপদেশ দ্বারা এবং পাপভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পত্নীর পরপুরুষ চিন্তার পথরোধে প্রয়াসী হইতেন, সুতরাং অনেক গৃহে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বিশেষ বিঘ্ন হইত না; তৎকালে নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করাই গৃহস্থের একমাত্র ধর্ম্ম ছিল, তাহাদের সর্ব্বসঙ্কল্প এবং সর্ব্ব কর্ম্মই পারলৌকিক ভোগাকাঙ্ক্ষা জনিত ছিল, এবং শাস্ত্রও তাহাদিগকে পারলৌকিক সমধিক সুখকর সংসারই প্রদান করিয়াছিল, সুতরাং তাহাদের সংসারচক্র নিবর্ত্তিত হইত না।

উল্লিখিত শাস্ত্রানুশাসিত দম্পতী, কিম্বা যাহারা মনোমত পত্নী বা পতিলাভে পরিতৃপ্ত, তাহাদের পরলোকে বা পরজন্মে পুনর্ম্মিলন কামনা সম্ভবপর ভাববৃত্তির সমতা সত্ত্বেও যে সকল প্রেমিক প্রেমিকার ইহজীবনে দাম্পত্য মিলন হয় না, যাহাদের শত আশা শত অভিলাষ শত শত সুখের কল্পনা দরিদ্রের বাসনার ন্যায় হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হইতেছে, তাহারা পরলোক বা পরজন্মে মিলন আশায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতে পারে, কিন্তু জীবের সকল আশা পরিতৃপ্তা হয় না, সকল বাসনা পরিপূর্ণা হয় না, ইহাই প্রাকৃতিক বিধান। পরলোক এবং পরজন্ম প্রকৃতির অন্তর্ভূত, সুতরাং ঈদৃশ আশা আকাশকুসুমবৎ। যে পতি পত্নীর সম্মিলন জনিত সঙ্ঘর্ষণে প্রেমসুধায় পরিবর্ত্তে বিষম বিদ্বেষ-বিষ উৎপন্ন

---

* ব্রতংতপস্তাং দেবার্চ্চাং পরিত্যজ্যপ্রযত্নতঃ। কুর্য্যাচ্চরণ সেবাঞ্চস্তবনং পতিতোষনম্।
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

হইয়াছে, যাহাদের বিষম দাম্পত্য সম্বন্ধ জাত সন্তাপে সাংসারিক সর্ব্ববস্তু প্রতপ্ত হইয়া দুঃখ প্রদান করে, তাহাদের পরজন্মে বা পরলোকে পুনর্ম্মিলন কামনা কি সম্ভবপর? যে বালবিধবার চিত্তপটে বালপতির প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত নাই, যাহার বিবাহের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার হৃদয়ে পতিপ্রেম ও পুনর্ম্মিলন কামনা কি সম্ভবপর? মৃতদার পুনর্বিবাহিতা পত্নীসহ সুখপ্রদ প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে, পূর্ব্ব পত্নীর স্মৃতি যাহার হৃদয়ে স্বপ্নেও আবির্ভূতা হয় না, তাহার আসক্তি স্রোত এবং বাসনা প্রবাহ কোন্‌দিকে প্রধাবিত হইবে? কাল বিবর্ত্তনে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এই প্রাচীন মত লুপ্ত হইয়া "আত্মার্থ এব প্রকরোতি ভার্য্যাং" এই নবীন মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং নব্য সমাজে কাহারও অযোগ্যা পত্নীসহ পুনর্ম্মিলন কামনা সম্ভবপর নহে। যাহাদের দৈহিক ও মানসিক শুভ সম্মিলন জনিত দাম্পত্য প্রেম হয় নাই, অথবা বৃত্তি পরিবর্ত্তনে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, যাহাদের পুনর্ম্মিলনার্থে বাসনা নাই, এবং ভাব মিলন চিন্তনে আশঙ্কায় কলেবর কম্পিত ও হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত হয়, তাহাদের চিরবিচ্ছেদই স্বাভাবিক এবং সুখকর। পুরোহিত পঠিত কতিপয় সংস্কৃত বাক্যের কি শক্তি যে বিরুদ্ধভাবাপন্ন নর নারীর নিত্য সম্বন্ধ যোজনা এবং রক্ষা করে? নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে, শত শত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উদ্বাহ মন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় সম্বন্ধ সংস্থাপনের কিংবা রক্ষার শক্তি নাই, সুতরাং পুরুষ বিশেষ সহ রমণী বিশেষের দাম্পত্য বন্ধনের নিত্যত্ব অযৌক্তিক এবং অপ্রামাণ্য।

অনিত্য দাম্পত্য বন্ধনের নিত্যত্ব কল্পনা করিয়াই সংসারাসক্ত স্মৃতিকার বিধবার সহমরণ ও আমরণ ব্রহ্মচর্য্যাখ্য কুচর্য্যার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রান্ধ হিন্দুসমাজ কোটী কোটী মৃতপত্নিকাকে শ্মশানানলে দগ্ধ করিয়া নারীহত্যাজনিত ঘোর পাপগ্রস্ত হইয়াছে, এবং অবোধিনী বিধবাকে প্রজ্বলিত বাসনানলে অহুতি প্রদান পূর্ব্বক অক্ষয় পাপ সঞ্চয় করিতেছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে নিত্য নৈমিত্তিক ও কামাদি কর্ম্মের ফল পুনঃ পুনঃ সংসার প্রাপ্তি। স্মৃতিশাস্ত্র এই সংসার ধর্ম্মেরই ব্যবস্থাপক; অবিদ্যা-বরিত সংসার কূপে ইহার উৎপত্তি এবং প্রভুত্ব। ইহা জীবকে সেই কূপস্থ পন্থাই প্রদর্শন করিতেছে; সংসার কূপের বহির্দ্দেশে ইহার অধিকার নাই, এবং জীবের

উদ্ধার সাধনের শক্তিও নাই। এই স্মৃতি-বিহিত কর্ম্মই কলির একমাত্র ধর্ম্ম তাহাতে সন্দেহ কি ?

যে জীব কলিগ্রস্ত, অর্থাৎ তমোময় মায়ামোহে অভিভূত, ভোগসুখ যাহার জীবনের লক্ষ্য, ত্রিবিধ সন্তাপ ভোগ যাহার নিয়তি, কলিস্মৃতি-বিহিত-কর্ম্ম তাহার ধর্ম্ম, কিন্তু যাহার হৃদয় সত্যের প্রদীপ্ত প্রভায় উদ্ভাসিত, যাহার বিবেকনেত্র উন্মীলিত, যিনি বৈরাগ্যামৃত পানে বলীয়ান হইয়া ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে কৃতসংকল্প, সেই মুমুক্ষুর চক্ষে স্মৃতিশাস্ত্র বালবাচালতা মাত্র ; সুখ দুঃখ, আশা নিরাশার উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত লোভ মোহকামাদি ব্যাদিত বক্ত্র নক্রসমাকীর্ণ ভীষণ ভবসাগর সন্তরণকারীর জন্য প্রেমপ্রসূনমালিকাময় সুখদ দাম্পত্য-বন্ধন ও গুরুভার নিগড়তুল্য, ঈদৃশ মুমুক্ষুই সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার ভাববৃত্তি এবং সম্বন্ধের অনিত্যতার জীবন্ত সাক্ষী।

সোঽহংস্বামী

কালীপ্রসন্ন স্মৃতি-প্রসঙ্গ।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের ন্যায় প্রতিভাশালী সাহিত্য-রথী বর্ত্তমান যুগে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মত বাণীর একনিষ্ঠ সাধক, প্রকৃত ভক্ত মহাত্মা ভাষা-জননীর প্রকৃত কল্যাণকামী মনীষী মহাজন বঙ্গদেশে দুই চারিজন ব্যতীত আর বড় বেশী এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-তরণী একেবারে কর্ণধার বিহীন হইয়াছে। আমরা অনেক দিন হইতেই তাঁহার একখানা বিস্তারিত জীবন-রচিত প্রকাশ করিবার পক্ষপাতী কিন্তু বিষয়টী এতই গুরুতর যে উহা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহায়তার ও সহযোগীতার উপর নির্ভর করে।

যাঁহারা কালীপ্রসন্নের সহিত পরিচিত ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার সাহিত্য-জীবনের, পারিবারিক ও বৈষয়িক জীবনের অন্তর্নিহিত তথ্যসমূহ জ্ঞাত ছিলেন একার্য্যে তাঁহাদের সাহায্য প্রয়োজন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহার পরিচিত বন্ধু, আশ্রিত আত্মীয় ও প্রবাসী বন্ধু সজ্জনের সহযোগীতা প্রার্থনা করিতেছি ; তাঁহারা সকলে তদীয় সাহিত্য-জীবন কথা ও নিজ নিজ পরিচয় কাহিনীর বিবরণী লিখিয়া পাঠাইলে তদীয়-জীবনী-সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা হয়।

এ সংখ্যায় পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতম সু-কবি ও সু-লেখক অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত বিবরণী প্রকাশ করিলাম। কালীভূষণ বাবু তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র ও বৈষয়িক এবং কর্ম্মজীবনের সঙ্গী ছিলেন; কাজেই তাঁহার নিকট হইতে আমরা বারান্তরে আরও প্রয়োজনীয় কথা জানিতে পারিব বলিয়া ভরসা করি। রায় বাহাদুরের অন্যান্য পরিচিত বন্ধু বান্ধবগণ ক্রমশঃ এই স্মৃতি-প্রসঙ্গের নিজ নিজ লেখনী পরিচালনা দ্বারা গৌরব-মণ্ডিত করিবেন বলিয়া আশা করি। বিঃ সঃ।

আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যসূর্য্য ৺ রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষের জীবনী লেখা এক সুবৃহৎ ব্যাপার। মাদৃশ লোকের তাহাতে হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্ঠতাব্যঞ্জক। আমি তাঁহার চির স্নেহ-পরিপালিত, বস্তুতঃ তিনি আমাকে প্রকৃতই সন্তান স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাই, আমি সেই বঙ্গ-গৌরব মহাত্মার বিষয়ে আমার ক্ষুদ্র জীবনের সহিত সংস্পৃষ্ট কয়েকটি কথা মাত্র এখানে উল্লেখ করিতেছি। এগুলি হয়ত তাঁহার জীবনী লেখকের প্রয়োজনে আসিতে পারে। যিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে যুগান্তর আনিয়াছেন; যাঁহার ওজস্বিনী ভাষা আজ বাঙ্গালা-সাহিত্যে আদর্শ বলিয়া পরিগণিত, যাঁহার গদ্য রচনা সর্ব্বদাই পদ্যময়ী ছিল, যাঁহার শব্দ বিন্যাস ও ভাষার মাধুরী "নিতুই নূতন", সংক্ষেপতঃ যিনি বঙ্গভাষাকে নূতন প্রাণ দান করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে যে কোন কাহিনী জানা যাইতে পারে, তাহাই সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইবে, সন্দেহ নাই। আমার ৺পিতৃদেবের ও আমার নিকট তাঁহার লিখিত বহু চিঠিপত্র ছিল। কিন্তু নানাপ্রকারে তাহার অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তখন ভাবি নাই যে ঐ পত্রগুলি যত্নে রক্ষিত হইলে, আজ তাহা সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইত।

আমার স্বর্গগত পিতৃদেব সঙ্গীত সাহিত্যামোদী সুকবি শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। রায় বাহাদুর তাঁহাকে "দাদা" বলিয়া সর্ব্বদা সম্বোধন করিতেন। আমি যে তাঁহার স্নেহানুগত বলিয়া নিজকে একটুকু গৌরবান্বিত মনে করি, তাহা আমি তাঁহার প্রিয়সুহৃৎ-পুত্র বলিয়াই অনেকটা বটে। আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর তিনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

শ্রীহরিঃ

আরমানিটোলা, ঢাকা।

চিরস্নেহাস্পদেষু— ২০শে মাঘ। ১৩০২

তোমার পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়াছি। কিন্তু আমি দশবার দিন অবধি Influenza অথবা অতি প্রবল কফরোগে কষ্ট পাইতেছি। এই হেতু প্রাপ্তি মাত্র তোমার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। তোমার পিতৃদেব স্বর্গগত পুরুষ ছিলেন। সসম্মানে জীবন যাপন করিয়া নিষ্পাপ দেহে ও সসম্মানে স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। তুমি তাঁহার জন্য শোক করিওনা, তাঁহার মত ধীর স্থির কার্য্যকুশল, সুহৃদ্বৎসল, পরোপকারী, পুণ্যাত্মা হইয়া তাঁহার প্রাণটা শীতল রাখিতে যত্নপর হইও। তাহা হইলেই তুমি সর্ব্বাংশে উন্নতি লাভ করিয়া জীবনে কৃতকার্য্য হইবে। যিনি চলিয়া গিয়াছেন, এ জীবনে তাঁহাকে আর দেখিবে না। আমাকে তাঁহার চিরস্নেহবদ্ধ অনুজ বলিয়া জানিও। আমি যে কয়দিন বাঁচিয়া আছি, সে কয়দিন তুমি অবান্ধব হইবে না। আমি চিকিৎসকগণের ভ্রমে প্রতারিত হইয়াছিলাম। চরম সময়ের দশঘণ্টা পূর্ব্বেও রোগকে লঘু মনে করিয়াছি। কিন্তু মানব জীবনে সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই এইরূপ ভ্রম ও প্রমাদ ঘটিয়া থাকে। সেজন্য পরিতাপ করি না। কিন্তু তিনি চলিয়া যাওয়ায় আপনাকে আপনি বড়ই দুর্ব্বল, দরিদ্র এবং অসহায় মনে করিতেছি। আমার দুঃখ তোমাকে বুঝাইতে পারি না। কার্য্যান্তে একবার এখানে আসিও। তখন সমস্ত কথা বলিব। * * *

Ever yours affectly
K. P. Ghosh.

এই পত্রখানি হইতেই স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের হৃদয়ের কত পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পাঠকগণ বুঝিবেন। শিশুকাল হইতেই পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁহার নিকট যাইতাম। তখন তিনি আমার প্রতি বড়ই স্নেহ দেখাইতেন এবং সময় সময় তাঁহার নিকট বসাইয়া খাবার খাইতে দিতেন। আমি মাইনর স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী হইতেই পিতৃদেবের উৎসাহে ঘোষ বাহাদুরের নিকট ইংরেজীতে পত্র

লিখিতাম। তিনি সরল ইংরাজীতে তাহার উত্তর দিতেন। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য বিশেষ কথা আমার মনে নাই।

আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে ঘোষ বাহাদুর তাঁহার নিকট যে একখানি পত্র লিখেন, তাহা আমার হস্তগত হইয়াছে। নানাকারণে পত্রখানির সমস্ত প্রকাশিত করিতে পারি না। আংশিক ভাবে উহা উদ্ধৃত করিলাম। এই পত্র হইতে পাঠকগণ রায় বাহাদুর সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন। পিতৃদেব বোধ হয় তাঁহাকে পত্র সহ আমার ভগ্নীর নির্ম্মিত একটা টুপি পাঠাইয়া দেন, এই পত্রখানি তাহারই উত্তরে লিখিত। পত্রখানি সমস্ত প্রকাশিত করিতে পারিলে অনেকেই ঘোষ বাহাদুরকে এক নূতন ভাবে দেখিতেন।

শ্রীহরিঃ

বান্ধব-কার্য্যালয়, ঢাকা
৮ই পৌষ, ১৩০২

শ্রীচরণকমলে অসংখ্য প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদং—

আমি আপনার কাছে বড় অপরাধী হইয়াছি। আপনি অত স্নেহ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, মাথার একটি টুপি পাঠাইয়াছেন, কিন্তু আমি এই কয়দিন তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেও সমর্থ হই নাই। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিলে আপনার দয়া হইবে। আমি পেটের অসুখে এবং আরও অনেক পীড়ায় শরীরে বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। তাকিয়ার উপর পড়িয়া থাকি এবং চক্ষে চস্‌মা দিয়া অধ্যায়ন করি, ইহা ভিন্ন আর কিছুতেই আমার স্ফূর্ত্তি নাই। যদি শরীরে স্ফূর্ত্তি থাকিত, তাহা হইলে আমি আপনার মত স্নেহকারী জনের কাছে সর্ব্বদাই পত্র লিখিতাম। মাথার টুপিটি পাইয়া এই শীতে বড়ই উপকৃত হইয়াছি। যিনি প্রতি বৎসরই আমার প্রতি মায়ের মত এত স্নেহ করেন, তাঁহাকে মা ডাকিতে পারিলে আমি বড় সুখী হইব। যদি নারায়ণের কৃপায় আর এক শীত পাই, তাহা হইলে আমার মাতাকে বলিবেন যে টুপীর ঘেড়টা যেন আর একটু বড় হয়। ছেলের মাথাটা খুব বেশী মোটা হইলে আর পাঁচজনে অবশ্য ঘৃণা করে। কিন্তু মাতা তাদৃশ বিরূপ সন্তানকে ঘৃণার চক্ষে দেখে না।

* * * * * * আমি শরীরে প্রকৃতই বড় কাতর হইয়াছি। এই পত্রখানি আরম্ভ করিয়াছি ৮ই পৌষ সমাপ্ত করিতেছি আজ ১০ই। আমার সেই পুরাতন ও পরীক্ষিত কর্ম্মক্ষমতা এই হালে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। * * * কয়েকটী বড় পণ্ডিত * * ফাঁকিতে মুগ্ধ হইল; দেশের সমাজ এবং বিশেষতঃ হিন্দু সম্প্রদায়কে বড়ই অপমান করিয়াছে। * * * * আর দেশের বড় বড় পণ্ডিতগণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপে চুপে * * * হইয়া সেই হিন্দুদ্রোহী পণ্ডিতকে ধান্যদূর্ব্বা ও পঞ্চরত্ন দ্বারা পূজা করিতেছেন। ইহা দাদা প্রাণে সহে না। আপনি এই মহামহোপাধ্যার চাটা মহামতিমদিগকে কিঞ্চিৎ আদ্দব ও * * * দিতে পারিলে হিন্দুমাত্রেই আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। নারায়ণের কৃপায় আপনার মঙ্গল হউক।

চিরস্নেহাশ্রিত সেবক
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ

আমার পিতৃদেবের মৃত্যু ১৩০২ সন ১৪ই মাঘ ঘটে। ইহার পরই রায় বাহাদুরের উপদেশ মতে আমি ভাওয়াল রাজ সরকারের চাকরিতে প্রবিষ্ট হই। এই অবধিই তাঁহার সহিত আমি বিশেষ সংসৃষ্ট হইয়া পড়ি। তাঁহার অন্তঃকরণ এত কোমল ছিল যে পিতার মৃত্যুর পর আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বালকের ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ভাওয়াল পরগণায় কালীগঞ্জ হাই স্কুলটি বহু পুরাতন ও বিশেষ পরিচিত। একমাত্র এই বিদ্যালয় দ্বারাই ভাওয়ালের মত অশিক্ষিত স্থান আজ উচ্চশিক্ষার আলোকে কতকটা আলোকিত হইতেছে। এই বিদ্যালয়টি রক্ষার কারণ একমাত্র স্বর্গীয় ঘোষ বাহাদুর বটেন। কালীগঞ্জ হইতে মুনসেফী আদালত গত ১৮৯৭ সালে স্থানান্তরিত হইলে ঐ বিদ্যালয়টি একেবারে বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। আমি নানাবিধ কারণ দেখাইয়া বিদ্যালয়টি রক্ষার জন্য তাঁহার নিকট পত্র লিখি। তিনি বিদ্যালয়টি রক্ষা করিতে সম্মত হয়েন এবং ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরকে তাহা জানান। ইহার পর তিনি স্বহস্তে বিদ্যালয়ের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। এই সম্বন্ধে কালীগঞ্জের সেই সময়ের মুনসেফ স্বর্গীয় এ, এম, বসুর ভ্রাতা ৺হরমোহন বসুকে তিনি যে পত্র লিখেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—

Dacca 9th April 1897

Babu,

Hara Mohan Bose

Secretary to the Kaliganj School.

Kaliganj.

Dear sir,

I am given to understand that you are going to give up the Secretary's place and are under the necessity of appointing some one else in that place. If it pleases you, I am perfectly willing to offer my humble services and would be very glad to take charge of the Secretarey's work and responsibility with Babu Kali Bhuson Mukherji who will work under my instructien as Assistant Secretary of the School.

Yours sincerely

Kali Prasnna Ghosh.

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে ৺ হরমোহন বাবুও রায়বাহাদুরকে এই বিদ্যালয়টি রক্ষার জন্য অনুরোধ করেন। রায়বাহাদুর যতদিন ইহার সম্পাদক ছিলেন, ততদিন ইহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করিতে কদাপি কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তিনি আমাকে ইহাও বলিতেন যে তিনি যে বিদ্যালয়ে সংস্পৃষ্ট তাহা সকল বিষয়ে না হউক, কোন কোন বিষয়ে যাহাতে আদর্শ হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

সুন্দর হস্তাক্ষরের তিনি বড় পক্ষপাতী ছিলেন। একমাত্র উহাদ্বারা অনেকে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। এবং অনেককে তিনি ঐ জন্য চাকুরি ও দিয়া গিয়াছেন। কালীগঞ্জ স্কুলে তিনি ইহার জন্য বিশেষ পারিতোষিক দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

আমি অল্পবয়সে পিতৃহীন হইয়া চাকুরিতে প্রবিষ্ট হওয়ায় তিনি সর্ব্বদাই আমাকে নানাবাক্যে উৎসাহিত করিতেন। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে

"আমি তোমা অপেক্ষা কম সম্বল নিয়া (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা) তোমারই এই বয়সে (২৪ বৎসরে) সরকারী চাকুরি নিয়াছিলাম।" ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি আমাকে পত্রিকার গ্রাহক হইতে বলেন এবং কতকদিন পরে ঐ জন্য ভাওয়াল রাজকোষ হইতে সাহায্য দিয়া আমার নামে একখানা দৈনিক "বেঙ্গলী" আনাইয়া দেন। ইংরেজী সম্বন্ধে তিনি বলিতেন "উহার মত সহজ ভাষা আর নাই এই ভাষায় মাত্র × × শব্দ আছে তাহা শিখিলেই ভাষায় Master হওয়া যায়।"

ভাওয়ালের ম্যালেরিয়ার ভয়েই তিনি সর্ব্বদা গরম কাপড় ব্যবহার করিতেন। এমন কি গ্রীষ্মকালে তিনি সর্ব্বদা গরম জামা ব্যবহার করিতেন। একদিন ভাদ্রমাসে বৃষ্টি হওয়ায় আমি একটা গরম আলোয়ান গায় দিয়া তাঁহার নিকট যাওয়ায় তিনি বড় খুসি হয়েন এবং বলেন "তোমার স্বাস্থ্যের প্রতি যে এত দৃষ্টি আছে তাহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।"

১৮৯৭ সালে তিনি "রায়বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হয়েন। ঐ উপলক্ষে আমি একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া তাঁহার নিকট পাঠাই। তাহাতে তিনি বড় বেশী হর্ষ প্রকাশ করেন এবং আমি কবিতা লিখিতে পারি ইহা জানিয়া বড়ই আনন্দিত হয়েন। এই উপলক্ষে তিনি আমাকে যে পত্র লিখেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

শ্রীহরিঃ

শরণমং

Dacca, 9th July

My dear Kali

I have been in very bad health since 6 weeks ago when I got a severe attack × × × × ×. My darling শ্রীমান্ টিটি, * the only son of your সুখেন্দুদাদা † has been suffering from remitent fever since the day of the earth-

* রায় বাহাদুরের প্রৌত্র শ্রীমান্ শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

† রায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ঢাকার পাব্লিক প্রসিকিউটার শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন ঘোষ, বি, এল্,।

quake. Then again we have been living in low godwns since the 12th june and do not see any hope of cheering prospects in the near future. For these reasons my mind has been very much depressed and this is why I did not write to you in reply to the extremely kind address (অভিনন্দন) you sent to me. But though I did not write to you, I blessed you from the bottom of my heart and I will preserve this precious *Souvnier* of your effectionate love till the end of my days. May God bless you and yours

Ever affectly
Kali Prasanna Ghosh

ইহার পর তাঁহার এই উপাধির খেলাত দান উপলক্ষে ঢাকাতে যে দরবার হয়, তাহাতে আমাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ১৩০৫ সনের ২৫শে বৈশাখ ডাকে এক পত্র লিখেন। ডাকের পত্র যদিইবা কোন কারণে না পৌঁছে, তজ্জন্য আবার ২৬শে বৈশাখ তারিখে লোকদ্বারা এক পত্র আমার নিকট পাঠান, ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের অগ্রহ ও স্নেহ বুঝা যায়। শেষ পত্রখানি এরূপ:—

শ্রীহরিঃ

ঢাকা
২৬শে বৈশাখ, ১৩০৫

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার নিকট গত কল্যকার ডাকে একপত্র লিখিয়াছি তাহা পাইতে পারিয়াছ কিনা জানিনা। তাই পুনরায় এইপত্র লিখিতেছি।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে ঢাকার কমিশনার আগামী ১১ই মে ২৯শে বৈশাখ বুধবার এখানে দরবার করিবেন এবং জগদীশ্বরের কৃপা হইলে ঐ তারিখে আমাকে উপাধির সনদ ও খেলাত দিবেন। ঐ উপলক্ষে কমিশনার সাহেব বাহাদুর দয়া করিয়া আমার আত্মীয় স্বজনদিগকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকে

অনুরোধ করিয়াছেন। অতএব তোমাকে লিখিতেছি তুমি এই পত্র পাওয়া মাত্র এখানে আসিয়া দরবারে যোগদান করিলে আমি সন্তুষ্ট হইব।

yours affly.

K. P.

বাঙ্গালা ১৩০৬ সনে মদ্‌রচিত "কুরুক্ষেত্রে কলঙ্ক" নামক কাব্য শেষ হয়। হস্ত লিখিত বই খানা দেখিয়া দিতে আমি উহা ঘোষবাহাদুরের নিকট পাঠাই। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বাবু উমেশচন্দ্র বসু দ্বারা বইখানা পরীক্ষা করান এবং নিজেও মাঝে মাঝে দেখেন। প্রায় একবৎসর পরে বইখানা আমাকে ফেরত দেন। ঐ সময় আমি একদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হই। তিনি আমাকে বই ছাপাইতে উৎসাহিত করেন এবং বলেন "ঐ একই বিষয়ের ২।৩ খানা বহির সঙ্গে তুলনা করিয়া তোমার বই খানাই ভাল লাগিয়াছে।" ইহার পর ঘোষবাহাদুর আমাকে এই ভাবে উপদেশ দিয়াছেনঃ—"দেখ বাবা, যে জীবনে প্রবেশ করিতে চাহ, উহাতে মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা, অর্থলোভ, ভালাবাসা ইত্যাদি কিছুই থাকেনা, ধীরে ধীরে সকলই ঘুচিয়া যায়। এই সব বুঝিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে * * " ইত্যাদি অনেক কথা বলেন, সমস্ত আমার মনে নাই।

ঘোষ বাহাদুরের সহিত ইউরোপের বহু পণ্ডিতের পত্রাদির আদান প্রদান ছিল। তিনি এরূপ পত্রের বিবরণ মাঝে মাঝে আমাকে বলিতেন। একদিন বিলাতের কোন বড় পণ্ডিত তাঁহার পুস্তক উপহার দিয়া লিখিয়াছিলেন" I am carrying coals to Newcastle" ঐ পণ্ডিতের নাম আমার স্মরণ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও তাঁহাকে কিরূপ সম্মান করিতেন, তাহা জানাইতে এই কথার উল্লেখ করিলাম।

তিনি অতিরিক্ত শিষ্টাচার পরায়ণ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একদিন একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। আমি তাঁহার নিকট বসিয়া আছি, ঐ সময় একটি যুবক উপস্থিত হইল। ঘোষবাহাদুর তাহাকে দেখিয়া দুইহাত বাড়াইয়া "আসুন আসুন বসুন" বলিতে লাগিলেন, সে যেন কত পরিচিত ও সম্মানের পাত্র। আমি ভাবিলাম যুবকটি কোন বড় ঘরের লোক হইবে।

যুবকটী ঘোষবাহাদুরের পুনঃ পুনঃ অহ্বানে থতমত খাইতে লাগিল এবং সে চেয়ারে বসিতে দ্বিধা বোধ করিতেছিল। কিন্তু ঘোষবাহাদুর তাহাকে না বসাইয়া ছাড়িলেন না। যুবক বসিলে পর তিনি তাহাকে বলিলেন "আপনি কে?" আমিত অবাক। বুঝিলাম যুবক তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। পরে বুঝিলাম যুবকটি তাহার বি, এ পরীক্ষার ফিসের সাহায্য প্রার্থী হইয়া অসিয়াছিল।

স্বর্গীয় মহাত্মার জীবনের আরও অনেক কথার আলোচনা করিব। তাহা সময়ান্তরে প্রকাশ করার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

দেশের সংবাদ।

উত্তর বিক্রমপুর।

দাতব্য চিকিৎসালয়—আউটসাহী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য এক কালীন দশহাজার টাকা দান করিয়াছেন। দেশের উন্নতি কল্পে যে সকল ধনশালী মহাত্মা অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না তাঁহারাই প্রকৃত মহাত্মা। আমাদের দেশে প্রত্যেক গ্রামেই এইরূপ ধনশালী ব্যক্তি আছেন যাহারা কোন না কোন সৎকার্য্য দ্বারা স্থানীয় অভাব উন্মোচন করিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সম্পাদন করিতে পারেন। রজনীবাবুর এই সদনুষ্ঠানের জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বিগত বৎসর বিদগাঁ নিবাসী ডাক্তার সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তও এইরূপ সদনুষ্ঠানের দ্বারা ঐ অঞ্চলের একটা অভাব দুরীভূত করিয়াছেন। দেশের সর্ব্বত্র এরূপ সদনুষ্ঠান অনুসৃত হইলে দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধিত হইবে।

* * * * *

স্বর্গীয় সারদাকান্ত সেন—সম্প্রতি কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম) নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত স্কুল সমূহের ডেপুটীইন্সপেক্টর সারদাকান্ত সেন মহাশয় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। সারদা বাবুর ন্যায়

কর্ম্মী, উৎসাহী, এবং ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। এবার শীতকালে তাঁহার সহিত আমাদের "বিক্রমপুরের" উন্নতি সম্পর্কে বিস্তারিতরূপে আলোচনা হইয়াছিল। সারদা বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন "দেখ, দেশকে ভালবাসা শুধু মুখে বলিলে হয় না, বক্তৃতায় লোক মাতাইলে হয় না—উহা প্রকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সুসম্পন্ন করা চাই। আমাদের বিক্রমপুরে বড় লোকের অভাব নাই, শিক্ষিত লোকের অভাব নাই, প্রচুর বিত্তশালী লোকের অভাব নাই। কিন্তু তবু দেখ, অন্ততঃ আমি তোমাকে অর্দ্ধশতাব্দীর কথা বলিতে পারি, দেশের আশানুরূপ কোন উন্নতিই সংসাধিত হয় নাই। কেন হয় নাই?—অনুসন্ধান করিয়া দেখ, প্রকৃত শিক্ষা লাভ আমরা করিতে পারি নাই। জীবনে, কাহারও কোনও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, শুধু নিজেদের লইয়াই আমরা ব্যস্ত থাকি। নিজেদের পারিবারিক গণ্ডী ছাড়াইয়া বাহিরের দশজনের কিছু উপকারের জন্য কেহই কিছু করিতে চাহেন না। মানুষ শুধু নীচ স্বার্থ নিয়া থাকিলে কখনও দেশের উন্নতি হইতে পারে না। একজন ইংরাজ নিজ দেশের উন্নতিকল্পে যেরূপ স্বার্থত্যাগে বা জীবন দানে উদ্বুদ্ধ হন আমরা তাহা হইতে শিখি নাই।" সারদা বাবু ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ পক্ষাপাতী ছিলেন। যাহাতে যুবক যুবতীরা শৈশব হইতেই ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সংযমী এবং প্রকৃত কর্ম্মী হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে তিনি চট্টগ্রামের একটী পাহাড়ে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমও স্থাপন করিয়াছিলেন। নিজে এবং পরিবারস্থ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যেও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের রীতি পালিত হয় সে জন্য বিশেষ লক্ষ্য রখিতেন। নিয়মানুবর্ত্তিতা, বাক্যে ও কার্য্যে ঐক্য সাধন ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রতছিল। তিনি "বিক্রমপুর" পত্রিকাকে এতদূর ভালবাসিতেন যে মৃত্যু শয্যায় শুইয়াও আমাকে লিখিয়াছিলেন, "তোমার "বিক্রমপুর" শেষ কয়মাস খুব নিয়মিত পাইয়া আমি খুব আনন্দিত হইয়াছিল। এতুর্দ্দিনেও তুমি যেরূপ উৎসাহের সহিত কাগজ চালাইতেছ তাহা বস্তুতই গৌরবের বিষয়। আমাকে কাগজ ভিঃ পিঃ করিওনা। আমার দেয় চাঁদা ঠিক ১লা বৈশাখ যাহাতে পাইতে পার তাহা করিব। যাহা কর্ত্তব্য, তাহার জন্য আবার তাগিদ দিতে হইবে কেন? আমি অত্যন্ত পীড়িত, যদি বাঁচি তাহা হইলে তোমাকে কাগজ সম্বন্ধে কতগুলি বক্তব্য জানাইব।" কিন্তু হায়! এই চিঠি পাইবার অব্যবহিত পরেই আমরা তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাই। সারদা

বাবুর মৃত্যুতে আমারা প্রকৃতই একজন বিক্রমপুরের সুসন্তানকে হারাইলাম। বারান্তরে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালী সৈন্য—বাঙ্গালী সৈন্যদলের বিক্রমপুর পরাণিমণ্ডল নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—দেখুন, আমি বিক্রমপুরবাসী, একথা মনে করিলে আমার বুক গৌরবে দশ হাত ফুলিয়া উঠে কিন্তু দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয়, যে বিক্রমপুর হইতে আশানুরূপ সৈন্য সংগ্রহ হইতেছে না। দেশের জন্য, রাজার কাজে, যদি আমরা দলে দলে অগ্রসর হইয়া সৈন্যদলে ভর্ত্তি না হই, তাহা হইলে ইহা বিক্রমপুরের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।" একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বস্তুতই আমাদের যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ আছে বলিতে হইবে। সম্প্রতি বানরি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান শ্যামাপদ দাশগুপ্ত বাঙ্গালী সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়াছেন। তাহাকে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, গ্রামবাসী ভদ্রমহোদয়গণ এবং উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেনগুপ্ত উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা দ্বারা বিদায় দান করিয়াছেন। শ্রীমান শ্যামাপদ ঢাকা হইতে করাচী যাত্রা করিয়াছে। মূলচর নিবাসী শ্রীযুক্ত অবলারঞ্জন মজুমদারও সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়াছেন। অবলা বাবু আমাদের স্বগ্রাম নিবাসী। আমাদের বিশ্বাস বিক্রমপুরে যুবকগণ নানাস্থান হইতে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতেছেন বলিয়াই আমরা সঠিক তথ্য জানিতে পারিতেছি না। আশা করি, বিক্রমপুরবাসী উৎসাহশীল বলিষ্ঠ তরুণ যুবকগণ স্বীয় মাতৃভূতির গৌরব রাক্ষার্থ, দলে দলে ব্রিটীশ পতাকাতলে সমবেত হইয়া প্রাচীন ইতিহাসের স্মরনীয় বীরভূমি "বিক্রমে বিক্রমপুরের প্রকৃত বিক্রম" এবং যশঃ অক্ষুণ্ন রাখিবেন। দিনাজপুরের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসা হইতে বিক্রমপুরস্থ আরিয়ল সরকার বাড়ীর শ্রীমান জগদীশচন্দ্র সরকার বেঙ্গল রেজিমেণ্ট দলান্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দিনাজপুর হইতে এই একটি মাত্র যুবক বেঙ্গল রেজিমেণ্টের দলে গিয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ এই যুবকটী বিক্রমপুরবাসী।

ঝড় বৃষ্টি—এবার দেশে খুব ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া পবনদেব স্বীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বাস্থ্য-মোটের উপর ভাল। কেবল দুইচারি গ্রামে মাঝে মাঝে ওলাউঠার উপদ্রব

হইতেছিল। শস্যের অবস্থা আশা প্রদ নহে। লড়াইয়ের দরুণ জিনিষ পত্রের মূল্য অতিরিক্ত বাড়িয়া গিয়াছে।

বিক্রমপুরের সুসন্তান—বিক্রমপুরের সুসন্তান, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, এবার ঢাকা সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পঠিত অভিভাষণ অত্যন্ত পাণ্ডিত্য ও গবেষণা পূর্ণ হইয়াছিল, আমরা উহা প্রকাশের চেষ্টা করিব। রমাপ্রসাদবাবু পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্ত্তা মার্সম্যান সাহেবের সহকারীরূপে একবৎসরকাল মান্দ্রাস নগরে অবস্থান করিবেন। এই সময়ে তক্ষশীলা, পাটলীপুত্র প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থান সমূহে গমন করিয়া পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন। তাঁহার এই নিয়োগে আমরা আন্তরিক আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি।

দক্ষিণ বিক্রমপুর।

শোক সভা—তুলাসার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকারী শচীনাথ সাহা মহাশয় সম্প্রতি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। কয়েক দিন হইল উক্ত বিদ্যালয়-প্রাঙ্গনে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ এক সভার অধিবেশন হইয়াছে। পালং এর সবরেজিষ্টার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু ছাত্র ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় সভায় উপস্থিত হইয়া শচীনাথ বাবুর গুণানুকীর্ত্তন করেন। সভাস্থলে মাত্র একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ প্রত্যেকে শচীনাথ বাবুর স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার্থ এককালীন অর্থদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। প্রায় দুই সহস্র টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। সভাস্থলে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে এই সংগৃহীত টাকার বার্ষিক সুদ হইতে এক বৎসর তুলাসার বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে বৃত্তি দান করা হইবে।

বিঝারী স্কুলের পুরস্কার বিবরণ—বিগত ২৯ মে উক্ত বিঝারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভার অধিবেশনে প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হইবার পর মসুবা গ্রাম নিবাসী বিক্রমপুরের

সুসন্তান হাইকোর্টের উকীল স্বর্গীয় ডাঃ প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের তৈলচিত্র উন্মোচিত হয়। সভাস্থলে ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা যতীন্দ্রবাবু, সভাপতি আনন্দ বাবু এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই মৃতব্যক্তির গুণানুকীর্ত্তন করেন।

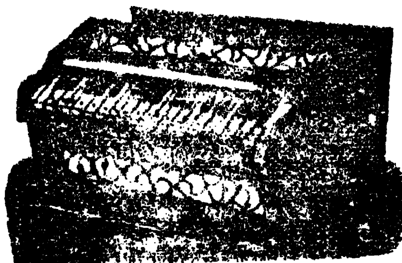
স্বাস্থ্য—এবার স্থানীয় স্বাস্থ্য ভাল। কোনরূপ সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয় নাই।

যুদ্ধঋণ—ভোজেশ্বরের পালবাবুরা ২৪৮০০ টাকা এবং উপশীর জমিদার বাবু তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ৯০০০ টাকা যুদ্ধঋণ প্রদান করিয়াছেন।

খেলাধূলা—ডোমসার গ্রামে ফুট খেলার ক্যাপ মেচের প্রতিযোগীতা চলিতেছে। দুঃখের বিষয় প্রত্যেক দলেই ভারাটিয়া খেলোয়ার আনান হইতেছে। ইহাতে বিক্রমপুরের কি গৌরবের কারণ আছে?

রাজসম্মান—পালং নিবাসী গৌহাটীর সরকারী উকীল স্বধর্ম্মানুরাগী মহাত্মা শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বি, এল, মহোদয় রাজার জন্মদিন উপলক্ষে "রায়বাহাদুর' উপাধিভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। ডোমসার নিবাসী, চট্টগ্রামের উকীল, মার্চেণ্ট ও বেঙ্কার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল রায় এম, এ, বি, এল, মহোদয়ও এবার রাজার জন্মদিন উপলক্ষে "রায়বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মানিত করা হইয়াছে। এজন্য আমরা সদাশয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

———



বিখ্যাত রেজিষ্টার

বি, বি, ফ্লুট হারমোনিয়ম।

আওয়াজ খুব জোর অথচ মিষ্ট। কাল পালিস করা সেগুণ কাষ্ঠে যন্ত্রটী প্রস্তুত এবং অন্যান্য মাল মসলা সকলই উৎকৃষ্ট ইহার কাজ অতি পরিপাটী এবং মজবুত অন্য সকল যন্ত্র অপেক্ষা এ যন্ত্র এদেশের হাওয়ায় অধিক দিন টিকিবে।

৩ অক্টেভ ১ সেট রিড ৪ ষ্টপ কেস সহ ১৫৲ হইতে ২৫৲ টাকা।

৩ অক্টেভ ২ সেট রিড ৫ ষ্টপ কেস সহ ৩০৲ হইতে ৪০৲ টাকা।

আর হরেক রকম করনেট ক্লারিওনেট বেহালা ও বেহালার সাজ ফ্লুট ও নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র এবং কারপেট, আসন সোফা ও গালিচা পাইকারি দরে পাইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়— অর্ডারের সহিত সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হয়। রেল ও পোষ্ট অফি সর নাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

বিপিন বিহারী দ. . এণ্ড সন্স।

৬৯নং রাধাবাজার,—কলিকাতা।



জবাকুসুম তৈল।

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়!

শিরোরোগের মহৌষধ।

এই নিদারুণ গ্রীষ্মের সময় যদি শরীরকে স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল রাখিতে ইচ্ছাকরেন যদি শরীরের দৌর্গন্ধ ও ক্লেশ দূর করিতে চান, যদি মস্তিষ্ককে স্থির ও বীর্য্যক্ষম রাখিতে ইচ্ছা করেন, যদি রাত্রে সুনিদ্রার কামনা করেন, যদি কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে বৃথা চিন্তা ও সময় নষ্ট না করিয়া জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করুন। জবাকুসুম তৈলের গুণ জগদ্বিখ্যাত, রাজা ও মহারাজ সকলেই ইহার গুণে মুগ্ধ।

১ শিশির মূল্য ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৵০

৩ শিশির মূল্য ২।০ টাকা ভিঃ পিতে ২৷৷৵০

১ ডজনের মূল্য ৮৸০ টাকা ভিঃ পিতে ১০৲ টাকা

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমি বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ দুই মাসের উর্দ্ধকাল ঢাকা হইতে অনুপস্থিত থাকার দরুণ এই দুইমাসে 'বিক্রমপুর' নিয়মিত প্রকাশ হয় নাই। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকও অনুগ্রাহকবর্গ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন। ভবিষ্যতে এইরূপ ত্রুটি হইবে না বলিয়াই ভরসা করি। আশ্বিনের কাগজ নির্দ্ধারিত সময়েই প্রকাশিত হইবে।

বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে 'বিক্রমপুরের' ন্যায় কাগজ পরিচালনা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য তাহা সর্ব্বসাধারণে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কিছুকাল 'বিক্রমপুর' পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন, উপস্থিত তিনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। 'বিক্রমপুর' পত্রিকার সহিত তাঁহার কোনরূপ সংস্রব নাই। অতএব 'বিক্রমপুর' সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে পত্রাদি লিখিতে হইলে আমার নিকট লিখিবেন।

গ্রাহকবর্গের মধ্যে যদি কেহ কোন সংখ্যার কাগজ না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বর লিখিয়া জানাইবেন, আমরা অপ্রাপ্ত সংখ্যা পাঠাইয়া দিব।

বিনীত নিবেদক

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শ্রাবণ ও ভাদ্রের সূচী।

১৩২৪ সন ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা।

বিক্রমপুর

৫ম বর্ষ } শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩২৪ { ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা।

বিবেক ও বৈরাগ্য।

গ্রহণ এবং ত্যাগই জীবিতের লক্ষণ, মৃতে এই দ্বিবিধ ক্রিয়ার অভাব দৃষ্ট হয়। অসার বস্তু ত্যাগ ও আহার্য্য পানীয়রূপে সার বস্তু গ্রহণ হেতু মানবদেহ রক্ষিত ও পুষ্ট হয়। ত্যাগের জন্য গ্রহণ এবং গ্রহণের জন্য ত্যাগ প্রাকৃতিক ক্রমে সতত অনুষ্ঠিত হইতেছে। নিশ্বাস গ্রহণ করিলেই প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়, এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে নিশ্বাসও গ্রহণ করিতে হয়, ইহার ব্যতিক্রমে জীবের জীবন রক্ষা হয় না। দৈহিক গ্রহণ ত্যাগ সহ বিবেক অনুস্যূত থাকে, মানব বায়ুর শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করে, আহার্য্য পানীয়ের দোষ গুণ, পরিমাণ এবং আহার পানের কালাকাল বিচার করে, সুতরাং দেহ রক্ষা ও পুষ্টির জন্য বিবেকবুদ্ধির প্রয়োজন, ইহার অভাবে দেহ রক্ষা হয় না।

মানসিক ত্যাগ গ্রহণাদিও তদনুরূপ, মানবের মন বাল্যাবধি ইন্দ্রিয়গত বহিঃসংযোগে নব নব ভাববৃত্তি গ্রহণ ও ত্যাগ করে, এই ত্যাগ গ্রহণই মানসিক সজীবতার লক্ষণ। কিন্তু মানসিক ত্যাগ গ্রহণ ও বিবেক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে মন ব্যামোহগ্রস্ত হয়, মানবের ধর্ম্মজীবনে এবং সাংসারিক জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত সতত পরিলক্ষিত হইতেছে। শরীরে বাল্য যৌবনাদি

অবস্থার ন্যায় মনেও বিভিন্ন অবস্থার বিবর্ত্তন হয়, বৈরাগ্যাবস্থাই মনের বার্দ্ধক্য, তখন নৈসর্গিক ক্রমে মনের ত্যাগ গ্রহণ উভয় শক্তি ক্ষীণ হইয়া অন্তকাল উপস্থিত হয়, তাহার পরিণাম মনের লয়।

বাল্যাবধি মানব মনে জ্ঞান পিপাসা এবং তদানুসঙ্গিক বিবেক বুদ্ধি নৈসর্গিক ক্রমে স্ফুরিত হয়, "ইহা কি? উহা কেন?" বালক ইত্যাকার প্রশ্ন দ্বারা পিতা মাতা অগ্রজাদিকে সতত উত্যক্ত করে, বালকের প্রশ্ন বিশেষের মীমাংসা করা বৃদ্ধেরও অসাধ্য হয়; এই জিজ্ঞাসা এবং বিবেক বলে বালক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হয়, এবং পদার্থের দোষ গুণ বিবেকপূর্ব্বক দুঃখদ হেয় বস্তু ত্যাগ এবং সুখদ উপাদেয় বস্তু গ্রহণ করে। বিবেকবুদ্ধি মার্জ্জিতা হইলে আপাতসুখদ প্রেয়ো বিষয় ত্যক্ত এবং আপাত ক্লেশপ্রদ কিন্তু পরিণামে শ্রেয়োবিষয় গৃহীত হয়, ঈদৃশ বিবেকই পশ্বাদি অপর জীবাপেক্ষা মানবের বিশেষত্ব প্রতিপাদন করে, এবং যাহার হৃদয়ে এই বৃত্তি প্রবল তিনিই মানব সমাজে বিশেষত্ব লাভ করেন।

মানবের সাংসারিক জীবনে সুখ বাসনা এবং আসক্তিসহ বিবেকের বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাতে বলাবলানুসারে কখন এই সহচরীদ্বয় এবং কখন বা বিবেক জয়লাভ করে। বাসনা ও আসক্তির সহচরী আখ্যার তাৎপর্য্য এই যে যত্র সুখবাসনা তত্র সুখদ পদার্থে আসক্তি, এবং ইহারাই সাহচর্য্যদ্বারা সংসারিজীবকে সর্ব্ববিধ সংসার ধর্ম্মে নিরত রাখিতেছে। যতকাল অবিদ্যাময়ী সহচরীদ্বয়ের প্রভাব প্রবল এবং বিবেক হীনপ্রভ থাকে ততকাল আপাত সুখদ বিষয়ের দোষ পরিলক্ষিত হয় না, সুতরাং মানব তাহাতেই অনুরক্ত থাকে, কিন্তু তাদৃশ অবস্থায়ও বিষয় বিশেষ পরিত্যক্ত এবং বিষয়ান্তর গৃহীত হয়, এই ত্যাগ গ্রহণ বিবেকজনিত নহে, ইহা অবস্থাজনিত, সুতরাং এতদবস্থায় ভাববৃত্তি কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না, ঈদৃশ জীবন নির্জীব বাচ্য।

অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ সহ বিদ্যালোচনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ধনাদি উপার্জ্জনোপায় অবলম্বন করেন, জীবন সসীম, কিন্তু জ্ঞান ও জ্ঞাতব্য অসীম, এই বিবেকবাণী তাহাদের কর্ণকুহরে সতত প্রতিধ্বনিত হয়, কেহ বিবেক বাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়া বিদ্বজ্জন মধ্যেও বিশেষত্ব লাভ করেন, নবতত্ত্ব উদ্ভাবন

বা আবিষ্কারপূর্ব্বক মানবসমাজের ইষ্ট সাধন, এবং গ্রন্থাদি প্রণয়নপূর্ব্বক বিদ্যার্থিগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন, অনেকেই অনবকাশের আপত্তি করিয়া বিবেকবাক্য অবহেলাপূর্ব্বক আত্মবঞ্চনা করেন, তাহাদের অর্জ্জিত বিদ্যা অচিরকাল মধ্যে বিনষ্ট হয়, ইত্যাকার জীবনেও সজীবতার লক্ষণ স্বল্প। গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ মাত্র স্বীয় সুখ সুবিধাদি স্বার্থত্যাগ না করিলে কেহই গার্হস্থ্য সুখভোগে সক্ষম হয় না, যে গৃহে গৃহস্বামী হইতে পরিবারস্থ নগণ্য নরনারী পর্য্যন্ত প্রত্যেকে আত্মসুখ সুবিধার চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক অপরের সুখ বিধানে যত্নবান হয়, সেই গৃহই সুখময়, একটি মাত্র বিবেক-বিহীন আত্মসুখপরায়ণ ব্যক্তির দোষে হিংসা-দ্বেষজনিত কলহানলে পারিবারিক সুখ শান্তি ভস্মাবশেষ হয়, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে; সুতরাং বিবেক এবং স্বার্থত্যাগই যে গৃহস্থাশ্রম ও গার্হস্থ্য সুখের ভিত্তি তাহার প্রমাণান্তর নিষ্প্রয়োজন।

বহির্ম্মুখ জীব স্বতন্ত্রাবস্থায় সুখবোধ করেনা তজ্জন্য পরিবার গঠন এবং সমাজ সংস্থাপন করে, অসভ্য মানব জাতির এবং বহুপ্রকার পশু পক্ষি কীট পতঙ্গাদিরও সমাজ দৃষ্ট হয়; রীতিনীতির তারতম্যানুসারে মানবসমাজ সভ্য ও অসভ্য আখ্যা প্রাপ্ত হয়। প্রথমে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ভাববৃত্তি ও প্রয়োজনানুসারে সমাজ শাসন প্রবর্ত্তিত হয়, ক্রমে সামাজিক বন্ধন ঈদৃশ দৃঢ় এবং শাসনতন্ত্র এরূপ কঠোর হয় যে নিতান্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও ব্যক্তি বিশেষ বা পরিবার বিশেষ তাহা ছিন্ন করিতে বা অবহেলা করিতে সাহসী হয় না। অনেক স্থলে সামাজিক কুনীতি এবং অসদ্বিধান হেতু কিংবা কাল বিবর্ত্তনে নব প্রয়োজন হেতু পূর্ব্ব প্রচলিত সমাজ-শাসনে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক অসুখ অশান্তি উৎপন্ন হয়, অথবা শাসন ফলে সমগ্র সমাজই সঙ্কটাপন্ন হয়, বিবেকবান, এমতাবস্থায় সমাজ, সামাজিক সম্বন্ধ এবং তাহার ফলাফল বিচার পূর্ব্বক স্বীয় এবং স্বপরিবারের স্বার্থচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সামাজিক প্রথার উৎকর্ষ সাধনে জীবনোৎসর্গ করেন; সমাজনীতিই যাহাদের স্বর্গ নরক নিয়ামক ধর্ম্মনীতি, সামাজিক বিধি প্রতিষেধ পালনে বা উল্লঙ্ঘনে যাহারা সতত স্বর্গে উত্থিত কিংবা নরকে নিপতিত হইয়া থাকে, তাহাদের ইত্যাকার স্বার্থত্যাগী বিবেকী লাঞ্ছিত হইতেছেন, এবং যাহাদের সহিত স্বর্গ নরকের ঘনিষ্ঠতা স্বল্প তাহাদের দ্বারা সমাজ সংস্কারকরূপে সম্মানিত

হইতেছেন; সর্ব্বত্রই ব্যক্তিবিশেষ বা বহুব্যক্তির বিবেকজনিত ত্যাগ গ্রহণ দ্বারা অসভ্য সমাজ সভ্য সমাজে পরিণত হইতেছে।

মানবসমাজসমষ্টিতে জাতি "Nation" এবং তদানুসঙ্গিক রাজ্য বা সাম্রাজ্য গঠিত হয়, সেই রাজ্য বা সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ স্বদেশ বাচ্য, স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গলে জাতীয়, সামাজিক পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত মঙ্গলামঙ্গল সঙ্ঘটিত হয়, স্বদেশ বিপন্ন হইলে স্বজাতি সমাজাদি সকলই বিপদগ্রস্ত হয়। বিবেকী বিচার নেত্রে ইহা দর্শন করিয়া ব্যক্তিগত পারিবারিক এবং সামাজিক মঙ্গলামঙ্গল উপেক্ষাপূর্ব্বক স্বদেশের কল্যাণ চিন্তা করেন।

সংসার দশায় বিবেকজনিত ত্যাগ গ্রহণ দ্বারা মানবের বিবিধ উন্নতি হইতেছে সত্য, কিন্তু সাংসারিক বিবেক বাসনা এবং আসক্তি শূন্য নহে; বাল্যের পুতুল ক্রীড়া হইতে স্বদেশের কল্যাণ সাধন পর্য্যন্ত প্রত্যেক কর্ম্মের অন্তরালে বাসনার ক্রিয়া, এবং পুতুল হইতে স্বদেশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিষয়ে আসক্তি বিদ্যমানা, বিবেকজনিত হেয় উপাদেয় বোধে এক বস্তু ত্যক্ত এবং বস্ত্বন্তর গৃহীত হয় মাত্র। ধর্ম্ম জগতেও এই ব্যক্তিদ্বয়ের ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। বিষয় সংযোগ বিয়োগ জনিত সুখ দুঃখাদি ও তাহার পরিণাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অনুভব্য, সুতরাং তদ্বিষয়ক বিবেক সহজসাধ্য, নিত্যানিত্য বিবেক অর্থাৎ বিষয় ও বিষয় সুখের অপূর্ণতা এবং অনিত্যতা বিচার করিয়া সংসারাসক্তি পরিত্যাগ যাদৃশ সহজ, অতীন্দ্রিয় সাধ্য ও সাধকের স্বরূপাবধারণ, সম্বন্ধনির্ণয় সাধনের প্রয়োজন এবং ফল নিরূপণ তাদৃশ সহজ নহে। অপ্রত্যক্ষ বিষয় নিরূপণে অনুমানই মানবের একমাত্র অবলম্বন, কিন্তু উপযুক্ত লিঙ্গাভাবে অনুমান দ্বারা তত্ত্বাবধারণ ও সত্যধর্ম্ম গ্রহণ অতীব দুরূহ।

এক শাস্ত্রবলে, অপ্রত্যক্ষ বিষয় নিরূপণে শাস্ত্র বাক্যই একমাত্র অবলম্বন, অপর শাস্ত্র বলে, শাস্ত্র বাক্যও বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করা কর্ত্তব্য * বেদ কোরাণ

* "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবানতাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ"॥
"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"
রঘুনন্দনধৃত বৃহস্পতি বচন
"যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মংবেদ নেতরঃ" মনু।

বাইবেলাদি বিভিন্ন শাস্ত্র বিভিন্ন সম্প্রদায় সত্যজ্ঞানে গ্রহণ এবং অসত্যজ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করে, একই শাস্ত্রের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাদ্বারা দ্বৈতাদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈতরূপ ত্রিবিধ মত প্রচলিত হইয়াছে, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে শাস্ত্রের সত্যাসত্য নিরূপণ ও লিঙ্গহীন অনুমান বা বিশ্বাস সাপেক্ষ। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছে "ক্ষুরস্যধারানিশিতাদুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ" এবং প্রকৃত পথ নিরূপণে সক্ষম তীক্ষ্ণ বিবেক ও বিবিক্ষা-সম্পন্ন ব্যক্তি চিরকালই বিরল॥

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মক্ষেত্র মাত্রই কল্পনা এবং বিশ্বাসের লীলাভূমি, ইহার প্রবৃত্তি মুখ মার্গসমূহ প্রশস্ত সরল এবং সহজগম্য, সেই হেতু "গবার মা" এবং "হবার পিসী" হইতে তর্করত্ন এবং শিরোমণি মহাশয় পর্য্যন্ত আপামর সাধারণ নরনারী তাহাতে নিয়ত সুখে পর্যটন করিতেছে, তাহাদের পথভ্রান্তির ও কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ পান্থ হইতে পথ প্রদর্শকের সংখ্যা নিতান্ত ন্যূন নহে। সুতরাং শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট শাণিত ক্ষুরধারবৎ দুস্তর ও দুর্গম পন্থা এবং এই সকল সহজগম্য ধর্ম্মপন্থা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইহা বিবেক সম্মত। প্রবৃত্তিমার্গের পথিক পরজন্মে বা পরলোকে গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু শ্রুতি নির্দ্দেশিত উক্ত পথাবলম্বি-পথিকের ইহকালেই গন্তব্যস্থান প্রাপ্তি ও পর্য্যটনের ক্ষান্তি হয় †

একের পারলৌকিক গন্তব্য স্থান অতীন্দ্রিয়হেতু অলক্ষ্য, লিঙ্গাভাবহেতু অননুমেয়, সুতরাং কাল্পনিক অপরের গন্তব্যস্থান ঐহিক সুতরাং প্রত্যক্ষ বা অনুভব্য। একের পাথেয় বিশ্বাস, অপরের পাথেয় বিবেক। উপাস্যের ব্যক্তিত্বই জাগতিক সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ভিত্তি, কারণ যাহা ব্যক্তিত্বহীন এবং ভূমা তাহা মানব-মন ধারণ করিতে বা উপাসনা করিতে সক্ষম নহে, ঈদৃশসাধ্যসহ সাধকের ভাব বিনিময় ও সম্ভবপর নহে, এই জন্যই পারসীর "ওরমাজদ" ইহুদির "জেহোভা" খৃষ্টানের "গড্" মুসলমানের "আল্লা" প্রভৃতি উপাস্য ব্যক্তিরূপে অনুকল্পিত। "জেহোভা স্বীয় অনুরূপ আকৃতিতে মানবসৃষ্টি করিয়াছিলেন" এই বাইবেল বাক্যে জেহোভার মানবাকৃতি প্রমাণিত হইতেছে, এই সকল ঈশ্বরই পূর্ব্বকালে মানবসহ কথোপকথন দ্বারা ভাব বিনিময় করিয়াছেন, তর্কস্থলে সর্ব্বব্যাপীস্বীকৃত হইলেও ধর্ম্মমন্দিরে এবং হৃদয়াভ্যন্তরে ঈশ্বর

† নতস্য প্রাণাউৎক্রমন্তি ব্রহ্মৈবসন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" বৃহদারণ্যক।

সসীম মানবাকার, এমন কি জেগোভা জেকবের সহিত একরাত্র মল্লযুদ্ধ ও করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পাশ্চাত্য ঈশচতুষ্টয় গৃহশূন্য, অর্থাৎ কাহারও গৃহিণী নাই, কেবলমাত্র জেহোভার একটী ঔরসজাত "Begotten" পুত্র আছে, কল্পনাদেবী সন্তান প্রসব না করিলে অপর ঈশত্রয়ের বংশ লোপেরই সম্ভাবনা॥

বৈদিক ও বৈদান্তিক ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব এবং পুরুষাদি শব্দ আত্মবাচক এবং ব্যাপ্ত্যর্থ ব্যঞ্জক * বেদ বেদান্ত শাস্ত্রের বহুস্থলেরূপক বর্ণনাও আছে, কিন্তু বিশ্বকারণে ব্যক্তিত্ব আরোপ তাহার লক্ষ্য নহে, শ্রুতি যে পরম পুরুষের বিরাট দেহ কল্পনা করিয়াছে তাহাও ব্যাপ্তি বা বিভুত্বজ্ঞাপক তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপে বেদ ও উপনিষদ্ হইতে কয়েকটী মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত হইল॥ †

পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে বিষ্ণুর এবং শিবের ব্যক্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে, হস্ত নয়নাদির সংখ্যায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও ইহারা মানবাকৃতি সম্পন্ন। গো মহিষের ধর্ম্মসংস্কার থাকিলে ভগবান্ বোধ হয় তদনুরূপই কল্পিত হইত। বৈয়াকরণ পুরাণ ও তন্ত্রকার ব্রহ্মের বিবাহ বিধান না করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, কারণ ব্রহ্মশব্দ ক্লীবলিঙ্গ, এবং বিষ্ণু ও শিবের সহধর্ম্মিনী ব্যবস্থাপূর্ব্বক পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

"স যোহয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বং"
"যৎসাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মাসর্ব্বান্তরস্তং" বৃহদারণক।
"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতাঃ" তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।
"তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥" যজুর্ব্বেদ।
"জ্ঞাত্বাশিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং" শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ"॥ মাণ্ডুক্য।
"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম।" ঋগ্বেদ।
"পরীত্যভূতানি পরীত্যলোকান্ পরীত্যসর্ব্বাঃ"
প্রদিশোদিশশ্চ।" সওতঃ প্রোতশ্চবিভুঃ প্রজাসু॥ যজুর্ব্বেদ।
"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতস্পাৎ" সহস্র শীর্ষাপুরুষঃ" "অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্র সূর্য্যৌ"
"সর্ব্বতঃ পানিলাদন্তং" "বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষি নাসিকঃ" যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌমূর্দ্ধা খং নাভিঃ" ঋক্ যজু ও অথর্ব্ববেদ।

ভগবদ্গীতাকার বিরাট পুরুষের ব্যক্তিত্ব এবং অর্জ্জুন ও অপরজীব হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন করিয়াছেন, কারণ অর্জ্জুন বলিতেছেন, "দৃষ্টালোকাঃ প্রব্যথিতা স্তথাহম্" সর্ব্বব্যাপীকে কিরীট গদা চক্রাদি অস্ত্র, দিব্যাভরণ, দিব্য মাল্যাম্বর ও গন্ধানুলেপন দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া ভগবদ্ভক্তগণের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, কিন্তু এই সুললিত কবিত্বপূর্ণ বর্ণনায় অজ্ঞের মন বিমোহিত হইলেও বিবেকীর হৃদয়ে তত্ত্ব সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয় যে "ব্যাসো-বেত্তি ন বেত্তিবা"॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ধর্ম্মক্ষেত্র কল্পনা ও বিশ্বাসের লীলাভূমি, ঈদৃশ ধর্ম্মক্ষেত্রের বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া জাগতিক কার্য্য কারণ বিবেক নেত্রে পর্য্যবেক্ষণ করিলে যাহা প্রতীয়মান হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে স্থানাভাব, সুতরাং অতিসংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

কার্য্যের নিমিত্ত ও উপাদানরূপ দ্বিবিধ কারণ দৃষ্ট হয়, যেমন অলঙ্কাররূপ কার্য্যের নিমিত্ত কারণ স্বর্ণকার, এবং উপাদান কারণ স্বর্ণ, নিমিত্ত কারণ এবং কার্য্যের সত্তা স্বতন্ত্র, একের অভাবে অন্যের ধ্বংস এবং একে অপরের ব্যাপ্তি বা স্থিতি অপ্রামাণ্য; যেমন অলঙ্কার ধ্বংসে স্বর্ণকারের মৃত্যু বা স্বর্ণকারের মৃত্যুতে অলঙ্কারের ধ্বংস কুম্ভকারে স্থিতি ও কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না॥ যদ্রূপ কার্য্যের ঈদৃশ নিমিত্ত কারণ কল্পনায় দ্বিবিধদোষ দৃষ্ট হয়, প্রথমতঃ তাহাতে শ্রুতি সম্মত ভূমাবিভু অনন্তাদি বিশেষণ যুক্ত হয় না, দ্বিতীয়তঃ পাত্র ও দেশগত পরিচ্ছিন্নতা হেতু তাহাতে কালতঃ পরিচ্ছেদ বা অনিত্যতা প্রতিপন্ন হয়, কারণ দেশকাল ও পাত্রগত পরিচ্ছেদের পরস্পর সাপেক্ষতা সম্বন্ধে প্রকৃতি অনাদিকাল হইতে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পক্ষান্তরে উপাদান কারণ হইতে কার্য্যের স্বাতন্ত্র্য সম্ভবপর নহে মৃদভাবে ঘটের এবং স্বর্ণাভাবে অলঙ্কারের অস্তিত্ব বন্ধ্যাপুত্রবৎ কিন্তু নিমিত্ত কারণ সংযোগ ভিন্ন একমাত্র উপাদান কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তির প্রমাণাভাব, মৃত্তিকা ও স্বর্ণ হইতে ঘট ও অলঙ্কার স্বতঃ উৎপন্ন হয় না।

"যতোবা ইমাণি ভূতানি জায়ন্তে" "তজ্জলান্ ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্র জগতকারণে জগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় প্রতিপাদন করিতেছে, এবং এই শ্রুত্যবলম্বনে বেদান্তদর্শন "জন্মাদ্যস্যযতঃ" এবং "প্রকৃতিশ্চঃ" সূত্রদ্বারা ব্রহ্মের নিমিত্তোপাদান

উভয় কারণত্ব অঙ্গীকার করিয়াছে, কারণ জগদীশ্বর জগতের একমত কারণরূপে স্বীকৃত হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটে। কিন্তু কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিচার দ্বারা জাগতিক কোন কারণে কার্য্যের নিমিত্তোপাদান রূপ দ্বিবিধ কারণত্ব প্রতিপন্ন হয় কি? সাগর মধ্যে তরঙ্গ বুদ্বুদাদির সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রত্যক্ষ হয় সত্য, কিন্তু বায়ু তাহার অন্যতম কারণ, কি লিঙ্গাবলম্বনে একাধারে দ্বিবিধ কারণত্ব ও কার্য্যের সৃষ্টি স্থিতি লয় অনুমিত হইতে পারে? উক্ত শ্রুতি মন্ত্রের এবং দার্শনিক সূত্রোক্ত তত্ত্বের অনুমানার্থে সর্ব্বজীবানুভূত এক মাত্র লিঙ্গ বিদ্যমান, তাহা মন এবং স্বপ্নরাজ্য॥

স্বপ্নরাজ্যের নিমিত্তোপাদান উভয় কারণ মন। স্বাপ্নিক বিষয়ের সৃষ্টি স্থিতি লয় মনেই হইয়া থাকে, উহার মনেতর স্বতন্ত্র সত্তা নাই, কর্ত্তা করণ কর্ম্ম, জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা, দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শনরূপে মনই বিবর্ত্তিত হয়, স্বাপ্নিক স্রষ্টা ও সৃষ্টি প্রকরণ রূপ লিঙ্গাবলম্বনে অনুমান, এবং শ্রুতি বাক্যে, প্রমাণিত হয় যে জগৎ কারণই জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত, কার্য্য ও কারণে তাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য নাই, যেমন নাম রূপের প্রতিলক্ষ্য হইলে স্বাপ্নিক বিষয় মনোময় এবং সত্তার প্রতি লক্ষ্য হইলে তাহা অসৎ প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ নাম রূপ যখন লক্ষ্য তখন বিবেক নেত্রে জগৎ ব্রহ্মময় বা আত্মময় প্রতিভাত হয়, এবং যখন সত্তা লক্ষ্য তখন স্বতন্ত্রাস্তিত্বাভাব হেতু জগৎ অসৎরূপে প্রতীয়মান বা নাস্তিত্বে পরিণত হয়। এই বিবেকজ জ্ঞান দ্বিবিধ, পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ, পরোক্ষ জ্ঞানী "স" এবং অপরোক্ষ জ্ঞানী "অহং" শব্দ ব্যবহার করেন * যে জ্ঞানিপুরুষ একত্বে বহুত্ব এবং বহুত্বে একত্ব দর্শন করেন, ভাষান্তরে, যিনি দৃশ্যমান খণ্ডত্বে এক অখণ্ড আত্মার বিবর্ত্তন বা ব্যাপ্তি দর্শন করেন, তাহার সাধ্য সাধকের স্বাতন্ত্র্য বোধ সম্ভবপর নহে, ঈদৃশ পুরুষের দৃষ্টিতে ধর্ম্মক্ষেত্র বালক্রীড়া ভূমি, এবং স্মৃত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বালবাচালতা মাত্র॥

"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম..
ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদংবরিষ্টং" মাণ্ডুক্য।
"স এবাধস্তাৎসউপরিষ্টাৎস পশ্চাৎ.......
সএবেদংসর্ব্বং॥
"অহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাৎ .....অহমেদং
সর্ব্বমিতি" ছান্দোগ্য।

এস্থলে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে এইরূপ বিবেক ও জ্ঞান সর্ব্বজীবে সম্ভবপর নহে, সুতরাং ধর্ম্মের প্রয়োজন। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে একাত্ম বিজ্ঞান লাভ দুরূহ এবং তাহার অধিকারী বিরল তাহাতে সন্দেহ নাই, এই জন্যই অনেক মহাপুরুষ বা অবতারাখ্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের বিবেকবুদ্ধি উপাস্যের বিভুত্ব এবং ভূমত্ব বা আনন্ত্য স্পর্শ মাত্র বিভ্রান্ত হইয়া উহার "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে, এই জন্যই অশরীরি অপ্রমেয় নিষ্কল চিন্ময় ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে, * এই জন্যই বৈদিক মহাদেব বেদবৃষ পরিত্যাগ করিয়া পৌরাণিক বৃষভারোহণ করিয়াছেন, এবং তান্ত্রিক ব্যক্তিত্বে অভিব্যক্ত হইয়া শিবাসহ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন॥ †
এই জন্যই নবীন নীরদ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতা, এবং শ্রীঅঙ্গের ব্রহ্মাখ্য আভায় রাসমণ্ডল আলোকিত ‡ যাহারা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরাখ্য জগৎকারণকে নিরাকার এবং ব্যাপী স্বীকার করেন, তাহারাও তাঁহাকে আত্মেতর রূপে মনন ও সম্বোধন করেন, আপনাকে দয়ার্হ পাপী এবং উপাস্যকে দয়াময় পরিত্রাতা বোধে ব্যাপ্ত ভগবানের স্বাতন্ত্র্য ও সঙ্কোচই প্রতিপাদন করেন, কারণ সাধক দেহের প্রতি পরমাণুতে, সাধকের মনে মননে, ভাববৃত্তি পাপ পুণ্য সাধন ভজনে, তাহার আমিত্বে এবং অস্তিত্বে যদি সাধ্যই বিরাজিত তবে সাধকের স্বতন্ত্র সত্তা প্রতিপন্ন হয় না, কে কাহার সাধন করে?

অনন্তের দেহ এবং ভূমার ব্যক্তিত্ব কল্পনা সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সাধন ভজনের ভিত্তি, বাস্তব, সরল বিশ্বাসী ভক্তের মানসনেত্রে চিন্ময় ধরা চূড়া বেণু নূপুরাদি পরিশোভিত ব্রহ্মজ্যোতিঃ পরিমণ্ডিত অপ্রাকৃত বপু প্রতিভাত না হইলে, কিংবা

---

* চিন্ময়স্যা প্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা॥
জ্ঞান সঙ্কলিনী।

† চত্বারিশৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষ
সপ্তহস্তা সোঅস্য ত্রিধা বৃষভোরোরবীতি
মহাদেবো মর্ত্ত্যা আবিবেশ॥ ঋগ্বেদ॥

‡ "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যতনুভ।"
চৈতন্যচরিতামৃত।

মানস দর্পণে চিন্ময় ব্রহ্মের নিরাকার শ্রীমুখ কমল এবং হস্তপদাদি প্রতিফলিত না হইলে, হৃদয়ে মধুরভাব বা পরাভক্তির আবির্ভাব হয় না, কিন্তু বিবেক নেত্র এই আকাশকুসুমের সৌন্দর্য্য দর্শনে অসমর্থ।

কোন কোন ভক্ত বা ভাবুকের এই অভিমত যে বৈদান্তিক ঋষিগণ ব্রহ্মের ভূমত্ব দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হইতেন, ঐশ আনন্ত্যের অন্ত না পাইয়া তাঁহাদের চিত্ত স্তম্ভিত হইত ; কিন্তু কিরূপে জগৎপতিকে পতিত্বে বরণ পূর্ব্বক প্রেমালিঙ্গনে বক্ষে ধারণ করিতে হয়, তাহা অভিনব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণই শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা উল্লিখিত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের বিশেষত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, অনন্তকে স্বার্দ্ধত্রিহস্ত মানবাকারে পরিণত করিয়া বক্ষে ধারণ অপ্রাকৃত মহিমার পরিচায়ক তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অহো! কল্পনার কি অদ্ভুত শক্তি, বিশ্বাসের কি বিস্ময়কর প্রভাব, ঋষির চিত্ত ব্রহ্মের ভূমত্বে স্তম্ভিত হইত, আমাদের চিত্ত মানব কল্পনা ও বিশ্বাসের অসীম মহিমা দর্শনে স্তম্ভিত হইতেছে।

ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন ভগবানের আবাসস্থান প্রয়োজন, তজ্জন্যই স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, নিত্যবৃন্দাবন প্রভৃতি নিত্যানন্দধাম কল্পিত হইয়াছে, ঐ সকল নিত্যধামে নিত্যানন্দ ভোগই ধার্ম্মিক জীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু শশবিষাণ দ্বারা কল্পনাখনি খনন করিলে কি কি তত্ত্বরত্ন লাভ হয়? পঙ্কিল সংসার সলিলে সুখতৃষ্ণা তৃপ্তা না হইতে পারে কিন্তু মরীচিকা জলে পিপাসা শান্তি কি সম্ভবপর? অনিত্য এবং অপূর্ণ পতির পার্থিব প্রেমে পরিতৃপ্তা না হইলেও কোন্ বিপ্রলব্ধা বন্ধ্যাপুত্র গলে বরমাল্য প্রদানার্থে খকুসুম আহরণে যত্ন করে? ইহজগৎ দুঃখময় দর্শনে যিনি আকাশস্থ গন্ধর্ব্বনগরে উপনিবেশ কামনা করেন, তাহার বাসনা সফল হয় কি? বিশ্বাসি ধার্ম্মিক কমনীয় কল্পনা কাননে বিচরণকরেন, ভাবিসুখপ্রত্যাশাজনিত সাময়িক সন্তোষই তাহার ধর্ম্মফল, কিন্তু মনাতীত ব্রহ্ম বিষ্ণু বা শিবাখ্য জগৎ কারণ সহ তাহার সাধনের কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ উপাস্য মনোগম্য বা বিষয়, তাহা ব্রহ্ম নহে। *

---

* "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
সামবেদীয় কেনোপনিষৎ।

ঈশ্বর প্রিয় এবং সয়তান হেয় কেন? এক সুখ শান্তিদাতা অপর সর্ব্ব দুঃখের নিধান রূপে কল্পিত! শ্যামল কিশোর রাখাল রূপ লীলারস রসিকা গোপাঙ্গনার এবং তাদৃশ ভাবাপন্ন ভক্তের নয়ন মনঃপ্রীতিকর হইলেও লীলারসানভিজ্ঞ কঠোর কর্ম্মীর বা জ্ঞানীর তাদৃশ রাখালরূপে সৌন্দর্য্যবোধের অভাবই স্বাভাবিক, কারণ "ভিন্নরুচির্হিলোকঃ" এবং সুখের সংস্কারও সর্ব্বজীবে এক নহে, কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় এবং বৈষয়িক সুখাতিরিক্ত কিছু জীব কল্পনা করিতে সক্ষম কি? না তাহা জীব করিতে পারে না, ভোগী ইহ সংসারে যে ভোগ করে এবং অপরের যে ভোগ দর্শন করে, তাহারই পূর্ণতা পরলোকে কল্পনা করে; এইজন্য খৃষ্টানের "পেরেডাইস" বা "হেভেন" মুসলমানের "ভিহিস্ত্" হিন্দুর স্বর্গ বৈকুণ্ঠ কৈলাসাদি স্থান পৃথিবীর অনুরূপ না হইলেও উহার সর্ব্ব পদার্থ পার্থিব গন্ধময়, ঈদৃশ বিষয় ভোগেই যদি ধর্ম্মজীবনের চরম লক্ষ্য তবে প্রবৃত্তি ধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রার্থনা ক্রন্দনাদি দ্বারা ভগবানকে উত্যক্ত না করিয়া এবং পরলোকের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ইহ জীবনের ভোগ্য আহরণ এবং ভোগ বাসনা চরিতার্থ করেন না কেন? প্রকৃতি প্রদত্ত ভোগ বাসনা সহ ভোগ্য আহরণ শক্তি সর্ব্বজীবে বিদ্যমানা, সেই শক্তির সদ্ব্যবহার না করিয়া অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধি বলে ভোগ্য আহরণ না করিয়া, স্তুতি মিনতি প্রার্থনা কি কর্ম্মঠতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক? ভোগ্য আহরণই ভোগীর ধর্ম্ম, এই নৈসর্গিক ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতি বুদ্ধি ও বিজ্ঞান বলে যে ভোগ্য আহরণ করিতেছে তাহা স্বর্গস্থ দেবতারও দুর্লভ, কারণ কোন দেশের কোন শাস্ত্রে ঈদৃশ ভোগোপাদানের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না; আর নৈসর্গিক ধর্ম্মভ্রষ্ট পরমুখাপেক্ষি অকর্ম্মণ্য হিন্দুজাতি প্রবৃত্তি ধর্ম্মাখ্য মরু-মরীচিকায় বিভ্রান্ত হইয়া বাসনা তাপে সন্তপ্ত হইতেছে। অহো! হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম ফল "দুঃখাদ্ দুঃখং জলাভিষেকবন্নজাড্য বিমোকঃ" সূত্রে সাংখ্য-দর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছে॥

অহেতুক প্রেম ভক্তি এবং নিষ্কাম কর্ম্মাদি দুর্ব্বোধ্য শব্দ সঙ্ঘাতে অবিশ্বাসির হৃদয় স্বতঃই জিজ্ঞাসা উদিতা হয় যে, ধর্ম্ম এবং তদঙ্গভক্তি প্রেম স্তুতি পূজা জপ প্রার্থনাদিতে কাহার প্রয়োজন? সাধ্যের কিংবা সাধকের? সাধ্য চিন্ময় প্রকৃতেঃ পরঃ বা অপ্রাকৃত, সুতরাং প্রাকৃতিক বা মায়িক মন এবং মানসিক

ভাব বৃত্তি তাহাতে সম্ভবপর নহে, তিনি আত্মতৃপ্ত আত্মরতি; সুতরাং সাধকের ভক্তি প্রেমাদি ভাব দ্বারা আনন্দময়ের সুখ বৃদ্ধি, ভক্তজনের আসঙ্গলিপ্সায় অধীর হইয়া ভগবানের বিরহ বেদনা, মূর্খ প্রভুর ন্যায়, নির্ব্বিকার ভগবানের আত্মপ্রশংসা অপ্রশংসাজনিত তুষ্টি রুষ্টি বিবেকসম্মত নহে। নৈবেদ্যাদিতে যে বিশ্বপতির কোন অভাব দূর হয় এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা সাধকগণ যে কোন বিষয়ে সাধ্যের প্রয়োজন সাধন করেন ইহা বিবেক স্বীকার করিতে পারেন কি ?

প্রার্থনা ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ, সর্ব্ববিধ স্তব স্তুতি সহ ধর্ম্মীর আন্তরিক প্রার্থনা অনুস্যূতা থাকে স্বয়ং সাধকের কিংবা শিষ্যবৃন্দের বোধগম্য না হইলেও ধর্ম্মে কাহার প্রয়োজন এবং কি উদ্দেশ্যে স্তব স্তুতি কৃত হয়, তাহা সম্ভবতঃ তাহাদের সর্ব্বজ্ঞ উপাস্য প্রার্থনা শ্রবণের পূর্ব্বেই জানিতে সক্ষম। সাংসারিক সর্ব্বকর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্ম কর্ম্মের মূলে ও দুঃখ নিবৃত্তি এবং সুখ প্রাপ্তির বাসনা, ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাখ্য শাস্ত্রীয় পুরুষার্থ * চতুষ্টয়, এবং অভিনব পঞ্চম পুরুষার্থ জীবের বাসনা বৃক্ষের সাধনা শাখার স্বতন্ত্র স্বাদযুক্ত পঞ্চ ফল। যিনি ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবারক, এবং ঐকান্তিক আনন্দ দাতৃরূপে কল্পিত, তাহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি প্রীতি স্বাভাবিক, কিন্তু নিঃস্বার্থ নহে। যদ্রূপ বায়ু সংযোগ ব্যতীত তটিনী তরঙ্গায়িতা হয় না, সঙ্ঘাত বিনা শব্দ উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ সুখ কিংবা দুঃখ সঙ্ঘাত ব্যতিত হৃদয়ে অনুরাগ কিংবা বিদ্বেষ বৃত্তির বিকাশ হয় না; সুতরাং অহেতুক ভক্তি প্রেম আকাশকুসুমবৎ। সংসার-ক্ষেত্রে সতত পরিলক্ষিত হয়, কোন প্রতিদান প্রার্থী প্রার্থনীয় বিষয় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রার্থনা করে "আমাকে ইহা প্রদান কর" দাতার বদান্যতায় যাহার দৃঢ় প্রত্যয় তিনি প্রার্থনীয় বিষয় নির্দ্দেশ না করিয়া দাতার উপর নির্ভর পূর্ব্বক বলেন "আপনার যাহা ইচ্ছা"। ধর্ম্মজগতেও কোন সাধক স্তব স্তুতি সাধনাদির প্রতিদানে ঐহিক এবং পারলৌকিক মঙ্গল প্রার্থনা করেন; সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে

* পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু।
চৈতন্যচরিতামৃত।

অসম্ভব, সুতরাং এই বাক্য ভগবানের প্রতি আশীর্ব্বাদ সূচক নহে, ইহা নির্ভরাত্মক প্রার্থনা মাত্র॥

দ্বেষ রাগৌহি সঞ্জাতৌ প্রতিকূলাণুকূলতঃ
স্বার্থৈরারভ্যতে সর্ব্বং সর্ব্বৈঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

সংসারক্ষেত্রের ন্যায় ধর্ম্মক্ষেত্রেও কোমল মনোবৃত্তির ক্রীড়াজনিত সুখ, সঙ্গ সঙ্গীত এবং উৎসবাদি জনিত আমোদ, আরাধ্যে ঐকাগ্র্য কালে দুঃখদ বিষয় বিস্মৃতি জনিত শান্তি এবং ভাবী সুখ প্রত্যাশার প্রাচুর্য্যই পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু দম্ভ ক্রোধ জিঘাংসাদি ক্রূড় বৃত্তির ক্রীড়া এবং তদানুসঙ্গিক দুঃখের ও অভাব নাই, শস্ত্র বলে সত্যধর্ম্ম প্রচারিত এবং রক্ষিত হইয়াছে, মানব মানবীর উষ্ণ শোণিত সিঞ্চনে ধর্ম্ম বৃক্ষ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, শতাব্দীত্রয় ব্যাপি "ক্রুসেইড" যুদ্ধে কত খৃষ্ট মুসলমান হতাহত হইয়াছে, কত শত নগর গৃহ সম্পত্তি সহ ভস্মসাৎ হইয়াছে, তাহা কে গণনা করিবে? "ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টের" বহু বৎসর ব্যাপি ধর্ম্ম যুদ্ধ "ইনকুইজিসনের" নৃশংস শাসন পাশ্চাত্য জগতে যে ভীতি অশান্তি এবং দুঃখ উৎপাদন করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। এতদ্দেশে ও হিন্দু বৌদ্ধের বিদ্বেষ বিসম্বাদ, সর্ব্বত্র সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব দ্বেষ পূর্ব্বোক্ত বাক্যের যাথার্থ্যই প্রতিপাদন করিতেছে; এমন কি ব্রজ গোপিকার মধুর ভাবাপন্ন প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিরীহ চরিত্রেও সাম্প্রদায়িক দ্বেষ এবং ক্রোধাদি বৃত্তির একান্ত অসদ্ভাব দৃষ্ট হয় না,—

"শ্রীবাসে করালি তুই ভবানী পূজন।
কোটী জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন॥"
"ভক্তি করি জ্ঞান মার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান॥"
"নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া॥"
"একজন পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
লোটী পোটী দাহ ভণি মারিল বলিতে॥

কৃষ্ণ নাম না লও কেন কৃষ্ণনাম ধন্য।
গোপী গোপী বলিলে বা কিবা হয় পুণ্য॥
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণ দোষোদ্গার।
ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিল প্রভু পড়ুয়া মারিবার॥
ভয়ে পলায় পড়ুয়া প্রভু পিছে ধায়।
আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায়॥"

অহো! শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও ঈদৃশ সাম্প্রদায়িক দ্বেষ এবং রোষ বিষ বিরহিত নহে। "অন্যাভিলাসিতা শূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতং" ঈদৃশ পবিত্র প্রেম ধর্ম্ম ও যখন ক্রোধ দ্বেষাদি দোষ শূন্য নহে তখন ধর্ম্মরাজ্যে শমতা জনিত সাম্যের অনুসন্ধান বিড়ম্বনা মাত্র॥

দম্ভ ক্রোধ প্রতিহিংসাদি বৃত্তি সতত বাসনা ও আসক্তির অনুসরণ করে, সংসার ক্ষেত্রে বা ধর্ম্মক্ষেত্রে এতদ্বিষয়ে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না, আততায়ি দস্যুপ্রক্ষিপ্ত শস্ত্রের ন্যায় স্বমতবিরোধি বাক্যবাণ ধার্ম্মিকের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করে, তখন তদ্রূপ প্রতিহিংসা বৃত্তিই হৃদয়ে উত্তেজিতা হয়। শত্রু দ্বারা স্বদেশ আক্রান্ত হইলে সংসারীর হৃদয়ে যদ্রূপ দুর্দ্দম্যা জিঘাংসা বৃত্তি উত্তেজিতা হয় স্বীয় সম্প্রদায় আক্রান্ত হইলে ধর্ম্মীর মনেও তদ্রূপই হইয়া থাকে। স্বীয় উপাস্য দেব গুরু কিংবা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতার প্রতি অপরের অবজ্ঞা দর্শনে ধর্ম্মির হৃদয়ে যে ক্রোধ উদ্দীপিত হয় তাহার দৃষ্টান্ত সংসারক্ষেত্রে বিরল।

নিতান্ত দাম্ভিক সংসারীও সময় বিশেষে স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতার ত্রুটি জনিত ভ্রম প্রমাদ স্বতঃ দর্শন করে, অপর ব্যক্তি উহা প্রদর্শন করিলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ত্রুটি স্বীকার পূর্ব্বক সংশোধন চেষ্টা করে, কিন্তু দাম্ভিক ধর্ম্মী স্বীয় ধর্ম্মমতে কদাপি ভ্রম প্রমাদ দর্শন করেন না, অপর ব্যক্তি প্রদর্শনে প্রয়াসী হইলে ধার্ম্মিকের বিশ্বাস ব্যামোহগ্রস্ত নয়ন নির্দ্দিষ্ট স্বীয় দোষ দর্শন না করিয়া প্রদর্শকের দোষানুসন্ধান করে। যে সকল ধার্ম্মিকের চিত্ত অপেক্ষাকৃত সংযতঃ চরিত্র গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, তাহাদের বাহ্য ব্যবহারে বা বাহ্যিক লক্ষণে প্রকাশিত না হইলেও হৃদয়ে এই নৈসর্গিক দ্বন্দ্ববৃত্তির ক্রিয়া অনিবার্য্য।

যদ্যপি বাসনাক্লিন্ন বিবেকনেত্র সম্যক দর্শনে সক্ষম নহে তথাপি মানব ইহার সাহায্যেই পার্থিব বিষয়ের দোষ গুণ নির্ব্বাচন করে, এবং বিষয় বিশেষ

ত্যাগ ও বিষয়ান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ধর্ম্মরাজ্যেও বিবেকের তারতম্যানুসারে কেহ দোষগুণ বিচার না করিয়া আমরণ কুলধর্ম্মই প্রতিপালন করেন, কেহবা উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, জগতে অবতার বা মহাপুরুষাখ্য যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই কুলধর্ম্ম ত্যাগ ও নবধর্ম্ম গ্রহণ ও প্রচার দ্বারা সজীবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

মানব জীবন প্রবাহে দুইটী ধারা সংসার এবং ধর্ম্ম। কোন জীবনে ধারাদ্বয় গঙ্গা যমুনা সলিলবৎ সংমিলিতা, কোন জীবনে স্বতন্ত্রপথগামিনী; কোন কোন জীবনে একটী অন্তঃসলিলা অপরটী তটবিপ্লাবিনী, কোন জীবনে তির্য্যক এবং কোন জীবনে ঋজুগতিতে সাগরোদ্দেশ্যে প্রবাহিতা হইতেছে। ধূর্জ্জটির জটাজালে গঙ্গাস্রোতাবরোধের ন্যায় সংসার ধারা যখন মায়ামোহজালে অবরুদ্ধা হয়, এবং জহ্নুদর সম গভীর বিশ্বাস গহ্বরে যখন ধর্ম্মধারা আবদ্ধা হয়, তখন একমাত্র বিবেক ভগীরথই উদ্ধার সাধনে সমর্থ; বিবেক দ্বারা পরিচালিতা হইলে উভয় ধারাই কালে বৈরাগ্য সাগরে সঙ্গতা হয়, কিন্তু আসক্ত জীব বৈরাগ্যের নামে বিভীষিকা দর্শন করে। "বন্ধু স্বজন বৈরাগ্যং হরদেবী হরপ্রিয়ে" প্রভৃতি প্রার্থনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

যে জীবের ভোগ বাসনা প্রবল এবং যিনি ভোগ্য আসক্ত তাহার সর্ব্ববৃত্তি প্রবৃত্তিমুখী, তিনি স্বীয় জীবত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়া ইহ বা পরলোকে ভোগ কামনা করেন, তাহার আরাধ্যও ভোগদাতৃ বা ভোগোপাদনরূপে কল্পিত ও উপাসিত হয়। ঈদৃশ ধর্ম্মের ভিত্তি বিশ্বাস, এবং বিবেকজ গ্রহণত্যাগবর্জ্জিত বিশ্বাসীর ধর্ম্মজীবন মৃতবৎ। পক্ষান্তরে যে জীবের ভোগ বাসনা পরিতৃপ্তা হইয়াছে, যাহার ভোগোপকরণে এবং ভোগায়তনরূপ জীবত্বে প্রয়োজন নাই সেই বিবেকি পুরুষই নিবৃত্তি মার্গের পথিক, এবং বৈরাগ্যই তাহার পাথেয়। অতঃপর আমি বৈরাগ্যের স্বরূপ বিচার করিব।

বিবেকনেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে ক্ষণবিবর্ত্তনশীল নামরূপের অন্তরালে জড়জগতের স্বতন্ত্র সত্তালক্ষিতা হয় না; যাহা নামরূপে বিবর্ত্তিত, তাহার তত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত অনুসন্ধিৎসু বিবেক সূক্ষ্মত্বে এবং আনন্ত্যে আত্মহারা হয়, যাহা অজ্ঞের অনন্ত তাহাই নামরূপে বিবর্ত্তিত দর্শনে বিবেকী জগতের

সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় এবং স্বতন্ত্রস্রষ্টা স্বীকার করেন না; একত্বে বহুত্ব ও বহুত্বে একত্ব এবং অব্যক্তের নামরূপ গুণে অভিব্যক্তি যিনি বিবেকনেত্রে দর্শন করিয়াছেন, তাহার রূপগুণ তারতম্যে হেয় উপাদেয় বোধ জনিত ত্যাগ গ্রহণ স্পৃহা বিবর্জ্জিত বৃত্তিই বৈরাগ্য বাচ্য।

যিনি স্বীয় সুষুপ্তি বিচার করিয়াছেন, সুপ্ত অহঙ্কারসহ মানসিক সর্ব্বভাব এবং সর্ব্ববৃত্তির লোপ বিবেকনেত্রে দর্শন করিয়াছেন, তিনি এই প্রাত্যহিক উপলব্ধিরূপ লিঙ্গাবলম্বনে ভক্তি প্রেমাদিভাব এবং তজ্জনিত দেব বা মনুষ্যসহ ঐহিক ও পারলৌকিক সম্বন্ধ, আশা নিরাশা সুখ দুঃখাদি সর্ব্ববিষয়ের পরিণাম অনুমানে সক্ষম, সর্ব্বভাববৃত্তি সম্বন্ধের অনিত্যতা প্রতিপত্তিহেতু ঈদৃশ বিবেকির হৃদয়ে যে আসক্তি বিরক্তি বিহীনবৃত্তি উন্মেষিতা হয় তাহার নাম বৈরাগ্য।

যাহা দেশকালপাত্রে অসীম, বা যাহা নিত্যবিভু এবং পূর্ণ, তাহাই অনন্ত বাচ্য, বিভাজক স্বতন্ত্র পদার্থের অভাবে অনন্তের অংশভাগ সম্ভবপর নহে, এবং অনন্ত হইতে স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব ও অসম্ভব, যিনি এই তত্ত্ব বিবেকপূর্ব্বক সমুদ্রে তরঙ্গবৎ স্বীয় আমিত্ব অনন্তের অন্তঃভূত দর্শন করেন, তাহার কাম্যাকাম্য বিষয়ের অভাব হেতু হৃদয়ের যে প্রসন্নতা তাহাই বৈরাগ্য।

যিনি বিবেকবলে পঞ্চকোষাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক স্বীয় নিষ্কল চৈতন্যসত্তা অবগত হইয়াছেন তাহার স্বর্গমোক্ষাদি সর্ব্বাভিলাষ শূন্য উদাসীন ভাবই বৈরাগ্য॥

সংক্ষেপতঃ বিবেকজনিত সম্যক দর্শনের ফল বৈরাগ্য, এবং বৈরাগ্য ফল দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তি॥

যদ্যপি বাসনা এবং আসক্তির অনুরোধেই জীব সর্ব্বকর্ম্মে ব্রতী হয়, তবে ইত্যাকার বৈরাগ্যবানের স্থানুবৎ নিষ্ক্রিয়ত্বই কি স্বভাব নহে? না, নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপিজাতুতিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" কর্ম্মই জীবত্বের স্বভাব, বৈরাগ্যবান ও কর্ম্মী, কিন্তু তাহার কর্ম্ম ফলাভিসন্ধিশূন্য, বিরাগী সংসারক্ষেত্রে নিষ্কাম নির্ভীক কর্ম্মবীর, এবং বিক্ষেপের কারণাভাব হেতু বিরাগী নিত্যযুক্ত যোগেশ্বর; কিন্তু ঈদৃশ বৈরাগ্যবান্—

"নিঃস্তোত্রো নির্ণমস্কারঃ পূজ্যপূজা বিবর্জ্জিতঃ
ন কৃতে না কৃতে নার্থো ন শ্রুতিস্মৃতি বিভ্রমৈঃ॥"

সোহংস্বামী

প্রেম-রাণী।

আমার হৃদয়খানি তোমারি আসন
অয়ি দেবী, অয়ি রাণী মোর,
তুমি সেথা নিশিদিন রেখেছ চরণ
কি স্বপনে করিয়ে বিভোর!
ধরণীর কোলাহল আছে দূরে পড়ি'
ছিন্ন আজি সকল বাঁধন,—
থেমে গেছে সাগরের উদ্বেল লহরী
অন্ধ বুঝি পেয়েছে নয়ন!
হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রি! কি আনন্দ আজ
কি নিঃসঙ্গ নীরব জীবন,—
লভিয়াছি অবসর—সাঙ্গ সব কাজ—
তোমা মাঝে হইতে মগন!
কতকাল কেটে গেছে দেখিনি তোমায়
শুনি নাই তব মধু বাণী,—
বহিয়াছি অবিরাম নিঠুর ধরায়
কি দারুণ অদৃষ্টের গ্লানি!
হেরি আজ সীমাহীন আকাশের মত
তুমি আছ ঘেরিয়া আমায়,
যত দূরে সরে গেছি, অলক্ষিতে তত
পড়িয়াছি বাঁধা ওই পায়!
ধরিতে ছুঁইতে তোমা নাহি পারি কভু
নিরখিতে নাহি অধিকার,—
প্রেমময়ী, ধ্যানময়ী, মনে হয় তবু
তুমি শুধু একান্ত আমার!
মোর সাথে তুমি বুঝি তোমারি পূজার
অর্ঘ্য কত করেছ রচনা,—

ভাবিয়াছি বৃথা আমি, অজ্ঞাতে আমার
হয়ে গেছে সার্থক সাধনা!
জন্ম-জন্মান্তর ধরি এমনি—এমনি
চলিতেছে প্রেম-অভিনয়,--
তুমি মোর প্রেম-রাণী, নিব ধন্য গণি'
হব যবে তোমাতে বিলয়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

কানাই পাটনী।

(গল্পময়)

কানাই পাটনী, চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী মাধবপাশার "রাজার বেড়ে" খেয় দিত। চন্দ্রদ্বীপের সৌভাগ্যের দিনের চিহ্ন "দুর্গাসাগর" এবং একটী ভগ্ন কামান ভিন্ন আর কিছুই নাই। "রাজার বেড়" রাজবাড়ীর গড়খাই ছিল, সেটা এখন নদীতে পরিণত হইয়াছে কিন্তু আজিও সেই পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি, নামের সঙ্গে জড়াইয়া রাখিয়াছে। জেলার পশ্চিমদিগের লোকদিগের তড়ে * এই নদীর খেয়া পার হইয়া বরিশাল যাইতে হয়।

আমার যখন প্রথম যৌবন, তখন আমি কানাই পাটনীকে দেখিয়াছি, সে আজ অন্ততঃ চল্লিশ বৎসরের কথা।

একবারের বেশী তাহাকে দেখিয়াছি, বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু সেই একবারেই তাহার চেহারা ও বাড়ীঘর আমার মনের মধ্যে ছাপা রহিয়াছে। এরূপ হওয়ার দুইটী কারণ ছিল।

একটী কারণ এই যে, তখন ও আমি এরূপ ঘনিষ্টভাবে এমন দুঃখী-গৃহস্থ দেখি নাই। বেহার ও ছোটনাগপুরে আসার পূর্ব্বে গৃহস্থের এমন শোচনীয় অবস্থা আগে আর চক্ষে পড়ে নাই। তার কালোরং যেন ছাই মাথান;

---

* "তড়ে" শব্দটা পূর্ব্ব বাঙ্গলায় প্রচলিত। "তট" হইতে তড় শব্দের উৎপত্তি। এটী "খুস্‌কী" শব্দ অপেক্ষা শুদ্ধ ও মধুর। (লেখক)

মাথাটীতে শাদায় কালোয় চুল, গায়ে কি মাথায় তেল মাথার চিহ্ন নাই। গলার কণ্ঠা ও বুকের হাড়গুলি ভাসিয়া উঠিয়াছে। পুকুরের জল বিষাক্ত হইলে মাছগুলি উপরে যেমন ভাসিয়া উঠে ঠিক সেইরূপ। পেটে পিঠে লাগিয়া গিয়াছে; বোধ হইল যেন সেই দুপ্রহর বেলা অবধি সে বৃদ্ধ কিছুই খায় নাই, খেয়া দিতেছে। বৃদ্ধের দাঁতগুলি বেশ পরিষ্কার এত কষ্টের মধ্যেও তাহার মুখখানি কি প্রফুল্ল!

খেয়া ঘাটের উপরেই তাহার ভাঙ্গা কুটীর। খুব ছোট একখানি খড়ের ঘর, হোগ্‌লা পাতার বেড়া, তার নানাদিকে ভাঙ্গা, ফাঁক ফাঁক। চালাখানির সকল স্থানে খড় নাই; বাঁশ বাকাড়িগুলি ঘুণে ধরা, চালাটী যেন মরিবার আগে গা ছাড়িয়া দিয়া নুইয়া পড়িয়াছে।

এই কুটীরের সম্মুখের উঠানটুকু কি সুন্দর! পাটনী-বধূ অন্য কাজের অভাবে উঠানখানাকে বোধ হয় বহুবার ঝাঁট দেয়, সিন্দুর পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়, এমনি পরিষ্কার। ঘরের পোতা খানিকেও লেপিতে লেপিতে খুব মসৃণ করিয়া রাখিয়াছে।

এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দুই একটী সন্তান লইয়া এই বাড়ীতে বাস করিত।

কানাই পাটনী নিজের হাতে নৌকা বাহিয়া তখন নদী পার করিতে পারে না, যে সকল পথিক পার হইবে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈঠা টানিয়া নৌকাখানিকে পারাপার করে, পাটনী নৌকায় বসিয়া বসিয়া থাকে, নৌকা কিনারায় ভিড়িলে খোঁটার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে। যাহারা পার হয় তাহাদের কেহ এক পয়সা দেয়, অধিকাংশ লোকই কিছু দেয় না। পাটনীও সেজন্য জোর জবরদস্তী কি তর্ক বিতর্ক করে না, সে জানে যে, তাহার নিজের পার করার শক্তি নাই, লোকেরা নিজেরাই পার হয়, তাহাকে যা দেয় তাই বেশী।

অবস্থা যাহাই হউক, কানাই পাটনী ইচ্ছা করিলে একটু ফিট্‌ফাট্ থাকিতে পারিত, কিন্তু সে তাহা করে নাই।

তার রুক্ষ চেহারা দরিদ্র বেশ, জীর্ণ বসন, পর্ণ কুটীর একদিকে, অন্যদিকে তার পরিচ্ছন্ন উঠান মসৃন মার্জ্জিত ঘরের পোতা পরিষ্কার দাঁত ও প্রফুল্ল মুখ আমার কাছে খুব নূতন ঠেকিয়াছিল।

তাহাকে মনে রাখার দ্বিতীয় কারণটী বলিতেছি, সেইটীর জন্যই আজ কানাই পাটনীর কথা ছাপার অক্ষরে স্মরণীয় করিয়া রাখিতে চাহিতেছি।

যে পথিকদের সঙ্গে আমি একত্রে যাইতেছিলাম, তাহাদের কাছেই এই পুণ্য-কাহিনী শুনিলাম; সংক্ষেপে বলিতেছি।

তখন কানাই পাটনী বৃদ্ধ হয় নাই, সে প্রৌঢ়। এক ভদ্রলোক, পৈত্রিক তালুকের সূর্য্যাস্তের খাজানা দেওয়ার জন্য টাকাও নোট কাগজে একটী পুঁটলী করিয়া হাত ব্যাগের মধ্যে ভরিয়া বরিশাল সহরে যাইতেছিলেন। সন্ধ্যার পরে তিনি কানাই পাটনীকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া পার হওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন সেই রাত্রেই তাঁহাকে সহরে যাইতে হইবে। ভদ্রলোকটী নৌকায় উঠিয়া ব্যাগটী খুলিয়া জিনিসপত্র ঠিক ঠাক করিয়া লইলেন, এবং ব্যাগের তলদেশ হইতে গুড়ুক তামাকের পুঁটলীটী ও হুকো কল্‌কে বাহির করিয়া লইতে ভুলিলেন না। ইচ্ছা যে পার হইয়া এক সিলিম তামাক সাজিয়া টানিতে টানিতে রাস্তা চলিবেন, জ্যোৎস্না রাত্রি ভয় কি? সঙ্গে একজন চাকরও ছিল।

ভদ্রলোক বরিশাল পৌছিয়া রাত্রিতে চক্রবর্ত্তীর হোটেলে ছিলেন। ভোর বেলায় ব্যাগ হইতে কাপড় বাহির করিতে যাইয়া চমকিয়া উঠিলেন, টাকার পুঁটলীটী নাই! "সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া ব্রাহ্মণ দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সকলে মিলিয়া অনেক অনুসন্ধান করিল কিছুই খোঁজ পাওয়া গেল না।

হোটেলের মালিক চক্রবর্ত্তী বলিল, "বোধ হয় বাড়ীতেই ফেলিয়া আসিয়াছেন, এখানে আনিলে যাবে কোথায় আমার এ হোটেলে কস্মিনকালেও চুরী চামারী নাই" হোটেলবাসী সকলেই তার কথার সমর্থন করিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই হোটেলে প্রথম আসিয়াছে; তাহারা ইহার "কস্মিনকালের" খবর কিছুই রাখেনা।

ব্রাহ্মণ উন্মত্তের মতন হইলেন। আগামী কল্য লাটের খাজানা দাখিল না করিলে পৈত্রিক তালুক নিলামে উঠিবে। এই তালুক হইতে ভরণ-পোষণ, দোল দুর্গোৎসব, বারমাসের তের পার্ব্বন, অতিথি সৎকার ইত্যাদি সমস্ত খরচ চলিয়া আসিতেছে। ইহা নিলাম হইয়া গেলে কি উপায় হইবে? আবার এতগুলি টাকা সংগ্রহ করা, তাহার পক্ষে অসম্ভব কার্য্য। সঙ্গের চাকরটী

বলিল, "দাদাঠাকুর, তুমি খেয়া নৌকায় ব্যাগ হইতে তামাক বাহির করিতে গিয়া হয়ত টাকার পুঁটলীও বাহির করিয়াছিলে, ভু'লে সেটী আর তুলিয়া রাখ নাই।" ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, ইহা অসম্ভব নয়। হায়রে নেশা, তামাকের জন্য তালুক গেল।

ভদ্রলোক কাহাকেও কিছু না বলিয়া মাধবপাশার খেয়াঘাটের দিকে ছুটিল, চাকরকেও সঙ্গে লইল না, সে যেরূপ দৌড়াইয়া চলিয়াছে, অন্য লোক তার সঙ্গে যাওয়া কোনও পক্ষেরই সুবিধাজনক নহে।

চারি ঘণ্টার রাস্তা দুই ঘণ্টায় চলিয়া ভদ্রলোক যখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে খেয়াঘাটে পৌছাইলেন, তখন উঠানে বসিয়া কানাই পাটনী তামাক খাইতেছিল। ব্রাহ্মণ তাহার কাছে যাইয়া—পায়ের কাছে প্রায় মূচ্ছিত হইয়া পড়িল। কানাই চমকিত হইয়া, সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি হইয়াছে ঠাকুর মশাই ?" ব্রাহ্মণ বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিল, "কানাই আমায় খুন করে ফ্যাল, আমি এই নদীতে ডুবিয়া মরিব, আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে।"

কানাই কলিকাটী লইয়া ব্রাহ্মণের কাছে ধরিয়া বলিল, "দাদাঠাকুর একবার তামাকটী খাও, স্থির হও, প্রাণ দিলে কি হইবে ?"

শোকার্ত্ত ব্রাহ্মণ তামাক খাইয়া একটু সুস্থ হইয়া সমস্ত বিবরণ বলিয়া হাহুতাশ করিতে লাগিল। কানাই পাটনী আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া ঘরের কোণ হইতে একখানা খন্তা বাহির করিয়া লইয়া ইঙ্গিতে ব্রাহ্মণকে তাহার সঙ্গে যাইতে বলিল। ব্রাহ্মণ মন্ত্রমুগ্ধের মতন সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

বাড়ীর দক্ষিণদিকে কয়েক ঝাড় কলাগাছ, তাহারই একটী গাছের গোড়া কানাই পাটনী খন্তা দিয়া খুঁড়িতে লাগিল, ব্রাহ্মণকে মাটি তুলিতে বলিল। যখন প্রায় একহাত খোঁড়া হইয়াছে, তখন মাটি তুলিতে যাইয়া ব্রাহ্মণের হাতে একটী পুঁটলী ঠেকিল, তুলিয়া দেখিল তাহারই টাকার পুঁটলি। তখন তাহার হস্ত অবশ হইয়াছে, সেই অবশ হস্তে টাকার পুঁটলিটী ধরিয়া সে পলকহীন নয়নে অবাক হইয়া পাটনীর মুখেরদিকে তাকাইয়া আছে। তাহার আনন্দ ও বিস্ময়েরভাব ভাষায় বর্ণনা হয় না। আর কানাই পাটনী এই গচ্ছিত গুপ্তধন অধিকারীর হাতে বুঝাইয়া দিয়া যেরূপ নিশ্চিন্ত হইল এবং আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিল তাহারও বর্ণনা হয় না।

কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ যখন কথা বলিতে সক্ষম হইল, তখন জিজ্ঞাসা করিল, "কানাই, এত দূরে আনিয়া পুঁতিয়া রাখিয়াছিলে কেন?" পাটনী বলিল "মাগীর ডরে, মেয়েমানুষ কি জানি যদি তার লোভ হয়?"

"ভক্তমাল" গ্রন্থে লিখিত আছে, এক কাঠুরিয়া পরিবার, স্বামীর নাম অঙ্কা এবং স্ত্রীর নাম বঙ্কা, তাহারা জঙ্গলে কাঠ কাটিয়া উহা বিক্রয় করিয়া দৈনিক সংসার খরচ চালাইত। একদিন স্বামী স্ত্রী কাঠের বোঝা মাথায় লইয়া ঘরে ফিরিতেছিল, অঙ্কা আগে আগে চলিয়াছে, বঙ্কা বোঝা লইয়া চলিতে পিছাইয়া পড়িয়াছে। অঙ্কা দেখিল রাস্তার একপাশে জঙ্গলের ধারে কয়েকটী স্বর্ণ মুদ্রা পড়িয়া আছে। দেখা মাত্র সে কতকগুলি ধূলী লইয়া উহার উপর চাপা দিল।

দূর হইতে বঙ্কা দেখিতে পাইয়াছিল যে, তাহার স্বামী সেখানে অবনত হইয়া কি করিল। ঘরে যাইয়া স্ত্রী, স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল যে, রাস্তায় নুইয়া পড়িয়া সে কি করিতেছিল? স্বামী সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল, তখন স্ত্রী, স্বর্ণ মুদ্রার লোভ করাত দূরের কথা, বলিল যে, মাটীকে তুমি মাটী চাপা দিলে কেন? অর্থাৎ সোণাও মাটী ধূলিও মাটী, মাটীকে মাটী চাপা দেওয়ার দরকার কি? অঙ্কা বঙ্কা সুদরিদ্র হইলেও উচ্চ অঙ্গের ভক্ত ছিলেন, কানাই পাটনী সেরূপ ভক্ত ছিল না, সে কোনওরূপ শিক্ষাও পায় নাই। অনেষ্ট জ্যাকোবের গল্পটা তৈয়ারী বলে মনে হয়, উহার মধ্যে আস্বাভাবিকতা আছে, কানাই পাটনীর কথা কিন্তু সত্য কথা। এ দেশে এমন কত কানাই পাটনী জন্মিয়াছে মরিয়াছে, তাহাদের খবর কে সংগ্রহ করে?

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

শ্যামসুন্দর।

বঁধুয়া

তুয়া দরশন লাগি
নয়ন সলিলে শত শয়ন তিতিল রে
শাঙণ রয়নি কত জাগি!
হে বসন্ত! কিষণকান্ত!
হে রিঝনাথ!

আজু
বরখপর ভেল ভেট তুঁঝ সাথ
কুরু　করুণ আঁখি পাত!
নমঃ　নরমকিশোর মরমকেশর
স্নিগ্ধ সুন্দর কাঁচা শ্যাম!
নমঃ　সৌম্য সোখীন ক্ষেম্য দখিণ
নিত্য নবীন অভিরাম!
নমঃ　শোহনমোহন কচিঠাম!
এস,　চিন্ময়!—চিত্তভবনে
এস,　বাঙ্ময়!—মুক্ত পবনে
কাকলীকল বরষি—
এস,　লীলায় বীণ গুঞ্জিয়া
শিলায় নলিন মুঞ্জিয়া
লালসমলিন মানস মম
শুভ্র করহ পরশি।
অই,　তরপে তরপে বাজে
সারঙ্-সানাই—সে নাই সে নাই
করে আবিরের থালা ফুকারে আভীরবালা
কাঁহা মেরা কানন-কানাই
আকুলি ব্যাকুলি মোর কাহারে জানাই?

বঁধু, এস, মন আসরে এস বন বাসরে
এস শ্যাম! রভসে মচাই
আজি, উঠিছে শিহরি নবোঢ়া কিশোরী
আমার মানসী রায়ই

৺ কুলচন্দ্র দে।

স্মৃতি। *

আজি শুধু মনে পড়ে কবে কোন্ অতীতে কোথায়,
আনন্দ ও বিষাদের আবর্ত্তিত স্বপ্ন-হিন্দোলায়
লভেছিনু কি সে দান সঙ্গোপনে অন্তরের তলে,—
আজি সে অতীত কোথা ডুবে গেছে গভীর অতলে!
একটি আনন্দময় দিবসের সুখ-স্মৃতিগুলি
যতনে কুড়ায়ে লয়ে মর্ম্মমাঝে রাখিয়াছি তুলি,
আজি তা'রা ভেসে ওঠে নিভৃত এ চিত্তে অনিবার
অপসারি নিশিদিন নিরাশার নিবিড় আঁধার।
মধুর সে স্মৃতিগুলি জীবনের শত আবর্ত্তনে
অতুলিত দানসম লুকাইয়া রেখেছি গোপনে;
বন্ধুর জীবন-পথে আনন্দের সে মুহূর্ত্তগুলি
বিষাদ-তিমির মাঝে চিত্ত মোর তুলিবে উজলি।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

---

* আধুনিক ইংরেজ কবি L. G. Moberlyর কবিতা অবলম্বনে লিখিত।

আসামযাত্রীর ডায়েরী।

(১)

২১শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার—রাত্রি পাঁচটার সময় উঠিয়া যাত্রার আয়োজন করিলাম। আমার প্রধান বিশষত্ব এই যে কোথাও যাইবার হুজুগটা অনেক দিন হইতেই ঘাড়ে চাপে, কিন্তু প্রকৃত কার্য্যকরী হইতে একটু বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়। দিন দশেক শুধু আলস্যেই কাটিয়াছে, করিবার মত কিছু করি নাই, অথচ করিবার যথেষ্ট ছিল। মাতাঠাকুরাণীর চরণধূলি ও আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া, সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া—বিদায় কথাটায় আপনারা হাসিবেন না। 'Remember any parting may be the last :—কে জানে এ বিদায় চির বিদায় কিনা। এরূপ বিদায়ে অনেক প্রিয়জনকে চির বিদায় দিয়াছি, এইত সেদিন গ্রামবাসী পরমাত্মীয় উকীলস্কুলের ৺ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চির বিদায়ের সংবাদ পাইলাম। এজীবনে আর কি তাঁহাকে পাইব ? না দেখিব ? প্রবাসে আসিয়া আরও কত প্রিয়জনের বিয়োগ-বার্ত্তা শুনিতে হয় তাহাই বা কে জানে ? দালানের রোয়াকে ছোট ছেলেটি ধূলি মাটি লইয়া খেলিতেছিল। সে ঘোড়ার গাড়ী দেখিয়া 'ঘোয়াগাড়ী ঘোয়াগাড়ী' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। মা দরোজা পর্য্যন্ত আসিলেন, তাঁর চোখ ছল ছল—আমাকে একদিনের জন্য ও দৃষ্টিহারা করিতে চাহেন না, কারণ আমি যে সবেধন নীলমণি। গাড়ীতে পৌছাইয়া দিতে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ চন্দ্রশেখর ও প্রীতিভাজন শ্রীমান পবিত্র ভায়া সঙ্গে চলিলেন। আমার একটা দোষ এই যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরের উপর নির্ভর করিয়া পারি, বিশেষ আত্মীয় স্বজনের কাছে থাকিতে, আমি বড় অকর্ম্মণ্য জীব, গাড়ীতে না উঠা পর্য্যন্ত বড় অসহায়! তারপর নিজের বোঝা ঘাড়ে পড়িলে শেয়ানা হইয়া উঠি।

মধ্যমশ্রেণীর গাড়ীর টিকেট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। আজকাল মধ্যমশ্রেণীর Return ticket উঠিয়া যাওয়ায় যাত্রীর ভিড় বড় কম হয়। ষ্টেসনে তেমন ভিড় নাই। খানিক পরে ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ময়মনসিংহের পথ আমার বড় পরিচিত পথ, এপথে কতবার আসিয়াছি গিয়াছি, কাজেই দেখিবার জন্য তেমন কোনও ঔৎসুক্য নাই। ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত

তেমন লোকজন ছিলনা। কিন্তু জ্যৈষ্ঠমাস, বাহিরে ভীষণ রৌদ্র, রৌদ্রের উত্তাপ গাড়ীতে বসিয়াও বেশ অনুভব করিতেছিলাম। এখানে কয়েকজন ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠিলেন, সকলেই বিশিষ্ট ভদ্রলোক। একজন বৃদ্ধ শিলং চলিয়াছেন, কথাবার্ত্তায় মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের লোক, কিন্তু পরিচয়ে জানিলাম তাঁহার বাড়ী কিশোরগঞ্জ মহকুমায়। দেখিতে দেখিতে গাড়ী জামালপুর ছাড়াইল, জামালপুর ছাড়াইলে মনটা একটু বিষণ্ণ হইয়া পড়িল, অদূরে মহীরামকুলের কাছারী, এই সহরের কতলোকের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, কিন্তু কয়েক বছর যাবত আর তাহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই। একদিন যাহাদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে হর্ষে-বিষাদে সময় কাটাইয়াছি, যাহাদের ভালমন্দ চিন্তা করিয়াছি, মনেপ্রাণে মনিবের কল্যাণ কথা ভাবিয়াছি আজ সে সব বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। আমার প্রাণে এ সব বিষয়ে বড় সামান্য দাগ লাগে, অল্প সময়ের মধ্যে দুঃখ ক্লেশ অন্যায় অবিচার ভুলিয়া যাই। সংসারে এ জীবনের এ বয়সের অভিজ্ঞতায় বেইমানি ও অন্যায় বিচার যতটা পাইয়াছি, ন্যায়নিষ্ঠা ও ভালবাসা তেমন পাই নাই। যাহার উপকার করিয়াছি সেই দাগা দিয়াছে। যাহাকে মিত্র ভাবিয়াছি তাহার নিকট হইতেই শত্রুর ব্যবহার পাইয়াছি। এসব নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে একটা পুরাণাগানের দুটো কথা মনে পড়িতেছিল :—

যারে প্রাণ দিলে প্রাণ পাওয়া যায়রে
তারে দিলিনা প্রাণ।

ঠিক্ কথা সে প্রিয়জনকেত প্রাণ দিলাম না! শুধু অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী ও স্বার্থপর মানুষের জন্য প্রাণ দিলাম।

বেলা প্রায় পাঁচটার সময় বাহাদুরাবাদ পৌছিলাম। এখানে দুইটি নদী, একদিকে যবুনা অপর দিকে তিস্তা বা ত্রিস্রোতা। ট্রেণ যেখানে থামে সেখান হইতে ষ্টীমার ঘাট পোয়ামাইলের বেশী দুর হইবেনা, চারিদিকে ধু ধু করে বালিরাশি, বৃষ্টি হইয়া যাওয়ায় বালির তেমন প্রতাপ নাই। দিব্য আরামে যাইয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। ষ্টীমারটির নাম Porpoise পূর্ব্বে আমাদের শৈশবে এই porpoise গোয়ালন্দ ও নারায়ণগঞ্জ চলাফেরা করিত, মাঝে দামুকদিয়াও সারার খেয়া ছিল, এখন বাহাদুরাবাদ ও ফুলছুরি (তিস্তামুখ) ঘাটের খেয়া

হইয়াছে। কি সুন্দর জাহাজ, কি সুন্দর বন্দোবস্ত, সর্ব্বশ্রেণীর যাত্রীর সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই জাহাজগুলি তৈরী হইয়াছিল। এখন এগুলো শুধু খেয়া ঘাটের তরণী।

প্রায় আধঘণ্টা পরে জাহাজ ছাড়িয়া দিল। নদী বেশ প্রশস্ত। মাঝে মাঝে চর, চরে কোথাও বস্তি আছে, যেখানে বস্তি, সেখানে দু'চারিটি গাছপালাও জন্মিয়াছে। সাদা বালির চরে সেখানকার শ্যামশোভাটুকু চোখে বেশ লাগে। ধবধবে বালির চরে সূর্য্যের তপ্ত কিরণে চোখ যেন ঝলসিয়া যায় সে সময়ে ঐ শ্যামসৌন্দর্য্য বাস্তবিকই নয়ন তৃপ্তিকর। পাঁচটা বাজিবার কিছু আগে জাহাজ ফুলছুরি ঘাটে ভিড়িল। রাত্রি আটটায় গাড়ী ছাড়িবে, কাজেই নাবিবার জন্য তাড়াহুড়ার কোনও দরকার নাই। তবু যাহাদের তাড়াহুড়াই অভ্যাস, তারা দলে দলে কুলি মজুরের সঙ্গে দরদস্তর করিয়া ছুটপাট করিয়া নাবিয়া গেল। আমি সকলের শেষে ধীরে ধীরে নাবিয়া একখানা মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে জিনিষপত্রাদি রাখিয়া হোটেলের সন্ধানে বাহির হইলাম। খানিক দূরে খান কতক ছোট ছোট ঘর, বাহিরে একজন কৃষ্ণাকার ব্যক্তি দণ্ডায়মান। লোকটি দৈর্ঘ্যে পাঁচফিট নয় ইঞ্চির ন্যূন হইবে না। ভুঁড়িটী দিব্য গোলাকার, ঠিক তানপূরার মত। পরিধানে একখানা লাল চওড়াপেড়ে কাপড়। কথার সুরে বুঝিলাম, আমাদের বিক্রমপুরবাসী; পরিচয়ে জানিলাম, আমার অনুমান সত্য। আমার কিন্তু এই হোটেলে কোন মতেই খাওয়ার প্রবৃত্তি হইল না।

শরীর যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ষ্টীমারে যাইয়া দিব্য আরামের সহিত স্নান করিলাম। স্নানের পর ডেকের ধারে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কি সুন্দর বিস্তৃত ত্রিস্রোতা নদী, আকাশ ঘনকালো মেঘে ঢাকা, কোথাও খুব কালো, কোথাও ধূসর, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যার সেই অস্ফুট অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে মেঘের ঘন ঘোর অন্ধকারে অপরূপ শোভার বিকাশ হইয়াছিল। দলে দলে কালো মেঘের দল ঝুলিয়া নদীর জলে মিশিয়া যাইতেছিল। ধারাগুলি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। নদী ফুলিয়া ফুলিয়া কলরোলে বাতাসের জোরে বহিয়া চলিয়াছে। পারের রেখা দেখা যাইতেছেনা, আছে শুধু একটা অস্পষ্ট আবছায়া মাত্র, অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া এশোভা দেখিলাম।

অতি দূরে যে নীল পাহাড়ের সারি দেখা দিয়াছিল তাহাও এখন মেঘের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

"বাদর দর দর ঝর ঝর ঝরে
বিরহ বিধুর আঁখি ঝরে অঝোরে।"

ষ্টীমারের পোর্টারের সহিত আমার আলাপ হইল। ইহার বাড়ী বোম্বাই মুল্লুক। সে দুঃখ করিয়া বলিল যে এখন আর এ পথে কোন লাভ নাই, পূর্ব্বে সারার পথে কত সাহেব সুবোও রাজা জমিদার যাইতেন, বেশ দু'পয়সা বিক্রী হইত, কিন্তু এখন কিছুই নাই। বৃষ্টি জোরে নামিয়াছিল, কখন থামে স্থির নাই, কাজেই ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া সার্সি টানিয়া দিয়া গাড়ীতে শুইয়া পড়িলাম। ঠিক্ রাত্রি আটটায় গাড়ী ছাড়িল। কোন্ পথে কেমন করিয়া রঙ্‌পুর, পার্ব্বতীপুর ছাড়িলাম, সে জ্ঞান আর ছিল না। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছিল, গাড়ীর সার্সিকপাটগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম, আবার বা কখনও খুলিয়া দিতেছিলাম। সহযাত্রী জ্ঞানেন্দ্রবাবু একটা বালিশ দিতে চাহিলেন, উহা আর লইলাম না। ঠিক্ ভোরে দিনাজপুর পঁহুছিলাম।

দিনাজপুর।

২২ শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ৫ই জুন।

ষ্টেশনে গাড়ী মিলিল। শুনিয়াছিলাম গাড়ী দুর্ঘট, সৌভাগ্যক্রমে আমি বিনা আয়াসে মাত্র চারি আনা ভাড়ায় গাড়ী পাইলাম। গাছপালায় ঢাকা, কাঁচারাস্তা। সহরের বড় বড় কয়েকটি রাস্তা ছাড়া, অধিকাংশই কাঁচারাস্তা। কয়েকদিন পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাই পথে ধূলা নাই, নচেৎ পথ দিয়া নাকি ধূলার জ্বালায় চলা ভার। আকাশ ছিন্ন ভিন্ন কালো মেঘে ঢাকা, ভোরের আলো তেমন করিয়া প্রকাশ পায় নাই। পথের দুইধারে আমের বাগান। অধিকাংশ বাড়ীই মাটির দেয়ালঘেরা, উপরে ছনের বা টিনের ছাউনি। গাড়ীতে যাইতে যাইতে ষ্টেশনের অল্প দূরেই বড় রাস্তার উপর দিনাজপুর নাট্যসমিতির বাড়ীটি দেখিলাম। বাড়ীটি বেশ। ইহা বিক্রমপুর জৈনসার নিবাসী ইঞ্জিনিয়ার করুণাবাবুর কীর্ত্তি। ঘাসীপাড়ায় যোগেশদাদার বাসা খুঁজিয়া বাহির করিলাম। এবাসার পাশ দিয়া দুই তিনবার ঘুরিয়া গিয়াছি কিন্তু তথাপি

প্রথমবার বাসাটি খুঁজিয়া পাই নাই—শ্রীমান্ সুরেশভায়াকে আগেই চিঠি দিয়াছিলাম, কিন্তু সে চিঠি সে পায় নাই। ভোরের বেলা হাতমুখ ধুইয়া বন্ধুবর প্রফুল্লচন্দ্রের আস্তানায় যাইয়া চায়ের বাটিতে মনোনিবেশ করিলাম। তারপর তাহাকে কাণ্ডারী করিয়া রাজপথে দেহতরী ভাসাইয়া দিলাম। দিনাজপুরের সহিত আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের একটু যোগ আছে। এখানে আমার মাতামহ স্বর্গীয় নবকুমার সেন মহাশয় কার্য্য করিতেন, তাঁহার মৃত্যুও এখানেই ঘটে। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের ছাত্রজীবন এখানেই আরম্ভ হয়। কাজেই ব্যক্তিগত হিসাবে দিনাজপুর আমার নিকট এক মহাতীর্থ। প্রাচীনদের মধ্যে ২।১ জন তাঁহাদের কথা বলিলেন।

বিক্রমপুরের লোকেরা কোথায় কিভাবে কোন্ কার্য্য দ্বারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন সে ইতিহাসটা জানিবার জন্য বহুদিন হইতেই আমার কৌতূহল জন্মিয়াছিল সে কৌতূহল চরিতার্থ ও ইতিহাস উদ্ধারের জন্যই আমার এই ভ্রমণ। দেখি কতটুকু কি করিতে পারি? দিনাজপুর সহরে টাঙ্গাইল ও পাবনা অঞ্চলেরই লোক বেশী, অনেকেত বাড়ীঘর করিয়া রীতিমত স্থায়ী ভাবেই বাস করিতেছেন। দেশের বাড়ীঘরও হয়ত অনেকের নাই।

প্রবাসী বিক্রমপুরবাসীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি প্রাচীন ব্যক্তি। বয়স সত্তরের কাছাকাছি, কি সত্তর উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিষ্ণুবাবু এখানে দ্বিতল বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। উপস্থিত তাঁহার মত প্রাচীন ব্যক্তি আর কেহই নাই। বিষ্ণুবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে "আমি যতদূর জানি বিক্রমপুরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লোক ৺নবকুমার সেন মহাশয়, গোলক সেরেস্তাদার মহাশয়ও গোবিন্দ কবিরাজ এ তিন জনের নামের সহিত আমার অনেক প্রাচীন ইতিহাস বিজড়িত। এ তিনজন বিক্রমপুরের লোকের কথাই আমি জানি। নবকুমার সেন মহাশয় অতি শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি নিজের কাজ লইয়াই থাকিতেন, বাহিরের কোনও খোঁজখবর রাখিতেন না। এখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।"

৺গোলকচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ী সোণারঙ্গ গ্রামে ছিল। তিনি সেরেস্তাদার ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক, দানশীল ও অতিথিবৎসল লোক এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কত ছাত্র, অসহায় উমেদার যে তাঁহার

বাসায় অন্ন পাইত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। একবার জজ সাহেব তাঁহার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিয়াছিলেন "সেরেস্তাদার মহাশয়, আপনার বাসগৃহ অপেক্ষা যে রান্নার ঘর বড় ?" তাহাতে তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন যে "হুজুর ইহাতেও যে আমার কুলায় না, বাহিরে পাতা লইয়া বসিয়াও যে ছাত্রদের খাইতে হয়। দিনাজপুরের বর্ত্তমান খ্যাতি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেকে তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে "গোবিন্দচন্দ্র সেন কবিরাজ মহাশয় এ সহরের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে প্রত্যহ আনন্দ-মেলা বসিত—নানাস্থান হইতে শত শত রোগী আসিত তিনি দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন। এত বড় বন্ধুবৎসল, অভিজ্ঞ ও তেজস্বী চিকিৎসক আরত দেখিনা। গোবিন্দ কবিরাজ মহাশয়ও আমি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম। তাঁহার ছেলেরা এখন এখানেই একরূপ স্থায়ী বাড়ীঘর করিয়া বাস করিতেছেন।"

ডাক্তার ভুবনমোহন কর বর্ত্তমান সময়ে এখানে বিক্রমপুরের উজ্জ্বল রত্ন। ইনি অশীতিপর বৃদ্ধ, ঋষিতুল্য ব্যক্তি। চির কুমার, নিবাস উত্তর বিক্রমপুরস্থ পাঐলদিয়া গ্রাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার এ মহাত্মাকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ ঘটে নাই, তখন তিনি স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। ইনি পরহিত-ব্রতে নিজের জীবন ঢালিয়া দিয়াছেন। যেখানে রোগী, যেখানে আর্ত্ত, যেখানে নিরাশ্রয় অসহায় ব্যক্তি সেখানেই ভুবনমোহনের মঙ্গলকর—তাহাদের ক্লেশ বিমোচনের জন্য নিযুক্ত। ইহার বিষয় একবার 'গৃহস্থ' পত্রিকায় কিছু লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে। এরূপ আদর্শ হিতকারী ত্যাগী সন্ন্যাসীর অভ্যুদয়েই দেশ পবিত্র হয়।

অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে পাঁচগা নিবাসী উকীল শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত গাঙ্গুলী ও গভর্মেণ্ট উকীল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনের নিবাস পালং। দিনাজপুর যাহারা বেড়াইতে যাইবেন তাঁহাদের মহারাজার বাড়ী, কমলাসাগরের দীঘী ও ৺ কান্তজীর মন্দির অতি অবশ্য দেখিয়া আসা উচিৎ, দুঃখের বিষয় আমি কান্তজীর মন্দির দেখিয়া আসিতে পারি নাই। দিনাজপুর রেল ষ্টেশনের ধারে প্রকাণ্ড

ময়দান, এইরূপ বিরাট মাঠ অতি অল্প সহরেই আছে। মোটের উপর দিনাজপুরের স্বাস্থ্য মন্দ নয়। বর্ষার সময়ে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে। এবার দিনাজপুরে অমৃত ফলের একান্ত অভাব।

আসামের পথে।

২৩শে জৈষ্ঠ বুধবার—অপরাহ্নে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ মেঘে ঢাকা, এই ঘনীভূত হইতেছে, এই আবার মিলাইয়া যাইতেছে। আজ বিকালে সহরে বেড়াইয়া আসিয়া তল্পীতল্পা বাঁধিলাম। ছেলেবেলা আমার বেড়াইবার অত্যধিক পরিমাণ ব্যাকুলতা দেখিয়া দাদা আমাকে 'মুসাফের' বলিয়া ডাকিতেন। সত্য সত্যইত আজ আমি 'মুসাফের' হইয়াছি—দাদা আজ স্বর্গে, কিন্তু তাঁহার কথাটা যখনই বেড়াইতে বাহির হই তখনই মনে পড়ে। তেরবৎসর পূর্ব্বে আমরা কলিকাতা হইতে কয়েক বন্ধু মিলিয়া 'পথিক' নামক একখানা মাসিক বাহির করিয়াছিলাম—কাগজখানা আমারি সম্পাদকতায় বাহির হইয়াছিল। আজ সেই 'পথিকের' সম্পাদক যে বাস্তবিকই পথিক। যাক্ অনেক বাজে বকিলাম। রাত্রি ১২।৩০ মিনিটের গাড়ীতে দিনাজপুর ছাড়িলাম। ষ্টেসনে একটী স্থানীয় খ্রীষ্টাণ যুবকের সহিত আলাপ হইল, সে সপরিবারে কলিকাতা চলিয়াছে। আমি গাড়ীতে উঠিয়াই বাহু উপাধান করিয়া কোনরূপে শুইয়া পড়িলাম। কখনও বা মাঝে মাঝে জানালার ভিতর দিয়া মুখ বাহির করিয়া চারিদিকের শোভা দেখিতেছিলাম। আকাশে ফাঁকা-ফাঁকা মেঘে ঢাকা, কোথাও ম্লান জ্যোৎস্নার আলোকে চারিদিক আলোকিত হইবার পূর্ব্বেই আবার কালো মেঘে সব ঢাকা পড়িতেছিল। মাঝে মাঝে দুই একটী গর্জ্জনও শুনা যাইতেছিল। মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে গদি নাই, এদিকের গাড়ীর এইরূপই ব্যবস্থা। গাড়ীগুলো পুরাণো, বেঞ্চভরা ছারপোকা। তবু রণে নিপতিত সৈন্যদলের মত দলে দলে যাত্রীরা যে যার শুইয়া পড়িয়াছে। পার্ব্বতীপুরে গাড়ী একেবারে খালি হইয়া গেল। এখন সুযোগ পাইয়া কুকুরকুণ্ডলীর অবস্থা ছাড়িয়া দিব্য পা মেলিয়া শুইলাম, উপাধান অবশ্য বীরভুজদ্বয়। বাহিরে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি হইতেছিল, কাজেই একটু শীতও বোধ হইতেছিল, গ্রীষ্মের দারুণ জ্বালা ছিলনা। খানিক পরে ঠক্ করিয়া

দরজাটা খুলিয়া গেল। একজন বাঙ্গালী রেলওয়েগার্ড গাড়ীতে ঢুকিলেন, হাতে একটী লণ্ঠন। আমাকে ঐরূপ ভাবে খালি বেঞ্চের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া উপরের তোলা বিছানাটা দেখাইয়া বলিলেন 'ঐ বিছানাটা কার? আপনার?' আমি বলিলাম 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' পুনরপি প্রশ্ন 'তবে কষ্ট পাচ্ছেন কেন?' আমি কহিলাম 'কে হ্যাঙ্গামা পোষায় বলুন?' বারে বারে খোলাও বাঁধা ও ত কম হ্যাঙ্গামা নয়? ভদ্রলোক ল্যাম্পটি তুলিয়া আমার মুখের কাছে খানিক ধরিয়া উহা নিবাইতে নিবাইতে বলিলেন 'বিনা হ্যাঙ্গামে জগতে কোন্ কাজ হইয়াছে বলুন?' আমি কহিলাম—'আপনি যে খুব বড় রকমের একটা কথা পড়িয়া বসিলেন?' ভদ্রলোক হাসিয়া বেঞ্চের অপর দিকে আমার মত খালি বেঞ্চের উপর শুইয়া কহিলেন "আপনি বিছানা থাকতে কষ্ট পাচ্ছেন, আর আমি বিছানা নাই বলে কষ্ট পাচ্ছি।' আমি কহিলাম "সুখও দুঃখকে সমান মনে করলেই ত সব দুঃখের অবসান হয়।" আর কথা চলিল না গাড়ী গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া চলিল, জানালা গুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছি, তবু ঝম্ ঝম্ ঝট্ ঝট্ করিয়া বৃষ্টির ধারা আসিয়া কাঁচের সার্সিতে লাগিতেছিল। আজ বাহিরে বর্ষণমুখর বর্ষার প্রকৃতি, বেদনার অশ্রুরাশি প্রবলবেগে ঢালিয়া দিতেছিল। সত্যসত্যই, আজু শমন দিন হোয়।"

২৪শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

ভোরের বেলা যখন জাগিলাম তখন গাড়ী তীব্রবেগে চলিয়াছে। আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা। বৃষ্টি অবিশ্রান্ত ভাবে পড়িতেছে। মাঠ ঘাট জলে ভরা। গার্ড বাবুটি বলিলেন যে এ অঞ্চলে আজকাল আর বৃষ্টির বিরাম নাই। শস্তের অবস্থা খুব সন্তোষজনক, পাট ও ধানে ক্ষেতগুলি ভরিয়া গিয়াছে। ধান ও পাট উভয়ের অবস্থাই ভাল। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু শ্যামলসুষমাভরা মাঠ, আর দূরে মসীমাখা তরুশ্রেণীশোভিত পল্লী সমূহ। রঙ্গপুরে আমাদের গাড়ীতে কালো মোটা সোটা গোছের এক জন ভদ্রলোক সপরিবারে উঠিলেন। এবং বেঞ্চের অপর ধারে একখানা কাপড় টাঙ্গাইয়া একটু আবরু করিয়া লইলেন। তাহার সঙ্গে ছোট ছোট দু'তিনটি ছেলে মেয়ে। এ ভদ্রলোকটিও রেলের কর্ম্মচারী। তিনি গাড়ি ছাড়িবার খানিক পড়ে আমাদের কামরায়

আসিয়া নেপাল বাবুকে (পূর্ব্বোক্ত গার্ডবাবু) জিজ্ঞাসা করিলেন "লালমণির হাটে দুধ পাওয়া যাইবে ত? সঙ্গে ছোট মেয়ে আছে' তাহার পশ্চাতে একটী পাঁচবৎসরের মেয়ে আসিয়াছিল সেদিকে তিনি বা অন্য কেহই লক্ষ্য করেন নাই, মেয়েটি গাড়ীর দরজায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ সে দরজা খুলিয়া গাড়ী হইতে পড়িয়া গেল। দরোজাটা যে খোলাছিল সে বিষয়ে কাহারো জানাছিল না; গাড়ীর ভিতরে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। যে যেখান দিয়া পারা গেল শিকল ধরিয়া টানাটানি করা গেল। প্রায় তিন চারি মিনিট পরে গাড়ী থামিয়া গেল। আমরা সকলে মিলিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়াইয়া লাইন ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। স্নেহময়ী জননী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে লাফাইয়া পড়িলেন। আমরা তাঁহাকে সান্ত্বনার কথা বলিলাম বটে, কিন্তু মার প্রাণে কি তাহাতে সান্ত্বনা লাগে? জগদীশ্বরের এমনি করুণা যে মেয়েটি একরূপ অক্ষত শরীরে কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল, ব্যাকুল পিতা অতি বড়আবেগে হারানিধিকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। মা যাইয়া শত চুম্বনে তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন। গাড়ীতে একটা আনন্দ-ধ্বনি পড়িয়া গেল। গার্ডসাহেব নিশান উড়াইয়া একটু বিদ্রূপের ভাবে বলিলেন—"You Bengali Babus are very careless."। তাত বটেই। এরূপ দৃশ্য শুধু কাগজেই পড়িয়াছি—আজ স্বচক্ষে দেখিলাম। লালমণির হাটে চা পান করিতে করিতে ঢাকার এক স্নেহভাজন বন্ধুকে দেখিতে পাইয়া প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল। এখানে দিব্য আয়াসের সহিত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। বৃষ্টি একটুকু থামে আবার পূর্ণবেগে আরম্ভ হয়। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে দেখিলাম অনেক সহযাত্রীই আবার গা ঢালিয়া দিয়াছেন। আলস্যে সময় কাটান যে কি ভয়ানক তাহা পথে ঘাটে বেশ উপলব্ধি হয়।

আমরা ছুটিয়া চলিয়াছি, দুইপাশে পল্লীগ্রাম। বাহেদের বাড়ী ঘর মন্দ নয়, তবে বেশভূষা সভ্যোচিত নয়। এখনও তাহাদের সাজসজ্জার তেমন বদল হয় নাই। অথচ শুনিলাম ইহাদের আর্থিক অবস্থা বঙ্গদেশীয় কৃষকদের চেয়ে অনেক ভাল। ইহারা তাহাদের মত ঋণগ্রস্ত ও বিলাসিতার দাস নয়। খানিক পরে গীতালদহজংসন পার হইলাম, এখানে কুচ্‌বিহার যাইবার জন্য

গাড়ী বদল করিতে হয়। গোলকগঞ্জজংসনে গাড়ী বদ্‌লাইয়া ধুবড়ীর গাড়ী ধরিলাম। এইবার প্রকৃত আসামে প্রবেশ করা গেল। দৃশ্য সম্পূর্ণ পুরাতন নহে একটু বেশ নূতনত্ব আছে। মানুষের চেহারাও বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। উদারউন্মুক্ত খোলা মাঠ। দূরে নীল মেঘের মত গারো পর্ব্বত শ্রেণী দেখা যাইতেছে। বাঁশের ঝাড় ও সুপারি গাছের আড়াল দিয়া দু'চারিটি পল্লী দেখিতেছি। ঘরবাড়ী একটু নূতন ধরণের কোথাও রেলওয়ে পুলের নীচু দিয়া জলস্রোত বেগে ছুটিয়াছে, সে সব স্রোতের ধারেই নেংটি পরিয়া দলে দলে লোকেরা মাছ ধরিতেছে। মাছ ধরিবার যন্ত্রপাতি ও একটু নূতন ধরণের। ক্রমে গৌরীপুর ইত্যাদি স্থানগুলি ছাড়াইয়া গেলাম। গৌরীপুরের রাজার বাড়া দেখা যাইতেছিল। চারিদিকে জলময়। আকাশ তেমনি মেঘাচ্ছন্ন। তেমনি ম্লান। ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া কখনও বৃষ্টি পড়িতেছে, কখনও থামিয়া যাইতেছে। এইভাবে চলিতে চলিতে বেলা প্রায় দশটার সময় ধুবড়ী পঁহুছিলাম। ধুবড়ী সহরটী দূর হইতে দেখা যাইতেছিল; আমার পরম সৌভাগ্য ধুবড়ী ষ্টেশনে যখন গাড়ী আসিল, তখন মেঘটা একটু সরিয়া গিয়াছে সূর্য্যঠাকুর একটু মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। দীপ্তমান্ সূর্য্য রশ্মিতে চারিদিক উদ্ভাসিত। (ক্রমশঃ)

ভিক্ষা।

(Burns হইতে)

একবার তুমি এস বাতায়নে, আঁখিযুগ তার অশ্রুপূর্ণ
মরিতেও যার পরাণ নাহিক কাঁদে।
এতটা নিঠুর হয়োনা, হয়োনা, হৃদয় তাহার করিবে চূর্ণ
ভালবেসে তোমা এই শুধু অপরাধে।
প্রতিদান তুমি দাও বা না দাও অভাগার ভালবাসার জন
এটুকু করুণা করিতে কি আর ক্ষতি?
তুমি পবিত্রা দেবীর মতন, দূষিত বলিয়া কোরোণা গণ্য
তোমা হতে জাগে যেই মনোভাব, সতী।

শ্রীকালিদাস রায়।

জীবন্ত ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম শব্দটি অনেক বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়; যখন আমরা বলি, অগ্নির ধর্ম্ম দগ্ধ করা, তখন ধর্ম্ম শব্দটিকে বিশেষক স্বভাব অর্থে ব্যবহার করি। এ অর্থে, অনর্থক ঝগড়া করা, চুরি করা প্রভৃতি ও কোন কোন ব্যক্তির ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আবার কতকগুলি সামাজিক নিয়মকেও ধর্ম্ম নাম দেওয়া হইয়া থাকে। যেমন, 'আহূতো ন নিবর্ত্তেত দ্যূত্যাদপি রণাদপি;' কেহ দ্যূত ক্রীড়ায় বা রণে আহ্বান করিলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে না, এক সময়ে ক্ষত্রিয়গণের এইরূপ ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু দ্যূতক্রীড়া বা অকারণ যুদ্ধ কখনও প্রশংসিত হইতে পারে না। দেবতার উপাসনা যে উদ্দেশ্যেই হউক, তাহাকেই অনেক সময় ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া উল্লেখ করা হয়। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণাদি এই শ্রেণীর। অন্যায়পূর্ব্বক প্রতিপক্ষকে দমন বা তাহার সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যেও অনেক সময় দেবতার আরাধনা করা হয়। ঠগীগণ ডাকাতি করিতে বাহির হইবার পূর্ব্বে কালীপূজা করিত। এইরূপ উপাসনাও ধর্ম্মানুষ্ঠান নামে অভিহিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি এইরূপ কোন অর্থে ধর্ম্ম শব্দের ব্যবহার করিতেছি না। তবে আমার ধর্ম্ম শব্দের অর্থ কি ?

ধর্ম্ম তাহাই, যাহা আমাদিগকে মুক্তি লাভের সাহায্য করে। এ মুক্তি কি রূপ ? বন্ধনমুক্ত গরু যেমন লোকের শস্যাদি খাইয়া তাড়িত হয়, সেই রূপ অবস্থা প্রকৃত মুক্তি নহে। সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি।

সংসার বড় সহজ জিনিস নহে। যাহারা মনে করে, স্ত্রী, পুত্র, ভাই বন্ধুই সংসার, তাহারা ভ্রান্ত। প্রকৃত সংসার মনে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টী পরিষ্কার হইবে। মনে করুন, কোনও মহিলার পুত্র বিদেশে আছে। তিনি দুই দিন তাহার চিঠি না পাইলে ভাবিয়া অস্থির হন, এই বুঝি তাঁহার ছেলের কোন পীড়া হইয়াছে, আহা, বাছা বিদেশে অসহায় অবস্থায় না জানি কতই কষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতেছে, এই বুঝি তাহার জীবন সংশয় উপস্থিত হইল, এই বুঝি সে কোথায় পড়িয়া গিয়া বিষম আঘাত পাইয়াছে, ইত্যাদি। এদিকে তাঁহার পুত্র হয়ত সুস্থ শরীরে মনোযোগ দিয়া তাহার কার্য্য করিতেছে, তাহার অনেক বন্ধু আছে, যাহারা তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তাহার কোন

অসুবিধা, কোন কষ্ট নাই। কয়েক দিন পরে পুত্র চিঠী লিখিল, মাতা পুত্রের মঙ্গল সংবাদ পাইয়া সুখী, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই পুত্র কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে, বিদেশস্থ প্রকৃত পুত্র এক, আর মনে মনে যে পুত্র গড়িয়া তাহার কল্পিত মঙ্গলামঙ্গলে হৃষ্ট বা বিমর্ষ হইতেছেন, সে তাহা হইতে ভিন্ন আর এক। এইরূপে আমরা অনেকে মানস মূর্ত্তি গড়িয়া থাকি। সেই সকল মূর্ত্তিতে বাহ্য মূর্ত্তির সহিত স্থূলতঃ সাদৃশ্য থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে আমরা আরও এমন কতকগুলি ধর্ম্ম জুড়িয়া দেই, যাহা বাহ্য মূর্ত্তিতে নাই। একই ব্যক্তি বা পদার্থ এক জনের পরম প্রীতিকর, আর আর এক জনের নিকট অত্যন্ত অপ্রিয়, এইরূপ সর্ব্বদাই দেখা যায়। সুতরাং বুঝিতে হইবে, প্রিয়ত্ব বা অপ্রিয়ত্ব বাহ্য পদার্থের মধ্যে নিহিত নহে; তাহা মানস মূর্ত্তির ধর্ম্ম বটে। এই সকল প্রিয় ও অপ্রিয় মানস মূর্ত্তিই সংসারের উপাদান। এই সকল লইয়াই সংসার। কেহ হয় ত মনে করিবেন, "তবে ত সংসার ত্যাগ বড়ই সহজ হইয়া পড়িল! কল্পিত মূর্ত্তির কল্পনা না করিলেই হইল।" কিন্তু এই সকল কল্পিত মূর্ত্তিকে ছাড়িতে চাহিলেও ত তাহারা ছাড়ে না! কত লোক আত্মীয়, বন্ধু, বিষয়, সম্পত্তি, সমস্ত ছাড়িয়া বনে গিয়াছেন। কিন্তু সংসার তাঁহাদে সঙ্গে গিয়াছে। ভরত সকল ছাড়িয়া মৃগশিশু লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন; শুকদেব তাঁহার কৌপীনের মায়া ছাড়িতে পারিলেন না। অন্যে যে পারিবে না, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? আমরা মাকড়সা বা গুটী পোকার মত নিজেরা জাল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আপনাদিগকে এমন করিয়া জড়াই যে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু প্রকৃতই কি মুক্তি অসম্ভব? শাস্ত্র বলেন, তাহা সম্ভব, এবং অনেক মহাপুরুষ মুক্তি লাভ করিয়াছেন। আমাদিগের ভাগ্যে সম্পূর্ণ মুক্ত পুরুষের দর্শন-লাভ ঘটে না, সত্য। আপাততঃ সেইরূপ মনে হয় বিশেষ পরীক্ষা করিলে অনেক সময় তাহাদের মধ্যে ও রাগদ্বেষের সত্তা দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং সেরূপ আর যাঁহাদিগকে দেখি, তাঁহারাও সম্পূর্ণরূপে রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত কি না, সে বিষয় সন্দেহ হয়। কিন্তু যাঁহারা এ বিষয় আমাদের অপেক্ষা অনেক কৃতকার্য্য হইয়াছেন, যাঁহারা প্রায় রাগদ্বেষের বশীভূত হন না, এ রূপ লোক সৌভাগ্যক্রমে কখন কখন আমাদিগের নয়নগোচর হইয়া

থাকেন। সুতরাং আদর্শ পূর্ণতা লাভ করিতে না পারিলেও ইহজীবনেই যে তাহার দিকে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর, এই সকল কৃতকার্য্যতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে স্বভাবতঃই এই আশার সঞ্চার হয় যে, বুঝি শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা নয় পূর্ণমুক্তি সময় সাপেক্ষ হইলেও সম্ভব।

এক দল লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, "মুক্তির প্রয়োজন কি? আমরা রাগ দ্বেষ লইয়াই বেশ আছি। ইহাতে দুঃখ আছে বটে, কিন্তু সুখও ত যথেষ্ট। যে উপায়ে দুঃখ হইতে মুক্ত হইব, তাহাতে সুখেরও ত ধ্বংস হইবে; পদ্মের মৃণালে কাঁটা আছে বলিয়া কি পদ্মকে পরিত্যাগ করিব? তাহাতে কি মূর্খতা প্রকাশ হইবে না?" একথার সম্পূর্ণ উত্তর পরে দেওয়া যাইবে, সম্প্রতি এই মাত্র বলিয়া রাখি, সাংসারিক সুখ নিকৃষ্ট জাতীয়, যাঁহারা উচ্চ সুখের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারা ইহাকে সুখের মধ্যেই গণ্য করেন না। এসুখের মধ্যে দুঃখের ক্ষণিক বা আংশিক নিবৃত্তির অতিরিক্ত আর কিছু আছে কিনা, সন্দেহ; তাইত মনে হয়, দুঃখ না থাকিলে এসুখের ও অস্তিত্ব থাকে না।

উপরিকথিত ব্যক্তিগণের বোধ হয় ধারণা এই যে, রাগ দ্বেষ হইতে মুক্তিলাভ করিলে আমরা কাষ্ঠ লোষ্ট্রের মত হইয়া পড়িব। সেরূপ হইতে কে চায়? কিন্তু কাষ্ঠলোষ্ট্রের অবস্থা মুক্তাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহাকে অজ্ঞানান্ধকার প্রায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে; আর মুক্তাবস্থায় জ্ঞানালোক ঝলসিতে থাকে। যে রোগে রোগীর রোগ-ক্লেশ অনুভব করিবার শক্তি থাকে না, সে বড় বিষম রোগ। তমগুণাধিক্যে যাহার কাষ্ঠলোষ্ট্রের অবস্থা হয়, তাহার দশা সেইরূপ। জীবন্মুক্ত পুরুষ যদি মনন হীন হন, তবেত তিনি মৃত। ঋষি বলিয়াছেন, "স জীবতি মনোযস্য মননেন হি জীবতি"—সেই জীবিত, যাহার মন মনন দ্বারা জীবিত থাকে। বাস্তবিক মুক্তাবস্থার যে 'সুখমাত্যন্তিকং যৎ তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্য মতীন্দ্রিয়ম্', যাহার সাময়িক আস্বাদ যোগাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সুখ আত্যন্তিক, তাহা দুঃখসম্পৃক্ত নহে; অধিকন্তু মুক্তাবস্থায় তাহার প্রস্রবণ অবিরল-ধারায় ক্ষরিত হইতে থাকে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "যোবৈভূমাতৎ সুখং, নাল্পেসুখমস্তি।"

ধর্ম্মের এই যে সংজ্ঞা দেওয়া হইল, তাহা শাস্ত্রের অনুমোদিত। যদিও শাস্ত্রে নানাস্থানে ধর্ম্মের নানাপ্রকার লক্ষণ উল্লিখিত আছে, তথাপি এই লক্ষণটী

তাহার কোনটীর বিরোধী নহে। যেখানে অন্য অর্থে ধর্ম্ম শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেখানে নিকৃষ্টতর ধর্ম্মই তাহা দ্বারা লক্ষিত। যেমন গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন,

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণংব্রজ।
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

অর্থ—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। এখানে 'সকল ধর্ম্ম' বলিতে নিকৃষ্ট ধর্ম্মই লক্ষিত হইয়াছে। নতুবা ভগবানের একান্ত শরণাগতি কি ধর্ম্ম নহে? তাহাই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; তাহার ফল সকল পাপ হইতে মোক্ষ-একথা এই শ্লোকেই আছে। পাপ-মোক্ষ আর সংসার-মোক্ষ একই কথা, কারণ, যেখানে রাগ দ্বেষ অথবা সংসার, সেখানেই পাপ।

হিন্দুধর্ম্মের ইহা বিশেষত্ব নহে। কি বৌদ্ধ ধর্ম্ম, কি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম, কি মোহম্মদীয় ধর্ম্ম, সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মই পাপ-মুক্তির উপায়রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কেবল যে সকল অসভ্য জাতির মধ্যে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, তাহারাই দেবতার সাহায্যে ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনকে ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে; কারণ তদপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় কিছু আছে, ইহা তাহারা ধারণাই করিতে পারে না।

এখন বোধ হয়, আমি যে অর্থে ধর্ম্ম শব্দের ব্যবহার করিতে চাই, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইতে পারিয়াছি। এই যে ধর্ম্ম ইহার সাধনের জন্য সকল ধর্ম্ম মতেই কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা আছে। যে সকল ধর্ম্মমত শাস্ত্রানুবর্ত্তী, তাহাদের ত কথাই নাই, প্রাকৃতিক ধর্ম্ম (natural religion) নামে পরিচিত নব-প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রহীন যে ধর্ম্মমত এই ধর্ম্ম সংঘর্ষের দিনে প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাও বিধিব্যবস্থাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। যে দেশে যে শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম তাহার উপরে বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে, তাহারই বিধিব্যবস্থা কিছু পরিবর্ত্তিত ভাবে তাহাতে গৃহীত হইতেছে। কোথাও বা তাহাতে বিভিন্ন ধর্ম্ম মতের বিধিব্যবস্থার সংমিশ্রণ ও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল বিধিব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি বাহ্য, কতকগুলি অন্তর। এই সকল বাহ্য ও অন্তের বিধিব্যবস্থামূলক ক্রিয়া মোক্ষ-সাধন বলিয়া ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। তাই জৈমিনি বলিয়াছেন, "চোদনা লক্ষণো ধর্ম্মঃ" বিধি ব্যবস্থার

প্রেরণাই ধর্ম্মের লক্ষণ। অবশ্য যাহাকে নিকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়াছি, যে প্রকার ধর্ম্ম বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে, তাহাতেও এই লক্ষণ বর্ত্তমান। এই সকল বিধিব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এখন জীবন্ত ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শরীর ও মনের সংযোগেই জীবন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মননহীন জীবন জীবনই নহে। বৃক্ষ লতার জীবন আছে বলি বটে, কিন্তু তাহারা বড় জোর অর্দ্ধ-জীবিত, তাই তাহাদিগকে জীব বলি না। পশু পক্ষীর জীবনে মনন ক্রিয়া তদপেক্ষা অনেক স্পষ্ট বলিয়াই তাহারা জীবপদ বাচ্য। এই লক্ষণ ধর্ম্মে প্রয়োগ করা যাউক। তবেই বুঝা যাইবে, যে ধর্ম্মে বাহ্য ও আন্তর উভয়বিধ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই জীবিত ধর্ম্ম। শুধু তাহাই নহে, এই উভয়ের সামঞ্জস্যও থাকা আবশ্যক। সে কথা পরে হইবে।

যেখানে কেবল বাহ্য ক্রিয়াগুলি অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ধর্ম্মের দেহ আছে, মন নাই ; সে মৃতধর্ম্ম। মৃতধর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইতে পারে না। মৃত দেহ দ্বারা কি কার্য্য সম্ভবে ? তাহা আমাদিগকে কখনও মোক্ষের দিকে লইয়া যাইতে পারে না।

আর যেখানে কেবল ভাবপ্রবণতা, তাহার অনুরূপ অনুষ্ঠান কিছুই নাই তাহাও জীবিত ধর্ম্ম নামের অযোগ্য। দেহহীন মনকে জীবিত বলা যায় না। তাহাকে ধর্ম্মের ভূত বলিলে বলা যায়। তাহাও মোক্ষলাভের সহায় হয় না, বরং অনেক সময় ভূতেরই মত মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে বিপদ্‌গ্রস্ত করে। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টীকে বিশদ করিবার চেষ্টা করিব। পরচর্চ্চায় প্রয়োজন কি ? আমাদের আপনার কথাই বলা যাউক। সকল প্রকারের দৃষ্টান্তই আমাদের মধ্যে আছে ; কোথাইবা নাই ?

আমাদের অনেক তথাকথিত ধর্ম্মানুষ্ঠান ঐহিক অথবা পারলৌকিক স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সেগুলি মোক্ষের সহায় হওয়া দূরে থাকুক, বরং সংসারবন্ধনকে আরও দৃঢ় করে। সে সকল অনুষ্ঠানের সময় আমরা যাহাকে ভক্তি-ভাবের উদ্রেক বলিয়া মনে করি, তাহা বাস্তবিক উচ্চাঙ্গের ভক্তি নহে, ঐ সকল স্বার্থ-লাভের জন্য আগ্রহাতিশয়ের রূপান্তর মাত্র।

এইরূপ ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ মৃত বলা যায় না, তবে ইহা নিকৃষ্ট জাতীয় এবং প্রকৃত ধর্ম্ম-পদ-বাচ্য নহে। তদ্‌ব্যতীত, অনেক স্থলে বিশেষ আন্তর ক্রিয়া দেখা যায় না। অনেকে পুরোহিতকে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হন, অনেকে পূজার সময় অন্যবিধ সাংসারিক কার্য্যে বা আমোদ প্রমোদে মগ্ন থাকেন। পুরোহিত হস্ত মুখাদি দ্বারা বিধিনির্দ্দিষ্ট বাহ্য ক্রিয়াগুলি কতকটা করেন, কিন্তু তাঁহারও মনের দিকে চাহিলে অনেক সময় হতাশ হইতে হয়। নিজের প্রাপ্তির হিসাব লইয়াই তাঁহার মন ব্যস্ত থাকে; তাহা যদি আশানুরূপ না হয়, তবে অসন্তোষের সীমা থাকেনা; আর প্রাপ্তি যথেষ্ট হইলে সেই সন্তোষেই তাঁহার মন পূর্ণ থাকে। যাঁহারা নিজের সন্ধ্যা পূজা নিজে করেন তাঁহারাও অনেক সময় নিয়মানুরূপ হস্ত মুখাদির সঞ্চালনই যথেষ্ট মনে করেন। অর্থহীন, ভাবহীন মন্ত্রোচ্চারণ বাগ্‌যন্ত্রের সঞ্চালন মাত্র, তাহার বেশী কিছুই নহে। ক্রিয়াগুলি যাঁহাদের ভালরূপ অভ্যস্ত হয় নাই, তাহাদের অবশ্য সেগুলি যাহাতে ঠিক ভাবে করা হয় সে দিকে মনঃসংযোগ আবশ্যক হয়, কিন্তু অভ্যাস হইয়া গেলে তাহারও প্রয়োজন হয় না। কলের পুতুলের মত বাহ্যক্রিয়াগুলি চলিতে থাকে, মন তাহার বিশেষ কিছু সংবাদ রাখে না। অনেক সময় পূজাদির সমারোহের উদ্দেশ্যে কেবল আপন গৌরব খ্যাপন মাত্র। ধর্ম্ম-সঙ্গীত ও কীর্ত্তনাদিতেও অনেক সময় কি গায়ক কি শ্রোতা কেহই সে সকলের প্রকৃত ভাব গ্রহণের চেষ্টা করে না, তাহার প্রয়োজন ও অনুভব করে না; স্বরমাধুর্য্যের দিকেই দৃষ্টি করে। হয়ত ইহাতে সকলকে তত দোষও দেওয়া যায় না; কারণ, যে সকল সঙ্গীত গীত হয়, তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। এইরূপ গানগুলিতে অভ্যস্ত হইয়া শেষে যে লোকে তাৎপর্য্য গ্রহণের অবশ্যকতা ভুলিয়া যাইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কখন বা গূঢ়ার্থক সঙ্গীতের যে ভাব লোকে গ্রহণ করে, তাঁহা ধর্ম্ম ভাবত নহেই, বরং (বিশেষতঃ কৃষ্ণলীলাদিতে) তদ্বিপরীত। এরূপ গানও যে ধর্ম্মসঙ্গীত নামে পরিচিত হইতে পারিতেছে, তাহার কারণ দুই এক কথায় বুঝান যায় না, এজন্য এখানে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, যে সঙ্গীত আমার ধর্ম্মভাবের উদ্রেক না করে, আমার

নিকট তাহা ধর্ম্ম সঙ্গীতই নহে; অন্যের নিকট হয়, হউক। আমি বলি, যে সকল সঙ্গীত এমন গূঢ়ার্থক যে সাধারণে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কোন মতেই বুঝিতে পারে না, সেগুলি সকলের মধ্যে গীত না হওয়াই ভাল। শ্রীচৈতন্যদেব এবিষয়ে সাবধান ছিলেন বলিয়া মনে হয়। আমিত আজিও কৃষ্ণলীলার কিছুই বুঝি না বলিলে হয়, সুতরাং তদ্বিষয়ক অনেক সঙ্গীতকেও ধর্ম্মসঙ্গীতরূপে গ্রহণ করিতে পারি না, কারণ তাহা শুনিলে আমার ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হয় না। বোধ হয় আমার মত অনেক লোক আছে।

এইরূপ ধর্ম্মভাবহীন যে ধর্ম্মাচরণ তাহা ধর্ম্মের মৃতদেহ মাত্র। মৃতদেহে যেমন জীবনী ক্রিয়াগুলি থাকে না, কিন্তু রাসায়নিক পচনাদি ক্রিয়া দেখা দেয়, মৃতদেহেও সেইরূপ হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে এমন হয় যে তাহার পূতিগন্ধেও বিষ-ক্রিয়ায় সমাজ পরিপূর্ণ হয়। আমাদের সমাজেও যে এইরূপ হইয়াছে, তাহা কি আবার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হইবে? কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মের নামে যে বিষম দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহা কি সকলের পরিজ্ঞাত নহে? আমরা মানুষের মৃতদেহ দাহ করিয়া নিঃশেষ করি, আর এই ধর্ম্মের ন্যাক্কারজনক মৃতদেহ পুষিয়া রাখি। ধর্ম্মবিষয়ে উদারতা হিন্দুধর্ম্মের একটী অনুপম প্রশংসনীয় বিশেষত্ব। কিন্তু উদারতা এক, আর দুর্নীতি ধর্ম্মের পোষাক পরিলেই তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া আর এক জিনিস।

এখন ধর্ম্মের ভূতের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। অবশ্য, যে মৃত, তাহারই ভূত হয়। মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার যেখানে ক্রটি হয়, সেখানেই ভূতের আবির্ভাবের আশঙ্কা বেশী। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেই কথা; যেখানে মৃত ধর্ম্ম, সেখানেই অনেক সময় ধর্ম্মের ভূত দেখা দেয়। উহা প্রায়শঃ মৃত ধর্ম্ম শরীরের অংশ বিশেষকে আশ্রয় করিয়া প্রতারণার মাত্রা পূর্ণ করে। তখন তাহাকে জীবিত ধর্ম্ম হইতে বাছিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। অসামঞ্জস্যই তাহাকে চিনিবার প্রধান উপায়। এমন অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, একজন লোক দিবসের অধিকাংশ সময় ধর্ম্মালোচনায় কাটায়, ধর্ম্ম-সঙ্গীত শ্রবণে মত্ত হইয়া অশ্রুকম্প পুলকাদি লক্ষণ প্রকাশ করে, কিন্তু তাহার চরিত্রের তাদৃশ কোন উন্নতি দেখা যায় না, মিথ্যাকথা, প্রতারণা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দ্বারা বরং তাহার মলিন স্বভাবই প্রকটিত হয়। এইরূপ চরিত্রের সহিত অসমঞ্জস

ভাবপ্রবণতাকে আমি ধর্ম্মের ভূতের আবেশ বলিয়া মনে করি। প্রকৃত ধর্ম্মভাবের সহিত ঐরূপ মলিন চরিত্রের সমাবেশ অসম্ভব। বাস্তবিক, ঈদৃশ ভাবপ্রবণতার মধ্যে যে ভাব, তাহা প্রকৃত ধর্ম্মভাব নহে, তাহার ভান মাত্র। সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, এই ভাব ঠিক স্বাভাবিক জ্ঞান-সহকৃত নহে, এক প্রকার hypnotismএর বিকার মাত্র।

অনেক সময় আমরা নিজেরাই বুঝিতে পারি না, আমাদের মধ্যে যে ধর্ম্মভাব আছে, তাহা প্রকৃত কিনা, আমরা ভূতগ্রস্ত কি স্বাভাবিক অবস্থায় আছি। এজন্য বিশেষ পরীক্ষা আবশ্যক। বুঝিয়া সময়ে প্রতিবিধান না করিলে যে বিষম অনিষ্ট। শ্রুতিও বলিতেছেন, "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, নচেদিহা বেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।" "ইহলোকে জানিতে পারিলে ঠিক হয়, নতুবা সর্ব্বনাশ।" পরীক্ষার উপায় কি? ধর্ম্মের যাহা উদ্দেশ্য তাহার দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতেছি কিনা, তাহা দেখিলেই প্রকৃত পথে চলিয়াছি কিনা, বুঝিতে পারা যায়। দেখিতে হইবে, আমরা প্রবৃত্তি সমূহকে বশীভূত করিতে কি পরিমাণে সমর্থ হইয়াছি; সংসারের মায়ামোহ কি পরিমাণে কাটাইতে পারিয়াছি; প্রেমের প্রসার কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে ও কর্ত্তব্যজ্ঞানকে কতদূর ফুটাইয়া তুলিতেছে, স্বাভাবিক করিয়া তুলিতেছে; ভগবান্ আমাদের নিকট কতখানি আত্মপ্রকাশ করিতেছেন; তাঁহাকে নিজের ও বিশ্বের কারণরূপে, আশ্রয়রূপে, গতিরূপে, নিয়ন্তৃরূপে, প্রাণরূপে,—সর্ব্বরূপে ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র অনুভব কি পরিমাণে পরিস্ফুট হইতেছে; তবেই বুঝিব, আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া পোষণ করিতেছি, তাহার অবস্থা কিরূপ। প্রকৃত ধর্ম্মভাব যেখানে থাকে সেখানে দম্ভ অহঙ্কারের স্থান নাই, কারণ ধার্ম্মিক দেখেন, ভগবানেরই সব, ভগবানই সব, তাহার নিজের মধ্যে যাহা কিছু ভাল, তাহাত তাঁহার নিজের কিছুই নয়!

শ্রুতি বলিতেছেন, "অয়ংধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাংভূতানাং মধু।" এই জীবন্ত ধর্ম্ম সকল ভূতে অমৃতরূপে অবস্থিতি করে। জীবন্ত ধর্ম্মের অধিকারীর জীবন মধুময় হয়; তাঁহার হৃদয়ে মধু, বাক্যে মধু, কার্য্যে মধু; তিনি কখনও বাহিরে কঠোরতা প্রদর্শন করিলেও সেই কঠোরতারও ভিতর মধু ভরা দেখা যাইবে। আর তিনি সদানন্দময়; ভগবান্কে যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সর্ব্বভূতে যাঁহার প্রেম, তাঁহার হৃদয়ে নিরানন্দ প্রবেশ করিবে কিরূপে? তাই

আবার "অস্মৈ ধর্ম্মায় সর্ব্বাণি ভূতানি মধু;" ধাম্মিক পুরুষের নিকট সকল ভূত মধুময়, কারণ তাঁহার হৃদয় প্রেমময়। এমন ভাবিবেন না যে, এই প্রেম যদি রহিল, তবেই সংসার রহিল। এপ্রেম সাংসারিক প্রেম হইতে পৃথক। ইহা প্রেমস্বরূপের প্রেম। সাংসারিক প্রেমে তাহার গন্ধ আছে বটে, কিন্তু সাংসারিক প্রেম প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা করে ও অনেক সময় দুঃখের কারণ হয়।

অমুক ধর্ম্ম জীবিত, অমুক ধর্ম্ম মৃত, এরূপ কথার অর্থ নাই। সকল ধর্ম্মের মধ্যেই এমন সকল ভাগ্যবান পুরুষ আছেন, যাঁহারা জীবন্ত ধর্ম্ম-সম্পদে গৌরবান্বিত। বলা উচিত, অমুকের ধর্ম্ম জীবিত, অমুকের ধর্ম্ম মৃত, অমুকের ধর্ম্মে কিছু কিছু জীবনের লক্ষণ দেখা যায়, ইত্যাদি।

জীবন্ত ধর্ম্ম লাভ করিবার উপায় কি? ইহা ভগবানের বিশেষ দান, শ্রেষ্ঠ দান; ইহা লাভ করিবার জন্য তাঁহার অনুগ্রহ আবশ্যক। সেই অনুগ্রহ পাইতে হইলে এক মনে তাঁহাকে ডাকিতে হইবে, এবং সেই ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আসক্তি ত্যাগের—নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্য-সাধনের অভ্যাস করিতে হইবে; প্রার্থনায় ও আচরণে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সতত চেষ্টিত থাকিতে হইবে। মনোবৃত্তি যাহাতে তদনুযায়িনী হয় তাহার জন্য অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া, যেগুলি নিজের প্রকৃতিতে উপযোগী হয়, সেগুলি অবলম্বন করিতে হইবে। সে সকলের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অসম্ভব। ভগবানের ইচ্ছা হইলে সময়ান্তরে তাহা করা যাইবে।

যদি ঈশ্বর কৃপায় আমার ধর্ম্ম জীবন্ত ভাব ধারণ করে, তবেই তাহা সংসার মুক্তির সহায় হইতে পারে। আর যদি তাহাই না হইল, তবে সে ধর্ম্ম দিয়া আমার প্রয়োজন কি? যেনাহং না মৃতঃ স্যাং, কিমহংতেন কুর্য্যাম্? ভক্তগণ মুক্তি চান না, এই যে একটা কথা আছে, ইহা বলিয়া কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, মুক্তিই শ্রেষ্ঠতম আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তু না হইতে পারে। কিন্তু উক্ত মুক্তিপদ কৈবল্য বা নির্ব্বাণের অর্থে ব্যবহৃত। ভক্তগণ সংসারমুক্তি চান না, এবড় হাস্যাস্পদ কথা; সংসারমুক্তি না হইলে যে উচ্চাঙ্গের ভক্তি ও অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রহ্লাদ ভগবানকে বলিয়াছিলেন,

যা প্রীতি রবিবেকানাং বিষয়েম্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

ইহার অর্থ এই "হে ভগবন্, বিবেকহীন ব্যক্তিগণের বিষয়ের প্রতি যে অক্ষয় প্রীতি থাকে, তোমাকে স্মরণ করিতে করিতে আমার হৃদয় হইতে তাহা যেন দূর না হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা বিষয় সকলকেই প্রীতির পাত্র বলিয়া প্রীতি করে তাহাদের বিবেকজ্ঞান জন্মে নাই; কিন্তু এ সকলিত তুমি আমার উপভোগের জন্য রাখিয়া দিয়াছ এবং ইহাদের মধ্যেও আমার মনের মধ্যে থাকিয়া আমাকে উপভোগ করাইতেছ, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া যেন এ সকল উপভোগ করিতে পারি, অপ্রেম দ্বারা তোমার দানের অবমাননা করিব কেন? যিনি এভাবে বিষয় ভোগ করিতে পারেন তিনি ত সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মত পূর্ণ জীবন্ত।

মৃত ধর্ম্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম ও ভাল। কারণ মৃত ধর্ম্মে জীবন সঞ্চার অপেক্ষা, নিকৃষ্ট ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রণোদিত ধর্ম্মের মুক্তিপ্রদ ধর্ম্মে পরিণতি সহজ। এইজন্যই আর্ত্ত ও অর্থার্থী উপাসককেও ভক্ত মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু কয়জনের জীবনে এইরূপ পরিণতিই বা দেখা যায়?

মা, জ্ঞানদায়িনি, অধম সন্তানের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দেও, মা! আর ত ধর্ম্মের শব লইয়া পড়িয়া থাকিতে পারি না। ইহা জীবনকে ত মধুময় করেই না, অধর্ম্ম রাক্ষসের কবল হইতে রক্ষা করিবার শক্তি ও ইহার নাই। ইহা কেবল ভারের মত আমার উপর চাপিয়া আছে। ইহার পূতিগন্ধে সময় সময় অস্থির হইতেছি। ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে; তাহাতেই যেন ভার লঘু বোধ হইতেছে। ইহাকে দিয়া কি করিব, মা? জীবন্ত ধর্ম্ম চাই, জীবন্ত ধর্ম্মের অমৃত আস্বাদন করিতে চাই। নতুবা শান্তি নাই, সুখ নাই। আর সংসারের মায়ামোহের অন্ধকারে জড়িত থাকিতে পারি না। জীবন্ত ধর্ম্মের জ্যোতিঃ আমার মধ্যে বিকিরণ কর; আমি ধন্য হই, কৃতার্থ হই।

শ্রীপরেশনাথ সেন।

বঙ্গের বরণ্যকবি দেশ-প্রাণ মহাত্মা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের প্রতি।

বরষিয়া ধরা দেহে প্রখর কিরণ,
জ্বলন্ত উৎসাহে করি কার্য্য সমাপন,
হাসিমুখে রক্তচ্ছটা করি বিকিরণ
গৌরবমণ্ডিত দেহে প্রশান্ত বদন
শ্রান্ত রবি যুদ্ধ জয়ী বীরের মতন
ছুটে যায় অপরাহ্নে আলয়ে আপন
বাঁচাইতে সেথা পুনঃ জীবের জীবন।
তেমতি তুমিও বুঝি, হে চিত্তরঞ্জন!
লভিয়া বিপুল যশঃ সংসারের কাজে
এসেছ ফিরিয়া গৃহে, ওহে কীর্ত্তিমান!
জীবনের মধ্যস্থলে স্বগণের মাঝে
স্বদেশের হিত লাগি বিকাইতে প্রাণ।
বিক্রমপুরের দৈন্য করিয়া স্মরণ
কাঁদিয়া উঠেছে তব ব্যাকুল হৃদয়
বুঝি তায় শুভক্ষণে হে দেশ রতন!
তাহার চিন্তায় তাই হয়েছে তন্ময়।
প্রতিভার দীপ্ত রবি! কর্ম্মক্ষেত্রে তব
পৌরুষ মনীষা হেরি মুগ্ধ কতজন
আশ্রিত কাঙ্গাল কত ব্যথিত মানব
তোমার কৃপায় লাভ করেছে জীবন।
দেশের দুর্দ্দশা দুঃখ করিতে মোচন
এখন দিয়াছ ঢালি শক্তি আপনার,
হও আগুয়ান তবে স্মরি নারায়ণ
উৎসাহে, আশীষ লাভ করি দেবতার।
শুভক্ষণে ভাগ্যবান যত সুধীজন

জনমি দেশের মুখ করেছে উজ্জ্বল
তোমার দৃষ্টান্ত আজি করিয়া স্মরণ
নিয়োগ করুক তার কাজে অর্থ, বল।
স্মরিয়া দেশের দয়া, রীতি, নীতি, কাল,
মুগ্ধ স্বার্থত্যাগে তব, ওহে গুণাধার!
বিক্রমপুরের এই নগণ্য কাঙ্গাল
তোমার চরণে করে শত নমস্কার।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত।

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ।

বেতকা।

চতুঃসীমা—বেতকা মৌজার উত্তরে ছট্রফটিয়া; পূর্ব্বে বিন্দুসার, পাইকপাড়া ও খিলপাড়া; দক্ষিণে সোণারঙ্গ ও নোয়াদ্দার মাঠ এবং পশ্চিমে রায়পুরা, আউটপাড়া, দ্বিপাড়া, রান্ধুনীবাড়ী ও চাঙ্গরী গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রাম উত্তরে ও দক্ষিণে দৈর্ঘ্য প্রায় সোয়া দুই মাইল; পূর্ব্বে ও পশ্চিমে প্রস্থে কোন স্থানে সোয়া মাইল এবং কোন স্থানে অর্দ্ধ মাইল আন্দাজ হইবে। সেটেলমেণ্ট মতে গ্রামের মোট জমি ৬২১ একর।

গ্রাম্য-ইতিহাস—উত্তর বিক্রমপুর মধ্যে বেতকা একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। এই গ্রাম সাধারণতঃ উত্তর ও দক্ষিণ বেতকা এই দুইভাগে বিভক্ত। ইহার নামোৎপত্তির ইতিহাস স্থিররূপে নির্ণয় করা কঠিন; পুরাতন দলিল পত্রে ইহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বেত বনের বেত কাটা হইতেই "বেতকা" নামের সৃষ্টি।

জন-বিবরণ—আদম সুমারী মতে এই গ্রামের লোকসংখ্যা সর্ব্বমোট—২১৭২। চাকুরী উপলক্ষে এই গ্রামের বহুলোক পরিবার সহ বিদেশে বাস করেন; আদম শুমারীতে ইহাদিগকে গণনা করা হয় নাই তজ্জন্য লোকসংখ্যা অত্যল্প দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু প্রকৃত লোকসংখ্যা অনুমান সাড়ে তিন হাজার।

এই গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, বারুই, ক্ষৌরকার, রজক, যুগী, ভূঁইমালী প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমানগণের বাস। এতন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; তৎপরে ব্রাহ্মণ ও বারুইর সংখ্যা প্রায় একরূপ। কায়স্থ এবং শূদ্রের সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক কম। অন্যান্য জাতির সংখ্যা অতিশয় সামান্য। ব্রাহ্মণগণ মধ্যে ঘোষাল, চাটাতি, বাড়ড়ী ও তালুকদার বংশ অতি প্রাচীন; কায়স্থগণ মধ্যে সরকার ও বিশ্বাস বংশই মৌলিক।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের প্রধান অবলম্বন চাকুরী; সামান্য সংখ্যক লোকের জীবনোপায় তেজারতি, তালুকদারী ও মহাজনী। বারুজীবিগণের উপজীবিকা নিজ ব্যবসায়—পাণ ও তরী তরকারী প্রভৃতি বিক্রয় এবং গৃহস্থি। অন্যান্য জাতির কার্য্য নিজ নিজ ব্যবসায়, কৃষিকার্য্য, সামান্য কারবার, দিন মজুরী প্রভৃতি। ভাবিয়া দেখিতে গেলে ২।৪ জন ভিন্ন এই গ্রামে কাহারও অবস্থা স্বচ্ছল নহে। মোটের উপর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বারুজীবিগণের অবস্থাই কিছু উন্নত বলিয়া অনুমিত হয়, অন্যান্যের অবস্থা শোচনীয়।

পল্লী-বিভাগ ও তদ্বিবরণ—আয়তনে বৃহৎ বলিয়া এই গ্রাম নিম্নলিখিত পল্লীসমূহে বিভক্ত। নিম্নে অতি সংক্ষেপে এই সকল পল্লীর বিবরণ ও খ্যাত নামা ব্যক্তিগণের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করা হইল।

ডিপুটীপাড়া—পেন্‌সন প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত রায় প্যারীমোহন বসু বাহাদুর বিগত ১৩০৬ সনে রেতকায় আগমনপূর্ব্বক একটী বৃহৎ বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতেছেন। সেটেলমেণ্ট কার্য্যে তিনি অতিশয় দক্ষ ছিলেন এইজন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯০৬ সালে "রায়বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন বসু বর্ত্তমান সময়ে পিরোজপুর মহকুমায় সবডিপুটীর কার্য্য করিতেছেন। নিজ অভিপ্রায়ানুসারে এই পল্লীর নাম রাখিয়াছেন "ডিপুটীপাড়া"।

তালুকদারপাড়া—তালুকদার উপাধিধারী কতিপয় ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করেন বলিয়া লোকে ইহাকে তালুকদার পাড়া বলে। তালুকদার মহাশয়গণ বহুদিন যাবৎ এই স্থানে বসবাস করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত তালুকদার মহাশয় এই পাড়ার প্রধান ব্যক্তি। ইনি এখন পেন্‌সন ভোগ করিতেছেন।

সিকদারপাড়া—সিকদার উপাধিধারী কতিপয় মুসলমান এই স্থানে বাস করেন বলিয়া ইহার নাম সিকদারপাড়া। উন্নত শ্রেণীর সিকদারগণ চাকুরী এবং ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন। ৺ মোহরালী ও ৺ আলিমদ্দি সিকদার ইহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। অন্যান্য সিকদারগণ নিরক্ষর, সাধারণ কৃষিজীবি গৃহস্থ।

ঘোষপাড়া—শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এই পল্লীতে ঘোষ পদবী-বিশিষ্ট কতিপয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তি বাস করিতেন বলিয়া লোকে ইহাকে ঘোষপাড়া নামে অভিহিত করিয়া থাকে। উক্ত ঘোষ মহাশয়গণের সময়ে এই পল্লীর অবস্থা অতিশয় উন্নত ছিল; সেই সময়ে অতি সমারোহে পল্লী মধ্যে ১১ বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত ও পূজা উপলক্ষে প্রতি বাড়ীতেই নিমন্ত্রণ ও ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। আদি বাড়ীর ঘোষ মহাশয়গণ সকলেই নিঃসন্তান; তাহাদের বাড়ী পতিত পরিত্যক্ত।

এই পল্লীর খ্যাতনামা ব্যক্তি (১) ৺ হরিশ্চন্দ্র বসু। ইনি থাকবস্থার ডিপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া বিক্রমপুর ও অন্যান্য স্থানের থাক নক্‌সা ও থাক সম্বন্ধীয় অন্যান্য কাগজ পত্রাদি প্রস্তুত করাইয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। (২) শ্রীযুক্ত রায় করুণাদাস বসু বাহাদুর। ইনি ডিঃ ও ছেস্‌ন জজের কার্য্য করিয়া এখন পেন্‌সন ভোগ করিতেছেন। বিগত ১৯০৬ সালে তিনি রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রায় বাহাদুর বেতকা মৌজার প্রধান ধনী। (৩) শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার। ইনি চট্টগ্রাম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করিয়া চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল হইতে এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় ১৫৲ টাকা বৃত্তি ও "বেলী" রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হন। অতঃপর বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতির বৃত্তি গ্রহণপূর্ব্বক ১৯০৬ সনে আমেরিকাযুক্ত রাজ্য হইতে অতিশয় কৃতিত্বের সহিত কৃষি-বিজ্ঞানে এম, এ, উপাধি প্রাপ্ত হন। ভারতবাসী মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তৎপর তিনি কুচবিহার মহারাজের চাকুরী গ্রহণপূর্ব্বক তামাক চাষে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের নিমিত্ত পুনর্ব্বার যুক্তরাজ্যে ও ইউরোপের নানাস্থানে শিক্ষা লাভ করিয়া তামাক চাষে Expert অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ হইয়া কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব মহারাজের অভিপ্রায়ানুসারে

কুচবিহার রাজ্যে কয়েক বৎসর তামাকের চাষ করেন। তাঁহার উৎপাদিত তামাক ৮০৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইত। উক্ত তামাক অত্যুৎকৃষ্ট চুরট প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। সেই সমস্ত চুরট প্রত্যেকটী ৫।৬ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। বর্ত্তমান সময়ে তিনি কুচবিহার রাজ্যের প্রধান বন্দোবস্ত কর্ম্মচারী (First Settlement officer)

এতদ্‌ভিন্ন এই পল্লীতে আরও কতিপয় মহাশয় পরোপকারী এবং বিদ্বান্ ব্যক্তি বাস করিতেন তন্মধ্যে ৺কালীহর গুহ ও ৺উমাকান্ত মজুমদার মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৺কালীহর গুহ ইনি কুমিল্লায় মোক্তারী করিয়া যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিতেন। দেশীয় বহু উপায়হীন লোকের অন্নবস্ত্র ও বাসস্থান প্রদান পূর্ব্বক সাহায্য করিয়া ও টাকার সদ্‌ব্যবহার করিতেন। তাঁহার দয়া এবং পরোপকার সর্ব্বজন বিদিত। বহুদিন হইল এই মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে এখনও গ্রামের লোকে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

৺ উমাকান্ত মজুমদার। ইনি নোয়াখালী জেলা স্কুল হইতে জুনিয়ার পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ঢাকাকলেজে সিনিয়ার চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া Mastership পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কিছুকাল টেঘরিয়া উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ে হেডমাষ্টারের কার্য্য করিয়া গভর্মেণ্ট উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ে ৩২ বৎসর ২ মাস সহকারী শিক্ষকের কার্য্য করিয়া পেন্‌সন প্রাপ্ত হন। কিছুকাল পেন্‌সন ভোগ করিয়া ১৩০৯ সালে পরলোক গমন করেন। তিনি ৪২ বৎসর কাল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছেন। তাঁহার বহুছাত্র উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি অতিশয় সৎস্বভাবান্বিত ও বিদ্বান বলিয়া সর্ব্বত্র উমাকান্ত "মাষ্টার" নামে পরিচিত ছিলেন। সময় সময় তিনি "সংবাদ প্রভাকর" নামক মাসিক পত্রে বাঙ্গালা পদ্য লিখিতেন। তিনি ভাল পার্শী জানিতেন। আমেরিকা প্রত্যাগত শ্রীমান ইন্দুভূষণ দেব মজুমদার বি, এ ; এম্, এস্, সি, তাঁহার চতুর্থ পুত্র।

মামুদাদপুর জমিদারীকাগজপত্রে এই পল্লীর নাম জোয়ার মামুদাদপুর বলিয়া লিখিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে এই পল্লীতে ২০।২৫ ঘর সাধারণ মুসলমান গৃহস্থের বাস

গোঁসাইপাড়া—গোস্বামী উপাধিধারী কতিপয় ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করেন বলিয়া ইহার নাম গোঁসাইপাড়া। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র গাঙ্গুলী গোস্বামী মহাশয় এই পল্লীর প্রধান ব্যক্তি।

সরকারপাড়া—বেতকার সরকার মহাশয়গণ এই পল্লীতে বাস করেন বলিয়া লোকে ইহাকে সরকারপাড়া বলে। শ্রীযুক্ত কালীকুমার সরকার ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসু মহাশয়দ্বয় এই পল্লীতে প্রধান ব্যক্তি। সরকার মহাশয় ব্রহ্মদেশে P. W. D.তে সুপারভাইজারের কার্য্য করিয়া প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এখন তিনি পেন্সন ভোগ করিতেছেন। বসু মহাশয় মৈমনসিং জজকোর্টে ওকালতী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন।

মুখুটীপাড়া—৺ মহিমচন্দ্র মুখুটী মহাশয় এই পল্লীতে বাস করিতেন বলিয়া লোকে ইহাকে মুখুটীপাড়া বলে। আসাম বগড়ীবাড়ী জমিদার বাড়ীতে চাকুরী করিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হন। বেতকা কালীবাড়ীর দালান তাঁহার উদ্যোগে প্রস্তুত হয়। তাঁহার বর্হিবাটীতে বেতকা পোষ্টাফিস এবং বালকগণের উদ্যোগে একটী ছোট রকমের লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে।

বাড়ড়ীপাড়া—বাড়ড়ী বংশীয় কতিপয় ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করেন বলিয়া ইহার নাম বাড়ড়ীপাড়া। বাড়ড়ী বংশের কতিপয় বাড়ীমাত্র এইস্থানে বর্ত্তমান আছে।

চক্রবর্ত্তীপাড়া—চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ এই পল্লীতে বাস করেন বলিয়া এই পল্লীর নাম চক্রবর্ত্তীপাড়া। এই পল্লীর প্রায় সকলের অবস্থাই স্বচ্ছল।

গিলাবাড়ী—এই পল্লীর কোন বাড়ীতে একটী গিলা গাছ ছিল। ঐ গিলা লতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বহুস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য লোকে এই পল্লীকে গিলাবাড়ী কহিয়া থাকে। ৺রাজমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় এই পল্লীর প্রধান ব্যা‍ক্ত ছিলেন।

ঘোষালপাড়া—বেতকার ঘোষাল মহাশয়গণ এই পল্লীতে বাস করেন বলিয়া ইহার নাম ঘোষালপাড়া। ক্রমে বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় স্থানাভাব হেতু বর্ত্তমান সময়ে ঘোষাল মহাশয়গণ ভিন্ন ভিন্ন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। অতি পূর্ব্বে এই স্থানে ঘোষাল মহাশয়গণের মাত্র দুই বাড়ী ছিল এখন ক্রমে ৭।৮ বাড়ী হইয়াছে। খিলপাড়া নিবাসী বিখ্যাত ধনী ঘোষাল

মহাশয়গণ কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান হইতে যাইয়া খিলপাড়া বাস করিতেছেন। বিলাতপ্রত্যাগত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত ঘোষাল মহাশয় এই বেতকার ঘোষাল বংশসম্ভূত। বর্ত্তমান সময়ে এই পল্লীতে প্রাচীন ব্যক্তি শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষাল। গ্রাম্য মাতব্বর শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ঘোষাল। কালীনাথ ঘোষাল মহাশয় ওকালতী পাশ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে মৈমনসিং মুক্তাগাছা চারি আনির জমিদার বাড়ীতে ম্যানেজারের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। গোবিন্দচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় রেঙ্গুণে পোষ্টমাষ্টারের কার্য্য করিতেছেন। বিদ্যালয়—বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রামে বিদ্যালয়ের বড়ই অভাব। রায় প্যারীমোহন বসু বাহাদুরের বাড়ীতে একটী মধ্যমাকারের উঃ প্রাঃ বিদ্যালয়, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসু মহাশয়ের উদ্যোগে তাঁহার বহির্বাটীতে একটী নিঃ প্রাঃ বালক ও বালিকা বিদ্যালয় এবং শ্রীযুক্ত কালীকুমার সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে তদীয় বিধবা কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী রায়ের উদ্যোগে একটী ছোট রকমের বালিকা বিদ্যালয়, সর্ব্বসমেত মোট তিনটী প্রাইমেরী বিদ্যালয়। বলাবাহুল্য এই গ্রামের শিক্ষার নিমিত্ত ইহা পর্য্যাপ্ত নহে। নিকটবর্ত্তী পাইকপাড়া উচ্চ ইংরেজী-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া গ্রামের বালকগণ ইংরেজী-শিক্ষা প্রাপ্ত হয়।

লাইব্রেরী—উল্লেখযোগ্য কোন লাইব্রেরী কিম্বা পাঠাগার এই গ্রামে নাই। রায় প্যারীমোহন বসু বাহাদুরের বাটীতে তাঁহার নিজস্ব একটী মধ্যমাকারের লাইব্রেরী (পুস্তক সংখ্যা ১০০০) এবং স্কুলের বালকগণের উদ্যোগে ৺ মহিমচন্দ্র মুখুটী মহাশয়ের বাটীতে একটী ক্ষুদ্র রকমের লাইব্রেরী (পুস্তক সংখ্যা ৩০০) আছে। স্থানীয় লোকের চেষ্টায় এই স্থানে একটী উচ্চ শ্রেণীর লাইব্রেরী স্থাপিত হওয়া একান্ত দরকার। স্থানীয় সর্ব্বসাধারণ লাইব্রেরীর বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছেন।

গ্রন্থকার ও লেখক—এইগ্রামে দুই জন মাত্র গ্রন্থকার-এবং একজন লেখক আছেন। রায় প্যারীমোহন বসু বাহাদুর প্রণীত গ্রন্থ (১) সার্ভেও সেটেলমেণ্ট সহচর (২) পরিমিতি (৩) প্রজাস্বত্ব ও তাহার লিখন। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দেব মজুমদার প্রণীত গ্রন্থ (১) মার্কিণ-যাত্রা (তাহার—আমেরিকা গমন বৃত্তান্ত) (২) How to inprove Tobacco Crops in India.

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বর্ত্তমান সময়ে স্থানীয় সংবাদপত্র "বিক্রমপুর" "ঢাকা-প্রকাশ" ও "কৃষি-সম্পদ" পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন।

শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যক্তি—এই গ্রামের শিক্ষা বিশেষতঃ উচ্চ শিক্ষা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ মধ্যেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য জাতির মধ্যে সাধারণ শিক্ষার প্রভাব বর্ত্তমান থাকিলেও উচ্চ শিক্ষা একরূপ নাই বলিলেই চলে। তবে বারুজীবিগণ আজ কাল ধীরে ধীরে শিক্ষা লাভ করিতেছে। এই জাতির মধ্যে ১ জন আই, এ, ২ জন এন্‌ট্রেনস ও ২ জন ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। গ্রামের তুলনায় উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা অতিশয় অল্প। মাত্র ১১টী গ্র্যাজুয়েট, ৩টী আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং ৯ জন বিগত বি এ, ও বিস্ এ সি পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছেন।

বিখ্যাত স্থান—মেলা আমোদ-প্রমোদ। পাইকপাড়া মৌজার পশ্চিম ও বেতকা সীমানার পূর্ব্বপ্রান্তে ক্ষুদ্র খালের ধারে একটী উচ্চস্থানে, বট, অশ্বথ, তেতুল প্রভৃতি কতিপয় বৃক্ষ একত্রে বর্দ্ধিত হইয়া অতিশয় সুন্দররূপে শোভা পাইতেছে। গ্রামের লোকে ইহাকে সুবচনী গাছ ও চতুষ্পার্শ্বের ভূমিকে সুবচনীতলা বলে। প্রতি শনিবারে ও মঙ্গলবারে গ্রাম্য রমণীগণ এইস্থানে একত্রিত হইয়া স্বীয় স্বীয় মঙ্গলকামনায় দেবতাজ্ঞানে এই সকল বৃক্ষোপরি তৈল ও সিন্দুরাদি বিলেপন করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণকে সযত্নে তাম্বুল ও বাতাসা প্রদান করিয়া থাকে। সময় সময় নব বিবাহিত বর ও কন্যাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া রমণীগণ মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন কচিৎ ২।১ সময় পূজান্তে পাঁঠা বলি প্রদান করিতে ও দেখা গিয়াছে।

বেতকা ঘোষপাড়া নিবাসী শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত নামে একব্যক্তি গ্রাম্য লোকের সহায়তায় প্রতিবৎসর চৈত্র সংক্রান্তি দিবসে সুবচনী তলায় একটী মেলা মিলাইয়া থাকেন। ১৫ বৎসর যাবৎ যথাক্রমে এই স্থানে মেলা বসিতেছে। চণ্ডক পূজার পর বৈকাল বেলায় এই মেলা আরম্ভ হয়। এই মেলায় ইংরেজী-বাদ্য প্রভৃতি বাজাইয়া নানারূপ সংও মিছিল বাহির করিয়া দর্শকগণের আনন্দবর্দ্ধন করা হইয়া থাকে। গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া নিকটবর্ত্তী অন্তঃপুরমহিলা-গণেরও মেলা দেখিবার কোন অসুবিধা হয় না। এই মেলায় প্রতি বৎসর সহস্রাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। গ্রামবাসিগণ এই মেলা হইতে বিবিধ

প্রকারের মস্ল মসল্লা, মিঠাই, তরীতরকারী, পুতুল, খেলনা, মনোহারী দ্রব্য, হাড়িপাতিল প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকে।

এই গ্রামের স্থানে স্থানে বালকগণ ক্রিকেট ফুটবল প্রভৃতি ক্রীড়া করিয়া থাকে। তন্মধ্যে "Friendsclub" নামক ফুটবল ক্লাবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইউনিয়ান—বেতকা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ লইয়া একটী ইউনিয়ান আছে, তাহার নাম বেতকা ইউনিয়ান। ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট কার্য্য ত্যাগ করায় অতি অল্পদিন হইল শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন বসু বাহাদুর অত্র ইউনিয়ানের প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। খিলপাড়া নিবাসী শ্রীসেখ মুলুকচাঁদ বেপারী ইহার তহশিল পঞ্চাত শ্রীযুক্ত কালীকুমার মল্লিক, কালীচন্দ্র চাটাতি ও শ্রীনিবারণচন্দ্র মজুমদার ইহার মেম্বর পঞ্চাইত। এই ইউনিয়ানের পঞ্চাইতগণ মধ্যে নিবারণ বাবুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতি অল্পকাল কার্য্য করিয়াই তিনি তাঁহার কার্য্যদক্ষতার নিদর্শন স্বরূপ বিগত ২ বৎসর যাবৎ বেঙ্গল গভর্মেণ্ট হইতে যথাক্রমে ২য় ও ১ম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইউনিয়ান কমিটী—বঙ্গীয় গভর্মেণ্টের আদেশে অন্যান্য স্থানের ন্যায় বেতকা গ্রামেও ৯জন মেম্বর সহযোগে একটী ইউনিয়ান কমিটী গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় প্যারীমোহন বসু বাহাদুর ইহার চেয়ারম্যান। মুন্সিগঞ্জের লোকেলবোর্ড বেতকার রাস্তাঘাট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকায় এতদিন রাস্তাঘাট একরূপ কিছুই ছিলনা। ইউনিয়ান কমিটীর উদ্যোগে বিগত বর্ষে ৪টী রাস্তার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ঢাকা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত হার্টসাহেব বাহাদুর রাস্তার কার্য্য পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। টাকা অনুযায়ী রাস্তার কার্য্য অতিশয় সন্তোষ-দায়ক একথা বলাই বাহুল্য। এইভাবে রাস্তার কার্য্য চলিতে থাকিলে আশা করা যায় ৫।৬ বৎসর মধ্যে রাস্তাঘাটের আর কোন অভাব থাকিবে না।

পোষ্টাফিস—৺ মহিমচন্দ্র মুখুটীমহাশয়ের বাড়ীতে একটী Branch Post office আছে উহাতে Savings Bankএর কার্য্য না থাকায় গ্রামবাসীগণের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পোষ্টাফিসের কর্ত্তৃপক্ষ এই দিকে দৃষ্টি পাত করিলে অচিরেই এই অসুবিধা দূর হইতে পারে।

হাট বাজার—এইগ্রামে কোন হাট বাজার নাই। ১½-২ মাইল দূরবর্ত্তী আবদুলাপুর অথবা সোনারঙ্গের বাজার এবং ২-৩ মাইল দূরবর্ত্তী মিরকাদিম, তালতলা অথবা টঙ্গিবাড়ীর হাট করিতে হয়। এই গ্রামে একটি বাজার হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় গ্রামবাসীগণের বৃথা সময় ব্যয় ও অকারণ ক্লেশভোগ অনিবার্য্য।

কীর্ত্তি--মঠ-মন্দির ইত্যাদি—উল্লেখযোগ্য কোন মঠ মন্দির ইত্যাদি এই স্থানে নাই। ৺ গুরুচরণ বসু ও ৺ প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়ের চিতার উপরে তদীয় পুত্র দুইটি ছোট আকারের মন্দির এবং শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় তদীয় মাতা ৺ ভগবতী দেবীর শ্মশানোপরি একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বেতকা নিবাসী ৺ রামকান্ত বাড়ৱী ও শিবচন্দ্র মল্লিক মহাশয় দ্বয় পথ শ্রান্ত আতপ-তপ্ত পথিকগণের তৃষ্ণা ক্লেশ নিবারণার্থে খৈয়ার চক নামক প্রকাণ্ড প্রান্তর মধ্যে ২টী দীঘি খনন করাইয়া দিয়াছেন। উহার একটী রাম কান্তের ও অপরটি মল্লিকেরদীঘি নামে খ্যাত।

শিল্প ব্যবসায়—শিল্প ব্যবসায়াদির জন্য এই স্থান তত উন্নত নহে। এইগ্রামে সামান্য কয়েক ঘর মাত্র যুগী বাস করিয়া থাকে। উহারা সাধারণ দেশীয় গাছা, মশারির চারখানা, ধুতি ও রঙ্গিল শারি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। বস্ত্রাদি বয়নকার্য্য ইহাদের বংশগত ব্যবসায়। নানাকারণে এখন বাজারে সূতার অভাব হওয়াতে ইহাদের কার্য্য ভাল চলিতেছেনা। কতিপয় কৃষি-জীবি মুসলমান প্রতি বৎসর সারেঙ্গ, গেণ্ডারী, খাগরী প্রভৃতি নানারূপইক্ষু উৎপন্ন করাইয়া লৌহ যন্ত্র সাহায্যে রস নিষ্কাশন পূর্ব্বক জ্বাল দিয়া উৎকৃষ্ট গুড় প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত গুড় বাজারে অতিউচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। পাটচাষের আধিক্য হওয়ায় বর্ত্তমান সময়ে ইক্ষু-চাষ আশানুরূপ হইতেছে না। জল-বায়ু-স্বাস্থ্য—এই গ্রামের স্বাস্থ্য একরূপ মন্দ নহে। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়ের মধ্যে মধ্যে কোন কোন বৎসর সংক্রামক পীড়া দেখা দিলেও তাহার বিস্তৃতি এবং আধিক্য ঘটিতে বড় দেখা যায় না। সাধারণতঃ ভদ্র অপেক্ষা কলেরা ও বসন্ত ইত্যাদি রোগের আক্রমণ কৃষক পল্লীতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সতর্ক হইয়া চলিলে এবং উত্তম পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে পারিলে আমার বোধ হয় এতদ্দেশে ব্যারাম পীড়া খুব কমই হয়। গ্রামে প্রায়

প্রতি বাড়ীতেই—২।১টী করিয়া পুকুর আছে কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় এই যে তাহার অধিকাংশের জলেই অপেয়। সমস্ত গ্রাম অনুসন্ধান করিলেও ১০।১২টীর অধিক ভাল পুকুর পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। গ্রামে সবে মাত্র ১টী দীঘি—রায় প্যারীমোহন বসু বাহাদুরের, উহার জল অতিশয় পরিষ্কার ও সুস্বাদু মালিকগণের তাচ্ছল্যেও অনেক পুকুরদল, পেনা, কচুরী প্রভৃতিদ্বারায় অতি অপরিষ্কার অবস্থায় পড়িয়া থাকে। অনেকে সেই কার্য্যে জল নিঃশঙ্ক চিত্তে পান করে, পাণীয় জল সম্বন্ধে গ্রামবাসীগণের এইরূপ অসতর্কতা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। অন্ততঃ জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া শীতল করিয়া পান করা কর্ত্তব্য।

উৎপন্ন দ্রব্য—কৃষি-উদ্ভিদ--বিক্রমপুরের পশ্চিমাঞ্চল হইতে এই স্থান অধিকতর উচ্চ। বিশেষতঃ রামপালের অতিশয় নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ভূমি অনেকাংশেই তদনুরূপ এবং যথেষ্ট পরিমাণে উর্ব্বরা। এইস্থানে আম, কাঠাল, কামরাঙ্গা, লট্‌কা, কাউ, পায়লা, পেয়ারা, বাদাম, জাম, জামরুল, নারিকেল, বেল, কথবেল, আমরা, চালিতা, জলপাই প্রভৃতি ফলকর বৃক্ষ, জারৈল, উরিয়াম, বউনা, পিঠখিলা, বাদাম, হিজল, মান্দার, পৌয়া, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বড়গাছ, এবং বেত প্রভৃতি উদ্ভিদ অতিশয় বাহুল্যরূপে জন্মিয়া থাকে। রামপালের উৎকৃষ্ট ফসল কলা, মূলা, ইক্ষু, বেগুন, আদা, হলুদ, ধান, পাট, মরিচ, জলকচু ও বিবিধ প্রকারের ডাইল ইত্যাদি অতি উত্তম রূপে জন্মিয়া থাকে। মুসলমান কৃষক ও বারুজীবিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক দিন রাত্রি খাটিয়া উল্লিখিত ফসল সমূহ এবং লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, শশা, ডাটা, ছিমড়া, প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া থাকে। এতদ্‌ভিন্ন বারুজীবগণের পাণ বরোজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ। এতদঞ্চলে যেরূপ উৎকৃষ্ট পান জন্মে' বিক্রমপুরের অন্য কোথাও এইরূপ জন্মে কিনা সন্দেহ। এইস্থানে প্রায় ছাড়া বাড়ীতে অতি সুন্দর পরিপাটী পানের বরোজ দেখিতে পাওয়া যায়। বরোজ পান ভিন্ন লাউ, কুমড়া, বেগুন, মরিচ, পটল ইত্যাদি ফসলও জন্মিয়া থাকে। বরোজের বাহিরে বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে উৎকৃষ্ট লেবু বিস্তর জন্মিতে দেখা যায়। বারুইগণ নিকটবর্ত্তী হাটে গাদ্দিগাদি পান বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রতি রবি ও বুধবারে মিরকাদিমের হাটে বহু পানের আমদানী হয়। বিদেশস্থিত / পাইকারগণ

তাহা ক্রয় করিয়া বিদেশে চালান দিয়া থাকে। মিরকাদিমের পান বিক্রয় এক অদ্ভুত ব্যাপার, স্বচক্ষে না দেখিলে ইহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

উদ্যান—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার বশত বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে, বহু ব্যয় ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, কিঞ্চিদধিক পাঁচ বিঘা জমির উপরে "মনোমোহিনী উদ্যান" নামে একটি নাতি ক্ষুদ্র উদ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন। নিবারণবাবু তাঁহার স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর নামানুসারে এই উদ্যানের নাম রাখিয়াছেন। তৎপ্রবর্ত্তিত এই উদ্যানে দেশী ও বিদেশীয় দশ প্রকারের আনারস, প্রায় ৫০ প্রকারের লেবু, কাগজী, জম্বুরা ও কমলা গাছ, দুই প্রকার সপেটা, চারি প্রকার জামরুল, ৪।৫ প্রকারের লেচু, বিবিধ প্রকারের আম্র, কাঁঠাল, ৩।৪ প্রকারের পেয়ারা, ২।৩ প্রকারের কুল, চারি প্রকার নারিকেল, বিলম্বি, লকেট, ক্ষিরনী, পেঁপে, বিলাতি ডেফল, গোলাপজাম, কালজাম, পীচফল, বেদানা, ডালেম, বিলাতি আমড়া, বিলাতি গাব, কাউ, চালিতা, লতা চলিতা' সিঙ্গাপুরীলালতেতুল প্রভৃতি ফলের; শতমুখী, পেপারমেণ্ট, গন্ধতৃণ, লতাকস্তুরী, অর্জ্জুন, কুটজ, ঘৃতকুমারী প্রভৃতি বহু প্রকার ভেষজ উদ্ভিদ এবং দারুচিনি, এলাচী, লবঙ্গ, গোলমরিচ, কর্পূর, হিং, আলুবোখরা, পান কর্পূর, গাছপান, পচাপাতা প্রভৃতি আয়কর বৃক্ষের এবং বিবিধ প্রকার সুগন্ধি পত্রের গাছ আছে। এতন্মধ্যে আনারস ও লেবু জাতীয় গাছের সংখ্যাই অত্যধিক। ১৩২২ সনের অত্যধিক জল বৃদ্ধি হেতু অনেক দুষ্প্রাপ্য ফল বৃক্ষাদি নষ্ট হইয়াছে।

বিগত ১৩২৩ সনে নিবারণ বাবু ঢাকা-কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীতে তাঁহার উদ্যান জাত বিবিধ প্রকারের ফল ও বৃক্ষাদিসহ-উপস্থিত হইয়াছিলেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ডকারমাইকেল সাহেব বাহাদুর প্রায অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল নিবারণ বাবুর প্রদর্শনীস্থিত তাঁবুতে উপস্থিত থাকিয়া তৎপ্রদর্শিত ফল ও বৃক্ষাদি দর্শনে সবিশেষ প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন "Babu you have made a very nice collection" অতঃপর গভর্ণরসাহেব বাহাদুরকে কিছু ফলাদি উপহার প্রদান করা হইলে তিনি সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঢাকা বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত এফ্, জি ফ্রেঞ্চসাহেব বাহাদুর মেলা কমিটির প্রেসিডেণ্ট স্বরূপে প্রদর্শিত দ্রব্যাদির জন্য নিবারণ বাবুকে একখানা স্যার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছেন। নিবারণবাবু হাতে কলমে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত

থাকিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় "কৃষি-সম্পদে" বিজ্ঞাপিত ১৩২৩ সালের স্বর্ণমেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন। জামালপুর চৈতন্য নার্শারির অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ, আর, এইচ, এস্‌ মহোদয় নিবারণবাবুর উদ্যমশীলতার জন্য তাঁহাকে একটী রৌপ্যপদক উপহার প্রদান করিয়াছেন।

রায় প্যারীমোহন বসু বাহাদুরের বিস্তৃত বাড়ীতে ও একটী ফুলের এবং ফলের বাগান আছে। এই বাগানেও নানাবিধ দেশীয় ও বিদেশীয় ফল এবং ফুলের গাছ আছে। আঙ্গুর, নাশপতি, কমলা, নারিকেল প্রভৃতি ফল শত চেষ্টাতেও ভাল জন্মিতেছেনা; আম্র কাঠাল, লিচি, পেয়ারা, জামরুল, তেজপত্র প্রভৃতি আশানুরূপ ফল প্রদান করিতেছে। রায় বাহাদুরের বাগানখানি অতি সুন্দর দেখিবার জিনিষ বটে। তাঁহার বাগানের দোফলা, তেফলা আম্র আমাদের দেশে নূতন।

দেবালয়—বেতকা গ্রামে একটী মাত্র দেবালয়—কালীবাড়ী। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার আদি বিবরণ অতিশয় অদ্ভুত। কথিত আছে ৺ বারাণসী ধাম হইতে কোন একব্যক্তি তিনটী প্রস্তরময়ী কালীমূর্ত্তি এদেশে বিক্রয়ার্থে আনয়ন করেন। তিনি অতি সহজে ২টী মূর্ত্তি বিক্রয় করিয়া অপর মূর্ত্তিটী কোন প্রকারেই বিক্রয় করিতে সমর্থ হন না। অবশেষে তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় "তুমি বেতকা নিবাসী আমার ভক্ত কালিদাস চাটাতির নিকট আমাকে রাখিয়া আইস। আমি তাহার নিত্য পূজার বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব"। এইরূপে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ঐ ব্যক্তি ৺কালিদাস চাটাতির নিকট উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন বিবরণ প্রকাশ করিলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলেন "আমি গরিব ব্রাহ্মণ, মাত্র ৩৲ টাকা বেতনে চাকুরী করি, আমি মায়ের নিত্যসেবা, কি প্রকারে চালাইব?" এই বলিয়া দেবীমূর্ত্তি গ্রহণে অস্বীকার করিলে তাঁহার প্রতিও নাকি স্বপ্নাদেশ হয়। অতঃপর কালিদাস চাটাতি মহাশয় মূর্ত্তি প্রদাতাকে ৭৲ টাকা প্রদান করিয়া অতিশয় ভক্তি ও যত্নসহকারে দেবীমূর্ত্তিসহ দেশে আগমন করেন এবং স্বপ্নাদেশ অনুসারে একটি পুষ্করিণী খনন করান কথিত আছে তিনি ঐ পুকুর গণেশ, কালভৈরব ও একটী শিবলিঙ্গ এবং কিছু ধন প্রাপ্ত হন। উল্লিখিত ধনদ্বারায় তিনি তাঁহার পিতৃ ও মাতৃ শ্মশানোপরি ২টী ক্ষুদ্র ইষ্টক মন্দির নির্ম্মাণ

করাইয়া তাহার একটীর মধ্যে শিবলিঙ্গ ও অপরটীর মধ্যে কালিকাদেবীরমূর্ত্তি ও প্রাপ্ত অপরাপর দেবমূর্ত্তি সকল স্থাপন করিয়া জীবিতকাল পর্য্যন্ত নিজে পূজা দিতে থাকেন। চাটাতি মহাশয় অতিশয় ভক্ত ও ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার সন্তান সন্ততি কেহই ছিলনা। তিনি তাঁহার ভদ্রাসন বাড়ী পর্য্যন্ত কালিকাদেবীর নামে উৎসর্গ করিয়া যান।

কালক্রমে চাটাতি মহাশয়ের প্রস্তুত মন্দির ভগ্ন হইলে ৺ মহিমচন্দ্র মুখুটী মহাশয় বিশেষ উদ্যোগ করিয়া বিজনীরাজ দুহিতা বগড়ীবাড়ীর জমিদার পত্নী ৺ ভদ্রেশ্বরী চৌধুরাণী হইতে টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে একটী ছোট দালান প্রস্তুত করান। স্থানীয় ব্যক্তিগণের অভিপ্রায়ানুসারে ঐ নব নির্ম্মিত দালানের এক প্রকোষ্ঠে শিবলিঙ্গ ও অপর প্রকোষ্ঠে অপরাপর দেবমূর্ত্তি সহ কালিকাদেবীর মূর্ত্তি উপস্থাপিত করেন। উক্ত মন্দির গাত্রে প্রস্তুত ফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিয়া ৺ ভদ্রেশ্বরী চৌধুরাণীর দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

"আসাম দেশে শিববংশজাতো।
বীজনীশ্বরোভূপ বাহাদুরোয়ঃ॥
ইন্দ্রাদি নারায়ন দেব আসীৎ।
সাক্ষাৎ দিবেন্দ্রস্য নবাবতাবঃ॥

ভদ্রেশ্বরী চৌধুরাণী শ্রীমতী-শ্রীমতিঃসদা। পর্ব্বজ্জোয়ার বাস্তব্যা তৎকন্যা-ভক্তি ভাবতঃ॥ "কাল্যাঃ কৈবল্যদায়িন্যাঃ শাকেমৈতেন্দ্র সন্নিতে। নির্ম্মায় মন্দির মিদং প্রতিষ্ঠিতমথাকারিন॥

শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার ভ্রাতাগণ বর্ত্তমান সময়ে কালিকা-দেবীর সেবাইত। তাঁহারা-পূজারিদ্বারা যথারীতি দেবার নিত্য পূজার কার্য্য করাইয়া উপস্বত্ব ভোগ করিয়া থাকেন। চাটাতি মহাশয়ের প্রস্তুত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখন ও বর্ত্তমান আছে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র মজুমদার।

ইছাপুরা স্কুলের ইতিহাস।

গত ১২৮৬ সনে পদ্মানদীর প্রবলবেগে কালীপাড়া বটেশ্বর সাহাবাজনগর প্রভৃতি স্থান ভাঙ্গিয়া নিলে তথাকার অধিকাংশ অধিবাসী ইছাপুরা আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এখানে আসিয়া স্থানীয় বালকগণের লেখাপড়ার কোনরূপ সুবিধা না থাকায় বালিয়াটী বাবুদের সরকারের স্থানীয় কর্ম্মচারী তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রামস্থ নূতন বাসিন্দা সকলের সমবেত পরামর্শে বর্ত্তমান স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত করুণাকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা ইছাপুর বাজারের পুকুরের পূর্ব্বপারে উক্ত জমীদার বাবুদের জমিদারী কাছারী ঘরে ১৮৮১ সনে মাত্র ১৩টী বালক নিয়া একটী পাঠশালা খুলিয়াছিলেন।

স্কুল স্থাপনের [illegible]

ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ত্রৈলো[illegible]নাথ সেন মহাশয় [illegible] তদন্ত করিয়া মুন্সীগঞ্জ ফিরিয়া যাইবার পথে উক্ত করুণা বাবুকে এ কাছারী ঘরে কয়েকটীমাত্র ছাত্র পড়াইতে দেখিয়া নিতান্ত উৎসুক হইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠশালাটী পরিদর্শন করেন এবং পাঠশালার ফলাফল দর্শনে বিশেষ সন্তুষ্ট হন। উক্ত ত্রৈলোক্য বাবু ভিজিট্‌বুকে যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান হাইস্কুলের ভিজিট্‌বুকের প্রথমেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উক্ত ত্রৈলোক্য বাবু করুণা বাবুর উদ্যোগ দেখিয়া তাহাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন এবং যাহাতে ঐ স্কুলের প্রতি গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ হইতে পারে এইরূপ চেষ্টা করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়া যান। ত্রৈলোক্য বাবুর উপস্থিতির সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী প্রমুখ নূতন বাসিন্দাগণ তাঁহার সহিত দেখা করিয়া স্কুলের জন্য বর্ত্তমান স্থানটীই নির্ব্বাচন করেন। ক্রমে স্কুলে ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধি হইলে উক্ত কাছারী ঘরে স্থান সঙ্কুলন না হওয়ায়, যে পর্য্যন্ত স্থায়ী স্কুল গৃহে প্রতিষ্ঠিত না হয় সে পর্য্যন্ত রাসমোহন গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে বড় একখানা আটচালা ঘরে উক্ত পাঠশালা স্থানান্তরিত হইয়া চলিতে লাগিল, ক্রমে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সহকারী শিক্ষকরূপে গ্রহণ করা হয় এবং কালীদয়াল

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত করা হয়। এইরূপে তিনজন শিক্ষক দ্বারা একবৎসরের অধিককাল উক্ত গোস্বামী বাড়ীতেই স্কুল চলিতে থাকে।

গোস্বামী বাড়ীতে ও ছেলেদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বর্ত্তমান সময়ে হাইস্কুল যেস্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে সেই স্থানে উক্ত বালিয়াটী জমিদার বাবুদের ব্যয়ে এবং নূতন বাসিন্দাগণের সাহায্যে একটী খরের আটচালা ঘর উঠান হয়। উক্ত ঘরের নির্ম্মাণ ব্যয় সাহায্যে রসিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় আর্থিক সাহায্য করেন এবং একজোড়া কাঠের কপাট দেন। এই আটচালা ঘরেই স্কুল চলিতে থাকে এবং ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়ান হয়।

ক্রমে ছাত্র সংখ্যা আরও বাড়িতে আরম্ভ করিলে তৎসঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের একটু ইংরেজী পড়ার ব্যবস্থা হয় কিনা তদ্বিষয়ে চেষ্টা আরম্ভ হয়। তদনুসারে করুণা মুখোপাধ্যায়ই ইংরেজী পড়াইতে আরম্ভ করাইলেন। এই সময়ে ঢাকার নবাবের দেওয়ান চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, জজকোর্টের উকিল হরিচরণ চক্রবর্ত্তী ও ব্রজকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় করুণা মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে করিয়া তৎকালীন স্কুল ইন্‌স্পেক্টর স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহাশয়কে ধরিয়া এই স্কুলকে মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করিয়া গভর্মেণ্ট হইতে মাসিক ২০৲ টাকা সাহায্য গ্রহণ করেন। এই সময়ে চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন এবং স্কুলের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। গভর্মেণ্টের সাহায্য পাইয়া হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় হেড্‌মাষ্টার, করুণাকান্ত মুখোপাধ্যায় সেকেণ্ডমাষ্টার, গিরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় থার্ডমাষ্টার, :রাসবিহারী মুখোটী হেড্‌পণ্ডিত এবং কালীদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় ২য় পণ্ডিত পদে নিযুক্ত হইয়া উক্ত মাইনর স্কুল পরিচালিত হইতে থাকে।

ইহার পূর্ণ উন্নতির সময়ে ইছাপুরার নূতন বাসিন্দাগণ কালীপাড়ার খ্যাতনামা জমিদারবাবু শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট মাইনর স্কুলটী এণ্ট্রেন্সস্কুলে পরিণত করার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনিও তাহাতে সম্মত হইয়া উক্ত স্কুলটী এণ্ট্রান্স পরিণত করতঃ কতকদিন বাজারের পুকুরের পার ও পরে ক্রমশঃ ছাত্রবৃদ্ধির সঙ্গে চামারদি গ্রামে দুর্গাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে একটী বৃহদাকার খরের ঘর প্রস্তুত

করতঃ তাহাতে চালাইতে থাকেন। ক্রমশঃই স্কুলের উন্নতি বিশেষত স্কুলটী সম্পূর্ণভাবে শ্যামাকান্ত বাবুর আয়ত্তাধীনে চলিতে থাকায় তদীয় সরিকবাবুগণ অন্য একটী এণ্ট্রেন্স স্কুল ইছাপুরার কতিপয় নূতন বাসেন্দার যোগে ইছাপুরা চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে স্থাপন করেন। এরূপভাবে দুইটী স্কুল কিছুদিন চলিবার পর উভয়পক্ষের সম্মিলিত উদ্যোগে চামারদি গ্রামের স্কুল গৃহেই মিলিত স্কুল চলিতে থাকাবস্থায় একটি ছাত্র এণ্ট্রেন্স পরক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তখন বাবু দিগেন্দ্রচন্দ্র হাজরা বি, এ হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। উপরোক্ত এণ্ট্রেন্স স্কুল অধিকাংশ ছাত্র ফ্রি পড়াইয়া ন্যূনাধিক ৩ বৎসর কাল চালাইতে কালীপাড়ার বাবুগণের বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহাতে বালকগণের শিক্ষার উন্নতির পরিবর্ত্তে নানাবিধ অসুবিধা অর্থক্ষয় ও গ্রাম্য দলাদলির সৃষ্টি ব্যতীত অন্য কোন লাভ নাই বিবেচনায় সর্ব্ববাদিসম্মত: একটী স্কুল করা আবশ্যক বোধে উক্ত মাইনর স্কুলেরই উন্নতির জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হয়।

এদিকে মাইনর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় পদত্যাগ করিলে ইছাপুরা গ্রামবাসী রামকুমার গাঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লৌহজঙ্গ মাইনর স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের পদ পরিত্যাগ করতঃ নিঃস্বার্থভাবে গ্রামের উন্নতি কল্পে এই মাইনর স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। তাহার কার্য্যগ্রহণের কিছুকাল পরেই কোন দুষ্ট বালক কর্ত্তৃক মাইনর স্কুল গৃহ ভস্মীভূত হয়। পরে স্কুলের স্থানের সুবিধা না হওয়ায় উক্ত রামকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাহার নিজ বাড়ীতে নিজ ব্যয়ে ঘর উঠাইয়া তন্মধ্যে স্কুল চালাইতে থাকেন।

এই সময়ে মাইনর ক্লাসের উপরে কয়েকটী অতিরিক্ত ক্লাসে ইংরেজী পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ছেলেদের পড়ার সুবিধা করিয়া দেন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা ঐসব অতিরিক্ত ইংরেজী ক্লাস পড়ান হয়। এই বিষয় গভর্মেণ্টের গোচর হইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়। তখন এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় ও রামকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, করুণা মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত অক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণের অদম্য চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে স্কুলটী স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল। তৎপর দিন দিনই স্কুলের অবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইতঃপূর্ব্বে স্কুলের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় রামকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অবৈতনিকভাবে এবং অন্যান্য শিক্ষক ও

পণ্ডিতগণ নামমাত্র স্কুলের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইছাপুরের নূতন বাসিন্দাগণ পুনরায় স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ জন্য ৮০০৲ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিলে পর আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ইছাপুরার পুরাতন বাসিন্দা) মহাশয় হাইস্কুলের বর্ত্তমান উত্তরের ভিটার টিনের আটচালা ঘরখানা নির্ম্মাণ করার সমস্ত ব্যয় নিজে সম্পূর্ণ বহন করিবেন প্রস্তাব করিয়া নূতন বাসিন্দাগণের সহিত যোগদান করার মত প্রকাশ করেন। এবং ১২০০৲ শত টাকা দিতে তিনি প্রস্তুত হন। নূতন বাসিন্দাগণ উক্ত টাকা গ্রহণ করতঃ স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ এবং কতক টাকায় স্কুলের আসবাব খরিদ করেন। নূতন বাসিন্দাগণ হইতে গৃহীত ৭০০৲ শত টাকা তৎসময়ের জন্য সকলকে ফেরত দেওয়া হয়। বর্ত্তমান হাইস্কুল self supporting না হওয়া পর্য্যন্ত মাইনর স্কুল স্থাপন হইতে নূতন বাসিন্দাগণ সময় সময় এককালীন যথেষ্ট সাহায্য এবং মাসিক চাঁদা দিয়া ও স্কুলের বিদেশীয় ছাত্র ও মাষ্টারগণকে অনেক স্বীয় স্বীয় পরিবারের মধ্যে আহার ও বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান হাইস্কুলের সেক্রেটারী পদে উপরোক্ত ঢাকার নবাবের দেওয়ান চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এবং জজকোর্টের উকিল হরিচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিযুক্ত থাকা সময়ে তাহাদের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় এবং হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু রায় মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সুচারুশিক্ষা প্রণালীতে স্কুল ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া শীর্ষস্থানীয় হইয়া প্রায় ৮৫০০৲ টাকা স্কুলফণ্ডে জমিয়াছিল যাহা দ্বারা বর্ত্তমান স্কুলের জন্য মাঠে জমি acquire এবং পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্য সচ্ছলরূপে হইতেছে। এককালীন দান ও মাসিক চাঁদা নূতন বাসিন্দাগণ মধ্যে প্রায় সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে ঢাকার নবাবের দেওয়ান চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, উকিল হরিচরণ চক্রবর্ত্তী, ব্রজকান্ত ও ব্রজবাসী গঙ্গোপাধ্যায়, নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত গোবিন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৬।৭ বৎসর বিশেষ যোগ্যতার সহিত চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় স্কুলের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত থাকিয়া স্কুলের কার্য্য পরিচালনা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ; বি, এল মহাশয় সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। তিনি ও যোগ্যতার সহিত স্কুলের

কার্য্য পরিচালনা করেন। তৎপর অস্থায়ীরূপে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার গুপ্ত মহাশয় প্রায় দুই বৎসর কাল স্কুলের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে বিগত ১৯১১ সনে কালীপাড়ার খ্যাতনামা জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী মহাশয় সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়া সুচারুরূপে স্কুলের কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন।*

শ্রীনলিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাটেশ্বরের 'দেউল।'

বিক্রমপুরে যে যে গ্রামে ভদ্র পরিবারের বসতি আছে 'নাটেশ্বর' তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই গ্রাম বিক্রমপুরের উত্তর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহার পশ্চিমদিকে সুপ্রসিদ্ধ মিরকাদিমের খাল ইহাকে খিলপাড়া গ্রাম হইতে বিভক্ত করিয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়া বরাবর পদ্মার দিকে ছুটিয়াছে। ইহার দক্ষিণে সোণারঙ্গ, পূর্ব্বে বজ্রযোগিনী ও রামপাল এবং উত্তরে পাইকপাড়া গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একটি অত্যুচ্চ ও সুবিস্তৃত 'দেউল' অর্থাৎ দেবনিবাস আছে। কথিত আছে বল্লালসেনের রাজত্ব কালেই এই দেউল নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সেই প্রাচীন দেব মন্দিরাদি ভগ্ন হইয়াই এই উচ্চ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। অদ্যাপিও কোন কোন স্থান খনন করিলে প্রচুর ইষ্টক ও নাটমন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি এই স্থানে নাকি বল্লালসেনেরই প্রতিষ্ঠিত নটরাজদেবের মন্দির ছিল, তদ্ধেতুই এই গ্রামখানির নাম 'নাটেশ্বর' হইয়াছে।

উক্ত উচ্চ ভূভাগের বিস্তার প্রায় ৮।১০ কানি হইবে; উচ্চতাও সমতল ভূমি হইতে প্রায় ১০।১২ হাত। এই দেউলের পশ্চিম ধারে ও স্থানীয়

---

* এইরূপ ভাবে বিক্রমপুরের অন্যান্য স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিজ নিজ বিদ্যালয়ের ইতিহাস লিখিয়া পাঠাইলে আনন্দের সহিত প্রকাশ করিব। বিঃ সঃ।

* মূর্ত্তিটি প্রকৃতই বুদ্ধ মূর্ত্তি কি না না দেখিলে তাহা স্থির করা যাইতেছে না। বিঃ সঃ

সরকারদের বাড়ীর লাগ উত্তরে একটি ছোট পুকুর ছিল। উহা 'কুণ্ডের পুকুর' বলিয়া পরিচিত। ইহাদ্বারা এই অনুমান হয় যে উপরোক্ত বল্লালসেনের এই দেউলেরই পূজার কিম্বা যজ্ঞের ফুল, বিল্বপত্র, হবি ইত্যাদি উহাতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। অন্যুন ত্রিশ বৎসর হইল ইহার বিস্তার বৃদ্ধি করিয়া ইহাকে একটি বড় পুকুরে পরিণত করা হইয়াছে। শুনিয়াছি, উহা খনন করিবার সময় নাকি কয়েকখানা প্রস্তর মূর্ত্তি, পিত্তল নির্ম্মিত একটি ঝালিকা, তাম্রকুণ্ড ও ঘট ইত্যাদি আরও নানাপ্রকার পুজোপকরণ পাওয়া গিয়াছিল। বিল্বপত্র ও ধান্য দূর্ব্বাসহ বদ্ধাবস্থায় ছিল। যে কয়খানা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে একখানা উক্ত সরকারদের বাড়ী, একখানা আটপাড়া ৺ কালীবাড়ী ও আর একখানা সোণারঙ্গ বৈকুণ্ঠ সেনের বাড়ী নিয়া গিয়াছিল। উহাদের প্রত্যেকখানিই নাককাটা বাসুদেব মূর্ত্তি।

বৎসর দুই, তিন অতীত হইল এই গ্রামের দক্ষিণ পাশে একটি ক্ষেত্রের ভূমি কর্ষণ করিবার কালে দুইটি প্রস্তর মূর্ত্তি পাওয়া যায়। একটি নানা কারু কার্য্যে সুশোভিত দশ অবতার প্রস্তর অপরটি নর্ত্তনশীল দুরোখা মূর্ত্তি, বোধ হয় কোন দেবালয়ের প্রস্তর বেষ্টনীর অংশ। মূর্ত্তি দুটি স্থানীয় 'মিত্র' বাড়ী আনিয়া রাখা হইয়াছিল। ঢাকা মিউজিয়মের কিউরেটার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ মহাশয় আসিয়া দশ অবতার প্রস্তরখানা চাহিয়া নিয়া গিয়াছেন। উহা এখন ঢাকা মিউজিয়মে আছে। অপরখানা বহুদিন যাবৎ উক্ত মিত্র বাড়ীই ছিল, সম্প্রতি অন্যত্র আছে।

উক্ত দেউলের লাগ দক্ষিণ পশ্চিম কোনে নূতন পুষ্করিণী নামে একটি পুকুর আছে। বিগত ১৩২৩ সনের ৬ই বৈশাখ উহার উত্তর পাড়ে প্রায় তিন ইঞ্চি পরিমাণ একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় পুর্ব্বে এই মূর্ত্তিটী অনেক মাটীর নীচে ছিল; বৃষ্টিতে উপরের মাটি একদিকে কাটিয়া নেওয়ায় মূর্ত্তিটী দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে।

নাটেশ্বরের দেউল দেখিবার জন্য নানাদিক হইতে কত শিক্ষিত ভদ্রলোক আসিয়াছেন ও আসিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ কেহ বা ইহার কতকাংশের ফটো তুলিয়া নিয়াছেন। বিক্রমপুরে আরও কয়েকটি দেউল আছে

বটে, কিন্তু ইহার উচ্চতায় এবং বিস্তারে অন্য দেউলগুলির চেয়ে ন্যূন হইবেনা বলিয়া আমাদের ধারণা বাস্তবিকই ইহা একটি দেখিবার স্থান।

শ্রীকুমুদিনীকান্ত মিত্র।

বাঙ্গলার "অনন্য সাধারণ" চিত্রকর।

শ্রাবণের "প্রবাসী পত্রিকায় বাংলার নূতন শিল্পীর" পরিচয়ে স্যর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরমহাশয়ের অর্দ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাতা নবভাস্কর রবীন্দ্র-শিষ্য শান্তি নিকেতনের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণ কাশীনাথ দেবলের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে "গগনেন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন নিজস্ব চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে বাংলার চিত্রশিল্পকে সমৃদ্ধও অনন্য সাধারণ করিয়া তুলিয়াছেন।" তাঁহার চিত্রের অনন্যসাধারণতা যাহা বুঝিয়াছি তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরমহাশয় স্যর রবীন্দ্রনাথের জ্ঞাতি, কাজেও দেখিতেছি তিনি সর্ব্ববিষয়ে ছায়ার ন্যায় স্যর রবীন্দ্রের অনুগামী।

গগনেন্দ্রনাথের চিত্রগুলি সমস্তই বিদ্রুপাত্মক এবং প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ ব্যক্তিগত দ্বিতীয়তঃ সমাজবিষয়ক তৃতীয়তঃ সাহিত্যের সমালোচক বিষয়ক।

ব্যক্তিগত চিত্রের মধ্যে দুইখানি আষাঢ় ও শ্রাবণের ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। একখানির নাম "ব্যঙ্গোক্তি" অপর খানির নাম "ব্যঙ্গ"। এই দুই খানি চিত্রে একই ব্যক্তি চিত্রিত হইয়াছেন। প্রথম খানিতে একজন ভুঁড়িওয়ালা কোটপ্যাণ্টধারী ব্যক্তি বিলাতি চুরুট হাতে লইয়া হুকায় ধূমপানে রত ও উপবিষ্ট বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন "আমার বাংলাকে আমি আশৈশব প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি।" দ্বিতীয় চিত্রখানিতে এক ব্যক্তির অর্দ্ধাঙ্গে কোটপ্যাণ্ট বিলাতি জুতা ও অপরার্দ্ধে ধুতি জামা নাগরা জুতা পার্শ্বে বিলাতী গাছের নোটিশবোর্ডে লিখিত আছে "Hybrid Bengalsis"। এই উভয় চিত্রেই বাঙ্গলা প্রাদেশিক সভার সভাপতি ও দশমবঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ কবি ও "নারায়ণ" সম্পাদক

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে আক্রমণ করা হইয়াছে। দাশ মহাশয় "বাঙ্গলার গীতি কবিতা"য় স্যর রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ না করিয়া এবং "বাঙ্গলার কথা"য় তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার ভক্তগণের মনঃ ক্ষোভ হওয়ায় তাঁহার প্রিয়শিষ্য শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীমান্ অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী 'ভারতী পত্রিকায়' মাসকাবারিতে অশান্তির নিশান উড়াইয়া বসিয়া আছেন। প্রবাসী পত্রিকাতেও দাশ মহাশয়ের সাহিত্যিক চুরি ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু এরূপ চুরি ধরিয়া সনাক্ত করা বড় কঠিন তাই বঙ্গের অবুঝ সাহিত্যিকগণের বোধোদয়ের নিমিত্ত এই ব্যঙ্গ চিত্রের অবতারণা। এইবার সাহিত্যিক দলের মুখবন্ধ হইলে আমরা বাঁচি।

ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ চিত্রের ৩য় খানির বিষয় বহুপুরাতন এবং চিত্রখানিও বহুপূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চিত্রের বিষয় স্যর রবীন্দ্রনাথও তদ্ভ্রাতৃগণের গৃহশিক্ষক। কোন কোন বড় লোকের বাল্যের গৃহশিক্ষক ম্যানেজার হইয়া থাকেন কিন্তু এই গৃহশিক্ষক বেচারা কোন্ অশুভক্ষণে গৃহশিক্ষকতা হস্তার্পণ কার্য্যে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মরিয়াও নিস্তার নাই। তাঁহার অপরাধ তিনি ঝড়বৃষ্টিতেও ছাতা মাথায় দিয়া গৃহশিক্ষকতা করিতে আসিতেন। তাই তিনি শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথের তুলিকার গুণে "পুরাতন ছাতা" নামক ব্যঙ্গচিত্রের বিষয় হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপরায়ণতার ফল ভোগ করিতেছেন। ইহারই নাম অদৃষ্টের পরিহাস!

এতদিন ব্রাহ্মের দল বিলাতী মিশনারী দলের পন্থা অনুসরণ করিয়া ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের সংস্কার করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু স্যর রবীন্দ্রনাথ কয়েকখানি উপন্যাসে নূতন আদর্শ চিত্রিত করিয়া হিন্দুসমাজের সংস্কারে উদ্যত হইলেন। প্রবীণব্রাহ্ম সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী কিংবা শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়কে কেহ এরূপ অপরাধে অপরাধী করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের পুস্তকগুলি আজিও স্ত্রীলোক বালক সকলেরই হাতে দেওয়া যায়। যাহা হউক এসম্বন্ধে মত-দ্বৈধ থাকিতে পারে। স্যর রবীন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া (শ্রী) চারুচন্দ্র বন্দ্যোমহাশয় স্রোতের ফুল উপন্যাস ও জাতিরক্ষা নামক গল্পে হিন্দুসমাজ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রভৃতিকে বেশ এক চোটে আক্রমণ করিলেন। ইহাদের দেখাদেখি শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথও দুইখানি চিত্রে হিন্দুসমাজকে টিটকারী

দিয়াছিলেন। ১ম চিত্রখানির নাম "নির্জ্জলা একাদশী"। ইহা আষাঢ়ের প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদকপ্রবর চিত্রপরিচয়ে স্বীয় সহৃদয়তার পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন "এই ছবিতে চিত্রকর (আমাদের (?) হিন্দুদের হৃদয়হীনতার ছবি আশ্চর্য্য রকম জোরালো ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাড়ীর কর্ত্তা গুরু ভোজনে ভুঁড়ি ফুলিয়ে কাছা সামলাতে সামলাতে আর দাঁত খুঁটতে খুঁটতে আচাতে চলেছেন, বাড়ীর সধবাগিন্নীটি কর্ত্তার প্রসাদ দুগ্ধের বাটিটিতে দিব্যি চুমুক মারছেন; বিড়াল কাক পিঁপড়ে মাছি—পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সবাই আহারে লেগে গেছে; কেবল বাড়ীর বিধবাটি জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের দীর্ঘ দিবসের প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপে ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হয়ে পাষাণ দেবতার দ্বারে ধন্না দিয়ে পড়ে ধুঁকছে। সকল বিধবার অশ্রুজল নির্জ্জলা একাদশীর দিনে পাষাণের উপর ঝরে পড়্ছে। আর বিশ্বের বিস্মিত চক্ষু বিস্তারিত হয়ে বাড়ীর অপর লোকদের ব্যবহার দেখ্ছে। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও হৃদয় বঙ্গ বিধবার দুঃখে দ্রবীভূত হইয়াছিল কিন্তু তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তিতেই জয়লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত হিন্দুকে এজন্য হৃদয়হীন বলিয়া গালি পাড়েন নাই। আর ঠিক কথা বলিতে গেলে বাঙ্গলার উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর বিধবার মধ্যেই নির্জ্জলা একাদশী প্রচলিত। ব্রাহ্মের মুখে হিন্দুর এইরূপ গ্লানি বড়ই বেদনা দায়ক। সম্পাদকপ্রবর কি বলিতে চাহেন—পতির মৃত্যুর পরে হিন্দুবিধবা দুবেলা চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় রূপে ভোজন করিয়া চিরবিচ্ছেদের উচ্ছাসরূপ কবিতা লিখিয়া দ্বিতীয় বিবাহ করিবে?

সমাজসংস্কারের ২য় ব্যঙ্গ চিত্রখানি শ্রাবণের প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত নাম "পতিদেবতা", টেরিকাটা কিম্ভূতকিমাকার মাতাল পতি জুতার আঘাতে পত্নীর রক্তপাত করিয়াছেন, পত্নী নতমস্তকে বোধ হয় ভাবিতেছেন "এরূপ স্বামীও আমার দেবতা স্থানীয়।" চিত্রখানির পরিচয়ে কোথাও লেখা নাই যে স্বামীটি হিন্দু; তথাপি যখন ব্রাহ্ম কিম্বা মুসলমান রমণী স্বামীকে দেবতা বলেন না তখন স্বামীটী নিশ্চয়ই হিন্দু। ব্রাহ্মদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে মাতাল না থাকিবারই কথা। এই চিত্রে যেন স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে "হে হিন্দুরমণী এরূপ স্বামী যদি তোমার অদৃষ্টে জুটে, তবে ঠিক জানিয়ো শাস্ত্রে তোমার 'পতিরন্যো বিধীয়তে।'" বলা বাহুল্য ব্রাহ্মচিত্রকর

নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, "ব্রাহ্মরমণীর" এরূপ স্বামী জুটিলে তিনি পত্যন্তর গ্রহণ করিতেন। নতুবা চিত্রের উদ্দেশ্য কি ?

৩য় শ্রেণীর চিত্রের বিষয় "বস্তুতন্ত্রহীন কাব্য রসিকদের দল। অর্থাৎ যাহারা স্যর রবীন্দ্রনাথের নব নব কবিতা অস্পষ্টতার জন্য বুঝিতে পারেন না, কিম্বা অশ্লীল উপন্যসে আপত্তি করেন তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া এই চিত্রগুলি আঁকা হইয়াছে। প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথমখানির নাম "বস্তুতবস্ত্রহীন কাব্য রসিক।" চিত্র-পরিচয়ে আছে "আমাদের দেশের সাহিত্য কুঞ্জবনে জনকতক এই রকমের সাহিত্য রসিক সমালোচকের ভীষণ উপদ্রব হইতেছে।" অবশ্য বলা বাহুল্য এই সমালোচকদল স্যর রবীন্দ্রনাথ ও তৎশিষ্যদলের উপরে উল্টাচাপ দিয়া বলেন "তোমরা আমাদের সাহিত্য কুঞ্জেও বেজায় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছ।" ২য় চিত্রখানি শ্রাবণের ভারতী পত্রিকায় বাহির হইয়াছে, নাম "বস্তুহীন কবিতায় ভরেনাক ভুঁড়ি, ঝুরিতে আসল কাব্য দু'জন ছ'বুড়ি।" স্যর রবীন্দ্রের ভক্তবৃন্দ কতদিন ধরিয়া শত শত প্রবন্ধ লিখিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, আজ শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তুলির দুইটা আঁচড়ে তাহা সারিলেন কারণ এই শেষের চিত্রখানিতে 'মিল' আছে। এখন আর বাঙ্গলার অবুঝ অরসিক সাহিত্যিকদলের বলিবার মুখ আছে কি ?

বলা বাহুল্য যে "প্রবাসী" বাঙ্গলায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র। স্যর রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে যে কোন তর্ক উঠে, তাহাতেই সবুজ পত্র, প্রবাসী ও ভারতী স্যর রবীন্দ্রনাথের পক্ষাবলম্বন করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রবাসী পত্রিকা শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্রকার্য্যে অনন্য সাধারণ প্রতিভার জন্য সার্টিফিকেট দিলেই আমরা নত মস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া লইব না। এখন দেখা যাউক শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ কিরূপ অনন্যসাধারণ চিত্রকর।

আধুনিক ব্যঙ্গচিত্র বিলাতের আমদানী এ কথা না বলিলেও চলে। এই ব্যঙ্গ চিত্র ও ভাঁড়ামিতে সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্য আছে। ভাঁড়ামিতে অনেক বিষয়ে লোকের মনঃকষ্ট উৎপাদন না করিয়া হাসান চলে, আর যদিই বা তজ্জন্য কেহ দুঃখিত হয় তাহা হইলে তাহা এত সামান্য যে হাসির তরঙ্গে সে দুঃখ দুঃখ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু ব্যঙ্গ চিত্রে ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করিলে, তিনি যেন জগতের সম্মুখে উপহাসাস্পদ হইয়া উঠেন। ইহাতে দুঃখের

পরিবর্ত্তে ক্রোধের উদয় হয়। সমালোচনায় যুক্তি থাকে, ব্যঙ্গচিত্রে কেবলই যেন অরুন্তুদ শব্দভেদী বাণ। সমালোচনা কঠোর হইলেও কিঞ্চিৎ ফলপ্রদ হইতে পারে, ইচ্ছা করিলে সমালোচিত ব্যক্তি উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু ব্যঙ্গ চিত্ররূপ সমালোচনার উত্তর নাই, কারণ ব্যঙ্গচিত্রকর যেন কাপুরুষের ন্যায় গুপ্তভাবে আক্রমণ করেন। সমালোচনায় সহৃদয়তা থাকিতে পারে কিন্তু ব্যঙ্গচিত্রে নীচতা হৃদয়হীনতা, কাপুরুষতা যেন মূর্ত্তিমান্।

সমাজ ও সম্প্রদায় বিশেষে ব্যঙ্গচিত্রের একরূপ বিষয় হইলেও পার্থক্য সুস্পষ্ট। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত ফেরতার দলকে ব্যঙ্গ করিয়া গান বাঁধিয়া ছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাদিগকে সংশোধিত করা। বিলাতফেরতার দল ক্ষুব্ধ হইলেও অসঙ্গত ব্যবহারগুলি পরিত্যাগ করিতে পারিতেন।

রবীন্দ্রনাথের অস্পষ্ট কবিতা ও অশ্লীল চরিত্রপূর্ণ গল্পের সমালোচকদিগকে অন্য দুইখানি ব্যঙ্গচিত্রে যেরূপভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় শ্রীমান্ অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীকে বলি "মহাশয় সাহিত্যে ভদ্রতার আদর্শ অপরকে শিখাইবার পূর্ব্বে আপনার সবুজের দলকে শিখাইয়া তালিম করুন।" হায়রে অনন্যসাধারণ প্রতিভা! এ অপেক্ষা আমাদের কবির দল ছিল ভাল। তাহাতে গালাগালি থাকিলেও উত্তর প্রত্যুত্তরে বুদ্ধির খেলা দেখা যাইত।

যাহারা সাধারণ কথাবার্ত্তায় লোককে আনন্দ দিতে পারেনা, তাহারাই ব্যঙ্গ করে। যাহারা ব্যঙ্গ করে তাহারা কখনও সরলচিত্ত হয় না, লোকে তাহাদের ভয়ে তটস্থ হয়—কখন কাহাকে সে আক্রমণ করিবে তাহার ঠিক নাই। এইজন্য লোকে ব্যঙ্গকারীকে দুর্জ্জনের ন্যায় পরিহার করে, অনেকে সম্ভ্রম বা ভক্তি করিয়া ব্যক্তি বিশেষকে দূরে রাখে, ব্যঙ্গকারীর প্রতি ব্যবহার ঠিক তাহার বিপরীত। তাই বলিতেছিলাম এই অনন্যসাধারণ চিত্রকরকে বঙ্গ সাহিত্য ধূমকেতুর ন্যায় মনে করে। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ এতদিন যে গগনে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই গগনেই প্রস্থান করুন বঙ্গসাহিত্য-গগন হইতে এই ধূমকেতুর বিদায় গ্রহণ করিলেই মঙ্গল হয়।

শ্রীবেচারাম বিদ্যাবাগীশ।

দেশের সংবাদ।

উত্তর বিক্রমপুর।

শোকসংবাদ—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত মালখাঁনগর নিবাসী স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র বসু মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করিতেছি। মহিমবাবু প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিলেন। ইনি বহুদিন সরকারী কার্য্য করিয়া জীবনের অপরাহ্নে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন। এই মহাত্মার ন্যায় স্বদেশপ্রাণব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দেশকে ইনি বস্তুতঃই প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। এইরূপ তেজস্বী নির্ভীক এবং কর্ম্মিষ্ঠ লোকের আমাদের দেশে বিশেষ অভাব আছে। বহুকাল গ্রাম্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীরূপে কার্য্য করিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতি-কল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইনি বৃদ্ধ হইয়াও যুবকের ন্যায় পরিশ্রমী, এবং কর্ম্মঠ ছিলেন। বিগত শারদীয় অবকাশোপলক্ষে আমাদের সহিত তিনি যুবকের ন্যায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছেন, কিসে "বিক্রমপুরের" উন্নতি হয়, বিক্রমপুরসম্মিলনীসভার উদ্দেশ্য লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং দেশের লোকের স্বাস্থ্য সুখ অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকে সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিতেন। মহিমবাবু স্পষ্টভাষী ও সাহসী ছিলেন, কাহাকেও ন্যায়সঙ্গত বাক্য শুনাইতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিতেন না। পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক প্রৌঢ় পুত্রের কোনও কার্য্যেরত্রুটি দেখিলেও তিনি যেরূপ ভাবে শাসন করিতেন, আমরা তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। বিক্রমপুরের বহু প্রাচীনতত্ত্ব তাঁহার জানা ছিল,—তাঁহার নিজ জীবনের ইতিহাসও উপন্যাস হইতে কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। ঈদৃশ মহাত্মার মৃত্যুতে বাস্তবিকই দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

জল—এবার দেশে বিগত দুই বৎসরের ন্যায় জলবৃদ্ধি হয় নাই। জল বৃদ্ধি না হইলেই বিবিধ পীড়ার আশঙ্কা।

বাজারদর—বিশেষ চাউলের দর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা সুলভ।

শস্যের অবস্থা উত্তম। নানা গ্রামেই ইউনিয়ান কমিটি হইয়াছে, শীঘ্রই ইউনিয়ান কমিটির ফলাফল বুঝা যাইবে।

দক্ষিণ বিক্রমপুর।

বিক্রমপুর সম্মিলনী—কয়েক দিন হইল পালং গ্রামে বিক্রমপুর সম্মিলনীর চিকন্দি শাখার এক অধিবেশন হয়। সেই সভায় ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে সমগ্র দক্ষিণ বিক্রমপুর চিকন্দী শাখা সমিতির অধীনে না থাকিয়া দক্ষিণ বিক্রমপুরের প্রধান প্রধান গ্রামগুলিকে এক একটী কেন্দ্রস্বরূপ রাখিয়া অনেকগুলি শাখা সমিতি গঠিত হইবে এবং এই শাখা সমিতিগুলি চিকন্দির অধীনে না থাকিয়া মূল সম্মিলনীর অধীন থাকিবে। পালং গ্রামে একটী শাখা স্থাপিত হইয়াছে,—পালং এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ এই শাখার অন্তর্গত।

বাঘিয়ারখাল--পালং, বালুচাড়া, বিলাসখাঁ, দাসর্ত্তা, বাঘিয়া, প্রভৃতি গ্রাম সমূহের মধ্য দিয়া বহু বৎসর যাবৎ বাঘিয়াখাল নামে একটী খাল বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে প্রায় সম্বৎসর ব্যপিয়া এতদঞ্চলের অধিবাসিগণের উক্ত জল পথ দ্বারা নৌকাযোগে গমনাগমনাদি চলিতে পারিত। কয়েক বৎসর যাবৎ উহা বালুকারাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া আসিতেছে। তদুপরি নদীর সহিত খালের সংযোগমুখ চর পড়িয়া রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নদী খাল বহুল বিক্রমপুরে জলপথই যাতায়াতের প্রধান উপায়। বাঘিয়াখালের মুখ রুদ্ধ হওয়ায় কেবল যে যাতায়াতেরই অসুবিধা ঘটিতেছে তাহা নহে। বর্ষাকালে নদীর জল ঐ খাল পথে গ্রাম সমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া তত্রত্য আবর্জ্জনা রাশি বিধৌত করতঃ নদীগর্ভে লইয়া যাইত এবং জলাশয় সমূহেও নূতন জল প্রবিষ্ট হইবার সুবিধা ঘটিত। সম্প্রতি উক্ত খাল রুদ্ধ থাকায় পালং প্রভৃতি গ্রামগুলির আবদ্ধজল নিকাশের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। খাল বিল নালা ডোবা প্রভৃতিতে বৎসর পর বৎসর জল আবদ্ধ থাকিয়া উহারা নানা প্রকার রোগ বীজাণুর উৎপত্তি স্থল এবং মশকাদির আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে এবং কৃষিক্ষেত্রে জল আবদ্ধ থাকিয়া কৃষিকার্য্যের অত্যন্ত বিঘ্ন সম্পাদন করাইয়াছে। এইখাল সংস্কারের উপর প্রায় ৩০টী গ্রামের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। কিন্তু ইহার সংস্কার বহুব্যয় সাধ্য—খালের মুখে যে চড় পড়িয়াছে তাহা খনন করা

আবশ্যক। চড়ের মধ্য দিয়া খাল কাটিয়া দিলেও তাহা পুনরায় বালুকা দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইবে কিনা ইহাই প্রশ্ন। কেবল যে বাড়িয়াখালের মুখ বন্ধ হইয়াছে এমন নয়, গত বৎসর ভোজেশ্বরের খালের মুখও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে দক্ষিণ বিক্রমপুরের স্বাস্থ্য আর বেশী দিন ভাল থাকিবে না। প্রতি বৎসরের জলপ্লাবন দ্বারাই বিক্রমপুরের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হইতেছিল আর এই খালগুলি ছিল বর্ষার শেষভাগে গ্রামগুলির আবর্জ্জনা রাশি নদীতে লইয়া যাইবার ড্রেণ। এইরূপ সুন্দর ড্রেণেজের বন্দোবস্ত আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ আমাদের জন্য করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন অশিক্ষিত! আমরা তাঁহাদের শিক্ষিত বংশধরগণ কি খালগুলি সংস্কারও করিতে পারিব না। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে বিক্রমপুরে রাস্তা অপেক্ষা খালের প্রয়োজন অধিক। গ্রামবাসিগণ রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যবান হইলেত রাস্তা দিয়া হাঁটিবে। বিক্রমপুরের স্বাস্থ্যও যদি নষ্ট হইয়া যায় তবে উকিল, ব্যারিষ্টার, জমিদারগণ দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইবে। আমরা গ্রামবাসিগণ মাঝে মাঝে আমাদের এই সকল শিক্ষিত ভ্রাতাদের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন আশা নূতন উৎসাহ পাইয়া থাকি। গ্রামগুলি যদি একেবারে বাসের অযোগ্য হইয়া যায় তবে কি আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতাগণ সভাসমিতি করিতেও গ্রামে পদার্পণ করিবেন?

চিকন্দি মহকুমা—শুনিতে পাই যে মাদারিপুর মহকুমার অন্তর্গত পালং, গোঁসাইরহাট, ভেদেরগঞ্জ এবং জাজিঁরা থানা লইয়া চিকন্দিতে একটী নূতন মহকুমা স্থাপিত হইবে। District Administration Reportএ কিন্তু ভোজেশ্বর এবং ডোমসার ষ্টীমার ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থান এই নূতন মহকুমার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এখন আবার চিকন্দিতে মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব ওঠে কেন? দুষ্ট লোকে বলে যে চিকন্দিতে যে সকল উকিল স্থায়ী বাসা করিয়াছেন তাহাদের উদ্যোগের ফলেই চিকন্দিতে মহকুমা স্থাপিত হইতেছে। চিকন্দি নিতান্ত অগম্য স্থান, বর্ষার দুই মাস ব্যতীত সেখানে যাতায়াতের কোনও প্রকার সুবিধা নাই। এই অঞ্চলে এমন একটী লোকও পাওয়া যাইবে না যে চিকন্দিতে মহকুমা স্থাপনে দুঃখিত নয়। নদীর তীরস্থ কোনও স্থানে মহকুমা স্থাপিত হওয়া উচিত। District Administration Reportএ এই সম্বন্ধে যাহা লিখা হইয়াছে তাহা এই :—

"Mr Woodhead, the collector of Faridpur, proposed that the headquarters of the new subdivision sholud be at Burirhat, in the centre of the Palang Thana—we are not inclined to support this, as Burirhat cannot be approached by boat except during the floods and its only connection with a steamer station is by a footpath, 5 miles long. We think that the head quarters should on the Kirtinasha river at a suitable place between Domesha and Bhojeswor steamer stations."

বুড়ীরহাটের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি চিকন্দির বিরুদ্ধেও সেই সব যুক্তি বিদ্যমান—অধিকন্তু বুড়ীরহাট মহকুমার কেন্দ্রে অবস্থিত। পালং ষ্টীমার ষ্টেসন হইতে বুড়ীরহাট পর্য্যন্ত ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের খুব ভাল রাস্তা আছে। আমরা কিন্তু ভোজেশ্বর এবং ডোমসারের মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থানের পক্ষপাতী।

কচুরী—দক্ষিণপারেও কচুরী প্রবেশলাভ করিয়াছে। এখনও দেশের এই শত্রুকে সামান্য চেষ্টাতেই দূরীভূত করা যায়। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই বিষয়ে লিখা হইয়াছিল। তিনি উত্তরে লিখিয়াছেন ইহা জনসাধারণের কাজ।

স্বাস্থ্য—গত বৎসর অতিরিক্ত জলপ্লাবনদরুণ দেশের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, এই বৎসর জলবৃদ্ধি হইতেছে না, কাজেই আশঙ্কা এই যে বর্ষান্তে দেশে ব্যারাম পীড়া দেখা দিবে।

ফসল—পাটের মূল্য যুদ্ধের দরুণ কমিয়া যাওয়ায় এই বৎসর পাটের চাষ খুবই কমিয়া গিয়া ধান্যের চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহুবৎসর যাবৎ এই বৎসরের ন্যায় বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র এঅঞ্চলে দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আশানুরূপ জলপ্লাবন না হওয়ায় ধানগাছগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

স্মরণে।

ছ'বৎসরের পরিচয় শুধু
তবু মোরে বেসেছিলে ভালো।
সংশয়-বাত্যা সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে
জ্বেলেছিলে বিশ্বাসের আলো।
কোথা গেছ তুমি কোথায় আলোক!
তমসা আবৃত হৃদি,
দুর্ব্বল চিত্তের শতেক দুঃখ
দহে মোরে নিরবধি॥

শ্রীভুপেন্দ্রমোহন সেন।

আইভান্ হো।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই দুইটি মানুষের বেশভূষায় যেমন, হাবভাব মেজাজেও তেমনিই পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। দাস বা জন্ম-নফরটির মুখের উপর একটা ক্রুদ্ধ বিষাদের ছায়া—সে অবনত মুখে বসিয়া রহিয়াছে, তাহার দৃষ্টি ভূতলে নিবদ্ধ। সে দৃষ্টিতে যেন আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক স্পন্দন ও নাই, আছে শুধুই একটা অসার নির্জ্জীবতা! কিন্তু সময়ে সময়ে এই রক্তিমাভ চক্ষুর্দ্বয়ে ও একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ঝলক দিয়া উঠিয়া যেন বলিতে চায়—তাহারও হৃদয় আছে; এবং সে হৃদয়েরও বেদনা অনুভব করিবার শক্তি আছে। মেঘাচ্ছন্ন দিবসের মত একটা গভীর নৈরাশ্যে তাহার মুখখানা সাধারণতঃ ভার-ভার থাকিলেও, তাহার অন্তরালে একটা প্রচ্ছন্ন বহ্নি-শিখা—সে যে উৎপীড়িত ও নির্য্যাতিত এই বোধ এবং সেই উৎপীড়ন ও নির্য্যাতনে বাধা দেওয়াতে তাহার

কর্ত্তব্য এইরূপ অভিলাষ—জাগ্রত রহিয়াছে। ওয়াম্বার হাবভাব কিন্তু অন্য ধরণের। সাধারণ ভাঁড়ের মত তাহার দৃষ্টিতেও একটা অর্থহীন ঔৎসুক্য প্রকটিত। ওয়াম্বা সতত-চঞ্চল কোন অবস্থাতেই যেন তাহার দৈহিক আরাম বা মানসিক তৃপ্তি হইতেছে না; অথচ তাহার চক্ষুতে বেশ একটা আত্মতৃপ্ত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে যেন জীবনে বড়ই সুখী এবং তাহার বেশভূষা ও অঙ্গভঙ্গিমা যেন বড়ই চমৎকার। শূকরগুলি মহাআনন্দে কচুবনে বিচরণ করিতেছে—অপর্য্যাপ্ত আহার পাইয়া তাহাদের দেহ হইতে যেন তৈল চুঁয়াইয়া পড়িতেছে। কতকগুলি আবার খালের ধারে পঙ্কে অর্দ্ধনিমজ্জিত হইয়া মনের সুখে গড়াগড়ি যাইতেছে। তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিবার জন্য রক্ষক সজোরে সিঙ্গাধ্বনি করিল—তাহারাও তেমনই মধুর স্বরে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, কিন্তু আপনাদের রাজভোগ কিম্বা মহা আরামের পঙ্কশয্যা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার মত কোন ইচ্ছাই তাহাদিগের দেখা গেল না। তখন গার্থ আপনার স্বদেশী বুলিতে বলিয়া উঠিল "এই নচ্ছার জানোয়ারগুলিকে ভূতে পাইল কি! ব্যাটারা নিজেরাও মজিবে—আমাকেও মজাইবে! আমি বলিয়া রাখিতেছি, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই দু'একটা নেক্‌ড়ে আসিয়া ঘাড় ভাঙ্গিবে, তবে যদি ব্যাটাদের আক্কেলের গোড়ায় জল যায়।" সঙ্গে একটা কুকুর ছিল প্রভুর সাহায্যার্থ খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া সে অবাধ্য শূকরগুলিকে তাড়াইয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু প্রভুর মনোগত ভাব কিম্বা আপনার কর্ত্তব্য ঠিক বুঝিতে না পারিয়াই হউক, অথবা ইচ্ছাকৃত দুষ্টবুদ্ধি বশতঃই হউক, সে বরং গোলযোগটাই বেশী করিয়া দাঁড়াইয়া তুলিতেছিল—তাহার তাড়নার ফলে শূকরগুলি আরও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। তখন গার্থ সঙ্গীকে ডাকিয়া কহিল "ওয়াম্বা, কেন বাপু জড়ভরতের মত বসিয়া রহিয়াছ। একবার পাহাড়টার এইধার দিয়া আগে আগে দৌড়াইয়া যাইয়া শূকরগুলিকে আস্তে আস্তে তাড়াইয়া লইয়া আসনা কেন?"

যেখানে বসিয়াছিল, অচল পাথরের মত সেখানেই বসিয়া রহিয়া ওয়াম্বা উত্তর করিল "হাঁ, দেখ এ বিষয়ে আমার চরণযুগলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছি। তাহারা একবাক্যে বলিতেছে যে এই পাঁকের মধ্য দিয়া আমার এই মনোহর জামা কাপড়গুলি যদি তাহারা বহন করিয়া লইয়া যায়, তবে আমার এই রাজ-দেহের এবং রাজাভরণের প্রতি বিশেষ অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে। তাহাদের

দ্বারা কখনই ইহা হইতে পারিবেনা। তাই বলিতেছি গার্থ, তোমারওই কুকুরটীকে ফিরাইয়া আন—তারপরে ও ব্যাটাদের ভাগ্যে যাহা হয় হউক, আর দেখ, ভাগ্যটা তেমন মন্দও হইবে না—দস্যুর হাতেই পড়ুক, ফৌজের হাতেই পড়ুক, আর পথিকের হাতেই পড়ুক, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তাহারা একেবারে "নর্ম্মান্" হইয়া বসিবে, আর তাহাদের রক্ষাকার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইয়া তুমিও মহাসুখে হাঁফ ছাড়িতে পারিবে।"

গার্থ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "শূয়রগুলি 'নর্ম্মান' হইয়া বসিবে! সে কি গো! বুদ্ধিটা আমার এমনিতেই কিছু স্থূল, তাহাতে মনটাও বিশেষ বিক্ষিপ্ত। তোমার ও সব হেঁয়ালি টেয়ালি আমার মাথায় ঢুকিবেনা। খুলিয়া বল।"

তখন ওয়াম্বা কহিল "আচ্ছা, এই যে জানোয়ারগুলি ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করিয়া চারপায়ে দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে—এ গুলিকে তোমরা কি বল?"

"কি বলি!—কোন্ গাধা না জানে যে এ গুলিকে আমরা 'সোয়াইন্' (শূয়ার) বলি?"

"বেশ কথা। এই 'সোয়াইন্' কথাটা হইতেছে সুন্দর স্যাক্সন্ ভাষা। কেমন, নয় কি? কিন্তু যখন চর্ম্মটি উৎপাটিত করিয়া, ঘাড়টি কাটিয়া, নাড়িভুঁড়িগুলি বাহির করিয়া, রাজদ্রোহীর মত ইহাকে পায় দড়ি দিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা হয়, তখন ইহার কি নাম হয়?" গম্ভীরভাবে ভাঁড় এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিল।

গার্থ বলিল "পর্ক।"

ওয়াম্বা বলিতে লাগিল "বড়ই সুখী হইলাম যে সকল গাধাই ইহাও জানে। কিন্তু জান কি যে এই 'পর্ক' কথাটা হইল নর্ম্মান্ ভাষা? তাই বলিতেছি যে যখন জানোয়ারটা জীবিত অবস্থায় স্যাক্সন্ নফরের তত্ত্বাবধানে থাকে, তখন স্যাক্সন্ নামেই তাহার পরিচয় হয়। কিন্তু যাই সম্ভ্রান্তদিগের উদরে যাইবার উপযোগী হইয়া সে অট্টালিকায় যাইয়া উপস্থিত হয়, তখন আর স্যাক্সন্ নাম-গন্ধ ও তাহার থাকিতে পারে না—একদম্ নর্ম্মান্ হইয়া বসে, এবং তখন তাহার নামকরণ হয়—'পর্ক' কেমন, নয় কি!"

গার্থ উত্তর করিল "ভাই ওয়াম্বা, তোমার মত একটা আহাম্মুকের মুখ দিয়া বাহির হইলেও, কথাটা খাঁটি সত্য।"

তেমনই গম্ভীর ভাবে ভাঁড় কহিতে লাগিল "সুধু কি এই একটি? তোমায় আরও বলিতেছি, শোন। 'অক্স' (ষাঁড়) মহাশয়ের কথাটি ধর। যত দিন পর্য্যন্ত তাহাকে তোমার মত গোলামের সেবা গ্রহণ করিতে হয়, ততদিন তাহার 'অক্স' এই স্যাক্‌সন্ আখ্যাটিই থাকে। কিন্তু যে মহামান্য দশন-পংক্তি তাহার চর্ব্বন-সুখ উপভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, যাই তিনি সেই দশন-পংক্তির সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হন, অমনি তাহার নীচ স্যাক্‌সনত্ব ঘুচিয়া যায়—ফরাসী বীর-পুঙ্গব হইয়া তখন তিনি 'বিফ্' নাম ধারণ করেন! 'কাফ' (গো বৎস) ও এই ভাবেই 'ভীল' হইয়া বসেন; যতক্ষণ তাহার যত্ন পরিচর্য্যার আবশ্যক, ততক্ষণই তিনি স্যাক্‌সন্—আর যখন তিনি উপভোগের সামগ্রীতে পরিণত হ'ন, তখন তিনি একদম নর্ম্মান্!"

নিতান্ত বিমর্ষভাবে গার্থ উত্তর করিল "বাস্তবিক ভাই, তোমার কথাগুলি যতই অপ্রিয় হউক, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যে বাতাসটুকু না হইলে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস চলে না, তাহা ছাড়া আর কিছুই আমাদের জন্য রাখে নাই। আর বাতাসটুকুও যে রাখিয়াছে, তাহাও বড় সাধ করিয়া নহে—আমরা বাঁচিয়া না থাকিলে তাহাদের গোস্বামী কে করিবে, সুধু এই ভয়ে। যাহা কিছু সুস্বাদ, যাহা কিছু পুষ্টিকর, সে সকলই তাহাদের ভোগের জন্য; যাহা কিছু মনোরম, সে সকলই তাহাদের শয্যার জন্য। আর আমাদের মধ্যে শৌর্য্যে-বীর্য্যে যাহারা মানুষ, তাহারাও বিদেশী প্রভুর সৈন্যদল পরিপুষ্টির জন্যই অভিপ্রেত—তাহাদের অস্থিতে বিদেশের ভূমি শুভ্র, তাহাদের রক্তে বিদেশের ভূমি রঞ্জিত হইতেছে! আর দেশে যাহারা পড়িয়া রহিয়াছে, হতভাগ্য স্যাক্‌সন্‌দিগকে রক্ষা করিবার সংকল্প কি সামর্থ্য কিছুই তাহাদের নাই! ভগবান্, আমাদের প্রভু কেড্রিক্ সাহেবকে রক্ষা ক'রো এই বীরশূন্য স্যাক্‌সন্ ভূমিতে একা তিনিই মানুষের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, শুনিতেছি ডিবিউফ্ সশরীরে এদিক পানে আসিতেছে জানিয়া কেড্রিক্ এত যে কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, তাহার পুরস্কার কি হইবে!"

ভাঁড় কহিল "গার্থ, আমায় তুমি নিতান্তই আহাম্মুক মনে কর, নতুবা কি আর সাহস করিয়া এমনভাবে তোমার মাথাটা আনিয়া আমার মুখে গুঁজিয়া দিতে! ডি বিউফ্ কিম্বা ম্যালভয়সিনের নিকট ঘুণাক্ষরেও যদি

বলিয়া দিই যে, নর্ম্মানদিগের বিরুদ্ধে কথা বলিয়া তুমি রাজদ্রোহ করিয়াছ, তবে বাছা শূকর রক্ষক, তোমার ঘাড়ের আর মাথা থাকিবে না; মহামান্য পুরুষদিগের অপবাদ করিলে কি কঠিন প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হয়, তাহা সর্ব্বসাধারণকে ভাল করিয়া শিখাইবার জন্য তোমাকে এই গাছগুলিরই কোনটার উপর দোল খেলা খেলিতে হইবে না ?"

গার্থ উত্তর করিল হ'য়েছে, গাধা, হ'য়েছে! ফুঁসলাইয়া পেটের কথা বাহির করিয়া লইয়া আমাকে বাগে পাইয়াছ কিনা, তাই বুঝি ভয় দেখানো হচ্ছে ? কিন্তু, বাপু, তুমি যে বিশ্বাসঘাতক হইতে পার না, তা' জানি বলিয়াই এত কথা তোমায় বলা হইয়াছে।"

ওয়াম্বা বলিল "বিশ্বাসঘাতক ?—না, সে কি আর আমার মত গাধার পক্ষে সম্ভব! ঘটে বুদ্ধি থাকিলে হইতে পারিতাম বটে। চুপ্ চুপ্, ও কাহারা এদিক্ পানে আসিতেছে ?" কতকগুলি অশ্বপদশব্দ শুনা যাইতেছিল।

ইতিমধ্যে কুকুরটা শূকরগুলিকে আনিয়া এক জায়গায় জড় করিয়াছে। তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতে যাইতে গার্থ কহিল "কি আবশ্যক বাপু, কে আসিতেছে ? চল, আমাদের পথ আমরা দেখি।"

ওয়াম্বা উত্তর করিল "না, আমাকে দেখিয়াই যাইতে হইবে। আমার খুবই মনে হইতেছে, পৈরিরাজ্যের দেশ হইতে ইহারা কোনও সংবাদ লইয়া আসিতেছে!"

"আঃ, মরণ আর কি! এখনও কি এসব হাস্য পরিহাসের সময় ? ওই শুনিতেছ না, মাত্র কয়েক, মাইল দূরে কেমন কড়াকড় বজ্র পড়িতেছে ও বিদ্যুৎ চমকাইতেছে! বাবা! আমি ত আকাশ হ'তে এমন মোটা বৃষ্টির ফোঁটা আর কখনও পড়িতে দেখি নাই! বাপু, ইচ্ছা করিলেত তুমি বেশ সুবুদ্ধির মতই কাজ করিতে পার। এখন তবে আমার কথা শোন ঝড়টা প্রবলভাবে আসিবার পূর্ব্বেই বাড়ীর দিকে চল। রাত্রিটা আজ বড় ভাল যাইবে বলিয়া বোধ হইতেছে না।"

গার্থের যুক্তির সারবত্তা এবার যেন ওয়াম্বা উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়া বোধ হইল, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

ধর্ম্মার্থ সারসংগ্রহ—শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এই গ্রন্থখানা বারদীর ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথের জীবনী এবং উপদেশ সম্বলিত। বাবা লোকনাথের অপূর্ব্ব জীবনী-প্রসঙ্গ বঙ্গের সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। এইরূপ মহাপুরুষদের পুণ্যময় জীবন-কথা যত অধিক প্রচারিত হয় ততই দেশের মঙ্গল। আমরা যামিনীবাবুর গ্রন্থপাঠে বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। তিনি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের একজন ভক্তশিষ্য এবং ব্রহ্মচারীর উপদেশ এবং জীবনী সম্বলিত গ্রন্থের প্রথম প্রচারকর্ত্তা। পূর্ব্ব সংস্করণের ক্ষুদ্র গ্রন্থখানাই সংস্করণের পর সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বা কোনরূপ জাতিগত সংকীর্ণতা বিবর্জ্জিত এই গ্রন্থখানা কি ভাষায়, কি পদবিন্যাসে সর্ব্বপ্রকারেই আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে লেখকের উপর মহাপুরুষের প্রভাব অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ধর্ম্মশিক্ষা-শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। এইরূপ শিক্ষাপ্রদ সাম্প্রদায়িক ভাব বিবর্জ্জিত গ্রন্থ অনায়াসেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের হস্তে পাঠ্যরূপে দেওয়া যায়। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। ঢাকা ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। ছাপা ও কাগজ ভাল।

দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য—শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন প্রণীত। কলিকাতা ভট্টাচার্য্য এণ্ডসন্‌এর পুস্তকালয় হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ আনামাত্র।

ভক্ত রেবতীমোহন এইবার শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কাহিনী লইয়া ভক্ত-সমাজে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার রচিত বালকশ্রীকৃষ্ণ যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন রেবতীবাবুর ভাষা কেমন মধুর, আর ভক্তি কথা কহিতে তিনি কেমন সক্ষম। তাই তাঁহার লেখনী-মুখে 'কোটি-সমুদ্র-গম্ভীর' গৌরাঙ্গ-লীলা ফুটিয়াছে ভাল। গ্রন্থকার মহাপ্রভুর বিচিত্র ভ্রমণলীলা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবদর্শনের বহু গভীর তত্ত্বের ও আলোচনা করিয়াছেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রস কি ?. তাঁহার অতি সুন্দর ব্যাখ্যাও

ইহাতে আছে। বৈষ্ণবধর্ম্মের সারতত্ত্ব না বুঝিয়া আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মের অযথা গ্লানি করি, অজ্ঞতাই তাহার মূল কারণ। রেবতীবাবুর এই গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেকে অতি সহজে বৈষ্ণবধর্ম্মের বহু সারতত্ত্বরত্নের সন্ধান পাইবেন। জ্ঞানলাভ হইবে। রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর মিলন দৃশ্য বস্তুতঃই পরম উপভোগ্য। তবে একটা কথা এই যে গ্রন্থখানা অতি বড় সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, অধ্যায় বিভাগের সহিত সূচী ও মূল ঘটনাগুলির উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের যেরূপ বিস্তৃত ইতিহাস আমরা বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে পাই, লেখক সেদিকে ততটা লক্ষ্য করেন নাই, বোধ হয় রামানন্দ-সম্মিলন ব্যাপার উপলক্ষ করিয়াই তাঁহার এই গ্রন্থ লেখা। আশা করি ভবিষ্যত-সংস্করণে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিস্তারিত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবেন, নচেৎ এক হিসাবে এই গ্রন্থখানা অসম্পুর্ণ বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে ইতিহাস ও ভ্রমণ-কহিনীর বিবরণ থাকিলে পাঠক সাধারণ উপকৃত এবং যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, সে সকল বিবরণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, রেবতীবাবুর ন্যায় বিজ্ঞ ও ভক্ত গ্রন্থকারের হাতে সে সকল চিত্র অতি রমণীয় হইত। এক হিসাবে এই গ্রন্থের নাম দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য না হইয়া দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও রামানন্দের সংমিলন হইলেই ভাল হইত। সে যাহা হউক ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের' পর এই শ্রেণীর গ্রন্থ এই একখানা মাত্র প্রকাশ হইল। রেবতীবাবুর গ্রন্থ বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগী ভক্ত মাত্রেরই গৃহে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় রাখা কর্ত্তব্য। এমন মিষ্টি মধুর ভক্তি কথা বহুদিন শুনি নাই বা পড়ি নাই। বঙ্গসাহিত্যানুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।

কাহিনী—শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক মুক্তাগাছা হইতে প্রকাশিত। এই ছোট বইখানা প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিত, কতকটা স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের 'ছায়াদর্শনের' ন্যায়। পরলোক কি? মৃত্যুর পর মানুষের কি কি অবস্থা হয়, এ সকল কঠিন সমস্যাগুলি অতি সহজ সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। গল্পগুলি অত্যন্ত

চিত্তাকর্ষক। যাহারা ভূতের গল্প পড়িতে বা জানিতে ভালবাসেন তাহাদের এই গ্রন্থখানা পড়া উচিত। উপন্যাসের চেয়েও সুমধুর পরলোকের কাহিনী পড়িয়া বেশ আনন্দ পাইবেন। লেখককে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—বিলাতি ভূত ছাড়া দেশী ভূতের কথা কি তাহারা জানেন না? অন্ততঃ খবরের কাগজে মাঝে মাঝে যে সকল ভূতুড়ে গল্প বাহির হয় সেগুলির তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করিলেওত বেশ ভাল হয়। ওদিকে হরিচরণবাবু একটু মন দিন না। বিলাতের ভূতই কেবল ধরা দিবে আমাদের দেশের ভূতেরা পালাইয়া যাইবে এ কেমন কথা! রহস্য ছাড়িয়া বলিতে পারি যে এ গ্রন্থখানা আমরা অত্যন্ত আরামের সহিত উপভোগ করিয়াছি। লেখকের ভাষাটি মিষ্টি,—বলিবার ভঙ্গীও ভাল। ঢাকা ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

বিক্রমপুর

৬ষ্ঠ বর্ষ, } জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫। } ২য় সংখ্যা।

প্রসঙ্গ-কথা।

বিক্রমপুর-সম্মিলনী সভা।

এখন আর "বিক্রমপুরসম্মিলনী সভার বড় একটা সাড়া পাওয়া যায় না। আজ দুই বৎসর যাবত সম্মিলনী একরূপ নীরব, কেন? কারণ বুঝিতেছি না। 'বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী' সম্প্রতি কলিকাতা সহরে একটী প্রদর্শনী খুলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আর আমাদের সম্মিলনী বিগত বর্ষে মহা সম্মিলনের ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। কলিকাতা—প্রবাসী সম্মিলনীর সভ্যগণের নিকট সম্পাদক মহাশয় কি কর্ত্তব্য প্রণালীতে সম্মিলনীর কার্য্য পরিচালিত হইলে ভাল হয় তৎ সম্বন্ধে মতামত চাহিয়া পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু মফঃস্বলের কাহারও নিকট সেইরূপ পত্রাদি লেখা তাঁহারা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই। ইহার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিলাম না। "বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার" কাজ কেবল কলিকাতা সহরেই সীমাবদ্ধ নহে—বিক্রমপুরের পল্লীর কথা বাদ দিলে, প্রবাসী বিক্রমপুরবাসীদের কথা ভুলিয়া গেলে আমাদের চলিবে কেন? আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা দ্বারা যতদূর বুঝিতেছি ও দেখিতে পাইয়াছি, বিক্রমপুরবাসীর প্রাণ দিন দিনই যেন অসার, নির্জীব এবং ঈর্ষ্যা-পরায়ণ হইয়া উঠিতেছে। ফলে কোন কাজই ভালরূপ হইতেছে না। গভর্মেণ্ট এখন যে ভাবে পল্লীর সংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে উন্মুখ হইয়াছেন,

এবং যে ভাবে আজকাল বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ইউনিয়ানকমিটি গঠিত হইতেছে তাহাতে রাস্তা ঘাট, পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি কার্য্যের জন্য আর সম্মিলনীর তেমন কোন কাজ করিবার নাই; করিবার সুযোগ সুবিধাও তাহারা পাইবেন কিনা সন্দেহ। যে ভাবে ইউনিয়ান কমিটি গঠিত হইতেছে উহাতে স্থায়ী পল্লীবাসীরাই নিজ নিজ গ্রামের উন্নতি-কল্পে আত্মশক্তি নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইতেছেন ও হইবেন কাজেই এদিকে আর সম্মিলনীর দৃষ্টি না ফিরাইলেও চলিবে। এখন তাহাদের দুই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য—(১ শিক্ষা (২) স্বাস্থ্য। বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের অভাব নাই বলিয়া বিদ্যালয়ের সংখ্যাও কম নহে, কিন্তু একটী কলেজের অভাবে বিক্রমপুরবাসী ছাত্রদের যারপর নাই কষ্ট হইতেছে। ছেলে পরীক্ষায় পাশ-করিল, কিন্তু কলেজে স্থান নাই! মেডিকেল স্কুল, সার্ভে স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল সর্ব্বত্রই তাহাদের ঠাঁই নাই—ঠাঁই নাই। পরীক্ষোত্তীর্ণ ভগ্ন হৃদয় এ সকল ছাত্রের ম্লান মুখমণ্ডলের দিকে চাহিলে প্রাণে যাতনা অনুভূত হয়। তাহারা কি করিবে? কোথায় যাইবে। অধিকাংশ অভিভাবকই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, তাহা-দের আর্থিক শক্তি সামর্থ্য এইরূপ নহে যে নানা স্থানে ছেলে পাঠাইয়া ভর্ত্তীর চেষ্টা করিবে। কাজেই অনেকের পড়াই হয় না। এরূপ স্থলে 'বিক্রমপুর কলেজের' জন্য শিক্ষিত বিক্রমপুরবাসীর উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশে কলেজ স্থাপনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, আমাদের জগদীশচন্দ্র বিক্রমপুর কলেজের জন্য তেমনি মনোযোগী হউন। কলিকাতার "বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা, এদিকে মনোনিবেশ করুন। ভাগ্যকুলের ধনকুবেরদের মধ্যে যে কেহ একটী কলেজ স্থাপন করিয়া দিয়া দেশের ও দশের যথেষ্ট কল্যাণ করিতে পারেন; শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ, মিঃ জে, এন দাশ গুপ্ত, অধ্যাপক মহলানবিশ, ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক শশীভূষণ দত্ত প্রভৃতির ন্যায় কৃতি ব্যক্তিগণ থাকিতে যদি বিক্রমপুর কলেজ আকাশ-কুসুমে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে বুঝিব—

'আমরা কেবলি স্বপন করি যে বপন বাতাসে'

মুন্সীগঞ্জের উদ্যোক্তাগণ কলেজ সম্বন্ধে কতদূর অগ্রসর হইলেন তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না—তাহারা এ বিষয়টি গোপন রাখিতেছেন কেন? সংবাদ

পত্রে এ বিষয়ের গভীরতর আন্দোলন করুন, প্রবাসী বিক্রমপুরবাসীর নিকট আবেদন করুন, অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা scheme গঠন করুন, কেবল জল্পনায় কল্পনায় কাজ হইবে না। আজ কিসের অভাব ছিল? কোথায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়ের হরেন্দ্র কলেজ! উহা থাকিলে আমাদের কিসের দুঃখ ছিল?

বিক্রমপুর সম্মিলনীর ডোমসারের অধিবেশনে পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন ও অন্যান্য দেশহিতজনক কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বার-এট-ল মহোদয় এক হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন এবং সভাক্ষেত্রেও কতক অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল,—সে অর্থ দ্বারা বিক্রমপুরের কোন্ হিতজনক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল তাহা জানা যায় নাই। তার পর সম্মিলনীকে রেজেষ্টরী করিবার প্রস্তাবও তথায় গৃহীত হইয়াছিল তদুদ্দেশ্যে তিনজন সভ্যও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তার পর কি হইল সে তত্ত্ব সম্মিলনের সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে জানান নাই—সাধারণে উহা জানিতে চাহে। সম্মিলনী আজকাল কুম্ভকর্ণের মত ঘুমাইতেছেন সে নিদ্রা ভাঙ্গিবার এখন প্রয়োজন হইয়াছে। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'।

*　　*　　*　　*

ভাগ্যকুলের স্বনামধন্য রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায়কে আমরা ভাগ্যকূলে বিক্রমপুরসম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনি তাহাতে সম্মত হইয়াছেন, আগামী শীতকালে যাহাতে ভাগ্যকূলে 'বিক্রমপুর মহাসম্মিলন' হইতে পারে সে আয়োজনের জন্য কলিকাতা মূল শাখা উঠিয়া পড়িয়া লাগুন—এবার মহাসম্মিলনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, কলেজ, খাল ও অন্যান্য সংস্কারের বিষয় আলোচনা ও মীমাংসার আবশ্যক :—

'আগে চল্ আগে চল্ ভাই'
পড়ে থাকা পিছে,　　　মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।'

কৃষিবিভাগের কথা।

ঢাকাতে কৃষি বিভাগ আসিবার পর হইতেই 'বেঙ্গলি' ও 'অমৃতবাজারে' কৃষি বিভাগের নিন্দা ও নব নিয়োজিত ডেপুটি ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর দাস গুপ্তের বিরুদ্ধ-সমালোচনা প্রকাশিত হইতে দেখিতে পাইতেছি। কেহ কেহবা কৃষি বিভাগের উপযোগীতাই উপলব্ধি করেন না—যাহারা ঐরূপ লিখেন বা বলেন তাহাদের বোধ হয় ধান গাছ কতবড় সে অভিজ্ঞতাও নাই। কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারীগণ পূর্ব্ববঙ্গে কৃষকগণের চাষ বাস সম্বন্ধে উন্নত প্রণালী শিক্ষা-দানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের চেষ্টা বহু স্থানেই সফল হইতেছে। আমরা সেদিন ঢাকার 'মণিপুর ফার্ম্মের কার্য্য' দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। শুধু দুই এককথায় তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিব। ঢাকা ডিভিজনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ, বিলাতী লাঙ্গলের আদর্শে তাহাপেক্ষাও টেক্‌সই কার্য্যক্ষম অথচ অল্প মূল্যের লাঙ্গল আবিষ্কার করিয়াছেন—ইহাও ঢাকা ফার্ম্মের গৌরবের কথা। আমরা উক্ত লাঙ্গলের দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষিত হইতে দেখিলাম। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর বাবু পূর্ব্ববঙ্গবাসী, তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্রই পরিচিত এবং এক কথায় খাঁটি practical man, বহুদিন যাবত কৃষি বিভাগে কার্য্য করিয়া অপূর্ব্ব দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সদালাপী, কর্ম্মী ও উন্নতিকামী কর্ম্মচারীর দ্বারা কৃষি বিজ্ঞানের সহিত সাধারণ কৃষকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় বৃদ্ধি পাইয়া দেশের কৃষকমণ্ডলী উন্নত প্রণালীর চাষ বাসে মনোযোগী হইবে এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। পূর্ব্ববঙ্গবাসী মাত্রেই ঢাকাতে কৃষি বিভাগের আগমনে ও শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর বাবুর ন্যায় যোগ্যতর ব্যক্তির প্রতি গভর্মেণ্টের গুণগ্রাহিতার পরিচয়ে আনন্দিত হইয়াছে।

বস্ত্র-সমস্যা।

একদিম আমাদের কর্ম্মহীনতা ও বাক্‌সর্ব্বস্বতার দিকে কটাক্ষ করিয়া কবি মনোমোহন গাহিয়াছিলেন,—

"কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
ধরবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ
বাকল টেনা ডোর কপিন"।

হায়! কবি আজ যদি তুমি বাঁচিয়া থাকিতে তাহা হইলে দেখিতে পাইতে যে, এখন আর কলের বসনও লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। সারা বাঙ্গালা দেশ, সারা ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া আজ দারুণ বস্ত্র-সমস্যা উপস্থিত। সংবাদ পত্রে প্রতিদিন শত শত দৃষ্টান্ত পড়িতেছি, আর চক্ষেও যে না দেখিতেছি তাহা নহে, কারণ সেটা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবারে উপলব্ধি করিয়া আসিতেছেন। কেন এমন হইল? সে মীমাংসার কথা এখন আর বলা চলে না। ভারতবর্ষের কাপড়ের কল ও সূতাভাবে বন্ধ, কাজেই কাপড় যোগাইতে পারিতেছে না। আর হতভাগ্য কথার সাগর ও পরশ্রীকাতর নিন্দক বাঙ্গালী আমরা—পরের নিন্দা গাহিয়া "আমি বড়" এই বাহাদুরী প্রচারের বাহাদুরী লইয়াই ব্যস্ত, তাই সারা বাঙ্গলা দেশের সবেধন নীলমণি বঙ্গলক্ষ্মী ও মোহিনী মিল কাপড় যোগাইতে পারিতেছে না। বঙ্গলক্ষ্মী নামে লক্ষ্মী হইলেও তাহার ভাণ্ডার একরূপ শূন্য। কলিকাতায় দুই এক দোকান ছাড়া 'বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড় পাওয়া যায় না। মোহিনী মিলের কাপড় তবু পাওয়া যায়। দামের কথা—সে ত সর্ব্ব মিলই তুল্য মূল্য। এখন উপায় কি? বস্ত্রাভাবে নারীর লজ্জা থাকিতেছে না,—বস্ত্রাভাবে পুরুষ ও রমণী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে। তবু গভর্মেণ্ট এ বিষয়ে তেমন প্রতীকারে মনোযোগী নন্। মাড়োয়ারী বস্ত্র ব্যবসায়ী দেশের এ দুর্দ্দিনেও লোকের অভাব ক্লেশ দেখিয়াও লাভের অঙ্ক ছাড়িতেছে না! মহাজনেরা সর্ব্বত্রই এই নীতি অবলম্বন করিতেছে, ইহার প্রতিকার গভর্মেণ্টের অবশ্য করণীয়।

কেহ কেহ আবার চরকায় সূতা কাটাইয়া অভাব দূর করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। একবার স্বদেশীর সময় এইরূপ উৎসাহের অগ্নি জ্বলিয়াছিল-তারপর সব নীরব। হুজুগে অনেক কথা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এখনকার দিনে চর্‌কার সূতা কাটিবার লোকও বড় বেশী নাই। কাটিয়াই বা কি লাভ! সূতা কিনিবার লোকও মিলেনা, ইহা আমাদের পরীক্ষিত কথা। আর বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক দিনে সেকেলে চরকায় সূতা কাটাইয়া যাহারা বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান

করিতে চাহেন, তাহারা দেশহিতৈষী হইতে পারেন, কর্ম্মী হইতে পারেন কিন্তু তাহারা ভবিষ্যতদর্শী লোক নহেন। চরকা জুটিলেও তুলা কোথায়? কয়জনের বাড়ীতে কার্পাস আছে। কার্পাসের চাষ করিয়া তুলা জন্মাইয়া সূতা তৈরী করিয়া উহা দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া দেশের নর নারীর লজ্জা নিবারণ করিবে ইহা পাগলের প্রলাপ। আর দুর্দ্দিন চিরদিন থাকিবেনা, তারপর প্রচুর বস্ত্রের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে কোথায় বা যাইবে চরকা কোথায় বা যাইবে সূতা। হে মহাপুরুষগণ! যদি কাজ করিতে চাও, তাহা হইলে কাপড়ের কল স্থাপনের চেষ্টা কর, জেলায় জেলায় কল প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রতী হও, অর্থ সংগ্রহ কর, তুলা কেন, এযুগ বৈজ্ঞানিক যুগ—বিজ্ঞানের সাহায্যে কলের সাহায্যে সূতা প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র তৈয়ার কর, সময় লাগিলেও যদি জেলায় জেলায় এক একটী করিয়া কল প্রতিষ্ঠা করিতে পার তাহা হইলে, বুঝিলাম কাজ হইল, দেশের প্রকৃত হিত হইল। ভবিষ্যতের একটা উপায় হইল।

আর বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান ভিক্ষা। জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় বস্ত্র সমিতি গঠন কর, অর্থ সংগ্রহ কর তারপর গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বস্ত্র-হীনকে বস্ত্র দাও। দেশে বড় বড় জমিদার ও অর্থশীল লোকেরা কেবল খায় দায় ঘুমায় জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটদের সহায়তায় তাহাদের নিকট হইতে অর্থ বাহির কর, নতুবা এসকল ধুরন্ধরেরা অতি অল্প জনেই পরের কাজে অর্থ দান করিবে। ইহারা আত্মসুখ ছাড়া কিছু বোঝেনা একবার সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া জাগাইয়া তোল। তারপর সহরে সহরে আজকাল শিক্ষিতা ও সম্পত্তিশালিনী রমণীরা "মহিলাসমিতি" বা কিছু ঐরূপ গঠন করিয়া অভিনয় করেন, অর্থ সংগ্রহ করেন ও বিধবাশ্রম বা অন্য কোন ও প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করেন। তাহাদের নভেল পড়িয়া, কার্পেট বুনিয়া বা সঙ্গীত গাহিয়া দিন কাটেনা এইবার তাহারা বস্ত্র-সমস্যার সংস্কার বিধানে অগ্রসর হউন। ঢাকার মহিলাসমিতি সর্ব্বাগ্রে এ আদর্শ দেখাইতে অগ্রসর হইয়া আমাদের মুখোজ্জ্বল করুন না!

বঙ্গে সৈন্য সংগ্রহ।

১৯১৭ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯১৮ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত দশ মাসে বঙ্গদেশ হইতে কত সৈন্য সংগ্রহ হইয়াছে প্রাদেশিক সৈন্য সংগ্রহ বোর্ড উহার নিম্নলিখিত হিসাব প্রকাশ করিয়াছে :—

প্রেসিডেন্সী বিভাগ।

কলিকাতা ২০১, চব্বিশ পরগণা ১৩৩, নদীয়া ১০২, মুর্শিদাবাদ ২৮, যশোহর খুলনা ৬০।

মোট সংখ্যা—৫৯৩।

বর্দ্ধমান বিভাগ।

বর্দ্ধমান ২৮, বীরভূম ২৯, বাঁকুড়া ৩৩, হাওড়া ৮৪, হুগলী ৭১, মেদিনীপুর ৩৭।

মোট সংখ্যা—২৮২।

রাজসাহী বিভাগ।

রাজসাহী ৬২, পাবনা ৬০, বগুড়া ১৫, মালদহ ১৭, দিনাজপুর ৪০, দারজিলিং ১, জলপাইগুড়ি ১১, রংপুর ২৭।

মোট সংখ্যা—২৩৩।

ঢাকা বিভাগ।

ঢাকা ১৭৪, ময়মনসিংহ ১৪৫, ফরিদপুর ১১৬, বাখরগঞ্জ ৮১।

মোট সংখ্যা—৫১৬।

চট্টগ্রাম বিভাগ।

চট্টগ্রাম ৫৩, ত্রিপুরা ৫০, নোয়াখালি ১৮, পার্ব্বত্য প্রদেশ ৬।

মোট সংখ্যা—১২৭।

ইহা ছাড়া পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ২৫, কোচবিহার ষ্টেট ১, বঙ্গের বাহির হইতে ১০২।

সর্ব্বসমষ্টি—১৮৭৯।

এই লিষ্ট হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ঢাকা বিভাগ ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হার্টও তাহার সহযোগীগণের অক্লান্ত চেষ্টাও যত্নই এইরূপ সফল্যের কারণ।

ভগবদ্‌গীতার সমালোচনা।(৩)

জীবেশ্বর তত্ত্ব

জীবেশ্বর স্বরূপ নিরূপণ জগত্তত্ত্ব মীমাংসা সাপেক্ষ। জগদুৎপত্তি ক্রম সম্যক নিরূপিত না হইলে জীবেশ্বর স্বরূপ সম্বন্ধে সত্যসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অতীব দুরূহ। তথাপি গীতার অসমঞ্জস জগত্তত্ত্ব এবং অপর ভগবদ্বাক্য বিচার পূর্ব্বক জীবেশ্বর স্বরূপ নিরূপণে প্রয়াসী হইব।

সাংখ্যমতে অসঙ্গ নিত্য শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বভাব সাক্ষি-স্বরূপ এবং উদাসীন পুরুষই দেহী বা জীবরূপে অভিব্যক্ত। সাংখ্য দর্শনে পুরুষের বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু পুরুষ বা আত্মার বহুত্ব বহুল অদ্বৈত শ্রুতি এবং স্মৃতি বাক্য বিরুদ্ধ, তজ্জন্য "না দ্বৈত শ্রুতিবিরোধো জাতি পরত্বাৎ" সূত্রদ্বারা মীমাংসিত হইয়াছে যে আত্মা বা পুরুষ সম্বন্ধে শ্রৌত একত্ববাচক বাক্য এক জাতিত্ব জ্ঞাপক মাত্র, উহা সংখ্যা বাচক নহে।

সাংখ্য মতে প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে জগৎ সৃষ্টি ; বিয়োগে প্রলয় এবং প্রকৃতি পুরুষ বিবেকজ জ্ঞান বৈরাগ্যদ্বারা মুক্তি হয়, সুতরাং বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বনিয়ামক ব্যক্তিগত ঈশ্বরের সত্তা "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" প্রভৃতি সূত্রযোগে নিরাসিতা হইয়াছে। পুরুষ স্বভাবতঃ মুক্ত, প্রকৃতি সংযোগই তাহার বন্ধনের হেতু। "ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষ সাধনোপদেশ বিধিঃ" স্বভাবত বদ্ধ হইলে পুরুষের মোক্ষোপদেশ ব্যর্থ হইত। জ্ঞানামুক্তি "জ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয়, "বৃত্তি নিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ" এবং 'বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ" সূত্রদ্বয় প্রতিপাদন করে যে বৈরাগ্য এবং অভ্যাস দ্বারা বৃত্তিরুদ্ধ হয়। "জীবন্মুক্তশ্চ" "উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ" এই সূত্রদ্বয় দ্বারা জীবন্মুক্তি এবং জীবন্মুক্ত পুরুষের উপদেশে মোক্ষপ্রদ জ্ঞান বৈরাগ্যাদি লাভ অঙ্গীকৃত হইয়াছে, সুতরাং সাংখ্যমতে পুরুষের মুক্তির জন্য ও ঈশ্বর বা ঈশাবতারের করুণা নিষ্প্রয়োজন, প্রকৃতি বিবেক-জনিত বৈরাগ্য এবং তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের হেতু॥

পতঞ্জলি সাংখ্য মতাবলম্বী, এই জন্য পাতঞ্জল-দর্শন "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" ইত্যাদি সূত্র থাকা হেতু, সেশ্বর সাংখ্য আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু পতঞ্জলি

সূত্রোক্ত 'বা' পদদ্বারা ঈশ্বর এবং তৎপ্রণিধানের গুরুত্বের লাঘব করিয়াছেন। কারণ "স্বপ্ন নিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা" যথাভিমত ধ্যানাদ্বা" ইত্যাদি সবিকল্পসমাধি বা একাগ্রতা সাধনের বহু উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর প্রণিধান তাহার একতম উপায় মাত্র।

পতঞ্জলির ঈশ্বর জগতের স্রষ্টাপাতা এবং জীবের সুখ দুঃখ, স্বর্গ, নরক, বন্ধ-মোক্ষের বিধাতা নহেন। "ক্লেশকর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ॥" অর্থাৎ সাংখ্যের বহু পুরুষের মধ্যে ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয় বর্জ্জিত পুরুষ বিশেষ বা জীবন্মুক্ত পুরুষই পতঞ্জলির ঈশ্বর। ঈদৃশ পুরুষের ঈশ্বর আখ্যা কেন? বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্য হেতু তিনি ঈশ্বর বাচ্য। "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞ বীজম্।" আত্মজ্ঞ পুরুষই জীবন্মুক্ত বাচ্য, এবং আত্মজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয়, শ্রুতি ও বলিতেছে + ১ "হে সৌম্য, যেমন এক মৃৎপিণ্ড দ্বারা সর্ব্বমৃন্ময় পদার্থের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ আত্মজ্ঞান হইলে সকলই জানা হয়, কারণ জ্ঞেয় সর্ব্ব বিষয়ই এই আত্মা"।

সাংখ্য বলিতেছে "উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ" পাতঞ্জল দর্শন বলিতেছে "সপূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ "অর্থাৎ জীবন্মুক্তি চিরকালই ছিল, আছে এবং হইবে, সুতরাং জীবন্মুক্ত পুরুষ কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, ঈদৃশ পুরুষই পূর্ব্বাবধি সকলের গুরু বা মোক্ষপথ প্রদর্শক। বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান বিজ্ঞান লাভে সুপথে কুপথে সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠ পুরুষ পুরুষান্তরের গুরু বা উপদেষ্টা ইহা সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থা সর্ব্বজীব ভোগ করে। যিনি জীবন্মুক্ত তিনি তুরীয় বা চতুর্থাবস্থা প্রাপ্ত, সুতরাং অ, উ, ম, এবং বিন্দু সমন্বিত প্রণব বা 'ওঁ'কার তাহার বাচক। বিচারে প্রতিপন্ন হয় মুক্ত পুরুষই পতঞ্জলির ঈশ্বর, ঈশ্বর শব্দের পাশ্চাত্য ঈশ্বরবৎ জগৎস্রষ্টা ব্যক্তিগত ঈশ্বর (Personal God) লক্ষ্য নহে॥

পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস ভাষ্য, বাচস্পতি মিশ্রকৃত তত্ত্ব বৈশারদ্যাখ্য টীকা এবং ভোজরাজকৃত রাজমার্ত্তণ্ডাখ্য বৃত্তি বিচারে প্রতীয়মান হয় যে ইহারা

× ১ আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।
যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতংস্যাৎ॥
ছান্দোগ্যোপনিষদ।

সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঈশ্বর শব্দের তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন নাই। যে শাস্ত্রে পুরুষাতিরিক্ত অপর চৈতন্য সত্তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, যে শাস্ত্রানুসারে পুরুষ প্রকৃতির বিবেকে মোক্ষ সিদ্ধ হয়, অপরের করুণার প্রয়োজন হয় না, তাহার ভাষ্যে ব্যাসদেব "কারুণিক" ঈশ্বর স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন, এবং "প্রণিধানাৎ" শব্দের "ভক্তি বিশেষাৎ" অর্থ করিয়াছেন। ভক্তি রস সিঞ্চনে কঠোর যোগমার্গ অপেক্ষাকৃত কোমলাকার ধারণ করিলেও ভক্তজনের নয়ননীরে ইহা কদাচিৎ সিক্ত হয়; কারণ ঈশ্বর প্রণিধানের ফলে এবং "যথাভিমতধ্যান" ফলে কোন প্রভেদ নাই।

ভাষ্যারম্ভে, পতঞ্জলির "অনেকবক্ত্র অহীশ" অর্থাৎ পৃথ্বীভার বহনকারি অনন্ত নাগের অবতারত্ব, এবং ভাষ্যের স্থানে স্থানে পৌরাণিক উচ্ছাস দর্শনে, স্বতই প্রশ্ন উদিত হয় যে মহাভাষ্যকার কি পুরাণ প্রণেতা ব্যাস, অথবা অপর কোন পুরাণ ভক্ত ব্যাস?

টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র "নমামি জগদুৎপত্তি হেতবে বৃষকেতবে" বাক্যে টীকারম্ভে জগৎকারণ বৃষকেতুকে নমস্কার করিতেছেন। তাঁহার সাংখ্যোক্ত জগৎ সৃষ্টি ক্রমে আস্থা ছিল কি? বৃত্তির প্রারম্ভে ভোজরাজ "ত্রিবিধান্যপি দুঃখানি যদনুস্মরণান্নৃণাম্। প্রয়ান্তিসদ্যোবিলয়ং তংস্তুমঃ শিবমব্যয়ম"॥ বাক্যে শিবের স্তুতি করিতেছেন। ঈদৃশ ব্যক্তিগত ঈশ্বর বিশ্বাসি ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণের যোগ দর্শনস্থ প্রত্যেক সূত্রে পরমকারুণিক ভগবানের আবির্ভাব দর্শন ও বিস্ময়কর নহে। বাস্তবিক পৌরাণিক কল্পনাক্লিন্ন মস্তিষ্ক, ব্যক্তিগত ঈশ্বর সংস্কারাপন্ন পরকৃপাপ্রার্থি অযোগিজনের যোগদর্শন ব্যাখ্যা অনধিকার চর্চ্চা মাত্র॥

পরমাণুবাদি বৈশেষিকাদি শাস্ত্রে অণুনিয়ামক চেতন কারণ স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু তৎসহ জীবের বন্ধ মোক্ষাদির কোন সম্বন্ধ নাই। "আত্মকর্ম্মসু মোক্ষোব্যাখ্যাতঃ" "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ," "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যা জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" প্রভৃতি সূত্রদ্বারা বৈশেষিক এবং ন্যায়শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞানোদয় কিংবা অজ্ঞানতা বা মিথ্যাজ্ঞান বিলয়ে, মোক্ষ, অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স নিরূপিত হইয়াছে। মীমাংসা দর্শনে ও কর্ম্মফল দাতা ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু এই সকল দর্শন সহ ভগবদ্গীতার বিশেষ সম্বন্ধ নাই, সুতরাং সাংখ্য ও বেদান্তমত সহ গীতার জীবেশ্বর তত্ত্ব আলোচিত হইবে॥

সাংখ্য শাস্ত্রে পুরুষের বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। দেহেন্দ্রিয়াদি সংশ্লিষ্ট পুরুষের বা জীবের ব্যবহারিক বহুত্ব সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ, কোন শাস্ত্র বা ব্যক্তি তাহা অস্বীকার ও করে না। পরমার্থতঃ পুরুষ বহুকিনা, এস্থলে তাহাই বিচার্য্য। প্রকৃতিজাত দেহেন্দ্রিয়মনদ্বারা পুরুষের স্বাতন্ত্র্য এবং বহুত্ব নিরূপিত হয়, কিন্তু ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায়, প্রাকৃতিক বিভেদক বস্তুর অভাব সময়ে পুরুষের ভিন্নত্ব এবং বহুত্ব কি উপায়ে নিরূপিত হইবে? পুরুষ স্বভাবতঃ নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব অসঙ্গ এবং উদাসীন, গুণবৈষম্যজনিত জগদ্বিকাশকালে তাহাতে প্রাকৃতিক গুণ কর্ম্ম কর্ম্মফল এবং সংস্কারাদি অধ্যাসিত হয়, এবং ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় প্রাকৃতিক গুণ কর্ম্ম সংস্কারাদি স্বীয় উপাদান কারণ প্রকৃতিতেই লীন হয়, পুরুষ সহ সংশ্রব থাকে না, তদবস্থায় পুরুষের বিভেদ বা বহুত্ব প্রমাণিত হয় না।

পুরুষের জাতিগত একত্ব স্বীকার দ্বারা অদ্বৈত শ্রুতি বিরোধ নিরাকৃত হয় না, কারণ সর্ব্বশ্রুতিতেই পুরুষ বা জগৎ কারণ এক বচনে নির্দ্দেশিত হইয়াছে, এবং জাতি বাচক কোন শব্দ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পরন্তু "সোঽকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" "একোঽহদেবো......বহুধা বিজায়তে"। ইত্যাদি বহুল শ্রুতি বাক্য পুরুষের পারমার্থিক একত্ব এবং জগদ্বিকাশ কালে ব্যবহারিক বহুত্বই প্রতিপাদন করিতেছে+১ বৃক্ষাদির সংখ্যাগত বহুত্ব এবং জাতিগত একত্বের ন্যায় পুরুষের পারমার্থিক বহুত্ব স্বীকৃত হইলে প্রত্যেক বৃক্ষের ন্যায় বস্তুতঃ এবং দেশতঃ পরিচ্ছেদ হেতু প্রত্যেক পুরুষের কালতঃ পরিচ্ছিন্নতা বা অনিত্যতা উপপন্না হয়। বাস্তবিক এই দৃষ্টান্ত ও সমীচীন নহে, কারণ বৃক্ষাদির জাতিগত এবং সংখ্যাগত বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব ও ব্যবহারিক, জাগতিক সর্ব্ব পদার্থই প্রকৃতি বা অণ্বাখ্য একের বিচিত্র বিকাশ মাত্র। অহঙ্কার এবং আকাশ বা অবকাশ প্রকৃতিজাত, সুতরাং প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় প্রতি পুরুষের স্বতন্ত্রাস্তিত্বানুভূতি এবং পরস্পর ব্যবধান হেতু স্বাতন্ত্র্য প্রতিপন্ন হয় না। সাংখ্যদর্শনের সকল সূত্র

×১ "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" "এক এবহি ভূতাত্মা ভূতেভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥" "পরে২ ব্যয়ে সর্ব্ব একী ভবন্তি।" একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।" "একং রূপং বহুধা যঃ করোতি" ইত্যাদি—

মহর্ষি কপিল কৃত নহে, ইহা শাস্ত্রাধ্যায়িগণ অবগত আছেন, অপর সূত্রের ন্যায় অশ্রৌত এবং অযৌক্তিক পুরুষ বহুত্ব বাচক সূত্র পঞ্চশিখ বা অপর অবিবেকি সাংখ্যাচার্য্যকৃত ইহাই বিচার সম্মত+১॥

জগত্তত্ব বিচারে যে শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তি দ্বারা কার্য্যকারণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাতেই পুরুষ আত্মা প্রজাপতি ব্রহ্ম বিষ্ণু দেবাদি বিভিন্ন নামে নির্দ্দেশিত এক অদ্বিতীয় সত্তার বহু জীবরূপে অভিব্যক্তি ও প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু রামানুজাদি বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈতবাদিগণ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা ভিন্ন এবং নিত্য এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং "দ্বাসুপর্ণা" এই বেদান্ত মন্ত্রদ্বারা স্বীয় মত সমর্থন করিয়াছেন+২॥

"সুন্দর পক্ষ বিশিষ্ট পক্ষিদ্বয় সংযুক্ত এবং সখ্যভাবে এক বৃক্ষে আরূঢ় আছে, তন্মধ্যে এক পিপ্পল ফল আস্বাদন করিতেছে, অপর ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করিতেছে" ভাষ্যকার, বৃক্ষ শব্দের দেহ, এবং পক্ষিদ্বয়ের জীবেশ্বর বা জীবাত্মা পরমাত্মা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে বিচার্য্য এই যে, প্রতি দেহে একটি পরমাত্মা বা ঈশ্বর এবং একটি জীবাত্মার অবস্থিতি স্বীকৃত হইলে আত্মার দ্বিবিধ জাতি এবং ঈশ্বর বা পরমাত্মার বহুত্ব উপপন্ন হয়, কিন্তু ঈশ্বর বা পরমাত্মার বহুত্ব সর্ব্বশ্রুতি এবং যুক্তি বিরুদ্ধ॥

যদ্যপি এক অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মার সর্ব্বদেহে ব্যাপ্তি স্বীকৃতা হয়, তবে তাঁহার জীবাত্মাতে ব্যাপ্তির ও কোন বাধ পরিলক্ষিত হয় না। পরন্তু তাঁহার জীবাত্মাতে ব্যাপ্তি স্বীকৃতা না হইলে, সর্ব্ব ব্যাপ্তিই উপপন্না হয় না। জীবাত্মাতে পরিব্যাপ্ত পরমাত্মার জৈব কর্ম্ম কর্ম্মফল এবং পাপ পুণ্য সুখ দুঃখাদিতে ব্যাপ্তিরই বা প্রতিবন্ধী কি আছে? আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বিবেক নেত্রে শ্রৌত সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীতি হয় যে এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই কার্য্যকারণ উভয়রূপে অভিব্যক্ত বা "বিভু"।

×১ "অবিবেক নিমিত্তো বা পঞ্চশিখঃ।" লিঙ্গশরীর নিমিত্তক ইতি সনন্দনাচার্য্যঃ" সাংখ্যদর্শন।

×২ "তত্র চিচ্ছব্দ বাচ্যা জীবাত্মনঃ পরমাত্মনঃ সকাশাদ্ ভিন্না নিত্যাশ্চ তথাচ শ্রুতিঃ"। রামানুজ দর্শন।

"দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ন্যো হভিচাক শীতি"। মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্।

পরমাত্মার এই বিভুত্ব বা জীবেশ্বরের একত্ব দর্শন করিয়াই বৈদিক ঋষি গুরুগম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়াছিলেন, "তুমি বিশ্বতোমুখ তুমি স্ত্রী তুমি পুরুষ তুমি কুমার তুমিই কুমারী, তুমিই বৃদ্ধরূপে দণ্ড হস্তে বিচরণ কর, তুমিই জন্ম গ্রহণ কর"। "ব্রহ্মই ধীবর, ব্রহ্মই ভৃত্য এবং ব্রহ্মই দ্যূত-ক্রীড়ক" "এতদ্ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বা বিজ্ঞাতা নাই" "যে ইহাতে নানাত্ব দর্শন করে সে মৃত্যু অপেক্ষা ও মরণ প্রাপ্ত হয়।"+১ এইরূপ শত শত শ্রুতি বাক্যে প্রতিপন্ন হয় যে আত্মাতে স্বজাতীয় বিজাতীয়াদি ভেদ এবং বহুত্ব কল্পনা অবৈদিক, এবং ঈদৃশ ভেদ হেতু পরিচ্ছিন্ন আত্মার কালতঃ অপরিচ্ছিন্নতা বা নিত্যতা ও সিদ্ধ হয় না।

তবে এই পক্ষিদ্বয়রূপ রূপকের তাৎপর্য্য কি ? "পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণ" গ্রন্থানুসারে ফলভোক্তা পক্ষী "সত্ব" এবং দ্রষ্টা পক্ষী "ক্ষেত্রজ্ঞ"+২ এস্থলে সত্ব শব্দের অর্থ কি ? গুণ বা অন্যার্থ গ্রহণে এস্থলে অর্থ সঙ্গতি হয় না, মেদিনী মতে সত্ব শব্দের অর্থ চিত্ত, অমরকোষ অনুসারে চিত্ত অর্থ মন, এস্থলে মন বুদ্ধি চিত্তাহঙ্কার রূপ বৃত্তি চতুষ্টয় সমন্বিত অন্তঃকরণের সত্বচিত্ত বা মনার্থ গ্রহণে অর্থ সঙ্গতি হয়। "তব চিত্তং বাত ইব ব্রজীমান্" ঋগ্বেদের এই মন্ত্রভাষ্যে "তব চিত্তং মনঃ" সায়ন এই অর্থ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে অন্তঃকরণ বৃত্তি সমষ্টির মন আখ্যা দৃষ্ট হয়; সুতরাং এস্থলে সত্বশব্দের অহঙ্কারাদি বৃত্তি সমন্বিত অন্তঃকরণ বা মনার্থ গ্রহণ অসঙ্গত নহে। আত্মা নিষ্ক্রিয় এবং অহঙ্কার কর্ত্তা ভোক্তা ইহা সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত। সাংখ্য দর্শন ও "অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ" সূত্র দ্বারা অহঙ্কারেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতেছে। পরন্তু অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্ব বিবেকিজনের নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য। যিনি কর্ত্তা তিনিই কর্ম্মফল ভোক্তা, এস্থলে যিনি ফল ভোক্তা তিক্তমিষ্টাদি স্বাদ তাহারই উপভোগ্য, অপরের নহে। রামানুজাচার্য্য ভোক্তা এবং দ্রষ্টা উভয় পক্ষীর চিদ্রূপতা কল্পনা করিয়াই জীবাত্মা এবং পরমাত্মাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু পিপ্পল ভোক্তা পক্ষী বা অহঙ্কার চিদ্রূপ নহে, অহঙ্কার প্রাকৃত বা মায়িক ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত।

(ক্রমশঃ)

সোহহংস্বামী।

অভিনয়।

(গল্প)।

[১]

আষাঢ়ের অপরাহ্ন। শ্রীমান সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, তাহাদের দ্বিতলের ছাতের উপর একখানা ইজিচেয়ারে শুইয়া "ডুমার" "মন্টিক্রিষ্টো" নামক বিখ্যাত নভেল পড়িতেছিল। দিনান্তরবির শেষ কিরণটুকু তখন রাজধানীর প্রতি সৌধচূড়ায় ঈষৎ সোণালী বর্ণের আভা আঁকিয়া দিতেছিল। সুরেশচন্দ্র নভেল পড়িতেছিল আর এক একবার দিক্‌চক্রবালে রক্ততপনের ক্রমনিমজ্জনের ভঙ্গীটুকু আনমনে লক্ষ্য করিতেছিল। দেখিয়া বোধ হইতেছিল সে যেন ডুমার বিচিত্র পাশ্চাত্য প্রকৃতির অপরাহ্ন দৃশ্যের সঙ্গে প্রাচ্য সূর্য্যাস্তের কোনরূপ সৌসাদৃশ্য আছে কিনা তাহাই শুধু দেখিতেছিল। সুরেশ যখন শেষবার মস্তক উত্তোলন করিল তখন পশ্চিমদিক্‌বালে ধূসর মেঘের কোলে একটি সুচিকণ সোণালী রেখামাত্র অতি উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছিল। তন্ময় হইয়া সে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল "বন্ধু!"

সুরেশ ফিরিয়া দেখিল অমিয়া! সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল অমিয়া এস।"

অমিয়া হাসিয়া বলিল "বস্‌বার ত একখানা বই আসন দেখ্‌ছিনে। তা-না হয় এই ছাতের উপরই বসাযাক্—কি বল?"

অমিয়া হাসিতে হাসিতে উপবেশন করিল। সুরেশ বলিল "তুমি দিন দিন খুব চতুর হচ্ছ।"

অমিয়া হাসিয়া উত্তর করিল "কোন্‌দিন কম ছিলাম বন্ধু?"

সুরেশ বলিল "তা সত্যি বটে। তুমি যেন সেই আগেকার মত ছোটটীই রয়েছ। কোন পরিবর্ত্তন হয় নি!"

অমিয়া বলিল "তোমার কিন্তু খুব হয়েছে। দিন দিন গম্ভীর হয়ে পড়্‌ছ। বি, এ, পাশ দিয়েছ বলে নয়?"

সুরেশ হাসিয়া উঠিল, বলিল "বি, এ, পাশ কর্‌লে সকলকেই বুঝি গম্ভীর হতে হয় অমিয়া?"

অমিয়া বলিল "তা দেখ্‌ছি ত।"

"দেখতে পাচ্ছত, আমাদের কত চিন্তা কত ভাবনা আছে। তোমাদের ত শুধু খাওয়া আর ঘুমান।"

অমিয়া হাসিয়া বলিল "পৃথিবীর নিয়মটা বোধ হয় উল্টে গ্যাছে, না?"

"কেন?

"আমি ত জান্‌তুম যে মেয়েরাই পুরুষদের এতকাল ঐ কথা বলে আস্‌ছে। এখন যে যুগ উল্টে গ্যাছে তা'ত জান্‌তুম না।"

"যাও—তোমার সঙ্গে কথায় পেরে উঠা দায়—যেন পঞ্চমুখে আরম্ভ কর।"

অমিয়া হাসিয়া বলিল "বন্ধু! ঐ বিশেষণটা শুনেছি পৌত্তলিকদের কোন বিশিষ্ট দেবতা প্রধানের প্রাপ্য—কোন দেবীর নয়।"

"নাঃ—তোমার সঙ্গে আর কথাই বল্‌ব না।"

অমিয়া জোর হাতে কহিল "ঘাট হয়েছে বন্ধু—ঘাট হয়েছে। আর বল্‌ব না। কিন্তু আমি যে কথার জন্য এসেছি তা তোমায় শুন্‌তেই হবে তা রাগই কর আর যাই কর।"

সুরেশ মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা—করিল "কি কথা?"

"মায়ের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করেছ কেন?"

"তোমাকে কে বল্লে?"

"কেন? তিনি মার কাছে বল্‌ছেন শুনে এলুম।"

"এই দ্যাখ—আবার সকলের কাছে লাগান হচ্ছে। আমাকে আর বাসায় টিক্‌তে দেবে না দেখ্‌ছি।"

অমিয়া একটু অভিমান-মিশ্রিত স্বরে বলিল, আমরা বুঝি "সকল" হয়ে গেলুম বন্ধু—কেমন?" সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

সুরেশ দেখিল সে হঠাৎ একটা কি কথা অসাবধানে বলিয়া ফেলিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল আমায় ক্ষমা কর। আমার মনটা বড় খারাপ।"

"কেন?"

"এই দেখ্‌ছ না—রোজ বিয়ে বিয়ে করে মা আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কচ্ছেন।"

অমিয়া একটু শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "তা সত্যি ত—মাত ভারি অন্যায় কচ্ছেন! ছেলেকে বিয়ে করতে বলা যে মহাপাপ তাত তিনি জানেন না। আচ্ছা মাকে আমি বলব এখন।"

সুরেশ একটু দুঃখিত ভাবে বলিল "বিদ্রূপের কথা নয় অমিয়া—সত্যি আমার বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছে নাই।"

অমিয়া বলিল "এত আর একটা নূতন কথা নয়। তোমাদের মতন বয়সে সকলেরই মনে ঐরূপ একটা ভাব উঠে শুনেছি।"

সুরেশ একটু গম্ভীর ভাবে বলিল "আমি আমার প্রাণের কথাই বল্‌ছি অমিয়া, আমি এখন বিয়ে করব না।"

"আর তা নিয়ে মার সঙ্গে রোজ রোজ ঝগড়া করবে, কেমন?"

"তা আমি কি করব। মাকে এত বুঝিয়ে বলি কিন্তু তিনি শুন্‌বেন না।"

"কিন্তু মার মনে কষ্ট দেওয়া কি পুত্রের কাজ হচ্ছে? আচ্ছা আমায় বল্‌তে পার কেন এখন বিয়ে করবে না?"

"অন্য কোন কারণ নেই অমিয়া। আমি মনে করেছি শীঘ্রই একবার বিলেত যাব। মাকে এখনও কথাটা বলি নি। কি জানি যদি আপত্তি করে বসেন। তাই মনে করেছি একেবারে সমস্ত ঠিক করে মাকে কথাটা বল্‌ব। আগে বিয়ে কর্‌তে আমার একেবারেই ই'চ্ছে নাই। মা বল্‌ছেন যখন পড়াশুনা ছেড়েই দিলুম তখন বিয়ে থাওয়া করে একেবারে সংসার পাতিয়ে বসি। আচ্ছা, এখন তুমি বল—শুধু শুধু একটা বোঝা জঞ্জাল বাড়িয়ে লাভ কি?"

অমিয়া হাসিয়া বলিল "আচ্ছা সে যাতে জঞ্জাল না হয় তার উপায় শ্রীমতী অমিয়া দেবী নিজে করবে—প্রতিশ্রুত হচ্ছে।

"না—না তর্ক করো না—অমিয়া। এখন আমায় একটা পরামর্শ দাও। কি করে মাকে ঠাণ্ডা রাখা যায় তাই বল।"

অমিয়া মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য আনিয়া বলিল "তাড়াতাড়ি একটা জঞ্জাল, যেখান থেকে পার, টেনে এনে ঘরে তুলে নাও।"

সুরেশ না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল "পাগল কোথাকার—যেমন আমি তেমন আমার মন্ত্রী।"

দুই জনেই চুপ করিল। কতক্ষণ পরে সুরেশ বলিল "অমিয়া একটা কথা শুন্‌বে।"

অমিয়া কুতূহলী হইয়া সরিয়া আসিল।

সুরেশ এদিক সেদিক চাহিয়া বলিল "আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না?

"কি ?"

"তুমি যদি কিছু মনে না কর—

"কি—বল ?"

সুরেশ অমিয়ার হাত দুটি ধরিয়া বলিল "বল তুমি কিছু মনে কর্‌বে না ?"

"আচ্ছা বল।"

সুরেশ একবার অমিয়ার দিকে, একবার উপরের দিকে চাহিল তারপর বলিল "তুমি আমাকে বাঁচাতে পার। মাকে ও দিন কতকের জন্য ঠাণ্ডা রাখ্‌তে পার।"

"কি করে ?"

সুরেশ একটু ঢোক্ গিলিয়া বলিল "আমি মাকে একরকম করে জানাব যে তোমাকেই আমি বিয়ে কর্‌ব। তবে কয়েকটা দিন একটু দেখ্‌ছি এই যা দেরী। অবশ্য বুঝতেই পাচ্ছ মাকে একটু ভুলানো বই কিছুই নয়।"

অমিয়া বলিল "না না লোকে কি ভাব্‌বে বন্ধু। আমার ভারি লজ্জা কর্‌বে।"

সুরেশ বলিল "অস্বীকার করো না বন্ধু! আর এত আমরা দুনিয়া ছাড়া একটা কাজ কচ্ছি না। কি বল ?"

অমিয়া কতক্ষণ কি চিন্তা করিল, তারপর বলিল "বেশ একটা অভিনয় হয় বটে কিন্তু ভারী বেহায়া হতে হবে যে! যা না তাই বলে—ছি—ছি—কেমন জানি মনে হয়।"

সুরেশ বলিল "কিছু না! তুমি আমাকে চিঠি লিখবে—আমিও তোমাকে চিঠি লিখ্‌ব—বেশ প্রণয়-সম্ভাষণ করে সকলকে জানিয়ে দেওয়া যে তুমি আমার ভাবী পত্নী। মাও একটু ঠাণ্ডা থাকবেন আর আমিও—তা হলে বেঁচে যাই। তুমি এই অভিনয় কর্ত্তে খুব ভাল পারবে। কেমন ?"

অমিয়া হাসিয়া বলিল "পার্‌বত। কিন্তু লজ্জাটাকে রাখি কোথা ?"

সুরেশ বলিল "বন্ধুর এই আব্দারটা তোমার রাখতেই হবে। কিন্তু একটা কথা। এখন যেমন তুমি আমাকে তোমার মনের কথা লুকাচ্ছ না, পরেও কিন্তু পারবে না। যেদিন তুমি তোমার প্রকৃত ভালবাসার পাত্রের সন্ধান পাবে সেই দিনই কিন্তু আমাকে জানাবে। আর সমস্ত চিঠিগুলি আমাকে ফেরত দিবে।

৩—

অন্যান্য ভার আমার উপর রইল। রাজি? অবশ্য তোমার উপর আমি অনেক উপদ্রব কচ্ছি।"

অমিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "খুব রাজী—বন্ধু—খুব রাজী। তবে কি জান? এবার যে সেকেণ্ডইয়ার। একেত "লজিক্‌টা মাথায় ঢুক্‌তে চায় না। তার উপর প্রণয়ের বানে সব না ভেসে যায়।"

দুই বন্ধুতেই হাসিয়া উঠিল। সুরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল "তুমি যে চঞ্চল —তোমার কাজ নয় লজিক পড়া"।—

তবে মাঝে মাঝে যেয়ে তুমি "লজিকটা" একটু বুঝিয়ে দিয়ে এস। দেখি —প্রণয় কাব্যির সঙ্গে সঙ্গে যদি এই কটমট "সাবজেক্ট" টা একটু সরস হয়ে উঠে।"

সুরেশ—হাসিতে হাসিতে বলিল "আচ্ছা—আচ্ছা। কিন্তু সাবধান সব যেন আবার ফাঁক করে দিও না।"

অমিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল "আচ্ছা সেজন্য তুমি কিছু ভেবনা। এখন তা হ'লে যাই—সন্ধ্যা হয়ে গেল।"

সুরেশ বলিল "একটু দাঁড়াও।" সে আসিয়া পার্শ্বস্থ টব হইতে একটী আধ ফুটন্ত নাইটকুইন ছিঁড়িয়া বলিল "এই নাও আমার ভালবাসার প্রথম উপহার।"

অমিয়া সুরেশের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর ফুলটি লইয়া বলিল "সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলুম।"

অমিয়া ফুলটি বুকে পরিল, তারপর দুইজনে হাসিতে হাসিতে নীচে নামিয়া গেল।

[২]

সুরেশ অমিয়ার বন্ধু। শৈশব হইতেই তাহাদের এই বন্ধুত্ব। সুরেশের পিতা উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অমিয়ার পিতা রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন। দুইজনেই এক সময়ে নব্যধর্ম্মে দীক্ষিত হন। দুই জনেরই অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। কাজেই এই দুই পরিবারের মধ্যে ও বেশ একটা ঘনিষ্টতা সংস্থাপিত হইয়াছিল।

কিন্তু তাঁহারা বেশী দিন এই পার্থিব সুখ ভোগ করিবার অবসর পান নাই। দুরন্ত কলেরা রোগ একবার মহানগরী পরিভ্রমণের সময় উমেশ বাবুকে কুক্ষিগত

করিয়া চলিয়া গেল। রজনীকান্তকেও বেশী দিন বন্ধু-বিরহ সহ্য করিতে হইল না। দুই বৎসর পরে তিনিও জ্বররোগে মর্ত্ত্য-লীলা সাঙ্গ করিয়া বন্ধুর অনুগামী হইলেন। তখন অমিয়ার বয়স সাত সুরেশের দশ, তাঁহাদের মৃত্যু দুই বিধবাকে যেন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তুলিল। তাঁহারা আত্মীয় স্বজন-হীন এই পৃথিবীতে পরস্পরকে নির্ভর করিয়া রহিলেন।

অমিয়া—বাল্যকাল হইতেই সুরেশকে "বন্ধু" বলিয়া ডাকিত। ক্রমে বাল্যের এই বন্ধুত্ব প্রকৃত বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। একটা অনাবিল স্নেহ ও ভালবাসা দুইটি হৃদয়কে এক করিয়া তুলিয়াছিল। বড় হইয়াও তাহারা পরস্পরকে বন্ধু বলিয়া ডাকিত। যৌবনের প্রভাব তাহাদের এই বন্ধুত্বের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই। তাহাদের মনে বন্ধুত্বের ভাব ছাড়া অন্য কোন ভাব মুহুর্ত্তেকের জন্যও কোন দিন উঁকি দেয় নাই। প্রণয় চক্ষে তাহারা কোন দিনই কাহাকেও নিরীক্ষণ করে নাই। তাই আজ এত সহজে সুরেশ অমিয়ার নিকট ঐ কথা বলিতে পারিয়াছিল। আমোদ-প্রিয়া অমিয়া ও সুরেশের কথামত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

দুইদিন পরে সুরেশের মাতা সুরেশের সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইবার পর তাহার পড়িবার ঘরের টেবিলের উপর একখানা পত্র পাইলেন। পত্রে লেখা ছিল—

হৃদয় দেবতা আমার!

তোমার পত্র পাইলাম। সত্যি আমি ভাবি নাই যে আমাদের পরিণাম শেষে কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে। তুমি আজ আমার চোক্ খুলিয়া দিয়াছ। প্রাণাধিক! এখন আমাদের উপায় কি? আমি ত কোন কর্ত্তব্যই খুঁজিয়া পাই না। আমার অবস্থা এখন যে কি প্রকার তাহা বলিতে পারিনা। আমি তোমার উপর সমস্ত ভার দিলাম। তুমিই আমাকে রক্ষা করিও।—ইতি

তোমার স্নেহের অমিয়া।

পত্রখানা দেখিয়া সুরেশের মাতার একটু সন্দেহ হইয়াছিল। কিন্তু পত্রখানা পাঠ করিবামাত্র তাহার সে সন্দেহ দূর হইল। তিনি হাসিলেন, ভাবিলেন এই জন্যই বুঝি সুরেশের বিবাহে এতটা অনিচ্ছা।

অমিয়ার মাতাও হঠাৎ একদিন অমিয়ার টেবিলের উপর একখানা

"সোণারতরী" বই পাইলেন। তাহার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখাছিল—"আমার অকৃত্রিম প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ কুমারী অমিয়া মুখোপাধ্যায়কে প্রদত্ত হইল—
"সুরেশ"।

অমিয়ার মাতা সেই দিনই সুরেশের মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

দিন যাইতে লাগিল। অমিয়া ও সুরেশের ডেস্ক ও পত্রে বোঝাই হইতে লাগিল। শুধু পত্রেই ক্ষান্ত নয়। পরস্পর দেখা হইলেও সেই কৃত্রিম অনুরাগ প্রদর্শন চলিতে লাগিল। ক্রমে এই পত্র লেখা ও অভিনয় একটা নেশার মতন হইয়া দাঁড়াইল। উপরে বিধাতা হাসিলেন।

[৩]

শারদীয়া—পূজা আসিয়াছে। সুরেশ তাহার কয়েকটি সমপাঠীর সঙ্গে স্থির করিয়াছে এবার বোম্বাই বেড়াইতে যাইবে। সে জিনিষ পত্র কিনিয়া আনিয়া বাসায় আসিতেই মা বলিলেন "সুরেশ! আজ রাত্রিতে অমিয়দের ওখানে তোর নিমন্ত্রণ হয়েছে। অমিয়ার মা বারবার বলে পাঠিয়েছেন যাস্ কিন্তু।"

সুরেশ সুবোধ ছেলের মত উত্তর করিল "আচ্ছা।"

সন্ধ্যার পর সুরেশ অমিয়াদের বাসায় উপস্থিত হইল। অমিয়ার মাতা বলিলেন "যাও বাবা এঘরে যেয়ে বসগে। অমিয়া! সুরেশ এসেছে। যাও বাবা! আমি লুচি ক'খানা ভাজিগে। অমিয়ার মাতা চলিয়া গেলেন।

অমিয়া তাহার পড়ার ঘরে বসিয়া একখানা বহির পাতা উল্টাইতেছিল সুরেশ ঘরে ঢুকিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাসিমুখে বলিল "এস বন্ধু এস,"

সুরেশ বলিল "ইস্, আজ যে বড় ঘটা দেখছি।"

অমিয়া একটা বিদ্যুৎবর্ষী কটাক্ষ হানিয়া বলিল "ঘটা করবনা? ভাবী স্বামীর মনত একটু ভুলানো চাই।

সুরেশ হাসিয়া বলিল "বেশ এই রকমই চাই।"

অমিয়া বলিল "কোথায়ও কিছু খুঁত পাবেনা বন্ধু।"

সুরেশ একটু কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া বলিল 'চুপ—জান এখন আমি আর তোমার সেই বন্ধু নই?"

অমিয়া সুরেশের কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল "জীবনবন্ধু! হৃদয়—সর্ব্বস্ব কেমন?"

সুরেশ হাসিয়া উঠিল বলিল "ঠিক বলেছ ঠিক। ইঃ তুমি যে বড্ড ঘেমেছ। সে এস্তে পকেট হইতে সুগন্ধি এসেন্স মাখানো একখানা সুন্দর রুমাল বাহির করিয়া অমিয়ার মুখখানা মুছাইয়া দিল। অমিয়া হাসিয়া 'বলিল' দূর।

সুরেশ বলিল "আচ্ছা—দূরেই যাই।' সে যাইয়া টেবিলটার উপর বসিয়া রুমালখানা ভাল করিয়া খুলিয়া একমনে দেখিতে লাগিল। অমিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল "কি ভাবছ জীবিতেশ্বর?"

সুরেশ বলিল "ভাবছি রুমালখানা আমার হৃদয়েশ্বরীর মনোমত হবে কিনা।"

অমিয়া রুমালখানি ধরিয়া বলিল "সত্যি আমার জন্য এনেছ প্রিয়তম! এত ভালবাস?"

সুরেশ ও অমিয়ার স্বরের অনুকরণ করিয়া বলিল "সত্যি তোমার জন্য প্রিয়ে! তোমায় এত ভালবাসি।"

দুইজনেই হাসিয়া উঠিল। অমিয়া বলিল "তারপর বন্ধু! বোম্বাই যাচ্ছ কবে?"

সুরেশ বলিল "কাল রাত্রির মেলে—সব কেনা হয়ে গ্যাছে।"

"এত শীগ্‌গির?"

"হাঁ আমাদের সকলেরই মত হয়েছে।"

অমিয়া হাসিয়া বলিল "দেখো বন্ধু। এবার বিরহের পালাটা কিরকম অভিনয় করি। খুবই চমৎকার হবে এখন।"

সুরেশ বলিল "একটু বেশী করে বরফ টরফ খেও। দেখ আবার শুকিয়ে যেওনা যেন।"

অমিয়া বলিল "ইস্—যাব না আবার! ঘন ঘন মূর্চ্ছ যাব প্রাণনাথ! প্রাণনাথ! বলে দীর্ঘঃনিশ্বাস ফেল্‌ব আরো কত কি করব দেখে নিও।"

সুরেশ হাসিয়া বলিল "তা তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। কিন্তু নিয়মিত চিঠি লিখ—বুঝলে?" আমারওত আবার দীর্ঘ বিরহের দিনগুলো কাটানো চাই।

"লিখ্‌ব বন্ধু খুব লিখ্‌ব। রোজ একখানা করে। তা সেখানেও কি ঐ রকম প্রেম পত্র পাঠাতে হবে?

"না গো না। ওখানে আর ওসবের দরকার নেই। আমার মতলব শুধু এদের ফাঁকি দেওয়া বইত নয়।

"আচ্ছা, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যেন খবর পাই।"

"তা নিশ্চয়। প্রবাসে যে তোমার—চিঠি ক'খানাই একমাত্র সম্বল হবে।"

এমন সময় বাহির হইতে মাতা ডাকিলেন "অমিয়া সুরেশকে নিয়ে আয়। আসন হয়েছে।"

[৪]

প্রাণে একটা মহাশূন্যতা বহন করিয়া সুরেশ বোম্বাই আসিল। একটা প্রবল স্ফূর্ত্তি লইয়া সে বাহির বাহির হইয়া পড়িয়াছিল বটে কিন্তু সে স্ফূর্ত্তি যেন দিন দিন কমিয়া আসিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সে অনাবশ্যক গম্ভীর হইয়া পড়িতে লাগিল। বন্ধুরা বলাবলি করিতে লাগিল "এপোলো হারবারের সাইট দেখে সুরেশের মাথা ঘুরে গ্যাছে। দেখিস্ রে আমার দুচার খানা কাব্য লিখে ফেলিস্ না।" 'সুরেশ জোর করিয়া হাসিয়া বলিত না রে না আমার উপর বাগ্‌দেবীর অতটা কৃপা হবে না।' সে মুখে এই কথা বলিত বটে কিন্তু অন্তরে যেন কি একটা রুদ্ধ বেদনা সমস্ত ধৈর্য্য ছাপিয়া আকুল উচ্ছ্বাসে সময় সময় বক্ষ ভেদিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিত। সুরেশ শত চেষ্টা করিয়াও সেটাকে থামাইতে পারিতেছিল না। দূরে আসিয়া তাহার নিজের কাছে ধরা পড়িবার যোগার হইল।

সে ভাবিল "সত্য সত্যই কি আমি যাহা সন্দেহ করিতেছি তাহাই সত্যে পরিণত হইতে চলিল। আমি কি শেষে নিজের কাছেই ঠকিলাম। মায়ের সঙ্গে চালাকী করিতে গিয়া কি শেষে নিজেই বোকা বনিলাম। আর অমিয়াই বা ভাবিবে কি? সে যখন রহস্য করিয়া বলিবে "ওগো বন্ধু! তুমি এমন! এই তোমার মনের জোর! "ছিঃ ছিঃ নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছি। কিন্তু প্রাণান্তেও অমিয়াকে একথা আমি জানিতে দিব না। সে অমিয়াকে লিখিল :—

বন্ধু!

এখানে এসে দিনগুলো কাটছে মন্দনয়। সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখে দেশটাকে আর ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না। মনে হয় চিরদিন এখানেই যেন থাকি। রোজ সমুদ্রে স্নান আর নৌকায় বেড়ান সে খুব স্ফূর্ত্তি বন্ধু। তুমি কেমন আছ? বিরহের দিনগুলো কাটছে কেমন? শুকিয়ে যাচ্ছ না ত? আমার কিন্তু

বিরহের জ্বালায় এত ক্ষুধা বেড়ে গ্যাছে যে হোটেলওয়ালা বলেছে আমাকে নাকি ডবল চার্জ্জ দিতে হবে। শীগ্‌গির করে উত্তর দিও। আমি ভাল আছি। আসি তবে। ইতি—

তোমার—সুরেশ।

অমিয়া তাহার উত্তর লিখিল—

তোমার পত্র পেয়ে ভারি খুসী হলাম বন্ধু! তোমার বিরহে এমন শুকিয়ে গেছি যে মা বল্লেন আমার হাতের চুড়ীগুলো নাকি বদ্‌লে গড়াতে হবে হাতে আর যায় না। তোমার কথা যখন মনে হয় তখনই লজিকটা নিয়ে বসি। এক একদিন পোনের ষোল পাতা পড়ে ফেলি। ভারি মজার বিরহ কিন্তু বন্ধু। আমি ভাল আছি। তুমি ভাল আছ ত? "প্রিয়তম" বলে সম্বোধন কর্‌লুম না বলে রাগ কর্‌বে না ত? ইতি—

তোমার—স্নেহের অমিয়া।

যথা সময়ে সেই চিঠি সুরেশের হস্তগত হইল। ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুকের মতন সে একটি একটি করিয়া প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিল কিন্তু কোন খানেই ব্যঙ্গের প্রচ্ছন্নতার মধ্যে একটা অনাবিল স্নেহছাড়া আর কিছুই সে খুঁজিয়া পাইল না। সুরেশ ভাবিল এই চিঠির উত্তর সে কি দিবে? নূতন করিয়া আর কি লিখিবে? অবশ্য রহস্যের ছলে দুই একটা বাজে কথা নূতন ভাবে লেখা যায় বটে কিন্তু তাহাও আর কতদিন? আর সে এই মিথ্যা রহস্যের আবরণে নিজেকেই বা কতদিন লুকাইয়া রাখিবে? যদিই বা কোনদিন ধরা পড়িয়া যায়। যে চতুরা সে। সুরেশ ভাবিল "দূরছাই আর ঐ দিক দিয়াই যাইব না। সহজ ভাবেই পত্রাদি লিখিব।" বোঝার উপর বোঝা চাপাইয়া বিশ্বাসঘাতক হৃদয়ের গুপ্ত কামনা-স্ফুলিঙ্গটাকে চাপা দিবার জন্য সে ৩।৪ পাতা শুধু "আপেলো বন্দর" "এলিফেণ্টা কেভ" "ম্যান্ অব ওয়ার" প্রভৃতির কথা-তেই ভরিয়া ফেলিল কিন্তু তবু তাহার তৃপ্তি হইল না শেষে সুরেশ একটা বড় রকমের মিথ্যা কথা চিঠির মধ্যে লিখিয়া আশান্তির নিশ্বাস ফেলিল। সে লিখিল—

বন্ধু! একটা বড় মজার কাণ্ড হয়ে গ্যাছে। সে দিন নৌকায় করে সমুদ্রে "সান্‌সেট্" দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। সে কি সুন্দর দৃশ্য বন্ধু আমি জন্মেও

ভুলব না। সূর্য্যটা যে এত বড় দেখাতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। পশ্চিম দিকের আকাশটা একেবারে সিঁদুরের মত লাল হয়ে গিয়েছিল। সমুদ্রের গাঢ় নীল জলের মধ্যে সেই লাল রং মিশে যে কি শোভাই হয়েছিল সে দৃশ্য বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্য্যটা কেমন আস্তে আস্তে জলের ভিতর নেবে যাচ্ছে তাই দেখিতেছি এমন সময় আমার সমপাঠী রমেশ (যে বিলেত যাওয়ার ফন্দিটা আমার মাথায় ঢুকিয়েছে) আমাকে বল্লে "সুরো! পিছন দিকে চেয়ে দ্যাখ্। "আমি পিছনে চাইলুম। সে আরও এক চমৎকার দৃশ্য বন্ধু। আমাদের প্রায় বিশ হাত দূর দিয়ে একখানা নৌকা আস্তে আস্তে ভেসে যাচ্ছিল। তার ছাদের উপর পনের বছরের একটি মেয়ে গুটি দুই তিন ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে বসে আছে। মেয়েটি খুব সুন্দরী। তার মুখখানা পশ্চিম দিকে ফেরান ছিল। আবক্ষ নিমজ্জিত তপনের রক্ত কিরণগুলি তার চোখে মুখে পড়ে তার রূপটা যেন আরও খুলে দিয়েছিল। সত্যি কথা বল্‌তে কি বন্ধু আমি যদি কবি হতুম তবে তখনি একটা মস্তবড় কবিতা লিখে ফেলতুম্। এখন কাণ্ডটা হয়েছে কি জান? সান্‌সেট্‌টা আমার ভাল লেগেছিল বলে আমি প্রায়ই সমুদ্রে বেড়াতে যাই। কিন্তু রমেশটা সকলকে আমার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে। ওরা বলে আমি নাকি মেয়েটার প্রেমে পড়ে গিয়েছি! আচ্ছা, বল দেখি বন্ধু! কোথাকার কোন্ মেয়েনামজানি না জাত জানিনা একমিনিটের দেখা আর অমনি প্রেমে পড়ে গেলাম! আমারত হাসির চোটে দম কেটে যাবার যোগাড় হয়েছে। ওদের জ্বালায় দেখ্‌ছি সমুদ্র-ভ্রমণটা ছেড়ে দিতে হবে; বসে যদি কখনও একটু চুপ করে থাকি তবে কেউ না কেউ এসে কাণের কাছে গাইতে থাকে—'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।' দেখ দেখি কি অন্যায়? চিঠিখানা বড্ড বড় হয়ে গেল নয়? 'তবে আজ এই পর্য্যন্ত। এখন যাই। ভাল আছত?"

ইতি তোমার সুরেশ।

একটু বিলম্বে চিঠির উত্তর আসিল। অমিয়া লিখিয়াছে—

বন্ধু! তোমার চিঠি ঠিক্ সময়েই পেয়েছি। কিন্তু উত্তর দিতে একটু দেরী হয়ে গেল বলে রাগ করোনা। অবশ্য দেরী হবার কারণটি তোমায় বলছি বন্ধু। আমার একটি আত্মীয় পুত্র আমাদের এখানে এসেছেন। দেখ্‌তে বেশ বন্ধু।

খুব ভাল গাইতে পারেন। এবার নাকি তিনি এম্, এ দেবেন। তাঁকে নিয়েই মহা মুস্কিলে পড়েছি। কোথায় "জু" কোথায় মিউজিয়াম, কোথায় "পরেশ নাথের মন্দির", একেবারে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে গেছি। একটুও অবসর পাইনা। যেতে না চাইলেই মহামুস্কিল। এমন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আর এমনভাবে অনুরোধ কত্তে থাকে যে কিছুতেই তার অনুরোধ এড়াতে পারি না। আজ রবিবার কোথায় বেড়িয়েছেন তাই এই ফাঁকে তাড়াতাড়ি তোমাকে চিঠিখানা লিখে ফেলছি। বলে গিয়েছেন বিকেল বেলা "ইডেন গার্ডেনে" হাওয়া খেতে যাবেন। আবার আমার সঙ্গে না গেলে নাকি চলবেনা। কি আপদ!

এবার বিরহের কথা লিখনি কেন? সমুদ্রের 'জলো" হাওয়ায় প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়েগ্যাছে নাকি বন্ধু? তোমাকে যে রমেশ বাবুরা ক্ষ্যাপাচ্ছেন শুনে দুঃখিত হলুম। আমি সামনে থাক্‌লে তোমার পক্ষ নিতুম নিশ্চয়। আমার বিরহত বুঝতেই পাচ্ছ বন্ধু। ঐ ভদ্রলোকটি বাসায় না থাক্‌লে হয়ত দুই একবার মূর্চ্ছাও যেতুম। কিন্তু তাঁর সামনে লজ্জা করে। তুমি কেমন আছ? যে দিন চিঠি পাবে সেইদিনই উত্তর দিও। আমার দেরী হয়েছে বলে তুমি রাগ করে দেরী করোনা। আমি ভাল আছি—ঐ সিড়ীতে তাঁর পায়ের শব্দ শুনছি। বিদায় বন্ধু। আজ আর নয়।

ইতি তোমার স্নেহের অমিয়া।

বম্বেমেল যথা সময়ে সেইপত্র আনিয়া সুরেশের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াগেল। সুরেশ সেইপত্র পড়িল। তাহার হৃদয়ের ধূমায়িত অগ্নি যেন আজ ঈর্ষার বাতাসে সহসা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে টুকরা টুকরা করিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া খণ্ডগুলি রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবিল "আমি কি নির্ব্বোধ কি দুর্ব্বল চিত্ত! সে যদি সেই দুদণ্ডের চেনা মানুষটির মিষ্টকথা এবং সঙ্গলাভের জন্য আমাদের এতকালের বন্ধুত্ব এমন করিয়া ভুলিয়া যাইতে পারে যে আমার নিকট চিঠি লিখিতে ও এখন তাহার অবসর খুঁজিয়া লইতে হয় তবে নাই বা পাইলাম তাহার চিঠি। তাহার সাহস এতটুকু ও নেই। থাকুক সে তাহার নূতন সঙ্গীর মিষ্টি গান, মিষ্টি কথায় ডুবিয়া আমি সাম্‌নে গিয়া তাহার এ সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিবনা। আমি দূরেই থাকিব।

সুরেশ লিখিল—

বন্ধু!

তোমার চিঠি এইমাত্র পেলেম। আমি রাগকরি নাই তাহার প্রধান সাক্ষী আজই তোমাকে পত্র লিখছি। কিন্তু বেশী কিছু লিখতে পার্‌লেম না। মাপ করো। দুদিনের জন্য এক যায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি তারই যোগার যন্ত্র হচ্ছে। তাই ভারি ব্যস্ত। যদি ইতিমধ্যে অবসর পেয়ে পত্র পাঠাতে চাও তবে এই ঠিকানায়ই পাঠিও। ভাল আছি, বেশ ভাল আছ শুনে সুখী হলুম। ইতি—

তোমার বন্ধু সুরেশ।

বোম্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়া সুরেশ অমিয়াকে ভুলিতে চেষ্টা করিল। পুরাতন দৃশ্যগুলি আবার সে ভাল করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। এটা সেটা করিয়া মনটাকে সে সর্ব্বদাই অন্যদিকে নিয়োজিত করিতে প্রয়াস পাইল কিন্তু হায়! সবই বৃথা। সে যতই চেষ্টা করিয়া তাহার স্মৃতি হইতে অমিয়াকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে চায় ততই যেন তাহার হাসিমাখা মুখখানি সুরেশের অন্তরে স্পষ্টতর হইয়া উঠে। কিছুতেই সে শান্তি পাইতেছিল না। এক একবার একটা আকুল আগ্রহ তাহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে সশব্দে সাড়াদিয়া উঠে কিন্তু তখনই সে প্রাণপণে সেটাকে দমন করিয়া ফেলে। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সুরেশ ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িল।

প্রায় দিন দশেক পরে অমিয়ার একখানা চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরেশ কম্পিত হস্তে চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিল। অমিয়া লিখিয়াছে—

"বন্ধু! শৈশব বন্ধু আমার! আজ আমার জীবনের এক মহাসমস্যা উপস্থিত, জীবনে তোমার কাছে কিছুই লুকাই নাই বন্ধু। অকপটে সকলই প্রকাশ করিয়াছি। তোমার কাছে আমার লজ্জা নাই সঙ্কোচ নাই। তাই এত সহজে কথাটা লিখিতে পারিতেছি। বন্ধু! মনে পড়ে তুমি কি বলিয়াছিলে? আমার প্রকৃত ভালবাসার পাত্রের সন্ধান পাইলে তোমাকে জানাইব। তাই আজ কম্পিত হৃদয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি। বন্ধু আমার! এখন আমাকে অঙ্গীকার মুক্ত কর। তোমার ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা হউক। আমায় মুক্তি দাও।

ইতি—

তোমার শৈশব-সঙ্গিনী অমিয়া।

পত্র পড়িয়া সুরেশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার হৃদয়ের স্পন্দন যেন থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল। সে সবলে দুইহাতে বুক চাপিয়া ধরিল। হায়! তাহার আশা কি তবে একেবারেই গেল? সে ভাবিয়া কোন কূলই পাইল না। সে আবার ভাবিল কলিকাতা ছাড়িয়া সে কি ভুলই করিয়াছে। যদি সে কলিকাতায় থাকিত তবে বুঝি এত সহজে অমিয়া তাহার বুকে এই শেলাঘাত করিতে পারিত না। এত সহজে কেহ তাহাকে কাড়িয়া লইতে পারিত না। কিন্তু এখন কি আশা নাই। এখন কি কলিকাতায় যাইয়া সে অমিয়ার মন ফিরাইতে পারিবে না? সে যাইয়া—অমিয়ার হাত ধরিয়া বলিবে "অমিয়া অমিয়া আর আমি অভিনয় করিতেছিনা। আমি সত্য সত্যই তোমাকে ভালবাসি প্রাণের সহিত ভালবাসি তবু কি সে শুনিবে না? এত বড় পাষাণী কি সে হইতে পারিবে? সুরেশ চিন্তা করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে সে বলিল "না আমি যাইব। মান অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিব। সে তৎক্ষণাৎ বন্ধুদের যাইয়া বলিল এক প্রয়োজনীয় চিঠি আসিয়াছে। এখনই তাহাকে এলাহাবাদ যাইতে হইবে।

মাতা সুরেশের শুষ্ক এবং বিবর্ণ মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে পুত্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরেশ একটু ক্ষীণহাসি হাসিয়া বলিল "না মা অসুখ কিছুই নয়। ট্রেনে এত ভীড় হয়েছিল যে ২।৩ রাত ঘুমুতেই পারি নাই। তাই শরীরটা একটু খারাপ। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি কিছু খাবার যোগাড় কর। মাতা চলিয়া গেলেন। সুরেশ হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

অপরাহ্নে সুরেশ অমিয়াদের বাসায় যাইবার সঙ্কল্প করিয়া বেশভূষা করিল। একবার শেষ চেষ্টাই তারপর হৃদয়-প্রতিমাকে ইহকালের জন্য বিস্মৃতির অতল জলে বিসর্জ্জন। সুরেশ দ্রুতপদে বাসার বাহির হইয়া গেল।

প্রথমেই অমিয়ার মাতার সঙ্গে সুরেশের দেখা হইল। তিনিও সুরেশের বিবর্ণ মুখ দেখিয়া সাগ্রহে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরেশ অন্য কোন সময় এই প্রশ্ন শুনিলে হয়ত খুব লজ্জিত হইত। যাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে সেই এই প্রশ্ন করিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার প্রাণের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে এই সব চিন্তা তাহার মনেও স্থান পাইল না। সুরেশ কোন রকমে মুখে হাসি আনিয়া

বলিল "এই কয়টা দিন খুবই ঘুরেছি। শরীরটাকে একটুও বিশ্রাম দেই নি। তাই শরীরটা একটু খারাপ।"

তিনি বলিলেন "যাও বাবা উপরে বসগে। অমিয়া বোধ হয় ছাদে বেড়াচ্ছে।

সুরেশ দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া পড়িল। সে দেখিল ছাদের প্রাচীরের উপর মাথা রাখিয়া অমিয়া আনত নয়নে যেন কি চিন্তা করিতেছে। সুরেশ আকুল কণ্ঠে ডাকিল অমিয়া—!"

অমিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার আনন হাস্য বিকশিত হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া সুরেশের হাত ধরিল, বলিল "বন্ধু! এসেছ।"

সুরেশ উত্তর করিল "হাঁ এসেছি"—"বন্ধু" কথা উচ্চারণ করিতে তাহার জিহ্বা যেন আজ আর সরিল না।

অমিয়া সুরেশের হাত ধরিয়া ছাদের এক পাশে টানিয়া লইয়া গেল। আস্তে আস্তে বলিল "এত শুকিয়ে গেছ কেন বন্ধু?"

সুরেশের স্বর কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল "বিশেষ ভাল ছিলাম না।"

অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন বন্ধু? এই না তুমি লিখেছিলে বেশ সুখেই দিন যাচ্ছে। এযায়গা সে যায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছ এমন কি দুটি লাইন চিঠি লিখবার অবসর পর্য্যন্ত ও হয় না। তা হঠাৎ এত মন খারাপ হল কেন?"

একটা বড় রকমের মর্ম্মন্তুদ বাণী সুরেশের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু সে অতি কষ্টে চিত্তবেগ দমন করিয়া একটু ক্ষীণ হাসিয়া বলিল "সকল সময় যে মন একরকম থাক্‌বে তার কি কোন মানে আছে? তুমি ত বেশ সুখে ছিলে তবে এত শুকিয়ে গেছ কেন?"

অমিয়াও একটু হাসিয়া বলিল "পরাধীন যে তার সুখ কোথায় বন্ধু?"

সুরেশ একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল "বাহাদুর সে লোক যে তোমাকে এত সহজে জয় কল্লে।"

অমিয়া হাসিয়া বলিল "কিছু বাহাদুরী নয় বন্ধু। যে ধরা দিতে চায় তাকে ধরতে ত সকলেই পারে। তাতে আবার বাহাদুরী কি?"

সুরেশ ভাবিল "অমিয়া কি পাষাণী! এত সহজে সে কথাগুলি বলিয়া ফেলিতে পারিতেছে? এতদিনের আলাপ এতদিনের পরিচয় কি এত শীঘ্র সে ভুলিল! সুরেশ বলিল "অমিয়া! একটা কথা বল্‌ব তুমি যদি রাগ না কর।"

"কি?"

"তুমি এত সহজে—"

"কি কর্‌ব বন্ধু বল। এতদিন জীবনটা বেশ খেলার ছলে কেটে যাচ্ছিল মন্দ নয়—কোন চিন্তা ভাবনা ছিল না। কিন্তু একদিন হঠাৎ যখন জাগিলাম তখন চেয়ে দেখি যে আমার সব বিলিয়ে দিয়ে বসে আছি। তখনকার অবস্থাটা একবার ভাবত বন্ধু। আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়লুম। যাকে সামনে—মনের মধ্যে পেলুম তাহাকেই আশ্রয় করে এ সংসারে দাঁড়াতে চাইলুম।"

"তবু অমিয়া—তাকে কি একবার ভাল করে দেখা উচিত ছিল না? সে আশ্রয় তোমার উপযুক্ত কিনা তাও ত একবার দেখা উচিত ছিল।"

"ভাব্‌বার আর সময় পেলাম কোথায় বন্ধু? সে যে একরকম জোর করে—"

সুরেশ উত্তেজিত ভাবে বলিল "না—না-তা হতে পারে না। অতটা দুর্ব্বল চিত্ত হইও না। একজন অপরিচিতের পায়ে অমন করে জীবনটা বলি দিওনা।"

অমিয়া বাধা দিয়া বলিল "তোমার ভুল বন্ধু। সে খুব পরিচিত।"

"খুব পরিচিত? কে সে অমিয়া?

"সে—"অমিয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিল। সুরেশ দৃঢ়রূপে তাহার হস্ত ধরিয়া অনুনয়ের স্বরে বলিল "সে কে অমিয়া আমি জান্‌তে চাই—এই আমার শেষ অনুরোধ" বল, বল অমিয়া বল, কে সে।

অমিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "সে তুমি—বন্ধু। আর আমি এ অভিনয় কর্ত্তে পারি না। আমায় বাঁচাও এ লজ্জা থেকে তুমি আমায় মুক্ত কর।"

শ্রীযামিনীমোহন সেন।

শেষ পত্র।

(১১)

দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন মানুষ বিচারনিষ্ঠ সচেতন জীব। কিন্তু সকল সময়ে উক্ত উক্তির যাথার্থ্যতা স্বীকার করা যায় না। বীচি-বিক্ষোভ-চঞ্চল জলধির মত মানুষের হৃদ্বোধ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। এই সচেতন বিচারনিষ্ঠা নভবিম্বিত সমুদ্রের মতনই প্রতিচ্ছায়াময়, স্নেহ প্রেম আকাঙ্ক্ষার সপ্ত রশ্মির ভিতর দিয়া যে সূর্য্য কিরণ তাহার চিত্তাকাশে প্রতিভাসিত হয়, তাহারই অনুরঞ্জনে তাহা অনুরঞ্জিত,বিলোপে তিমিরাবলুপ্ত হয়। তাহার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয় যখন একটি কামনার অখণ্ডিত শিখায় সকল চেতনার উর্দ্ধে প্রোজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া ওঠে, তখন তাহার তলবর্ত্তী সমস্ত স্থান তাহার অপরিহার্য্য ছায়ায় অন্ধকার হইয়া যায়।

প্রিয়তমা এই প্রদীপ্ত নবানুরাগ বর্ত্তিকার নিম্নবর্ত্তী অন্ধকারে অন্ধবৎ দিনাতিপাত করিতেছিল, সহসা কান্তমণির আবির্ভাব তাহার আলোকিত মনোজগতের রশ্মিজাল তাহার চেতনার তলবর্ত্তী অন্ধকারের উপর প্রতিফলিত করিল। প্রিয়তমার চমক ভাঙ্গিল।

ছয়মাস পরে প্রিয়তমা প্রথম আপনার দিকে ফিরিয়া চাহিল, আজ প্রথম তাহার হৃদ্বোধ হইল যে তাহার এ সুখ স্বর্গের সোপান লোকধর্ম্ম ও সমাজ-ধর্ম্মের আনুকূল্যের প্রশস্ত পথপার্শ্বে নহে, কণ্টক-শঙ্কিত তীরে ভুজঙ্গ-বেষ্টনে দুর্গতি ও দুর্দ্দশার গহনে নিবিড় অন্ধকারে সে সঙ্কীর্ণ সোপান মূল স্থাপিত ; সে আপন অন্ধতায় পথ না দেখিয়া সেই ভয়াকীর্ণ স্থানে চরণ ক্ষেপণ করিয়াছে ! প্রিয়তমা শিহরিল।

পলকে ভুবনেশের স্মৃতি তাহার ভয়ভারাতুর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, অরুণোদয়ে অপগত নিশির তিমিরের মত সকল অন্ধকার অপসারিত হইয়া তাহার হৃদয় গগনে সমুদিত আনন্দ-দিনমনির কিরণ জালে সকল দিশি আলোকিত হইয়া গেল।

মাঝখানে কান্তমণি বাস্তবের আকারে কালো একটা কুৎসিৎ ছায়ার মতন তাহার আলোকিত কল্পনা জগতের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, এবার প্রিয়তমা

তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারিল না। ছায়া বলিল "আমি তোমার কুমারী নামে কলঙ্ক জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিব, যে স্নেহ তুমি জীবনের আশীর্ব্বাদরূপে লাভ করিয়াছ, জীবনের অভিশাপ রূপে তাহা তোমাকে দগ্ধ করিবে।" প্রিয়তমা চোখের জলে বালিশ ভিজাইতে লাগিল।

প্রিয়তমার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া নন্দলাল বাবু একদিন গিয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখ, প্রিয়ের কি হয়েছে, বল ত।"

গৃহিনী বহির্জগৎ হইতে চিত্ত প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অন্তর্মুখী হইয়া বসিয়াছিলেন নন্দলাল বাবুর কথা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন "কি বলছো"?

বল্‌ছি যে, প্রিয়কে আজকাল যেন কি রকম দেখছি, ডাকলে সামনে আসে না, মুখ তুলে কথা কয় না, নিভৃতে যেন থাকতে চায়। রোগা রোগা কেমনধারা দেখাচ্ছে, চোখের কোলে কালশিরা পড়েছে—মানেটা কি? "অসুখ অসুখ কচ্ছে কত দিন থেকে, আবার ওষুধ পত্রের নাম নিলে বলে ভাল আছে, তাই গরজ ও বড় করি নি। "কি অসুখ বলে?"

"বিশেষ কিছু নয়, এই মাথাধরা একদিন হয়ত বল্লে ঘুম হয় নি, একদিন বল্লে জ্বর জ্বর কচ্ছে।" "আমায় বল নি কেন?"

"ভাল হয়ে গেছে বলে আবার মাঝে মাঝে, তাই ভেবেছিলাম সেরে যাবে।"

এটা তোমার বড় অন্যায়, আমায় বলা তোমার খুবই উচিত। রোগ বাড়াতে সময় দিলে আর সারান যায় না। গৃহিনী নীরব রহিলেন।

"ভাল করে আবার জিজ্ঞাসা করে দেখো কি হয়েছে। ছেলেমানুষ লজ্জায় হয়ত বল্‌ছে না। আর, দেখ,—ওদের কারু সঙ্গে ঝগড়া হয়নি ত? "সম্ভব নয়।

যাই হোক্ জিজ্ঞাসা করে দেখো"।

নন্দলাল বাবু বাহির হইয়া গেলেন। অন্ধকারে জানালার কাছে প্রিয় দাঁড়াইয়াছিল, নন্দলাল বাবুকে বাহিরে দেখিয়া নিঃশব্দে সে চলিয়া সরিয়া গেল। গৃহিণীকে তিনি কি বলিলেন দূরত্ব নিবন্ধন সে ভাল করিয়া শুনিতে পাইল না, শুধু তাহার নিজের নামটা তাহার কাণে আসিল তাহার হৃৎস্পন্দন থামিয়া গেল, শরীরের সমস্ত রক্ত সহসা জমাট হইয়া শীতল হইয়া গেল। যে আশঙ্কায় সে পলকে সহস্রবার মরিয়াছে, হয়ত ইহা তাহাই! প্রিয়তমার সংশয় মাত্র রহিল

না। মুখ ঢাকিয়া অন্ধকারে শয্যালীন হইয়া পড়িয়া রহিল। অনর্গল অশ্রুধারে তাহার শয্যা সিক্ত হইতে লাগিল।

আহারের সময় অনুপমা আসিয়া ডাকিল, "দিদি, ওঠ, লক্ষীটি"।

প্রিয়তমা বালিসে মুখ গুঁজিয়া কহিল, আমার জ্বর আস্‌ছে বোধ হয়, খাব না।"

অনুপমা বলিল, আজ অমাবস্যা, তা হতেও পারে।"

অনুপমা তাহার কাজে চলিয়া গেল, থাকিয়া থাকিয়া তাহার বুকের কোণে একটা বেদনা বাজিয়া উঠিতে লাগিল।

[১২]

"চিঠি! চিঠি!"

ডাকহরকরা শিকল ধরিয়া ঘন নাড়া দিল।

প্রিয়তমা ফুল তুলিতেছিল, ফুল ফেলিয়া দ্রুতপদে কপাট খুলিয়া দিল। একটা খবরের কাগজ, একটা বিজ্ঞাপনের পুস্তিকা নন্দলাল বাবুর নামে খান দুই পোষ্টকার্ড পিয়ন হাতে দিল। অন্য সময় হইলে প্রিয়তমা স্নাতবেশে অশুচি এই লোকটার হাত হইতে চিঠি লইত না। কিন্তু আজ প্রিয়তমা সমস্ত ভুলিয়া গেল, একটা গভীর গূঢ় পুলকের উদ্বেল অণুরণনে তাহার সমস্ত চিত্ত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, কম্প্র হস্তে চিঠি কখানা উল্টাইয়া দেখিয়া প্রিয়তমা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চিঠিগুলি বারান্দায় টুলের উপর ফেলিয়া দিল।

প্রিয়তমা এই প্রথম বেদনার তীব্রতা বোধ করিল, এই প্রথম নিরাশার অবসাদ প্রাণে অনুভব করিল, এই প্রথম দুঃখময় জগতের অগ্নিস্পর্শ তাহার অন্তরে পঁহুছিল।

প্রিয়তমা জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু শুখাইল না। নিদাঘ-রৌদ্রে সহকারের মুকুলোদ্গমের মত এ উত্তাপে তাহার অবিকসিত নারীত্বর্ণতায় পঁহুছিল।

কলের মত প্রিয়তমা ফুল তুলিয়া সাজি ভরিল রোজ সে কত বাছিয়া ফুল তুলিত, কোন ফুল শবাসনা কালিকার নীলিন্দীবর অঙ্গে মানাইবে, দেবীর রক্তচরণ কোন্ ফুলের অঞ্জলিতে শোভিত হইবে, ঘেন কেশান্ধকারে লুপ্তপ্রায় কর্ণমূলে কোন্ ফুলে কর্ণালঙ্কার রচনা করিবে; কিন্তু আজ ঘন-সঞ্চরমান অশ্রু-বিন্দুতে তাহার চোখের কাছে সকল দৃশ্য মুদিয়া যাইতে লাগিল। বেশী কিছু

নয়,—শুধু দুটি ছত্র লেখা—অতি সাধারণ কথা দিয়া, অতি সাধারণ ভাবে, সামান্য দু'টি লাইন মাত্র! তাহারই মধ্যে যেন আজ তাহার সমস্ত বিশ্বের শোভা সঙ্গীত বদ্ধ করিয়া সে পাঠাইয়া দিবে!

সেদিন পূজায় বসিয়া প্রিয়তমা যখন চণ্ডীর ধ্যান করিতে লাগিল, নৃমুণ্ডমালিনী উদ্যতপ্রহরণা জ্যোতির্মণ্ডলমধ্যগতা চণ্ডীর পরিবর্ত্তে আরেকটি মুখ তাহার মানস নয়নের সম্মুখে উদিত হইল, তাহার সমস্ত চেতনা সেই চক্ষের চাহনিতে কেন্দ্র গ্রহণ করিতে লাগিল, তাহার ধ্যানের প্রতিমার সহিত সে মুখ এক হইয়া মিলিয়া যাইতে লাগিল, সচন্দন বিল্বপত্র অশ্রুজলে নিষিক্ত করিয়া প্রিয়তমা সে নব স্থাপিত দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে অনুপমা তখন ধীরে কপাট ঠেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি তোমার পূজো হয়েছে না কি? তখন প্রিয়তমা চমকিয়া ধ্যানের আসন ছাড়িয়া উঠিল, এবং হঠাৎ তাহার মনে হইল আজ সে স্তব আবৃত্তি করে নাই, অথবা কি করিয়াছে তাহার মনে নাই! স্মরণ মাত্রে প্রবল একটা অনুতাপ গ্লানির সঙ্গে মিশিয়া তাহার অন্তরে কশা হানিয়া গেল।

অবশ দেহভার টানিয়া লইয়া প্রিয়তমা গরদ ছাড়িয়া তাহার আটপৌরে কাপড়খানি পরিল। অনুপমা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি, তুমি কাঁদছো?"

অশ্রু গোপন করিবার মিথ্যা প্রয়াস করিয়া প্রিয়তমা কহিল, "আমার চোখে বোধ হয় কিছু গেছে! "চোখে কিছু যায় নি, তুমি সত্যি কাঁদছো!

ম্লান হাসি হাসিয়া প্রিয়তমা বলিল ও তোর বাঁধা গৎ, কল্পনার চোখে তুই কতই দেখিস্!"

অনুপমা কিছু কহিল না, প্রিয়তমার কপোলের উপর কপোল রাখিয়া নীরব হইয়া রহিল। তাহার নিজের চক্ষু অশ্রু-ভারে আবিল হইয়া গেল।

দুই ভগিনী অনেকক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। ভুবনেশের কথা প্রিয়তমা অনুপমাকে কিছু বলে নাই, এবং অনুপমাও কখনও তদ্বিষয়ে প্রশ্ন মাত্র করে নাই, তত্রাচ এই নীরব আলিঙ্গনের মধ্য দিয়া সহানুভূতির স্নিগ্ধ স্পর্শটুকু প্রিয়তমার বেদনাবিক্ষুব্ধ হৃদয়ে উশীরপ্রলেপের মত জুড়াইয়া দিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

অনুপমাকে বুকের কাছে টানিয়া নিয়া প্রিয়তমা কহিল "অনু, আমি কোনও দিন তোর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করি নি।"

অনুপমা বলিল "আর, আমিই বুঝি কোরেছি!"

"আমি বড়, কিন্তু আমি কোন ও দিন বড় বোনের মত তোকে করি নি, তুই চিরদিন আমায় মায়ের মত সেবা যত্ন করে আস্‌ছিস!"

"হঠাৎ তোমার দিব্যজ্ঞানের উদয় হোল দেখ্‌ছি যে!"

"না সত্যি অনু, জীবনে আমি কিছু কর্ত্তে শিখি নি"!

"পরশু দাদা আসবে দিদি"।

দাদা আস্‌বে আস্‌বে করে শুধু দিন পিছুচ্ছে"!

"অনু!"

"কি?"

"এবার দাদাকে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত কর্‌রে দেব"।

"কিসে?"

"ফুল পল্লব দিয়ে দাদার ঘর সাজাব'

অনুপমা হাসিয়া বলিল "বেশ হবে তবে।"

দুই ভগিনী ঘর সাজাইবার প্রোগ্রাম ঠিক্ করিতে প্রতীপের ঘরে গেল।

অনুপমা বলিল, "তুমি ততক্ষণ দেখে নাও কোথায় কি কর্ব্বে, আমি চট্ করে দেখে আস্‌ছি ঝী বাটনা বেটে দিয়াছে কি না। ও বলছিল কাল মাছ কুটতে ও হাত কেটেছে, আজ আরও বাটনা বাটতে পারবে না।" অনুপমা চলিয়া গেল।

প্রিয়তমা ঘরের মাঝখানে টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। প্রতিদিন সে সন্ধ্যাবেলা সকলের অলক্ষ্যে দীপদানের ছলে এ ঘরে আসিত, অন্ধকারে বিশ্বের সকল দৃশ্য যখন চক্ষের সম্মুখ হইতে মুছিয়া যাইত, তখন ভুবনেশের মানস-মূর্ত্তি তাহার ধ্যান মন্ত্রে প্রাণলাভ করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিত, সে মূর্ত্তির পদতলে বসিয়া প্রিয়তমা আপনা ভুলিত জগৎ ভুলিত। যে দীপদানের ছলে সে এ ঘরে আসিত, সেই দীপ জ্বালিবার কথাও তাহার মনে থাকিত না, -টেবিলের কাছে যেখানে ভুবনেশ বসিয়া পড়িত, সেইখানে ধূপদানীটি রাখিয়া ঘট উজাড় করিয়া সকল ধূপ সে ধূপদানীতে ঢালিয়া দিত, তারপর সমস্ত যখন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত,

তখন নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া ভাবিত দেবতার পায় এমন করিয়া নিঃশেষে আপনাকে দান করিতে সুখ আছে। এ ঘর তাহার দেবগৃহ হইয়াছিল, এ ঘরের জিনিসপত্র তাহার দেবচর্য্যার জিনিস হইয়াছিল।

প্রিয়তমা টেবিলের জিনিস পত্রগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া সযত্নে অঞ্চলে মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। সহসা প্রিয়তমার মনে হইল যে প্রতীপ জন্মাবধি এ ঘরে কাল কাটাইয়া আসিতেছে, কিন্তু কোনও দিন ও তাহার জিনিষপত্র তাহার ঘর বলিয়া সে ইহার যত্ন করে নাই। আজ যে এ ঘরের ধূলিটুকুও তাহার কাছে চন্দনকণাবৎ আদরণীয়! এই ঘরের ঐ মাটির উপরে যেখানে একদিন ভুবনেশের চরণ চিহ্ন পড়িয়াছিল, নিঃস্তব্ধ অন্ধকারে তাহার উপর হৃদয় রাখিয়া যেমন করিয়া তাহার প্রাণ মন জুড়াইয়া গিয়াছিল, জগতে আর কিছুতে তেমন জুড়ায় কই!

খানিক পরে অনুপমা যখন আসিল তখন দেখিল প্রিয়তমা টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—শূন্যার্পিত দৃষ্টি, বহির্জ্ঞান-লুপ্তপ্রায়, মুখে অপরূপ এক আভা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অনুপমা ধীরে চলিয়া গেল। তাহার চোখের কাছে অন্ধকার আরো নিবিড় হইয়া উঠিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

গোপন-প্রকাশ।

(মূল পারস্য হইতে)

তোমার আমার প্রেম ছিল গোপনে,
দু'জনের দেখাশুনা বিজন বনে।
নয়নে প্রেমের নীর বিকশি উঠি,
যে কথা বলিনি মুখে বলেছে ফুটি।
দেহের সৌরভ তব বাতাসে ভেসে,
গোপন অভিসার নীরবে প্রকাশে।
গোপন ছিল যাহা বাহিরে অজানা,
দু'জনে বলে দিল না মানি মানা।

মান্‌সান্ জলপ্রপাত।

এই বিখ্যাত জলপ্রপাতটি লাসীও ব্রাঞ্চ্ লাইনের "সেয়েন্" (SE-EN) ও "কুনিয়াং" (Kounyaung) ষ্টেশনের মধ্যে বর্ত্তমান। মান্দালয় মহানগরী হইতে যে লাইনটি "মায়হং" (Myhuung) জংসন পার হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে মেমিও ও লাসীও গিয়াছে, সেই লাইনেই "সে-য়েন্" এবং "কুনিয়াং ষ্টেশন অবস্থিত। রেঙ্গুন হইতে মান্-সান্ জলপ্রপাত ৫৩৬ মাইল দূরে। এই প্রপাতের অতীব সন্নিকটে বর্ম্মা-রেলওয়ে কোম্পানি একটি ডাক্‌বাংলা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পর্য্যটকগণ উক্ত জলপ্রপাত দর্শন করিতে আসিলে এ ডাকবাংলাতে অবস্থান করিতে পারেন, সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত আছে। প্রপাতের ২০।২৫ ফিট্ উত্তর দিয়া রেল-লাইন আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে।

মান্‌সান্ জলপ্রপাত এসিয়ার ভিতর দ্বিতীয় বৃহত্তম (Second largest)। এসিয়ার সর্ব্ববৃহত্তম কাবেরী জলপ্রপাতে উক্ত প্রপাত অপেক্ষা অধিক জল পতিত হয় বটে, কিন্তু মান্‌সান্ প্রপাতের দৃশ্য উহা অপেক্ষা শত অংশে রমণীয়। এই প্রপাত "নামিয়ো (Namyo) নদী হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। "নামিয়ো" ধীর-ধারায় নর্থদারেন-শান-ষ্টেটের "সীনি" (Hseinei) নামক স্থানের "কোনঙ্" (Ko-knog) পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া, ক্রমেই বিস্তৃতায়ন হইয়া বর্দ্ধিত বেগে, খাড়াই পাহাড়-প্রাচীরের মধ্য দিয়া, দক্ষিণগামী হইয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা-খণ্ড-সমূহ ঐ জল স্রোতকে বাধ দিয়া প্রত্যেক প্রতিবন্ধকের স্থানে একটি একটি ক্ষুদ্র প্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। আবার কোথাও কোথাও প্রস্তর রাজি স্রোতের বেগে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া নানা আকৃতি ধারণ করিয়াছে——মনুষ্যাকৃতি, হস্তিআকৃতি, কুম্ভীরাকৃতি ইত্যাদি এইগুলি দেখিতে বড়ই আমোদজনক। এই ভাবে এ জলস্রোত কুনিয়াং-পল্লী পর্য্যন্ত আসিয়া, তথায় উচ্চ সোপানবৎ শৈল-মার্গ অতিক্রম করিয়া নিম্নে অবতরণ করিয়াছে। তারপর এখান হইতে আরও প্রায় এক মাইল অগ্রসর হইয়া ৫০ ফিট্ উচ্চ হইতে ঐ জলরাশি নিম্নে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, এখান হইতে আবার কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া প্রায় ৩০ ফিট্ উচ্চ হইতে ঝম্প-প্রদান করিয়াছে, এই ভাবে ক্রমান্বয়ে আরও চারি স্থানে লম্ফ-প্রদান করিয়া প্রচণ্ড বেগে পর্ব্বত প্রান্তে

আসিয়াছে। পর্ব্বত প্রান্তে আসিয়া শৈল-সমূহ দ্বারা পুনরায় বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে, উন্মত্ত হইয়া, একঝম্পে উপত্যকায় পড়িয়াছে। পর্ব্বতের এ স্থানটা একদম খাড়া, এই স্থান্ হইতে ঐ উন্মত্ত জলস্রোত প্রায় ৩৫০ ফিট পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া, প্রায় ৩০০ ফিট উচ্চ হইতে প্রবল বেগে নিম্নে ভীষণ শব্দে ঐ উপত্যকায় পড়িতেছে। এ ভীম গর্জ্জন বহুদূর হইতে শুনা যায়। পূর্ব্ববর্ণিত ডাক্বাংলার সম্মুখ হইতে এই প্রপাতের দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়। দিন নাই, রাত্রি নাই, সকাল-সন্ধ্যায়, সুদিনে দুর্দ্দিনে, এই জলরাশির অবিরাম পতনের দৃশ্যে ও অক্লান্ত ঐ গভীর গর্জ্জন শ্রবণে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়। বর্ষের বিভিন্ন সময়ে এই প্রপাতের আকৃতি ও বিভিন্ন প্রকার। বর্ষাকালে এ জলস্রোত এ স্থানে প্রায় ৬০০ ফিট্ পরিমাণ বিস্তৃত হয়, তখন ইহা প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করে। রাত্রিতে এই ভৈরব-গর্জ্জন শুনিলে অতি সাহসিক ব্যক্তির ও ভীতির সঞ্চার না হইয়া পারে না। এই জলস্রোত পতনের সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেক জল প্রস্তরের আঘাতে সূক্ষ্ম বারিকণায় পরিণত হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইতেছে;—সেই জন্যই জল প্রপাতের নিকটবর্ত্তী ৭০।৮০ ফিট পরিমাণ স্থান সর্ব্বদাই বাষ্পরাশিতে আচ্ছন্ন। প্রভাতের তরুণ কিরণ যখন, এই বাষ্প সমূহ মধ্যে পতিত হয়, তখন ইন্দ্রধনু বা রামধনুরন্যায় নানাবর্ণ সমদ্ভুত হইয়া কিযে এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে, তাহা বর্ণনাতীত। কেলিডোস্কোপ্ (Kaleiodscope) যন্ত্র ঘুরাইয়া যেমন দর্শক প্রতি মূহুর্ত্তে নূতন নূতন শোভা চিত্র দেখিয়া থাকেন, তেমনই দর্শক এ প্রপাতের শোভা বৈচিত্র্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন। বাস্তবিকই, এ সৌন্দর্য্য বর্ণনার বিষয় নহে; "শুধু চেয়ে চেয়ে দেখা, আর স্তব্ধ হয়ে রহা" ভিন্ন ভাবিবার বিষয় কিছু নাই। যিনি স্বয়ং ইহা প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন; তিনি কোন বর্ণনা পাঠে তাহার ধারণা করিতে পারিবেন না। এই জলস্রোত উল্লিখিত উপত্যকায় পড়িয়া হ্রদে পরিণত হইয়াছে—প্রায় ৫০০ ফিট্ পরিসর; একটি হ্রদ হইতে একটি স্রোতস্বিনী বাহির হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তর রাশির উপর দিয়া সংক্ষুব্ধ গতিতে প্রবাহিত হইয়া "নামা" নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গম স্থানে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, দেখিতে বড়ই সুন্দর। এস্থান হইতে "থিব" পর্য্যন্ত এ সুদূর-ব্যাপী পথ মধ্যে এক অপ্রশস্ত জলস্রোত সমভাবে প্রবাহিত। ইহার দুই পার্শ্বে রমণীয় কমলা লেবুর বৃক্ষশ্রেণী, আর সুবিশাল শৈলরাজি বিরাজমান, সোভাগ্য

খুবই কম। পার্ব্বত্য শানদের তুই চারিখানা ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর মাত্র বর্ত্তমান। ফল থাকিলে উপরোক্ত কমলা লেবুর বৃক্ষগুলি যে, কি এক অভিনব সাজে সজ্জিত হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রপাতের অনতিদূরে, দক্ষিণদিকের পাহাড়গুলির দিকে চাহিয়া দেখিলে, চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এ সকল পর্ব্বত শিখরে অসংখ্য "ওক" বৃক্ষ বর্ত্তমান; ইহাদের স্বাভাবিক জাফ্রাণ্ বা সোণালি রং এর পুষ্পের উপর যখন সূর্য্য-রশ্মি পড়ে, তখন সুবর্ণের পাহাড় বলিয়া ভ্রম হয়। তখন সত্য সত্যই, গাইতে ইচ্ছা হয়— "কেবারে আদর করে, তোমার শিরে

সোহাগ ঝুঁটি বেঁধে দেছে;

আবার রে চূড়ায় চূড়ায়, কেবা তোমায়

হীরের টোপর পরায়েছে।"

প্রপাতের পশ্চিমদিকের অরণ্যানীতে বরাহ, বন্যকুক্কুট, ময়ূর, মৃগ প্রভৃতি বন্যশ্বাপদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; বাঘ ও মহিষের দর্শন ও এস্থানে তুর্লভ নয়। শিকার-প্রিয় ইংরাজদের পক্ষে স্থানটি একান্ত উপযোগী।

এই প্রপাত হইতে ৫০ মাইল উত্তরে "বডুইন্" (Bawdwin) নামক স্থানে সুবৃহৎ সীসার খনিসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাই জগতের সর্ব্ববৃহত্তম সীসা খনি। বর্ম্মামাইনস্ (Burma Mines) কোম্পানি ইহার স্বত্বাধিকারী। এই খনি দেখিবার বস্তু, সন্দেহ নাই। দেশ দেশান্তর হইতে কত লোক যে ইহা দেখিতে আসিয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাচীনকালে এইখনি সমূহে ভারতের "গোলকুণ্ডার" ন্যায় প্রচুর পরিমাণে সোণা বর্ত্তমান ছিল। চীনেরা এই গুপ্ত রত্নের সন্ধান পাইয়া একাদিক্রমে বহুকাল পরিশ্রম করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ সোণা স্বদেশে লইয়া গিয়াছেন, আর যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও ব্রহ্ম ও শান রাজগণ তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্যে আনয়ন করিয়া, কেহ কেহ উহার দ্বারা বুদ্ধ মূর্ত্তি, সিংহাসন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, আবার কেহ কেহ তাঁহাদের নিজ নিজ মূর্ত্তি, মহিষীদের মূর্ত্তি প্রভৃতি গড়াইয়া ভিন্ন ভিন্ন "প্যাগোডা" মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই খনি সমূহে যথেষ্ট পরিমাণে সোণা পাওয়া যাইত বলিয়াই ব্রহ্মদেশের যেখানে সেখানে এত সোণার ছড়াছড়ি দেখিতে যায়।

এখন প্রত্যহ যথেষ্ট সীসা এই খনি সমূহে উদ্ভূত হইতেছে। যাহা উদ্ভূত হইতেছে, তাহা সমস্তই "জড়-মন" জাতির ধ্বংসের জন্য জাহাজ পূর্ণ করিয়া "বর্ম্মামাইনয়া" কোম্পানি বিলাতে প্রেরণ করিতেছেন। এই সীসার দ্বারাই বর্ত্তমান মহাসমরের গোলা, গুলি নির্ম্মিত। উক্ত কোম্পানির এঞ্জিনিয়ারেরা এইজল প্রপাতের জলধারা সম্ভূত শক্তিটাকে কাজে লাগাইবার জন্য পরামর্শ করিয়াছেন। এই বিপুল শক্তি-দ্বারায় তাড়িৎ উৎপাদন-যন্ত্র (Dynamo) চালিত করিয়া, সেই তড়িতের দ্বারায় উক্ত খনির কারখানার অসংখ্য কল চালাইবার এবং ঐ স্থানের পথ, ঘাট, গৃহ প্রভৃতি আলোকিত করিবার জন্য বন্দোবস্ত হইয়াছে। এঞ্জিনিয়ারগণ প্রকাশ করিয়াছেন, প্রপাতের যে জল উপর হইতে নিম্নে পতিত হইতেছে, তাহার কার্য্যবল ৩ লক্ষ অশ্বের বলের সমান (অর্থাৎ ৩ লক্ষ অশ্ব পরিশ্রম করিয়া যে কার্য্য করিতে পারে, এ জলরাশিও সেই পরিমাণ কার্য্যক্ষম)। প্রতিদিন এ জল প্রপাতে প্রায় ৭ কোটী ঘনফুট পরিমিত জল পতিত হয়। "সীনী" ষ্টেটের "সাবোয়ার" (Sabwa) সহিত "বর্ম্মামাইনস্" কোম্পানির এইরূপ সর্ত্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা প্রপাতের স্বভাব দৃশ্যের কিছুমাত্র সৌন্দর্য্যের হানি না করিয়া, বিদ্যুৎ-শক্তি-উৎপাদন গৃহ (Power House) প্রভৃতি প্রপাতের যে কোন স্থানে নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন। কুনিয়াং ষ্টেশনের তিন মাইল দক্ষিণে এই তাড়িৎ প্রজনন ক্ষেত্র স্থির হইয়াছে।

এই প্রপাতের বিভিন্ন স্থানের এবং বিভিন্ন সময়কার দৃশ্য দেখিবার জন্য ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র হইতে এমন কি ইউরোপ হইতে বহু পরিব্রাজক ও দর্শক এস্থানে আগমন করিয়া থাকেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু ঠাকুর।

সুখের মরণ।

(মূল পারস্য হইতে)

আজি এই দিন শেষে এসেছে মরণ
তোমায় কত ভালবাসি বলিনি কখন।
যে বাণী যে প্রেম ছিল হৃদয়-কোণে,
সে কথা কি বলা যায় মরণ-ক্ষণে।
তুমি জান প্রিয়তম! কত ভালবাসি,
তব জ্ঞান, তব ধ্যান মোর দিবানিশি।
ক্ষীণ পতঙ্গের মত অনলে পুড়িয়া,
তোমারে লভিব নাথ! মরণে বরিয়া।

আসামযাত্রীর ডায়েরী।

১লা আষাঢ় শুক্রবার ১৩২৪।

ভোরের বেলা শ্রীমান্ পবিত্রকুমারকে লইয়া সহর দেখিতে বাহির হইলাম। রাস্তাগুলি পাকা হইলেও বালুর আধিক্য একটু বেশী। ঘরগুলি অধিকাংশই টীনের। বেড়া সেই ইকড়ের উপর মাটির প্রলেপ তার উপর চূণকাম করা। সম্মুখে বারান্দা। গৌহাটির চারিদিক বেড়িয়াই পাহাড়। কামাখ্যা-দেবীর নীলাচল পাহাড় এখান হইতে দেড় মাইলের বেশী দূরে নহে। পথে স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ইনি স্থানীয় সাহিত্যসেবী, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথা হইল। ভাগলপুরের তৃতীয় বার্ষিক সাহিত্য-সম্মিলনে ইঁহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। সে অনেক দিন আগেকার কথা। নিশিবাবুর পত্নী স্বর্গীয়া শতদল-বাসিনী বিশ্বাস 'বেহুলা, চিন্তা' প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। নিশিবাবু পুনরায় বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছেন। তাঁহার এখান হইতে আমার বহুদিনের পরিচিত শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহার সদানন্দ অমায়িক ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। কথার মধ্যে ঐতিহাসিক-প্রসঙ্গই বেশী। বিকেল বেলাও বহু ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

২রা আষাঢ়।—

ঝর ঝর ঝম্ ঝম্ রবে সারাটি দিন বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ঘরের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য। লোভীকে লোভ দেখাইলে যেমন রক্ষা নাই, তেমনি নেশা-খোরকে নেশার লোভ দেখান অতীব গর্হিত কার্য্য। আমি বিখ্যাত 'চা' খোর না হইলেও অত্যন্ত মাঝামাঝি রকমের যে একজন নেশাখোর তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। একে বৃষ্টি—ঠাণ্ডা, তাহার উপর আমার হাতে তেমন কোনও কাজ নাই, কাজেই সময় বুঝিয়া 'পেয়ালাভর নেশা চলিতে লাগিল। আমি চা রূপ পানীয়কে নেশা কহি। কল্যাণীয়া সুনীতিও পেয়ালার পর পেয়ালা ঢালিয়া দিয়া নেশাটা মস্‌গুল করিয়া তুলিল। কত কাব্য, কত ইতিহাস, কত প্রত্নতত্ত্ব, কত স্ত্রী-শিক্ষার আলোচনা যে চলিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। মীমাংসাহীন তর্কের যাহা

হয় আমাদের তর্কও তাহাই চলিতেছিল। সুনীতিকে সরল সহজ ভাষায় suffragist বলা যাইতে পারে!

দূরে কামাখ্যা পাহাড়ের দৃশ্য কুয়াসাচ্ছন্ন দেখা যাইতেছিল। শিলংএর পথের পাহাড় একরূপ অন্ধকারে ঢাকা। বর্ষাকালে আসাম বেড়াইতে যাওয় কত বড় নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় তাহা আজ বেশ বুঝিতেছিলাম। নিষ্কর্ম্মা হইয় বসিয়া আছি।

৩রা আষাঢ়—

গৌহাটি সহরটি দিবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নদীর ধার অতি সুন্দর। আজ দুপুরের সময় রায় কালীচরণ সেন বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কালীচরণ বাবু এখানকার গভর্মেণ্ট উকীল। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় শ্রীমন্ত সেন মহাশয় বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন। যখন তিনি দেশ হইতে বাহির হইয়া আসেন তখন তাঁহার হাতে মাত্র।০ চার আনার পয়সা সঙ্গে ছিল। তাঁহার জীবন বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। আমরা বারান্তরে তাঁহার জীবন কথা প্রকাশ করিব। পূজ্যপাদ পরমহংসসোহহং স্বামীর প্রবন্ধাদি সম্পর্কে বহু আলোচনা হইল। আমাকে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভায়' বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নিজের অক্ষমতা বুঝিয়াও "বৈষ্ণব ধর্ম্মের শিক্ষা" সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। কালীচরণ বাবু মহারাজ রাজবল্লভের বংশধর, দেখিতে অতি সুপুরুষ। আদর্শ হিন্দু পরিবার। হিন্দুধর্ম্মের কঠোর রীতিনীতি রক্ষা করিয়া চলা যতদূর সম্ভবপর তাহাই চলিতেছেন। মিষ্টভাষী বিনয়ী চরিত্র-বান্ পুরুষ। "সনাতন" হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভা ইঁহার অক্ষয়-কীর্ত্তি। সভা-গৃহটী অতি সুন্দর শীঘ্রই অতিথিশালাও নির্ম্মিত হইবে শুনিলাম।

৫ই আষাঢ় মঙ্গলবার—

'সৌভাগ্য-সোপান' 'যুবকবন্ধু' প্রভৃতিগ্রন্থ-প্রণেতা বহুদিন যাবত আসাম প্রবাসী। তাঁহার বাড়ী আমাদেরই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে, প্রসন্ন বাবু প্রবীণ, বিদ্বান ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি, আজ ভোরে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যাইয়া ভগ্ন-হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলাম,—তিনি এখন কলিকাতাতে আছেন, কাজেই তাঁহার সহিত আর দেখা হইল না। দুপুর বেলা কি করিব কি করিব ভাবিতে ভাবিতে রৌদ্রের মাঝখানে মাথায় চাদর জড়াইয়া বীরবেশে একাকী কামাখ্যা

পাহাড় দর্শনে বাহির হইলাম। একঘণ্টা হাটিয়া নীলাচলের পাদদেশে পঁহুছিলাম। নিম্নে থানা, দুই তিন খানি দোকান ও রেলওয়ে ষ্টেসন। উপরে উঠিতে বরাবর সিঁড়ি তৈরী আছে, বেশ সু-প্রশস্ত প্রস্তর সোপানশ্রেণী। জনপ্রবাদ নরকাসুরের তৈয়ারী, ইহার কোনও খাঁটি ইতিহাস পাওয়া যায় না। সোপান বাহিয়া উঠিতে লাগিলাম। বাতাস মাত্রও নাই; অন্যান্য পাহাড়ে খানিকটা উঠিলেই নির্ম্মল বাতাসে প্রাণ জুড়াইয়া যায়, এখানে তাহার বিপরীত ভাব। কাঠগোলাপ গাছ পথের দুইধারে খুব বেশী, অল্প একটু উপরে উঠিয়াই বহু যাত্রীদলের সহিত সাক্ষাৎ হইল; স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। তন্মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গের যাত্রীই বেশী দেখিলাম, অম্বুবাচী উপলক্ষেই যাত্রী সমাগম বেশী হয়। এবার আমি দেবী দর্শন বা ভালরূপে ৺ কামাখ্যা পাহাড় দেখিবার জন্য আসি নাই, শুধু সখের খেয়াল মাত্র। এখানে সেখানে পাহাড়ের গায়ে খোদিত দেব দেবী মূর্ত্তি, তন্মধ্যে গণেশের মূর্ত্তিই বেশী, আধঘণ্টা পরে নীলাচলের শিখরদেশে দেবী মন্দিরের সমক্ষে পঁহুছিলাম। সোমেশ্বর পাণ্ডার ঘরে যাইয়া পাটি পাতিয়া আরামে শুইলাম এবং দুই গ্লাস চিনিপানা খাইয়া প্রায় একঘণ্টা ঘুমাইয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। গৌহাটি ফিরিয়া কীর্ত্তন শুনিতে হরি-সভায় চলিলাম। প্রায় রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন শোনা গেল। কাল শিলং যাইব। বেলা ৭ টার সময় মোটর গৌহাটি ছাড়ে।

শিলং-যাত্রা।

৬ই আষাঢ় বুধবার। খুব ভোরে উঠিয়া শ্রীমান্ বিনয়কুমারের সহায়তায় জিনিষপত্র গুছাইলাম। তারপর স্নান করিয়া দিব্যপরিপাটিরূপে ভোজন সমাপন করিয়া জিনিষ পত্রাদি সহ মোটর ষ্টেশনে আসিলাম। এখানে মালপত্র ওজন ও টীকেট কিনিয়া লইয়া গাড়ীতে উঠা গেল। আমার ভাগ্যক্রমে পাঁচটাকার টীকেট কিনিয়াও পনেরটাকা মূল্যের সিট্ পাইয়াছিলাম। যাত্রাশুভ বলিতে হইবে বৈকি! বন্ধু সত্যভূষণ খুব ভোরে একটা ওয়াটার প্রুফ আনিয়া

দিয়াছিলেন। বিনয়ও সত্যবাবু দু'জনেই আমাকে ষ্টেসনে পঁহুছাইয়া দিতে ষ্টেসনে আসিয়াছিলেন।

৭-৩৫ মিনিটে মোটর ছাড়িল। গরমে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলাম, এবার তাহা দূর হইল। রাজপথ বাহিয়া ক্রমাগত দক্ষিণদিকে গাড়ী ছুটিয়া চলিল। ছোট ছোট পাহাড়গুলি দক্ষিণে ও বামে ফেলিয়া ক্রমাগত চারি মাইল চলিয়া যাইয়া অবশেষে পাহাড়ের পথে গাড়ী উঠিতে সুরু করিল। গৌহাটি হইতে শিলং ৬৪ মাইল দূর। মুসৌরী ও দার্জ্জিলিংএর পথের ন্যায় এখানেও ঘুরিয়া ফিরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া পথ চলিয়াছে। পাহাড়ের গা কাটিয়া পথ তৈরী করা হইয়াছে, পথ বেশ প্রশস্ত। এইরূপ বনজঙ্গলাকীর্ণ পার্ব্বত্য-পথ আমার নিকট নূতন নহে। পাহাড়ের গায়ে বাঁশের ঝাড়ই বেশী বস্তিও আছে, চাষ ও চলিতেছে। উপত্যকা ভূমিতে ধানের চাষ আছে। নংপো পর্য্যন্ত (Nangpoh) তেমন দৃশ্য বৈচিত্র্য চোখে পড়ে নাই। এস্থানে আমাদের নাম ধাম ঠিকানা কোথায় যাইব সব একজন ভুটিয়া subinspector কে লিখাইয়া দিতে হইল। আমি ভুটিয়া subinspector কে জিজ্ঞাসা করিলাম এ যায়গার স্বাস্থ্য কেমন। সে বলিল "very bad place Babu, full of Malaria; কি মোটা ছিলাম কি হয়েছি। লোকটি বেশ। এখানে Teahouse, Hospital, ইত্যাদি আছে। আমি এখানকার ডাকঘরে একখানা পত্র post করিলাম ও এক পেয়ালা চা নিঃশেষ করিলাম। চারিদিকে বড় বড় পাহাড়, তাহারই নিম্নে এস্থানটি অবস্থিত বলিয়া এখানকার স্বাস্থ্য তেমন ভাল নহে। নংপো শিলংএর অর্দ্ধপথ। গৌহাটি হইতে ৩২ বত্রিশ মাইল দূর, নংপো ছাড়াইলেই পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়। আমরা ক্রমশঃ উপরে উঠিতেছি। দুইদিকে উচু পাহাড়, পাহাড়ের মাঝখান দিয়া পথ, মাঝে মাঝে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। বড় বড় গাছ পালা আকাশের দিকে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান, মাঝে মাঝে ঝরণা ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মোটর যখন মাঝে মাঝে থামে, তখন চারিদিকের নীরবতায় আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে হয়। 'ঝিল্লীমুখরিত বন পরিপূরিত'তা ছাড়া তরুলতাগুল্মসমাচ্ছন্ন বন্ধুর পর্ব্বত গাত্রে আর কোনও শব্দ নাই। পাখীর গান ও শোনা যায় না। মাঝে মাঝে বাতাসের দোলনীতে মৃদু মৃদু শব্দ। আকাশ কখনও ঘনকৃষ্ণ মেঘে ঢাকিতেছে, কখনও মেঘ সরিয়া

যাইতেছে, কখনও বৃষ্টি হইতেছে কখনও রৌদ্র দেখা দিতেছে। আষাঢ় মাস। বর্ষাকাল। বৃষ্টির স্থিরতা নাই, বিশেষ পাহাড়ের গায়। এই রৌদ্র এই বৃষ্টি কি বৈচিত্র্য। রৌদ্র বৃষ্টির এই অভিনব খেলা দেখিতে দেখিতে মানব জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্না, আশা নিরাশার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে কখন কিভাবে কেমন করিয়া যে এ জীবন কাটিয়া যাইবে তাহাত জানি না! স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছি, উঠিতেছি নাবিতেছি। কে জানে কোন্ ভাবে কেমন করিয়া দীপ নিবিয়া যাইবে একদিন এই সজীব দেহ ধূলিতে মিশাইবে, চিতানলে ইহার শেষ চিহ্নও চির বিলুপ্ত হইবে।

আমাদের পথের প্রায় দুইশত ফিট্ নীচু দিয়া একটী নদী কলরোলে বহিয়া চলিয়াছে! তার শব্দ, শিলায় শিলায় ঘাত প্রতিঘাত কাণে শুনিতেছিলাম চঞ্চলা বালিকা যাইবেই, তাহাকে ফিরাইবার জন্য কত কি বাধা কিন্তু সেকি বাধা মানিবে? সে ছুটিয়া চলিয়াছে। কে তাহার গতিরোধ করিবে! খানিক দূর অগ্রসর হইলে Pine বা সরল তরুর সারি দেখা দিল। ঝাউগাছের মত পাতা, সুন্দর সরল বৃক্ষগুলি। দেখিতে দেখিতে শিলং আসিয়া পঁহুছিলাম। যখন শিলং পঁহুছিলাম তখন বেলা প্রায় আড়াইটা, ধীরে ধীরে দুই একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রায় তিনটার সময় অগ্রজপ্রতিম সুহৃদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র দাস গুপ্তের বাসায় পঁহুছিলাম এবং পঁহুছিয়াই এক পেয়ালা চা ও গরম গরম হালুয়ার সহিত সাদরে অভ্যর্থিত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

কার্পাসের চাষ।

পূর্ব্ববঙ্গে কার্পাসের বিশেষ চাষ নাই; কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় অল্প পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে বিদেশীয় অনেক প্রকার কার্পাসের পরীক্ষা করা হইয়াছে; কোন্ জাতিই ভাল জন্মে না; ইহাদের মধ্যে ইজিপ্ট, কাম্বোডিয়া, বম্বেড্ প্রলিফিক অপেক্ষাকৃত ভাল।

দেশীয় কার্পাসের মধ্যে নিম্নলিখিত জাতিগুলি ভাল :—

১। বুড়ি—ইহা ছোটনাগপুর ও সাঁওতালপরগণায় ভাল জন্মে এবং ইহার ফলন অধিক।

২। ধারোয়ার—ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে একটি মার্কিণ দেশীয় জাতি কিন্তু অনেক কাল এদেশে আবাদের পর প্রায় এদেশীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

৩। ব্রোচ—এদেশীয় কার্পাসের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট জাতি। বাজারে ইহা সুরাট বলিয়া পরিচিত।

৪। গাছ কার্পাস—ইহার গাছ অনেক বৎসর বাঁচে; ইহার সূতা লম্বা, শক্ত ও মসৃণ হয়। দেও কার্পাস, রাম কার্পাস ও রাজ কার্পাস প্রভৃতি ইহার নানা নাম আছে। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ এই সূতা হইতে যজ্ঞোপবীত তৈয়ার করিয়া থাকেন।

কার্পাসের চাষ করিতে হইলে প্রথম হইতেই সতর্ক হওয়া আবশ্যক। স্থানীয় মৃত্তিকা ও আবহাওয়া ভেদে উপরোক্ত যে জাতি যে জেলায় ভাল জন্মে তাহারই অধিকতর আবাদ করিতে হইবে। কোন্ মাসে বীজ বপন ও চারা রোপণ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়, তাহারও পরীক্ষা করিতে হইবে।

মৃত্তিকা—বুড়ি কার্পাস প্রায় সকল মাটীতেই জন্মে; ব্রোচ এবং ধারোয়ার, দোঁয়াশ ও আঁটাল মাটীতে ভাল হয়। কার্পাসের পক্ষে উচ্চজমি প্রশস্ত; ভূমি হইতে যাহাতে ভালমত জল নিকাশ হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। জল দাঁড়াইলে ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যে জমি সাধারণতঃ ভিজা উহাতে আইল করিয়া বীজ বুনিতে হয়। ২।৩ ফিট অন্তরে প্রায় ½ হাত উচ্চ আইল করিতে হয়; এইরূপ ভাবে জল নিকাশের বন্দোবস্ত করিলে ফসল ভাল হইতে পারে।

জমি প্রস্তুত প্রণালী—মৃত্তিকা গভীর ভাবে চাষ করা কর্ত্তব্য। ৮। ১০ বার চাষ ও মৈ দিয়া ধূলা করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৫০/ মণ গোবর সার দেওয়া উচিত উহার সহিত ছাই ও চূণ দিলে আরও ভাল হয়। জমিতে সার ছিটাইয়া দিয়া ২।৩ বার চাষ ও মই দিয়া উহা ভাল মত মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়।

বীজ বপন—প্রতি বিঘায় /১॥০—/২ সের বীজ বুনিলে চলিতে পারে। গোবর, ছাই ও চুণ একত্র মিশাইয়া, উহার মধ্যে বীজ মাখাইয়া বুনিলে ফল ভাল হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস বীজ বুনিবার প্রশস্ত সময়; এই সময় জমিতে রস না থাকিলে জল সেচন করিয়া বীজ বুনিতে হয়। ২।৩ ফিট অন্তর ২।৩টি বীজ একত্র বুনিতে হয়।

ইজিপ্ট ও আমেরিকার কার্পাসের বীজ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে কিম্বা আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বুনিলে ভাল হয় এ বিষয়েও পরীক্ষা আবশ্যক; বর্ষাকালে ফল পাকিলে সূতা ভাল হয় না। একারণ কোন্ মাসে কোন্ জাতীয় কার্পাস বুনিলে মাঘ ফাল্গুন মাসে ফল পাকিবে তাহা জানা আবশ্যক।

চারা একটু বড় হইলে কেবল ভালগুলি বাছিয়া রাখিয়া অন্যগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হয়; কোনওটা মরিয়া গেলে পুনর্ব্বার রোপণ করা কর্ত্তব্য; এই সময় একবার নিড়ানী করা আবশ্যক। ফুলের কলি বাহির হইবার পূর্ব্বে জমি একবার কোদলাইয়া দিতে হয়। কার্পাসের সহিত উরিদ, অরহর, শণ, ধঞ্চা প্রভৃতিরও আবাদ করা চলে।

ফল সংগ্রহ—কার্পাসের ফলগুলি সম্পূর্ণ না পাকিলেও উহার খোসা ফাটিয়া তুলা বাহির না হইলে সংগ্রহ করা উচিত নহে। তুলা মাটিতে পড়িয়া বৃষ্টি কিম্বা শিশিরে ভিজিয়া গেলে অব্যবহার্য্য হইতে পড়ে; একারণ খুব সাবধানের সহিত সংগ্রহ করা আবশ্যক। খোসা হইতে তুলা বাহির করিবার সময়ও বিশেষ সাবধান হইবে কারণ খোসার অংশ মিশ্রিত থাকিলে উহার মুল্য কমিয়া যায়। যে সমস্ত ফলগুলি প্রথম পাকে উহার তুলা ভাল হয়। এই সমস্ত তুলা রৌদ্রে ভাল মত শুকাইয়া ঘরে জমা করিয়া রাখিতে হয়। কম শুকাইলে সূতা খারাপ হইয়া যায়।

খরচ—চাষ আবাদে বিঘা প্রতি ৮৲। ১০৲ টাকার অধিক খরচ লাগে না। কিন্তু এক বিঘার ভাল ফসল হইতে প্রায় ২॥০ মণ—৩/ মণ বীজসহ তুলা পাওয়া

যায়। বীজ ছাড়াইয়া ফেলিলেও প্রায় ৷৵০ সের কি ১৷৵ মণ তুলা থাকে। ইহার ২০৲—৩০৲। ইহার আবাদে আমাদের কাপড় পোষাক তৈয়ার করার জন্য একমাত্র উৎকৃষ্ট সূতা পাওয়া যায় এমন নহে, ইহার বীজ হইতে মূল্যবান তৈল ও গবাদির খাদ্যের জন্য খৈল পাওয়া যায়। ইহার আবাদে খরচ বাদেও বিঘা প্রতি ১৫৲—২০৲ টাকা লাভ হইতে পারে।

পোকা—

সাধারণতঃ কার্পাসের গাছে নিম্নলিখিত পোকা দেখিতে পাওয়া যায়—

১। চুঙ্গি পোকা—ইহা এক প্রকার সুতলী পোকা। কীড়াগুলি পাতা গুটাইয়া উহার মধ্যে থাকে এবং পাতা খায়। যখন গাছের পাতা চুঙ্গীর মত হইতে দেখা যায় তখন তাহাদিগকে পোকা সহিত তুলিয়া কেরোসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিতে হয়। অথবা মাটিতে পুতিয়া রাখিতে হয়। ইহাতে পোকার বংশ বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। একটি জলের পাত্রে কিছু কেরোসিন দিলেই চলিতে পারে।

২। গুটী পোকা—দুই প্রকার সুতলী পোকা কার্পাসের গুটীর ভিতরে ঢুকিয়া খায়। প্রথম হইতে নজর রাখিয়া আক্রান্ত গুটীগুলি অথবা যে গুটী মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে তাহা একত্র করিয়া মাটীর নীচে পুতিয়া রাখিতে হয়।

কাপাসী পোকা—গান্ধি জাতের এক প্রকার লাল পোকা কার্পাসের গুটীর ভিতরের বীজের রস চুষিয়া খায়। এক একটি গুটীর উপর অনেকগুলি পোকা থাকিতে দেখা যায়।

একটি টুকরী গাছের নীচে রাখিয়া গাছ নাড়া দিলে পোকাগুলি পড়িবে। এইরূপে পোকা সংগ্রহ করিয়া কেরোসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিতে হয়। পোকা কিম্বা অন্যান্য রোগ যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য প্রথম হইতেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। একবার অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলে উহার দলন করা বড়ই কষ্ট ও শ্রমসাধ্য।

সরকারী কৃষিবিভাগ হইতে সঙ্কলিত।

ব্রাহ্মণগাঁ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে

সৈন্যসংগ্রহ সভা।

গত ৩রা এপ্রিল, বুধবার ভোর ছয় ঘটিকার সময় ছয় জন বাঙ্গালী যুবক সৈন্য ব্রাহ্মণগাঁ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে আগমনে সভার অধিবেশন হয়। শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণ সৈন্যদিগকে যথোচিৎ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাহাদের জলযোগের এবং আহারের যথাযোগ্য ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। বেলা ৮ ঘটিকার সময় সভা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র গুহ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্য হইতে অনেকেই বক্তৃতা করেন এবং বর্ত্তমান ইউরোপের মহাসমরে সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য ও সৈন্যদলে নিযুক্ত হইবার জন্য ছাত্রগণকে আহ্বান করেন। প্রথমতঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র গুহ মহাশয় এক অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন— "তোমরা বঙ্গের সুসন্তান! সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য এই মহাসমর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছ! তোমাদের জীবন আজ ধন্য ও সার্থক হইল। আমি ভগবানের নিকট সতত প্রার্থনা করিতেছি তোমরা যেন এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পার; এবং বাঙ্গালীর ভীরু নামের কলঙ্ক ঘুচাইয়া বাঙ্গালীর গৌরব চিরদিনের জন্য অক্ষুন্ন রাখিতে পার। দেশের মঙ্গল কার্য্যে তোমাদের জীবন পরিচালিত হউক। তোমরা কার্য্য সাধন করিয়া যশস্বী যুবকগণ উৎসাহিত হইয়া সমর ক্ষেত্রে প্রবেশ করুক। ভগবান তোমাদিগকে দীর্ঘজীবী করুন! ইত্যাদি। * * * * *

তৎপর অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ বক্তৃতা করেন। বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু শীতলচন্দ্র কর্ম্মকার বি, এ মহাশয় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং ছাত্রগণকে অনেক বিষয় সদুপদেশ প্রদান করেন। মৌলভি সাহেব ও অন্যান্য শিক্ষকগণ ও বক্তৃতা করেন। সানিহাটি গ্রাম নিবাসী পেন্‌সন্ প্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা ছাত্রগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক ভদ্রমণ্ডলী বক্তৃতা করেন।
